REGISTERED No. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দশম বর্ষ—৮ম সংখ্যা।

বৈশাখ।

সন ১৩২৯ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক খণ্ড ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

REGISTERED NO. C—675.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"।

দশম বর্ষ। { ১৮৪৩ শক, ১৩২৯ সাল, বৈশাখ। } ষষ্ঠ সংখ্যা।

আবাহন।*

(পণ্ডিত শ্রীশ্রীপদ বিদ্যাবিনোদ লিখিত।)

এস' এস' হরি, গোলোকবিহারী
বিরাজ', মুরারি হৃদি-বৃন্দাবনে।
বাসনা অন্তরে— অন্তরে অন্তরে
নেহারি তোমা'র জুড়া'ব জীবনে॥
ভকতি-যমুনাকূলে শ্যামরায়,
জ্ঞান-কদম্বেরি মূলে আজি হায়
দাঁড়াও বামে হেলে বিমল বিভায়
"রাধা" বোলে বাঁশী বাজাও' সঘনে॥
বেণু রবে ব'বে যমুনা উজান,
পুলকে পূরিবে তাপিত পরাণ,
ভবজ্বালা সব হবে অবসান
রূপ হেরি হরি এড়া'ব শমনে॥
আমার বলিতে তোমা বিনে আর,
এ ভবমাঝারে কে আছে আমার,
এস' হৃদিনিধি হৃদে একবার
পাপী ব'লে যেন ঠেল'না চরণে॥

* আলেয়া—তেওরা।

উষা সূক্তম্।

(লেখক—শ্রীভববিভূতি শর্ম্ম বিদ্যাভূষণ)

অবতারণা। আমরা বহুবার ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক উষাসূক্ত পাঠের উপযোগিতা নানা-ভাবে ব্যক্ত করিয়াছি। এক্ষণে এই আলোচ্য সূক্তে—২য় ও ৩য় মন্ত্রে উষাদেবীকে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের সখীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবগণের চিকিৎসক ইহা সকলেই বিদিত আছেন। উষার সহিত দেববৈদ্যের যখন এতটা ঘনিষ্ঠতা—তখন উষাকালে উত্থান,—প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে উষাসূক্তপাঠ—ইত্যাদি দ্বারা উষার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিলে যে সহজেই নীরোগ হওয়া যায়—ইহাই বুঝা যাইতেছে; ব্রাহ্মণসন্তানগণ কি সুস্থ ও নীরোগ হইবার জন্য এই সহজ উপায় অবলম্বন করিবেন না? বাবুর দল যে বেলা ৮টা পর্য্যন্ত শয্যায় শায়িত থাকিয়া নিজেরা অম্ল, উদরাময় ইত্যাদি রোগে জীর্ণ হইতে-ছেন,—দেশটাকেও রোগের প্রকোপে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছেন। একবার কাঙ্গালের কথা শুনিয়া আমাদিগের নির্দ্দেশমত যথাকালে উষাসূক্ত পাঠের জন্য উদ্যুক্ত হউন ইহাই বিনীত নিবেদন।

৪র্থ মণ্ডলস্য ৫২ সূক্তম্।

গায়ত্রীচ্ছন্দঃ,—উষো দেবতা।

প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরিস্বসুঃ।
দিবো অদর্শি দুহিতা॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। স্যা (=সা,—সেই স্তূয়মানা) সূনরী (সু—শোভন+নরী—নেত্রী, প্রাণি-গণের নেত্রী স্থানীয়া) জনী (ফলের জনয়িত্রী, ফলদা) স্বসুঃ (স্বসৃস্থানীয়া রাত্রির) পরি (উপরি ভাগে—রাত্রির অবসানকালে) ব্যুচ্ছন্তী (অন্ধকার—বিনষ্ট করিয়া) দিবঃ (দ্যোতমান আদিত্যের) দুহিতা উষা—প্রত্যদর্শি (সর্ব্বজন কর্ত্তৃক—পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।)

বঙ্গানুবাদ। এই স্তূয়মানা নিখিল প্রাণিবর্গের নেত্রীস্থানীয়া,—ফলদা দ্যোতমান আদিত্যের দুহিতা—উষা তাঁহার স্বসৃ স্থানীয়া রাত্রির অবসানে অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া সকল জন কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

অশ্বেব চিত্রারুষী মাতা গবামৃতাবরী।
সখাভূদশ্বিনো রুষাঃ॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। অশ্বেব (অশ্বার মত) চিত্রা (বিচিত্ররূপা) অরুষী (রোচমানা) গবাং (রশ্মি সমূহের) মাতা (নির্ম্মাত্রী) ঋতাবরী (যজ্ঞবতী) উষা—অশ্বিনোঃ অশ্বিনীকুমার

দ্বয়ের সখা (একত্র স্তূয়মানা) হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার দ্বয় ও উষা—একত্র স্তুত হওয়ায় পরস্পরের সখিত্ব প্রসিদ্ধ।

বঙ্গানুবাদ। অশ্বার মত বিচিত্ররূপা—রোচমানা—রশ্মিসমূহের জননী যজ্ঞবতী উষাদেবী অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের সখী স্থানীয়া।

উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি।

উতোষো বস্ব ঈশিষে ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। তুমি অশ্বিনোঃ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের) সখা অসি (হও), উত (অপি চ) গবাং (রশ্মিসমূহের) মাতা অসি। হে উষঃ। বস্বঃ (ধনের) ঈশিষে—ঈশ্বরী।

বঙ্গ। হে উষঃ। তুমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সখীস্বরূপা, রশ্মিসমূহের জননী,—এবং বসু বা ধনের ঈশ্বরী।

যবযদ্বেষসং ত্বা চিকিত্বিৎসূনৃতাবরি।

প্রতি স্তোমৈরভুৎস্মহি ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। যবয়ন্তঃ—বিযুজ্যমান- দ্বেষাংসি শত্রুগণ যাঁহা হইতে—সেইরূপ, অথবা যাঁহা দ্বারা শত্রুগণ পৃথককৃত বা বিদ্রাবিত হইয়া থাকে। রাত্রিকালে হননার্থে উদ্যুক্ত শত্রুগণ —দস্যু চোরাদি—উষাকালে পলায়িত হয়। তাদৃশী—চিকিত্বিৎ—জ্ঞানদাত্রী ত্বা (তোমাকে সূনৃতাবরি (সম্বোধন পদ—বাক্যবতি। পশুপক্ষি প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিবর্গের শব্দ দ্বারা মুখরিত। হে দেবি উষে। তোমাকে স্তোমৈঃ (স্তুতিদ্বারা) প্রত্যভুৎস্মহি (প্রতিবোধিত করিতেছি।

প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ।

ওষা অপ্রা উরু জ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ভদ্রা রশ্ময়ঃ স্তুত্যা রশ্মিসমূহ) প্রতি অদৃক্ষত (পরিদৃষ্ট হইতেছে)—গবাং (উদক সমূহের) সর্গা ন (সৃষ্টির মত—বৃষ্টিধারার মত) এই উষা—উরু (মহৎ) জ্রয়ঃ (তেজঃ) আ অপ্রাঃ (আপূরিত করিয়াছেন)।

বঙ্গানুবাদ। মনোরম রশ্মিসমূহ পরিদৃষ্ট হইতেছে।—উষাদেবি বৃষ্টিধারার মত মহৎ তেজ দ্বারা আপূরিত করিতেছেন।

আপপ্রুষী বিভাবরি ব্যাবর্জ্যোতিষা তমঃ।

উষো অনু স্বধামব ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ। হে বিভাবরি (প্রভাবতি) উষোদেবি—আপপ্রুষী (আপূরয়ন্ত্রী—তেজো দ্বারা জগৎ আপূরিত করিয়া) জ্যোতিষা (তেজোদ্বারা) তমঃ অন্ধকার ব্যাবঃ (=ব্যাবৃণোঃ —আবৃত অর্থাৎ অভিভূত করিয়া থাক)—অনু (পশ্চাৎ) স্বধাং (হবিঃ—প্রভৃতি যজ্ঞীয় অন্ন অব (রক্ষা কর)।

বঙ্গানুবাদ। হে প্রভাবতি উষাদেবী! তুমি তেজোদ্বারা জগৎ আপূরিত করতঃ স্বকীয় জ্যোতিঃ দ্বারা অন্ধকার আবৃত বা অভিভূত করিয়া থাক। পশ্চাৎ হবিঃ প্রভৃতি যজ্ঞীয় অন্ন রক্ষা কর।

আদ্যাং তনোষি রশ্মিভিরন্তরিক্ষমুরুপ্রিয়ং।
উষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। হে উষঃ! রশ্মিদ্বারা দ্যাং (স্বর্লোক) আ তনোষি (ব্যাপ্ত হইয়া থাক) উরু (বিস্তীর্ণ) প্রিয় অন্তরীক্ষ (ব্যাপ্ত হইয়া থাক) শুক্রেণ শোচিষা (প্রদীপ্ত প্রকাশ দ্বারা) যুক্তা হইয়া—এইরূপ করিয়া থাক।

বঙ্গানুবাদ। হে উষে! তুমি প্রদীপ্ত প্রকাশযুক্ত হইয়া রশ্মিদ্বারা স্বর্লোক ও বিস্তীর্ণ প্রিয় অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত হইয়া থাক।

বর্ত্তমান শিক্ষা বা সম্মোহনবিদ্যা।

(লেখক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।)

মানবজাতির শিক্ষার বিষয় চিন্তা করিতে গেলে দুটি প্রণালী চ'খে পড়ে। একের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্ব রক্ষা, অপরের উদ্দেশ্য—সমাজের মঙ্গলসাধন।

প্রথম পক্ষের কথা ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য ধন, জন, পুত্রৈশ্বর্য্য অকাতরে পরিত্যাগ করিতে পারেন তথাপি ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন-দিতে পারেন না। সামান্য পার্থিব রাজ্য দূরে থাক তাঁহারা ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্য বলিতে পারেন "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে" ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পাইলেও আমি ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারি না। এই ভাবপ্রণোদিত হইয়াই কর্ণ স্বহস্তে স্বীয়পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া দিতে উদ্যত হন। ভগবান্ রামচন্দ্র গর্ভবতী পতিপ্রাণা সতীশিরোমণি পত্নীকে নিরপরাধিনী জানিয়াও শ্বাপদসঙ্কুল বনে প্রেরণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ শত সহস্র দৃষ্টান্ত ভারতেতিহাসে মিলিবে। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে কত কত মহাপুরুষ রাজৈশ্বর্য্য ধনরত্ন সম্মান অম্লানবদনে পদদলিত করিয়াছেন। জাতি-হিত-যজ্ঞে ব্যক্তিত্বের আহুতিপ্রদান—"বহুজনসুখায় বহুজন-হিতায়"—আত্মবলিদান বহুত্ব সাগরে একত্বের বিসর্জ্জন দ্বিতীয় পক্ষের মূলমন্ত্র। সতীর সতীত্ব, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান বিনষ্ট হয় হউক, দয়া মায়া স্নেহ মমতা, দূর হয় হোক, নিরপরাধ দুর্ব্বল অন্যায়রূপে নিপীড়িত লাঞ্ছিত হয় হোক, ন্যায় ধর্ম্ম সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট হয় হোক, চাই দেশের হিত, চাই জাতির হিত। এই ভাবের কোনও ভাবুক বলিয়াছিলেন—"দেশের জন্য আমি শতবার জাল করিতে পারি"—শত সহস্র অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করিতে হয়

হোক, ব্যক্তিত্ব ভস্মীভূত হয় হোক, কোন দিকেই দৃক্‌পাত নাই; চাই দেশের হিত, চাই সমাজের কল্যাণ।

পাশ্চাত্য জগৎ এই শেষোক্ত ভাবের সাধক। ভারতে এই উভয় ভাবের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। ভারত সর্ব্বময় ব্যক্তিত্বের উপাসক, ভারতের দৃষ্টিতে আত্মমঙ্গল ও সমাজমঙ্গল এমন কি বিশ্বমঙ্গল অভিন্ন। ভারতে যে নিজেকে যথার্থ ভালবাসে সে সমগ্র সমাজ—কেন সমগ্র জগৎকেই ভালবাসে, কারণ সে জানে,—"ঐ তদাত্মামিদং সর্ব্বং"—সে মানে;—"তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ"—* যাক সে সমুদয় প্রাচীন কথা, অতীতের স্মৃতি. উহা যে আর ফিরাইয়া পাইব তাহা যেন কল্পনারও অতীত হইয়া উঠিয়াছে! বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয় ইহাতে না হয় ব্যক্তিত্ব রক্ষা, না হয় সঙ্ঘসৃষ্টি, ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে চাই ঈশ্বর, কর্ম্মফল ও পরকালে সুদৃঢ় বিশ্বাস। আজকালকার শিক্ষালয়ে ঐ তিনেরই প্রবেশ নিষেধ। সঙ্ঘসৃষ্টি করিতে হইলে, চাই স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশ প্রেম, ও স্বধর্ম্মে বিশ্বাস। আজকাল আমরা বাল্যকাল হইতে ঐ তিনেরই নানারূপ নিন্দা ও বিকৃত ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিতেছি। এবং পক্ষান্তরে আমাদের বিরুদ্ধ ভাবেরই স্তুতিবাদ শিক্ষা করিতেছি। প্রতিদিন যদি এক বিষয়ের স্তুতি বা নিন্দা শুনা যায়, তাহা হইলে ঐ স্তুত-বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও নিন্দিত বিষয়ের প্রতি বিরাগ আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সত্যাসত্য অনুসন্ধান না করিয়া একজনের বাক্যের পর দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া প্রতিদিন ঐরূপ অনুশীলন করিতে করিতে মনের এমন একটা অবস্থা আসিয়া পড়ে যে তাহার আর বিন্দুমাত্রও স্বাতন্ত্র্য থাকেনা; তখন ঐ উপদেষ্টা বক্তা বা উপদেষ্টার সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়ে; তখন ঐ উপদেষ্টা ব্যক্তি যদি একখান নিমের ডাল দিয়া বলে যে ইহা সুমিষ্ট ইক্ষু চর্ব্বণ কর, তাহা হইলে ঐ অভিভূত ব্যক্তি ঐ নিমের ডালখানাকে প্রকৃতই সুমিষ্ট জ্ঞানে চর্ব্বণ করিবে, এবং ইক্ষুদণ্ড দিয়া যদি বলা হয়—ইহা নিমের ডাল, ভয়ানক তিক্ত, দূরে ফেলিয়া দাও, ঐ অভিভূত ব্যক্তি প্রকৃতই উহাকে তিক্তজ্ঞানে দূরে নিঃক্ষেপ করিবে। এই যে এক ব্যক্তির বাক্যের পর নির্ব্বিচারে দৃঢ়বিশ্বাস ইহাকেই হিপ্‌নটিস্‌ম্ বলে। ইহা নিদ্রিত বা জাগ্রত উভয় অবস্থাতেই হইতে পারে The great essential feature of hypnosis is, however, not sleep, but a heightened receptivity of suggestion with or without sleep. Sylvan A. Lee Hypnotist.

অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন, যাদু করিতে হইলে গা ঝাড়ার অনুকরণে হস্ত চালনাদি নানা প্রক্রিয়া করিতে করিতে লোক যখন একরূপ মোহনিদ্রায় অভিভূত হয় তখন তাহাকে যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহা মিথ্যা হইলেও অভিভূত ব্যক্তির নিকট ধ্রুবসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, উহাকেই যাদু (Mesmerism) বলে। জাগ্রদবস্থায় পুস্তকাদি

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যমীমাংসা-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বিরচিত হিন্দু-জীবন গ্রন্থের ভাবার্থ লক্ষণে প্রবন্ধের এইটুক।

যাঠের দ্বারা উহা কেমন করিয়া সম্ভব হয় ? কেমন করিয়া সম্ভব হয় তাহা আমার মত একজন টিকিধারী ব্যক্তি বঙ্গভাষায় বলিলে বর্ত্তমান যুগে বিশ্বাসযোগ্য হইবে না মনে করিয়া বর্ত্তমান যুগের বেদবাণী অবিকল নকল করিয়া দিলাম The effects produced by suggestion in the waking state are matters of everyday notice. (The practice of hypnotic Suggestion. p. 70.)

ভাবার্থ—কৃত্রিম নিদ্রাকালে উপদেশ দিলে যে ফল হয় জাগ্রদবস্থায় প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিলেও ঠিক সেই ফল হয়।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে একজন সুস্থকায় ব্যক্তিকে কোনও বিশ্বস্ত ব্যক্তি যদি বলে – "তোমার শরীর ত খুব খারাপ দেখছি" —আর কতকগুলি লোকে যদি ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সুস্থকায় ব্যক্তি অচিরকাল মধ্যেই অসুস্থ হইয়া পড়িবে। প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত সাহেবের উক্তি যথা ;—

How depressing it is to most people to be toled that they look ill, and if the remark is repeated by several acquaintances in succession, it will take a strong-minded person not to give way to suspicions that his heath is really getting bad.

কোনওরূপে একজনের মনে যদি সদসৎ কোনও বিষয়ের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ঐ বিশ্বাস ফলে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। শিক্ষিত পাঠক মহোদয়গণ ইহা আপনাদের কুসংস্কারপূর্ণ পিতৃপিতামহের উক্তি নহে ; অলৌকিক গল্পপ্রিয় প্রাচীন ঋষিগণের বিরচিত পুরাণ বর্ণিত গাঁজাখোরী গল্প নহে, ইহাও বর্ত্তমান যুগের আপ্ত ঋষিবিরচিত সারগর্ভ গ্রন্থেই আছে। যথা :—

The old story of the French criminal who was condemned to death, and killed by suggestion, is wellknown, but is so much to the point that it will bear being once more referred to.

Some savants begged that a particular prisoner who was awaiting execution might be made the subject of exepriment, to show how powerful the effect of the magination might be. they bandaged his eyes, then slightly scratched his arm, so slightly as not to create any bleeding, a jet of warm water was now allowed to trickle down his arm and speash into a vessel The experimenters talked to each other concerning the length of time a man would take to bleed to death, and every now and then exchanged remarks as to how weak his pulse was becoming, they had not to wait long to see how powerful an effect their suggestion could produce for very soon the poor man's heart began to fail, and his execution, though absolutely bloodless, and a little more tedious, was just as complete as though the guillotine had been employed.

ভাবার্থ এই যে, পুরাকালে ফ্রান্স দেশে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে চক্ষু বাঁধিয়া তাহার বাহুতে একটি আঁচড় দিয়া দেওয়া হয়; এরূপ মৃদু আঁচড় দেওয়া হয় যাহাতে তাহার অঙ্গে রক্তপাতও না ঘটে, পরে ঐ স্থানে ঈষদুষ্ণ জলধারা দেওয়া হইল এবং কতকগুলি লোক পরস্পর বলাকওয়া করিতে লাগিল যে হায়! এ বেচারার অঙ্গ হইতে যেরূপ রক্তস্রাব হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই ইহার মৃত্যু ঘটিবে; আহা! দেখ, দেখ ইহার শরীর কেমন ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠ্‌ছে এইরূপ বলাকওয়ার ফলে লোকটি অচিরকাল মধ্যেই হার্ট ফেল করিয়া মারা গেল। এই যাদুমন্ত্র (Hypnotic suggestion) মৌখিক, লিখিত, অঙ্গভঙ্গী বা দৃষ্টি দ্বারাও হইতে পারে, এ সম্বন্ধে প্রধান যাদুকর লী সাহেবের উক্তি এই;—

By "Hypnotic suggestion" we meen any suggestion made by the operator to his patient, either verbally, in writing, by gesture, look or in any other way during hypnosis.

সুতরাং সুকুমার বালকগণের চিত্তে যদি বাল্যকাল হইতেই স্বজাতি, স্বদেশ, স্বধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা বা অবিশ্বাসের বীজ বপন করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে ঐ বালক উহার প্রভাবে উক্ত উপদেষ্টার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইহাকেই বলে সম্মোহন বিদ্যা! যাহার প্রভাবে আজ সমগ্র দেশ সম্মুগ্ধ! তাই স্বদেশের সুস্বাদু ইক্ষু চর্ব্বণ করিয়া তিক্তজ্ঞানে দূরে ফেলিতেছি, আর বিদেশীয় নিম্বকাষ্ঠ সুমধুর ইক্ষু জ্ঞানে চর্ব্বণ করিয়া মধুরং মধুরং মধুরং বলিয়া বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছি। নিজের সহোদর ভ্রাতাকেও বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই; সম্পূর্ণ সম্বন্ধশূন্য বা বিরুদ্ধ সম্বন্ধ বিশিষ্ট সাত সমুদ্র তের নদীপারের লোকের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস! হইবে না কেন, আমরা যে বাল্যকাল হইতে শিখিতেছি আমরা প্রবঞ্চক, আমরা মিথ্যাবাদী ইত্যাদি। অনেকে হয় ত বলিতে পারেন কথাটি কি সত্য নয়? আমাদের মধ্যে প্রবঞ্চকতা বিশ্বাসঘাতকতা কি অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায় নাই? পাইতে পারে; তাহার মূলেও ঐ Mesmerism বা যাদুবিদ্যা। যাদুক্রিয়ায় অভিভূত ব্যক্তিকে (Hypnotic subject) যদি বলা যায়—তোমার উত্থানশক্তি নাই, সে আর উঠিতে পারিবে না। তোমার বাক্‌শক্তি নাই, সে আর কথা বলিতে পারিবে না। তোমার নিকট তোমার ভ্রাতা যে অর্থ রাখিয়াছে তাহা তুমি অস্বীকার করিবে সে তাহাই করিবে। এই উপায়ে মাতালকে ভাল করা যায়, ভাল লোককে মাতাল করা যায়, চোর করা যায়। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ছিল—

"অহং দেবো নচান্যোস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্"—

আমি মুক্ত আমি ব্রহ্ম দেবতা অপাপ
সচ্চিৎ আনন্দরূপী নাই শোক তাপ ॥

ফলে হইতও তাহা। এখন শিখিতেছি;—

অহস্তমো নচাজ্ঞোস্মি ক্ষুদ্রেবাস্মি সুশোকভাক্
অজ্ঞানো নিত্যদুঃখোঽহং নিত্য বদ্ধস্বভাববান্"
ক্ষুদ্র আমি তমঃ আমি আমি শোকাধার'
নিত্যবদ্ধ থাকা হয় স্বভাব আমার॥
অজ্ঞান স্বরূপ মোর আমি দুঃখময়।
আমিই অনিত্য শুধু এই ভবে হায়!॥

ফলে হইতেছেও তাহাই। প্রাচীন কালের শিক্ষা ছিল,—"সগুণো. নির্গুণো বাপি ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ"—ভগবান্ বলিতেছেন ব্রাহ্মণ সগুণ বা নির্গুণ হউন তিনি আমারই তনু; হইতও তাহাই। এখন বাল্যকাল হইতেই আমরা পণ্ডিত কাজেই আমরা ইহার বিপরীত শিক্ষালাভ করিতেছি। আজকাল অনেক বড়লোকের বাগানে দেখি, বেল মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি পারিজাত বিনিন্দিত দেশীয় কুসুমের স্থান না থাকিলেও, জঙ্গলাকীর্ণ অপরিস্কৃত স্থানে জলাভাবে শীর্ণকায়, অন্নাভাবে শীর্ণ কলেবর স্বজাতীয় দরিদ্র প্রতিবাসীর ন্যায় কোনওরূপে জীবনধারণ করিয়া অপমানেই যেন নিবিড় জঙ্গলে মুখ লুকাইয়া রাখিয়াছে। আর তাহার স্থানে গন্ধহীন বৈদেশিক আর্ত্তব কুসুম (Season flower) সকল মর্ম্মর প্রস্তর বেষ্টিত হইয়া অবিরত বারি-নিষেকে স্ফীতবক্ষে উদ্যানস্বামীর বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়াই যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে। আগে আমরা সন্তানসন্ততির নাম রাম কৃষ্ণ হরি হর প্রভৃতি রাখিতাম; উদ্দেশ্য—পুত্রাদিকে ডাকিবার ছলেও দশবার ভগবন্নাম উচ্চারিত হইলে জীবের পরমকল্যাণ হইবে। এখন জেম্স্ ফক্স প্রভৃতি নাম রাখিয়া মহানন্দ অনুভব করি। আমরা যে দিন দিন ফক্স শ্রেণীতেই উন্নীত হইতেছি তখন আর উহা বৈ আমাদের ভাল লাগিবে কেন? আর কত দৃষ্টান্ত দেখাইব? এইরূপে দেশীয় ফল ফুল নাম ধাম এমন কি হাওয়াটি পর্য্যন্ত ঘৃণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। দুটি একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা বলি—

অনতিকাল পূর্ব্বে কলিকাতা নগরের একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর একখানা গৌরাঙ্গদেবের প্রতিমূর্ত্তি অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়া কলিকাতার একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী ধনীর দ্বারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে, ধনী চিত্রপটের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে চিত্রকর দুইশত টাকা চাহেন; ধনী তাহাতে অধিক মূল্য বলিয়া চিত্রপটখানা ক্রয় করিলেন না। তখন চিত্রকর হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন এমন সময় আমার একটি পরিচিত আত্মীয়ের সহিত তাহার দেখা হয়, তিনি চিত্রকরকে চিনিতেন, পরে চিত্রকরের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—আপনি অমুক সাহেবের নিকট যান তিনি খুব গুণগ্রাহী ও ভারতবন্ধু তিনি লইতে পারেন। তখন চিত্রকর সেই সাহেবের নিকট গিয়া চিত্রপটখানা দেখাইলে সাহেব তাহার চিত্রবিদ্যার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—বাবু! তোমার দুর্ভাগ্য যে ভারতে জন্মিয়াছ; আমাদের দেশ হইলে এই ছবি দ্বারাই তুমি বড়লোক হইতে পারিতে। যাহ'ক তুমি ছবিখানা কত চাও? চিত্রকর দুইশত টাকা প্রার্থনা করিলে; সাহেব তিনশত

টাকা দিয়া বলিলেন, তোমার ছবির মূল্য দুইশত ও পারিতোষিক একশত মোট তিনশত দিলাম, ইহাও অতি সামান্য হইল। চিত্রকর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব! তুমি এ ছবি কি করিবে? সাহেব হাসিয়া বলিলেন,পনের দিন পরে আসিয়া দেখিয়া যাইও। চিত্রকর ঔৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া পনর দিন পরে আসিয়া শুনিলেন—সাহেব ছবিখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন। চিত্রকর জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব! কাহার নিকট ছবিখানা বিক্রয় করিলে? সাহেব যে নাম করিলেন, তাহাতে চিত্রকর বুঝিলেন—তিনি প্রথম যে বাঙ্গালী ধনীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হন, সাহেব তাহারই নিকট ছবিখানা বিক্রয় করিয়াছেন। তখন চিত্রকর সমধিক ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাহেব! ছবিখানা কত মূল্যে বিক্রয় করিলেন? সাহেব হাসিয়া বলিলেন পাঁচশত টাকা! চিত্রকর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাসায় গেলেন।

একদা জনৈক শিক্ষিতাভিমানী ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন ভাই! আজ ট্রেণের মধ্যে একটি সন্ন্যাসীর সাথে আলাপ হইল, লোকটা লম্বা লম্বা সংস্কৃত বচন ঝেড়ে কাণ ঝালাপালা ক'রে তুল্লে। তখন বিরক্তিতে তিষ্ঠিতে না পেরে ভাবলুম যে ভণ্ড বেটা চারগণ্ডা পয়সা খসালে দেখছি। শেষে দেখি লোকটা অনর্গল ইংরাজীতে লেকচার দিতে লাগ্‌লে, তখন বুঝলুম লোকটা নেহাত ভণ্ড নয় শিক্ষিত! কাজেই দুটি টাকার কম আর তাঁর হাতে দিতে পারলুম না! পাঠক মহাশয়! বুঝুন দেশের কি দুরবস্থা! যখন লোকটা আপনাদেরই পরমারাধ্য বেদবেদান্তের কথা বলিতেছিল, ততক্ষণ লোকটা ভণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। আর যেই সেই কথাগুলি বৈদেশিক ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিল অমনি সে শিক্ষিত সচ্চরিত্র বলিয়া গণ্য হইল! এমন কি বৈদেশিক ভাষায় তিরস্কার ও পুরস্কার বলিয়া গণ্য হয়, আর দেশীয় ভাষায় স্বরূপ কথনও বিরূপ বলিয়া মনে হয়। যদি আমি কাহাকেও বলি লোকটা বড় 'বেণে' সে হয় ত আমার নামে মান হানির নালিস রুজু করিবে। পক্ষান্তরে ঐ কথাটিই যদি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বলি He is a great merchant তাহা হইলে সাদরে করমর্দ্দন করিয়া বসাইবেন। আমি যদি কাহাকেও বলি লোকটা গাড়োয়ানী করে, তাহা হইলে তিনি ঘোরতর অপমান মনে করিয়া চটিয়া লাল হইবেন। আবার যদি বলি লোকটা Drivery করে, তাহা হইলে তিনি মহা গৌরব অনুভব করিবেন! আমি যদি পত্নীর ভ্রাতার পরিচয়ে বলি ইনি আমার শ্যালা; তাহা হইলে তিনি আমাকে একান্ত অসভ্য মনে করিবেন। আর যদি বলি ইনি আমার Brother-in-low তাহা হইলে আমি সুসভ্য বলিয়া বিবেচিত হইব!! এই শিক্ষা যদি যাদু (Mesmerism) না হয়, তবে আর কাহাকে যাদু (Mesmerism) বলিব? আমরা শাস্ত্রের লক্ষণ জানিতাম;—"অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং। সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ"—শাস্ত্র অনেক সংশয় ছেদনকারী, পরোক্ষার্থের দর্শক এবং সকলেরই লোচন স্বরূপ সুতরাং ঈদৃশ শাস্ত্রে যাহার জ্ঞান নাই সে অন্ধই। এখন দেখিতেছি ঐ লক্ষণটি সম্পূর্ণ অব্যাপ্তিদোষ দুষ্ট। কারণ এখনকার শাস্ত্র ঐ লক্ষণের সম্পূর্ণ অলক্ষ্য বোধ হয়;—"অনেক সংশয়োৎপাদি

পরোক্ষার্থস্য নাশকং সর্ব্বস্য মোহনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যজ্ঞ এব সঃ”—— অনেক সংশয়ের উৎপাদক, পরোক্ষ বিষয়ের নাশক এবং সকলেরই মোহজনক। এখনকার শাস্ত্রের এইরূপ লক্ষণ করিলেই ঠিক হয়। আগে ভট্টপল্লীর ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের ব্যবস্থাই সকলের শিরোধার্য্য ছিল, এখন উহা উপহাসের বিষয় মাত্র। তাহার স্থানে ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি, আনিবেশান্ত প্রভৃতি যাহা বলেন তাহাই সকলের অবিচার পালনীয়। এই আক্ষেপের উত্তরে অনেকে বলেন যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ যাহা বলেন তাহার অনুকূলে কোনওরূপ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইতে পারেন না; কাজেই আজকালকার লোকে আর শুধু মুখের কথা, শুধু বেদের আদেশ, শুধু লোভ ও ভয় দেখান স্বর্গ নরকের কথায় ভুলে না। এখন বিজ্ঞানের যুগ, চাই বৈজ্ঞানিক যুক্তি। আজকাল সমাজশরীরের এই আর একটি মহা ব্যাধি। আজকাল পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা পূজা প্রভৃতি কার্য্য হইতে টিকি ধারণটির পর্য্যন্ত এক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে। ঐ সকল যুক্তিগুলি যেমনই অসার তেমনই হাস্যজনক। আগে শুনিতাম একাদশীতে অন্ন ভক্ষণ পাপজনক, এখন শুনি ১৫ দিন অন্তর পাকাশয়কে একটু বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য তাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তাহ'লে ত যে কোনও দিন দিলেই চলে এবং উভয় দিন ব্যাপিনী একাদশী হইলে দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস কখনই করিবে না এ সমুদয় ব্যবস্থার হেতু কি? পক্ষান্তরে যাহার অগ্নিবল প্রদীপ্ত তাহার পক্ষেই বা উপবাসের প্রয়োজন কি? পক্ষভেদে পুত্রবান্ গৃহীরই বা উপবাস নিষেধ কেন? আগে শুনিতাম নবমীতে লাউ ভক্ষণ পাপজনক। এখন শুনি চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে২ দেহে রসসঞ্চার হয় সুতরাং নবমীতে স্বভাবতঃই রস বৃদ্ধি হয় ঐ সময় আবার রসবর্দ্ধক লাউ ভক্ষণ ব্যাধি জনক। তাহা হইলে লাউ অপেক্ষা অত্যধিক শ্লেষ্মা বর্দ্ধক দধ্যাদি নিষিদ্ধ হইল না কেন? পক্ষান্তরে পলাণ্ডু প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্য সহযোগে উহার শ্লেষ্মাবর্দ্ধক দোষ নাশ করিয়া ভক্ষণকরায় বোধ হয় দোষ না হইতে পারে; ইহাকেই বলে দেহাত্মবাদ। যাহারা এই ক্ষণস্থায়ী দেহকে কাকবিষ্ঠার ন্যায় অতিতুচ্ছজ্ঞান করিতেন তাহাদের নিখিলচেষ্টাই যেন দেহ রক্ষার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে! অবশ্যই ইহা আমি অস্বীকার করিনা যে ঐ সকলের সহিত স্বাস্থ্যের কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া চলিলে নীরোগ দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় ইহা নিশ্চয়। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষাই উহার মুখ্য লক্ষ্য নহে; উহা অবান্তর ফল মাত্র। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহাতে নানা ব্যভিচার ঘটে, ফলে না যায় লক্ষ্যে পৌছান, না ঘটে অবান্তর ফলসিদ্ধি। একাদশীর উপবাস যদি স্বাস্থ্যের খাতিরে না করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে করাযায় তাহা হইলে দৈহিক স্বাস্থ্যলাভ ত হইবেই, পরন্ত আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যও লাভ হইবে। মন ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইবে, কষ্টের লাঘব হইবে। আর দেহের জন্য একাদশী করিলে রোগচিন্তা মানসে উদয় হইয়া লঙ্ঘনের কষ্টে মন অবসাদগ্রস্ত হইবে, জঠরাগ্নি প্রবল থাকিলে বা লোভনীয় খাদ্য উপস্থিত থাকিলে ঐ একাদশীর প্রতি প্রবৃত্তি থাকিবে না, নিয়ম ভঙ্গ হইবে। একবার নিয়ম ভঙ্গ হইলে দুর্দ্দমনীয় মনকে আয়ত্ত করা

কঠিন হইবে। এই সমুদয় কারণে ধর্ম্মব্যাপারে বৈজ্ঞানিক যুক্তির সন্ধান বিশেষ অহিত কর। বিশেষতঃ একবিষয়িনী যুক্তি অন্য বিষয়ে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রয়োগ করিলে লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অভিধানে দেখিতে পাই,—"মোক্ষেধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"—মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধির নাম জ্ঞান, এবং শিল্প ও ব্যাকরণাদি শাস্ত্র বিষয়িনী বুদ্ধিরনাম বিজ্ঞান। সুতরাং এই বিজ্ঞানের যুক্তির দ্বারা যাহারা মোক্ষশাস্ত্রের লক্ষ্য নির্ণয় করিতে যান তাহারা নিতান্তই অজ্ঞান। ছেলেবেলায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ঋজুপাঠ নামক পুস্তকে "চত্বারো মূর্খ পণ্ডিতাঃ"—নামক একটি গল্প পড়িয়াছিলাম, গল্পটি এখন আমার সম্পূর্ণ মনে নাই; যতটুকু মনে আছে পাঠক মহোদয়গণকে উপহার দিতেছি। চারটি ব্রাহ্মণবালক এক টোলে একত্র অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত হইলে একত্রেই দেশে যাইতেছেন। একটি শ্মশানের উপর দিয়া পথ অথবা পথভ্রষ্ট হইয়া উহারা শ্মশানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তথায় একটি মৃত গর্দ্দভ পড়িয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে একজন বলিলেন,—রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ"—রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে থাকে সে বান্ধব। এ গর্দ্দভটি যখন শ্মশানে রহিয়াছে, তখন নিশ্চয় আমাদের বান্ধব, ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। এই বলিয়া চারিজনে মিলিয়া গর্দ্দভটি স্কন্ধে করিয়া লইয়া গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূরে গিয়া দ্রুতগামী একটি উট্ দেখিয়া একজন বলিলেন,—ধর্ম্মস্য ত্বরিতা গতিঃ"—ধর্ম্মের গতি অতি ত্বরিত। এই জীবটি যখন দ্রুত যাইতেছে তখন নিশ্চয় এ ধর্ম্ম সুতরাং ইহাকে ধর। এই বলিয়া বহুকষ্টে চারিজনে মিলে উটটি ধরিলেন। তখন একজন বলিতেছেন;—"ইষ্টং ধর্ম্মে নিয়োজয়েৎ"—বান্ধবকে ধর্ম্মে নিযুক্ত করিবে, অতএব এই গর্দ্দভটি উটের পায়ে বাঁধিয়া দেওয়া যাক। এই বলিয়া গর্দ্দভটি উটের পায়ে বাঁধিয়া দিয়া তাহারা এক স্রোতস্বতী নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীপার হওয়া আবশ্যক কিন্তু পারের কোনও উপায় নাই। এমন সময় দেখা গেল স্রোতবেগে একটি তৃণ ভাসিয়া যাইতেছে। এক ব্যক্তি এরূপ একটি শ্লোক পড়িলেন, যাহার ভাবার্থ বিপদে পড়িলে তৃণের সাহায্যেও সমুদ্র পার হওয়া যায়, ইহাই বলিয়া একজন তৃণ লক্ষ্য করিয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং নিমজ্জিত প্রায় হইয়া মরণোন্মুখ হইলেন। তখন আর একজন—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ অর্দ্ধেন কুরুতে কার্য্যং..............."—এই বলিয়া বান্ধবের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণাস্ত্রে তাহার শিরশ্ছেদন করিয়া লইলেন। এইরূপ হাস্যজনক আরও অনেক ঘটনা আছে। গল্পটি পড়িয়া তখন বড়ই আমোদ বোধ হইত, তখন বুঝিতাম না যে ইহার মধ্যে এরূপ সারগর্ভ উপদেশ আছে। এখন মনে হয় যে এক বিষয়িনী যুক্তি অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করিলে তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি ত ঘটেই না পরন্তু লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। তাই বলিতেছি শিল্পশাস্ত্রের যুক্তির দ্বারা মোক্ষশাস্ত্রের মর্ম্মাবধারণ করিতে গেলে আমরাও ঐ "চত্বারো মূর্খ পণ্ডিতাঃ"র দলভুক্ত হইব তাহাতে সন্দেহ কি ?।

কথাপ্রসঙ্গে অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছি। আমার আলোচ্য বিষয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি জগতের শিক্ষা-প্রণালীর দুটি ধারা। একটির লক্ষ্য ব্যক্তিত্ব রক্ষা বা আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন, অপরের লক্ষ্য সঙ্ঘসৃষ্টি। আমরা বর্ত্তমানে যে শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে উহার কোন লক্ষ্যেই পৌঁছিবার কোনই সুযোগ নাই পরন্তু বিরুদ্ধ লক্ষ্যের দিকেই সবলে ধাবিত হইতে হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষার দ্বারা সমগ্র দেশটিই যেন যাদু (Mesmeriged) হইয়া রহিয়াছে; তাই আজকাল দেশের নেতৃবৃন্দ জাতীয়শিক্ষা জাতীয়শিক্ষা বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিতেছেন। স্কুল কলেজের ছেলেরা বৈদেশিক শিক্ষালয় ত্যাগ করিয়া দলে দলে জাতীয়বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে; দেখিয়া শুনিয়া প্রাণে বড় আশার সঞ্চার হইল, ভাবিলাম এইবার যখন রোগ ধরা পড়িয়াছে তখন নিশ্চয় সুচিকিৎসা হইবে। আশায় আশায় দুটি একটি জাতীয় বিদ্যালয় পরিদর্শনও করিলাম, হরি! হরি! এ যে দেখি মদ্যপের আতপ তণ্ডুলের মদ্য! এক মদ্যপ পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে পুরোহিতের বিশেষ অনুরোধেও মদ্যপান বন্ধ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য পুরোহিত অনুযোগ করিলে বলিলেন যে আপনি সেজন্য মনে কিছু ক'রবেন না; আমি আজ আতপ চালের মদ খেয়েছি! এও যে দেখি সেই রকম! সেই কোটপ্যাণ্ট চশমা শোভিত গুরুমহাশয়গণ (অবশ্য কোটপ্যাণ্টগুলি খদ্দরের তাহাতে সংশয় নাই সুতরাং আতপ চালের মদ নয় কি?) সেই চেয়ার টেবল বেঞ্চ শোভিত বিদ্যালয় সেই দশটার মধ্যে যাহোক মুখে দুটি দিয়া প্লীহা চাপিয়া ধরিয়া মৃত্যুর সহিত পাল্লা দিয়া দৌড়! এখানেও বিদ্যার্থিগণের মধ্যে সেই বেড়ি, ছড়ি, ঘড়ী, এসেন্স, সাবান, রুমাল, চা সিগারেট প্রভৃতি বিলাস সামগ্রীর অবাধ প্রচলন, কাজেই ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচৌর্য্যই হইয়া থাকে। তবে বিশেষত্বের মধ্যে আতপতণ্ডুলের মদ্য। ঐ জিনিষগুলি সব দেশে প্রস্তুত এবং ঐ সকল সাবানে বিলাতী এসেন্স থাকিলেও দেশীয় শূকর গোরুর চর্ব্বিই যে মিশ্রিত হয় ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। এখানেও পূর্ব্ব পুরুষগণের বন্দনীয় বন্দ্য উপাধি ব্যাণ্ডো মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নবভাবে স্ফূর্ত্তি করিতেছেন। এখানেও চতুর্দ্দশ পুরুষের অপরিচিত দুরধিগম্য বৈদেশিক ভাষায় মনোভাব আদান প্রদান করিবার ব্যবস্থা! এখানেও ঈশ্বর পরকাল বা জন্মান্তরের প্রবেশাধিকার নাই। সন্ধ্যা বন্দনা, সদাচার সংযম কিছুরই অনুষ্ঠান নাই। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই cock has wings cock has wings বলিয়া কক্ কক্ করিতে হইবে আর a sly fox met a Hen ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইতে হইবে, ইহাই আজকালকার জাতীয় শিক্ষা!! ইহাতে কেহ মনে করিবেন না যে আমি সকলকেই টোলে ভর্ত্তি হইয়া "মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং" পাঠ করিতে বলিতেছি। তাহা অসম্ভব বর্ত্তমান সময়োপযোগীও নয়। মুগ্ধবোধ পড়িলেই জাতীয় শিক্ষা হয় না। জাতীয়শিক্ষা মানেই জাতীয় ভাবশিক্ষা। এখন জাতির বন্দনীয় বন্দ্য উপাধিকে ব্যাণ্ডো করিয়া কেন বিজাতীয় ভাব আন? জাতীয় ভাব শিখিতে হইলে বিজাতীয় ভাবের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসহযোগ করিতে হইবে। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোনও বৈদেশিক জিনিষ লইতে হইলেও

তাহাকে জাতীয় ছাঁচে জাতীয় ভাবে ঢালিয়া লইতে হইবে। বৈদেশিক ভাবের সহিত অসহযোগ না করিয়া কেবলমাত্র বৈদেশিক দ্রব্যের সহিত অসহযোগ করিতে চেষ্টা করিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, ঐ বৈদেশিক ভাবেই "অনিচ্ছন্নপি বাষ্ণের্য় বলাদিব নিয়োজিতঃ"—করিয়া তোমাকে বৈদেশিক দ্রব্য লইতে বাধ্য করাইবে, আর যদি বৈদেশিক ভাবের সহিত সম্পূর্ণ অসহযোগ করিতে পার; তাহা হইলে বিনা চেষ্টাতেই বৈদেশিক দ্রব্য সম্ভার তোমার সম্মুখ হইতে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইবে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তুমি যদি নিজকে বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দিতে অগৌরব মনে কর, তৎপরিবর্ত্তে ব্যাণ্ডো বলিয়া. পরিচয় গৌরব মনে কর; তাহ'লে তুমি খদ্দরই পর আর চরকাই গড় তুমি ঘোর কপটাচারী জাতীয় শিক্ষা হইতে এখনও বহুদূরে। মনে রাখিও তোমাদের ভগবদুক্তি—বাহ্যেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ইন্দ্রিয়ার্থান্বিমূঢ়াত্মামিথ্যাচার স উচ্যতে"—যে মূঢ় বাহ্যেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনে মনে বিষয়ের স্মরণ করে সে কপটাচারী। কুশাসনে বসিয়া থালা বাটীতে করিয়া স্বহস্তে মাখিয়া মুরগীর ঝোল দিয়া অন্নভক্ষণ অপেক্ষাও কোট প্যাণ্ট পরিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবলে রাখিয়া কাঁটা চামচের সাহায্যে হবিষ্যান্ন . ভোজন করাকে জাতীয় ভাবসাধকের পক্ষে গুরুতর পাপ বলিয়া মনে করি। কারণ পূর্ব্বোক্তরূপে অভক্ষ্য ভক্ষণ করিলেও জাতীয় ভাবটি বজায় থাকিবে; আর শেষোক্ত ভাবে পবিত্রভোজন করিলেও জাতীয়ভাব নষ্ট হওয়ায় জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে, তাই বলি জাতীয়ভাব নষ্ট করিও না। জাতীয় ভাষায় শিল্পবিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিতে হইবে। পুনরায় বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, অনাচার, কদাচার, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিলাসিতা ত্যাগ করিতে হইবে। সংযমের অবতার শক্তির উৎস কর্ম্মের যন্ত্র, ধর্ম্মের সাধক, জ্ঞানের উপাসক হইতে হইবে; তবেই তোমাদের এই মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইবে। তাই বলি ভারত সন্তানগণ! আর কতকাল মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? যেটিকে তোমরা জাগরণ মনে করিতেছ, উহা জাগরণ নয় উহা স্বপ্নমাত্র! উহাও যাদুকরের যাদু! যাহার প্রভাবে ইক্ষুদণ্ডভ্রমে নিম খাইতেছ, হার ভ্রমে কালসর্প গলায় পরিতেছ, অমৃতজ্ঞানে বিষপান করিতেছ, আর যাদুকরগণ তোমার এই দুরবস্থা দেখিয়া মিটি মিটি হাসিতেছে। তাই বলি আর্য্যসন্তানগণ! উঠ, জাগ নিজের পায়ে ভর করিয়া দাড়াও, ছিড়িয়া ফেল মোহশৃঙ্খল, দূর কর বিলাসবাসনা, স্মরণ কর আমরা ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকির সন্তান। মনে কর আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষের উক্তি,—"নমেদ্বেষরাগৌ, নমে লোভমোহৌ" মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাব শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং—তাই বলি অমৃতের সন্তানগণ! এই অনার্য্য জুষ্ট অস্বর্গ্য অকীর্ত্তিকর মোহ পরিত্যাগ কর। একবার চিন্তা করিয়া দেখ তোমরা কে? তোমরা অমৃতের সন্তান, তোমরা মহতো মহীয়ান্ তোমরা ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং তাই পুনঃ পুনঃ বলি

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং
ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ!—
ওঁ তৎ সৎওঁ—

শিক্ষা।

এই অবনত ভারত যে সময় উন্নত ছিল, যে সময় বিশ্বস্তবাভরণ বলিয়া এই ভারত প্রখ্যাত হইয়াছিল। আধ্যাত্মিক উন্নতির বাসনায় এক সময়ে দেবগণ যে ভারতে যাগাদিক্রিয়াসম্পন্ন করিতেন, ধনবল জনবল জ্ঞানবলে ভারত যখন স্বর্গকেও খর্ব্বপ্রায় করিয়াছিল, যখন পৃথিবীর সকল মানবই এই হীন ভারতের নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিতে আসিত—পৃথিবীর নন্দন-কানন সেই ভারতের আজ এ হেন দুর্দ্দশার কারণ কি? কোন মন্ত্রবলে কোন যাদুবিদ্যা বলে ভারতের সেই অতুল সুখসৌভাগ্য চিরাস্তমিত এবং ভারতসন্তানগণের হৃদয় চির তমসাবৃত! যে দেশে অকালমৃত্যু ছিল না, অকালে মরণ হইলে মৃতের অভিভাবকগণ তথা সমাজ রাজাকেই দায়ী করিত, রাজাও অবনত মস্তকে সেই দায়ীত্ব গ্রহণ করিতেন, এবং স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন (নমেস্তেয়ো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। ন নাহিতাগ্নির্না যজ্বা. ন স্বৈরো নচ স্বৈরিণী) আমার রাজ্যে চোর নাই, কদর্য্য ব্যক্তি নাই, মদ্যপ নাই, নিরগ্নি অযাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষ নাই, ব্যভিচারিণী স্ত্রী নাই এ হেন ভারতের এই স্বর্গীয় সম্পদ কোন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালপ্রভাবে অদৃশ্য হইল!

যে ভারতে মানবে দেবত্বের প্রথম বিকাশ হয়, মানবের অমরত্ব প্রথম বিঘোষিত হয়, আজ সেই ভারতের এই দুর্দ্দশার কারণ কি? এ বিষয় নিবিষ্টভাবে আলোচনা করিলে বৈদিক সময় হইতে এ যাবৎ কালের ইতিহাসাদি যাহা আছে তাহার অনুশীলনে স্বতঃই উপলব্ধি হয় যে একমাত্র শিক্ষাই তাদৃশ উন্নতির কারণ—আবার এইরূপ শিক্ষাই এতাদৃশ অবনতির কারণ *।

শিক্ষা মানবকে দেবত্বে বিভূষিত করিতে পারে, আবার শিক্ষাই মানবকে দানবে পরিণত করে, যে দিন যে মুহূর্ত্তে নির্ম্মল আর্য্যশিক্ষায় মলিনতা প্রবেশ করিয়াছে, যে দিন যে মুহূর্ত্তে সাত্ত্বিক বলের সহিত রাজসিক বলের সংগ্রামে তমোবলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে নিবৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রবাহ প্রবৃত্তির দিকে ধীরে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে এই অবস্থায় ভারতকে দাঁড় করাইয়াছে, সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা ভেদে শিক্ষা দুই প্রকার। যাহাদ্বারা অন্তঃকরণের সদ্বৃত্তি নিচয়ের পরিস্ফুরণ ও পরিপোষণ হয় তাহাই সুশিক্ষা। আর যাহার দ্বারা কুবৃত্তিগুলির স্ফুরণ ও পোষণ হয় তাহাই কুশিক্ষা। বিদ্যালয়ে কেবল বিদ্যার অনুশীলনেই অন্তঃকরণবৃত্তি সমূহের সম্যকস্ফুরণ হয় না, সদসদনুষ্ঠান ও সংসর্গ তাহার অন্যতম কারণ। যাহার বিদ্যমানতায় যাহার বিদ্যমানতা, এবং যাহার অভাবে যাহার অভাব হয় সেই কার্য্যের প্রতি সেইকারণ। এই অন্বয় ও ব্যতিরেকসিদ্ধকারণ। অন্তঃকরণ বৃত্তি বিস্ফুরণরূপ কার্য্যের, যেমন বিদ্যার অনুশীলন তেমন সদসৎ কর্য্যের অনুষ্ঠান ও সদসৎ সংসর্গ,

---

* কিং কিং ন সাধয়তি কল্পলতেব শিক্ষা।

কিন্তু ইহাতে বিশেষত্ব এই যে যে জাতীয় অনুষ্ঠান ও সংসর্গ ঘটে—অন্তঃকরণের সেই জাতীয় বৃত্তির বিকাশ ও পুষ্টিসাধনে পূর্ণসহায়তা করিয়া বিদ্যানুশীলন কারণরূপে অভিহিত হয় এই জন্যই "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি॥ মহাবাক্যের ন্যায় এই বাণী হিন্দুসমাজের সকল স্তরে প্রসার লাভ করিয়াছে। কুপ্রবৃত্তিপরায়ণগণ মধ্যেও লেখাপড়া জানা লোক বেশী দুর্জ্জন, কেননা অন্তকরণের কুবৃত্তির বিকাশে ও বর্দ্ধনে লেখাপড়া পূর্ণ সহায়তা করিতেছে।

পক্ষান্তরে সদ্বৃত্তিপরায়ণ জনগণমধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ সুতরাং বিদ্যানুশীলন অন্তঃকরণের সদ্বৃত্তিনিচয়ের প্রকাশে ও বর্দ্ধনে সহায়তা করিয়া শিক্ষানামের অধিকারী হইয়াছে।

প্রবৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রবল প্রবাহে ভারতে সেই সকল সুখসৌভাগ্য সুদূর অতীতের কোলে ভাসিয়া গিয়াছে, আজ বিশ্বম্ভরা ভারতভূমি নিজেকে ভরণ করিতেও সমর্থ নহে, তাই আজ পৃথিবীর নন্দনকানন শ্মশানে পরিণত, তাই আজ দেবভূমির বিনিময়ে পিশাচভূমি। অন্তঃকরণের সদ্বৃত্তিনিচয়ের পরিস্ফুরণই প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ। যাহার বলে মানব অন্য জীব হইতে পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়, সেইটীই মানবের অনন্য সাধারণ ধর্ম্ম; আর তাহাই মনুষ্যত্ব, ঐ মনুষ্যত্বের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে অন্তঃকরণের সদ্বৃত্তি সমষ্টি ব্যতীত অপর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং মনুষ্যত্বের উৎপত্তি সূক্ষ্মশরীরে; স্থূল শরীরে তাহারা বিকাশ হয় মাত্র; জন্মান্তরীয় অনুশীলনের ফলে অন্তঃকরণের যে সকল বৃত্তি গুলি স্ফুটনোন্মুখী হয়, সেইসকল বলবৎবৃত্তি প্রকাশযোগ্য স্থূলশরীর প্রাণীগণ লাভ করে, এই কারণেই জীবগণ কখনও পশুযোনি কখনও বা মনুষ্যযোনি কখনও বা দেবযোনি লাভে সমর্থ হয়। অন্তঃকরণই অন্তঃকরণের পাশবিকবৃত্তির (ঘোর তামসিকবৃত্তির) বলবত্তায় পশুযোনি, সদ্বৃত্তির বলবত্তায় মনুষ্যযোনি,) শ্রেষ্ঠ সদ্বৃত্তির বলবত্তায় দেবযোনি লাভ সংঘটন করিয়া দিয়া নিজবৃত্তি নিচয়ের প্রকাশ করে, সুতরাং অন্তঃকরণের এই বৃত্তিবিভাগই জাতিবিভাগ, আর অন্তঃকরণের বৃত্তির বিকাশই জাতির বিকাশ বলিতে হয়; যেমন বলবৎ পাপবৃত্তি জীবকে পশুদেহ ধারণ করাইয়া পশুত্ব ও মানবত্বের ভেদটা অনুভূত যোগ্য করিয়া দেয়, তেমনই মনুষ্যমধ্যেও সাত্বিক রজঃসাত্বিক, রজস্তামসিক ও তামসিক এই মানবীয় অন্তঃকরণের চতুর্বিধ বৃত্তি চতুর্বিধ দেহ গঠন করাইয়া মানবগণকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেয়। অর্থাৎ অন্তঃকরণের বলবৎ সাত্বিক বৃত্তি তাহার বিকাশ উপযোগী সাত্বিক স্থূ·দেহ রজঃ-সাত্বিকবৃত্তি তাহার বিকাশ যোগ্য রজঃ সাত্বিক স্থূলদেহ রজস্তামসিকবৃত্তি তাহার বিকাশযোগ্য রজস্তামসিক দেহ এবং মানবীয় অন্তঃকরণের বলবৎ তামসিকবৃত্তি তমঃ-প্রধান স্থূলদেহ গঠন করাইয়া নিজ নিজ বিকাশসাধন করিয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক সৃষ্টি কৌশল অবলম্বন করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন, "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ অন্তঃকরণের স্ফুটনোন্মুখী বলবৎবৃত্তি সকল নিজ নিজ বিকাশযোগ্য তথাবিধ স্থূলদেহ গঠন করিলেও পার্থিব ধূলি সমাবৃত মহার্ঘমণির ন্যায় ভূমিতলগত মলিনতাবৃত হইয়া নিজ স্বরূপ প্রকাশে অক্ষম হইয়া পড়ে; সেই মলিনতা দূরকরণার্থ সংস্কারবৎ শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা।

শাস্ত্রকারগণ সংস্কারকেই প্রধান আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "চিত্রং কর্ম্ম যথা নেকৈরঙ্গৈ রুন্মিল্যতে শনৈঃ ব্রাহ্মণ্যমপি তদ্বৎ স্যাৎ সংস্কারৈর্বিধিপূর্ব্বকৈঃ। চিত্রশিল্পীর পুনঃ পুনঃ তুলিকাপাতে যেমন একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনোহর মূর্ত্তি চিত্রফলকে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সংস্কার সাধনতায় ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হয়, ব্রাহ্মণত্ব (মানবীয় অন্তঃকরণের বলবৎ সাত্ত্বিক বৃত্তি) নিজ বিকাশ যোগ্য দেহ গঠন করিলেও সংস্কারের ন্যায় সদনুষ্ঠান ও সৎ সংসর্গের সহিত বিদ্যানুশীলন পার্থিব মলিনতাকে দূর করিয়া বিকাশের কারণ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব বিকাশযোগ্য দেহ জীবগণ পাইলেও তাদৃশ শিক্ষাদির অভাবে ব্রাহ্মণ মনুষ্যত্ববৎ ক্ষত্রিয় মনুষ্যত্ব বৈশ্য মনুষ্যত্ব, শূদ্র মনুষ্যত্ব বিকাশের অভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন স্বর্ণ রৌপ্য নামে অভিহিত দ্রব্য স্বর্ণ বা রৌপ্য কিনা জানিতে হইলে, নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া জানিতে হয়, সেইরূপ এই স্থূলদেহ প্রথম শ্রেণীর সদ্বৃত্তি বিকাশের আধার কি না জানিতে হইলে, স্বর্ণাদি সংস্কারের ন্যায় তথাকথিত সংস্কারও শিক্ষারূপ নিকষ প্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া জানিতে হয়। সংস্কার ও শিক্ষায় যে দেহে ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ হইল না—সে দেহ ব্রাহ্মণ দেহ নহে বুঝিতে হয়। সেইরূপ অন্য দেহত্রয়ও বোঝা যায়। সুতরাং চতুর্বিধ দেহেই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রাকৃতিক মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সুশিক্ষার সর্ব্বথা প্রয়োজন, আর তথাকথিত সুশিক্ষা লাভের জন্যই শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের বিধান আছে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে সদ্বৃত্তি পরিস্ফুরণোপযোগী কতকগুলি সদনুষ্ঠানের বিধি, আর কতকগুলি তথাবিধ স্ফুরণ প্রতিকূল কার্য্যের নিষেধ, তাদৃশ বিধিনিষেধ মানিয়া যতকাল পর্য্যন্ত অধ্যয়নের নিয়ম আছে সেই নিয়মিত কালকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর তাদৃশভাবে অধ্যয়নকারীকে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী বলে। প্রাচীনকালে বিদ্যানুশীলনের সহিত সদনুষ্ঠানও সৎসংসর্গ করিতে হইত বলিয়া প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ ঘটিত; আর তাহারই ফলে তখন মানবে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, আর এখন বিদ্যানুশীলনের সহিত, তাদৃশ ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান ও সৎসংসর্গ ঘটনা হয় না তাই এখন মানবে মনুষ্যত্বের বিকাশের পরিবর্ত্তে দানবত্ব বিকাশই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

পূজ্যপাদ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাত বৎসর ৺কাশীবাস করিবার পর গত ২৬শে বৈশাখ বেলা ১০॥টার সময় নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। তাঁহার সৎকর্ম্মময় পবিত্র জীবনের আদর্শ আমাদের আলোচনা ও অনুকরণের যোগ্য বিবেচিত হওয়ায় তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নে বিবৃত করা হইল।

৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাতুলালয়ে কলিকাতার ৬।নং বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীটের বাটীতে ২৩শে অগ্রহায়ণ ১২৬৪ ইংরাজী ৭ই ডিসেম্বর ১৮৫৭ সোমবার সপ্তমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন।*

হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৪ অব্দে হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৭৯ অব্দে বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ১লা ফেব্রুয়ারী পরীক্ষার ফল বাহির হইলে সেই দিনই তিনি হুগলী নর্ম্মাল স্কুলে অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। প্রায় দেড় বৎসর পরে এম্,এ পরীক্ষা দিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রাপ্ত হইয়া নোয়াখালি গমন করেন ও ২৭শে অক্টোবর ১৮৮০ তারিখে কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

এই চাকরী লইয়া যাত্রাকালে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺ভূদেববাবু তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন—"এই বংশ চিরকাল অধ্যাপকের বংশ। তুমিও শিক্ষকতা করিতেছিলে এক্ষণে তোমার কার্য্যে একই একজিকিউটিভ কার্য্য মিশ্রিত আছে, একটা পেয়াদার চাকরীতে লোক নির্ব্বাচনই হউক আর খুনি মোকর্দ্দমাই হউক যেখানে 'তোমাকে' মত স্থির করিতে হইবে, তাহা তোমার ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যের কথা; তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।" এই উপদেশ তিনি কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার সংস্রবে যে কেহ আসিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন।

৺মুকুন্দবাবুর চরিত্রের বিশেষত্বই এই ছিল যে যখনই কোন বিষয়ে তাঁহাকে মত স্থির করিতে হইত তখনই সেইরূপ অবস্থায় তাঁহার পিতৃদেব কি করিতেন বা কি বলিতেন যেন ধ্যানে সেইটি জানিবার চেষ্টা করিতেন। একবার একজন অধ্যাপক কোন বিষয়ে তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে বলায় তিনি বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ হইতে সেই সম্বন্ধে ভূদেববাবুর মত পড়িয়া শুনাইতে তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলেন। উক্ত অধ্যাপক বলেন, "ওটা ত আমার পড়া ছিল। আপনার স্বাধীন মত আমি চাই॥" তাহার উত্তরে মুকুন্দবাবু বলিয়াছিলেন "স্বাধীন মানে ত স্ব=অধীন। তা বাবার মত যদি আমার স্ব মত না হয় ত কার মত আমার হইবে।"

আপন জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া লইবার কথা উঠিলে ৺ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন "আমার পিতৃদেব হইতেই আমার সব যদি এইটা দেখাইবার জন্য আমার জীবনী লেখ তবেই সেটা সার্থক হইবে। নচেৎ বৃথা হইবে।" মুকুন্দবাবুর সম্বন্ধেও এই কথা খাটে; কারণ তিনি তাঁহার পিতার ছায়া ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও পিতাকে উল্লেখ করিয়া রোগের যন্ত্রণায় বলিয়াছিলেন "বাবা, যদি আমার জীবনের কাল শেষ হইয়া

* আমরা স্বর্গীয় মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টিত ছিলাম, ইতিমধ্যে এডুকেশন গেজেটে অনেকটা প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অতিরিক্ত আর কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে উহা পাঠক সমীপে উপস্থিত করিব। ব্রাঃ সঃ সঃ

থাকে তবে তুমি এ'স আমার তোমার কাছে লইয়া যাও, যদি কাজ বাকি থাকে তা হলে একটু কষ্ট কম করে দাও।"

অবস্থার তুলনায় তাঁহার দান অপরিমিত ছিল। কাশীর জনসাধারণ তাঁহাকে "দাতাকর্ণ" আখ্যা দিয়াছিল। তবে তিনি প্রকাশ করিতে চাহিতেন না, বরাবরই গুপ্তদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের দেহান্তর হইলে তিনি তাঁহার প্রাপ্য অর্থদ্বারা "সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার" নামক একটি ফণ্ড স্থাপন করেন। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দরিদ্র বিপন্ন ও আর্ত্তের সাহায্য এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে সহায়তা করার মুখ্য উদ্দেশ্যে এই ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। বিগত ৮২ বৎসর ধরিয়া এই সমিতি নানা পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন

এ ভিন্ন কান্যকুব্জ চতুষ্পাঠী স্থাপন এবং গো সেবার্থ গোকুণ্ড সমিতির সংস্থাপনার্থ অর্থেও একান্ত চেষ্টায় এই ভগ্নশরীরেও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছিলেন; গোকুণ্ড ফণ্ডে তাঁহার অকৃত্রিম প্রিয়বন্ধু সার ডেভিড্ উইল সাহেব ৭৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মুকুন্দবাবু তাঁহার পিতার অক্ষয়কীর্ত্তি বিশ্বনাথ ফণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া নিজ পিতার নামে ৺ভূদেব বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যায় বিশ্বনাথ বৃত্তি সীমাবদ্ধ। এই বৃত্তি কাশীধামে কয়েকটী অধ্যাপককেও দেওয়া হয়। তৎপরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নামে ৺গোবিন্দ বৃত্তি নামেও একটী বৃত্তি দেওয়া হয়। বেহার ও উঃ প্রঃ প্রদেশের জন্য তিনি ভূদেব হিন্দি মেডেল দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পিতার কীর্ত্তি রক্ষা এবং বৃদ্ধিই তাঁহার জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য ছিল।

৺মুকুন্দবাবু বরাবরই সুলেখক ছিলেন। বিগত অর্দ্ধশতাব্দীকাল যাবৎ এডুকেশন গেজেট পত্রে তাঁহার রাশি রাশি রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। তবে কোন বিষয়েই যেমন তিনি নিজেকে প্রকাশিত করিতে ভালবাসিতেন না, সেইরূপ তিনি কখনও লেখায় নাম দিতেন না। তাঁহার লিখিত সুচিন্তিত পুস্তকগুলির মধ্যে তিনখণ্ড সদালাপ, নেপালী ছত্রী, ভূদেবচরিত এবং অনাথবন্ধু (উপন্যাস)—এই কয়েকটীই সমধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অনাথবন্ধু উপন্যাস ১৮৯৫ অব্দে যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল সংবাদ পত্রেই তাহা উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছিল। অনাথবন্ধু পুস্তকে তিনি দেশহিতৈষিতা প্রচারের এবং আদর্শ হিন্দুগৃহের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, চিরজীবনের কার্য্যে তাহাই দেখাইয়াছেন। স্বদেশী প্রচার যেভাবে হইলে নির্দ্দোষ এবং স্বদেশের মঙ্গলের হেতু হইবে এই পুস্তকে তিনি তাহা দেশবাসীকে বহুবর্ষ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত "সদালাপ" পুস্তকের তিনখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ও আরও কয়েক খণ্ড লিখিত আছে। বহুতর শুভত্বপূর্ণ কাহিনী জীবনচরিত দেশকাল জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এই সংগ্রহে স্থানলাভ করিয়াছে। গ্রন্থের মুখবন্ধে গ্রন্থকার পুস্তক সম্বন্ধে পরিচয় দিবার কালে বলিয়াছেন "সদালাপে সংগৃহীত রত্নগুলির অধিকাংশই প্রাচীনকাল হইতে মানবের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে এবং অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত আকারে ভূমণ্ডলের একাধিক ভাষা মুদ্রিত আছে; তবে এই সংগ্রহে সকল কথাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এ গুলি পরিবার বর্গের এবং বন্ধুবান্ধবের সহিত পড়ার খানিকটা সময় আনন্দে কাটিতে পারে। প্রবন্ধগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সেইজন্য রেলে, ট্রামে নৌকার ও ঘোড়ার গাড়ীতেও পড়া চলিতে পারে। এই সংগ্রহে সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি প্রীতিপোষণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার ভাল কথা প্রচারের চেষ্টা হইয়াছে।

"আমার মনে হয় যে, পাঠকগণ একবার সমস্তটা তাড়াতাড়ি পড়িবার সময় যেগুলি ভাল নালাগে, সেগুলি যদি পেনসিলের দাগ দিয়া কাটিয়া দেন এবং দ্বিতীয়বারে সেগুলিন না পড়েন, তাহা হইলে এই সংগ্রহ হইতে সকলেরই নির্ম্মল আনন্দলাভ ঘটিতে পারে। যেটা একজন কাটিয়া দিবেন সেই টাই হয় ত আর একজনের খুব ভাল লাগিবে। ফলতঃ এই পুস্তক সম্বন্ধে যে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি, সমস্ত জীবনে সকলের সহিত ব্যবহারেই সেই প্রকার উপায় অবলম্বন করিলে সকলেরই মনে শান্তি এবং আনন্দ অক্ষুন্ন থাকিতে পারে।"

বাস্তবিক সদালাপের ন্যায় বহু মহাপুরুষের চরিত্র ও উক্তি সংস্পৃষ্ট এবং সুচরিত্র গঠনের সহায়ক ও জাতীয় জীবনীশক্তির সম্বর্দ্ধক পুস্তক বঙ্গসাহিত্যে অতি অল্পই আছে।

তাঁহার লিখিত নেপালীছবি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালের সুন্দর ইতিহাস। ইহার বহুতরতথ্য অনেক দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও কাগজপত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীরামচরিত্রের আলোচনা নামে তিনি একটি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য "ভূদেব চরিত" ইহার প্রথমখণ্ড ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাকী অংশ এখনও মুদ্রিত হইয়া উঠে নাই। একান্ত ভগ্নশরীরে বিপুল পরিশ্রমের পর ঐ বইখানি সবে মাত্র সমাধা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার জীবনের ব্রত আজ সাঙ্গ হইল। আমার পিতৃদেবের জীবনী যদি আমি আমার স্বদেশবাসীকে নাদিয়া যাইতাম তবে আমায় তাহাদের নিকট অপরাধী হইয়া যাইতে হইত।" নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বইখানি ছাপা তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না।

"আমার দেখালোক" নামে আর একখানি বিবিধ ও বিচিত্র ঘটনা সমন্বিত পুস্তক লিখিত হইয়া আছে। তাহার মুদ্রণও তিনি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি যে পড়িয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

৺মুকুন্দবাবু ধনীগৃহে জন্মিয়াও কোনদিন বিলাস সুখে মগ্ন হয়েন নাই। তিনি চিরদিনই ত্যাগী সংযমী ও অনাসক্ত পুরুষ ছিলেন। যৌবন হইতেই তিনি পিতৃ প্রদর্শিত পথে স্বদেশ শিল্পের রক্ষণ ও প্রচারে কায়মনোবাক্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীজী যে নির্ব্বিরোধ স্বদেশী প্রচারের ও স্বদেশ সেবার উপদেশ দিয়াছেন, বহুবর্ষ পূর্ব্বে পুষ্পাঞ্জলিকায় ভূদেববাবু সেই কর্ম্মনীতির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ৺মুকুন্দবাবু পিতার উপদেশ সমস্ত জীবন ধরিয়াই নীরব সাধনার অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বদেশী সাধন অকৃত্রিম ও উদার এবং অচঞ্চল ছিল। বঙ্গবিচ্ছেদের বহুবর্ষ পূর্ব্বে অত্যন্ত ক্লেশসাধ্য ও দুষ্প্রাপ্য স্বদেশী শিল্পের ব্যবহার তিনি সপরিবারে করিয়া আসিতেছিলেন। খদ্দর পরা তাঁর বাড়ীতে আজ নূতন নয়। যেখানে যখন যে স্বদেশী শিল্পের বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠান

খোলা হইয়াছে, সেখানে দ্বিধাহীনভাবে সেয়ার কেনা বা সাহায্যদান তিনি করিয়াছেন "টিউটি-কোবিন" "কেশরসুগার" ইত্যাদিতে অনেক টাকাই লোকসান হইলেও তিনি পুনশ্চ নূতনকার্য্যে অর্থ নিয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বলিতেন, "দেশের কার্য্যে দেশের লোক ক্ষতির ভয় পাইলে কাজ হইবে কেন? দশটা গেলেও দুইটা ত টিকিবে।"

তিনি নিজে স্বদেশী মোটা সুতার আট হাতি খাটো ধুতী পরিয়া ও চটি পায়ে দিয়া সর্ব্বত্রই গমন করিতে কখনই দ্বিধাবোধ করেন নাই। বাড়ীর লোকে কেহ আপত্তি করিলে বলিতেন "আমি যদি লম্বা কোঁচা ঝুলাইয়া বেড়াই সে কিছুই বিচিত্র নয়" ইহাতেই বরং কেহ কেহ বলে "আপনি যদি পারেন, তবে আমরাই বা না পারিব কেন?" ইতর ভদ্র সকল সম্প্রদায়ের যে কোন লোক তাঁহার সংস্রবে আসিত, সেই তাঁহার একান্ত অমায়িক সহৃদয়তা—পূর্ণ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধান্বিত ও ভক্তিমান হইত। পথে ঘাটে নিজের মাথায় মোট তুলিতে তিনি অসমর্থ মুটে দেখিলে নিজের হাতে তাহার মাথায় মোট তুলিয়া দিয়াছেন, অন্ধ ভিখারীকে হাতে ধরিয়া নিজের লাঠি তাহাকে দিয়া গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কাহারও যাচ্ঞা বা অনুরোধ তিনি অবহেলা করিতে পারিতেন না। সেইজন্য কেহই তাঁহার দ্বারে অর্থ সামর্থ্য ও সাহায্য খুঁজিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে প্রবেশ করিতে বাধা পায় নাই। তাঁহার শরীর কয়েক বৎসর হইতেই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিল। সেই ভগ্ন শরীরে তিনি সভাসমিতির এবং দুস্থ বিধবা প্রভৃতির বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদনার্থ নিজের কোনও অসুবিধাকে গ্রাহ্য করিতেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিবসেও মহিলা-ভৈষজ্যালয়ের অধিবেশনে যোগদান করিয়া আসেন। সকলের সহিত সহানুভূতিতে তিনি কখনই নিজের কথা ভাবিতে শিখেন নাই।

মুকুন্দবাবু জীবনে অনেক শোক-দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। পিতৃবিয়োগ শোকের আঘাত সহনীয় হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও একান্ত স্নেহময় জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺গোবিন্দ দেব বাবুকে হারান। মুকুন্দবাবু পিতার প্রতি যেরূপ ভক্তিমান ছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপরও সেইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অকালবিয়োগে কয়দিনের মধ্যেই তিনি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভ্রাতার মৃতদেহের সাক্ষাতে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে নিজের পুত্রে ও ভ্রাতুষ্পুত্রে তাঁহার বিন্দুমাত্রও প্রভেদ থাকিবে না। সাংসারিক সকলকার্য্যে তিনি সে প্রতিজ্ঞা চিরজীবন পালন করিয়াছিলেন। অতিক্ষুদ্র বিষয়েও কখনও তিনি এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। জীবনের শেষভাগে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি বড় বড় শোকের আঘাতে তাঁহার শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাঁহার একটি কন্যার বিবাহের বৎসরেই বৈধব্য ঘটে। ইহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় তৃতীয় পুত্র সোমদেবের অকাল বিয়োগ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গণদেব একদিনের জ্বরে (মেসিন হাইটিস এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রামদেব কয়েকদিনের ইনফ্লুয়েঞ্জায় অকস্মাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। পরিশেষে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রবধূর মৃত্যু ঘটে। এই সকল পারিবারিক দুর্ঘটনায় তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর ও দৃঢ়চিত্ত অত্যন্ত দ্রুত ভগ্ন হইয়া পড়ে। বাহিরের লোকের কাছে

কখনই তিনি শরীর মনের কোন প্রকার দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতেন না, সমস্তই নিজের হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইহার ফলে তিনি কঠিন হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাঁহাদের পৈতৃক বাতব্যাধিও কয়েকবৎসর হইতে শরীরে জোর করিয়াছিল। অনিদ্রারোগে দেড়বৎসর যাবৎ বিশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু এমতাবস্থাতেও পিতার জীবন-চরিত লেখায় বা শোনায় তাঁহার সকল কষ্ট বিদূরিত হইত। কোনও বাহিরের লোক আসিলে চিরাভ্যস্ত সহজ ও সানন্দ মূর্ত্তিতে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার ভিতরের কষ্ট কিছুই বুঝিতে পারিত না।

তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "লোকের মুখে 'আহা' শুনিতে যেন আমার মাথা কাটা যায়।" মুকুন্দবাবু তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতার যে প্রাতঃস্মরণীয় পুত্র ছিলেন তাহাতে কোনও সংশয় নাই। তিনি নিজেকে কখনও প্রচার করেন নাই, কিন্তু নিজের ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যপূত, নির্ভিকমত জীবনের সকল সময় সকল অবস্থাতেই ইংরাজ ও স্বদেশীয় সকলের মধ্যেই অকুণ্ঠিত ভাবে প্রচার করিয়াছেন। কার্য্যজগতে অনেক বড় বড় ইংরাজ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন, তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিয়াছেন, সকল নিম্নতন কর্ম্মচারী তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন প্রাতেঃ একটা সভায় যান সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলে গিয়া শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা আলাপ আনন্দে কাটাইয়া আসেন। তাঁহার মৃত্যুকে ভীষ্মদেবের ন্যায় ইচ্ছামৃত্যু বলা যায়। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা আসিলে তাঁহাকে বলেন, আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আর একমাসের মধ্যেই আমার শেষ হইবে। আমার বাবার শ্রাদ্ধের দিন বৈকালে আমি যাইতে চাই। আমি বাবা ছাড়া কিছু জানিনা। লোকে আমায় সুপুত্র বলিয়া জানিবে। ২৪শে বৈশাখ শ্রাদ্ধের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে ব্রাহ্মণভোজন ও অধ্যাপক বিদায়ের বন্দোবস্ত সমস্তই স্বচক্ষে দর্শন করেন। বৈকালে পরিজনবর্গের নিকটে বলেন "দেখ, একাদশীর দিন মৃত্যু হইলে বাড়ীর লোকের বড় কষ্ট। দ্বাদশীর দিনটাও ভাল নয়। ত্রয়োদশীতে মরণই ভাল।" ২৬শে বৈশাখ অতি প্রত্যূষে ত্রয়োদশীতে গৃহদেবী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিকে দর্শন করিয়া অর্দ্ধঘটিকাকাল তাঁহার সমীপে থাকিয়া ধ্যান প্রণামাদি করেন। ইহার ঘণ্টা দুই পরেই নিদ্রা হইতে উঠিয়া অবসন্ন বোধ করিলেন। বলিলেন আমার "কি পক্ষাঘাত হইল নাকি।" ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন নাড়ী নাই। তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয় গীতার একাদশ অধ্যায় পাঠ করিয়া শুনান। তাঁহার একটি বিশেষ ভক্ত শ্রীরাম-স্তোত্র গান করিলে তিনিও সঙ্গে সঙ্গে গান করিতে থাকেন। আর একটি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কাছে আমার আর কোনও স্বীকৃতি নাই তো আমি যে চলিলাম।" তাহার পর তাঁহার বিধবা কন্যাকে নিজে ডাকিয়া দেবীস্তোত্র পাঠ করিতে আদেশ করেন। ইহার দুএক মিনিট পরেই বেলা ১০॥টার সময় নিতান্ত সহজভাবে যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

এইভাবে মহানিদ্রার শান্তিময় ক্রোড় লাভ করিলেন। এই সময় তাঁহার মুখে সমাধি লাভের আনন্দই প্রকাশিত হইয়াছিল; সেই প্রফুল্ল মুখে মৃত্যু কালিমার স্থানও ছিল না। তাঁহার লিখিত সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনীর প্রারম্ভেই উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্য :—

রাজানো যং প্রশংসন্তি যং প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ
সাধবো যং প্রশংসন্তি স পার্থ পুরুষোত্তমঃ।

তাঁহার নিজের সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিলেই প্রবন্ধের সকল কথাই বলা হইয়া যায়।

বাদ।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন।)

মাননীয় শ্রীযুক্ত "ব্রাহ্মণসমাজ" সম্পাদক মহাশয় সমীপে—সবিনয় নিবেদন—

মহাশয়! বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজের হিতার্থে—ধর্ম্মকর্ম্মের সহায়তার্থে—এই প্রবন্ধটি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভবদীয় "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রে প্রকাশ করিয়া লেখককে কৃতার্থ করিবেন।

সন ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "ব্রাহ্মণসমাজে" মান্যবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয় "পৌরোহিত্য ও মন্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে আমার আহ্নিককৃত্যের দুইটি মন্ত্রে দোষারোপ করিয়াছেন এবং ক্রমশঃ অন্যান্য মন্ত্রেরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নিতান্ত সুখের বিষয়; যেহেতু বিজ্ঞজনের এইরূপ আলোচনার ফলে আমার ভ্রমগুলি কালে তিরোহিত হইতে পারিবে। কিন্তু তিনি যে লিখিয়াছেন, আমার সংশোধন কার্য্য চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডীর ন্যায় হইয়াছে, ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তাহার কারণ, বহুকাল ব্যাপী ঘোরতর বিপ্লবে বৈদিক মন্ত্রাদির সংশোধন কার্য্য কিরূপ প্রয়াস সাধ্য, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। "ন হি বন্ধ্যা বিজানাতি গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্।" তিনি যখন শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির প্রেরণায় অভিনব ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবধি প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তিনিও এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। সুতরাং তিনিও আমা হইতে অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইলেও, ঈদৃশ কার্য্যের ক্লেশ, নিতান্ত অনভিজ্ঞ বলিয়া আমার মত ভূয়িষ্ঠ না হউক, কিয়ন্মাত্র অনুভব করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ঋষিকল্প কুমারিল ভট্টই যখন—

"আগম প্রবণশ্চাহং নাপবাদ্যঃ স্খলন্নপি।
ন হি সদ্বর্ত্মনা গচ্ছন্ স্খলিতেষ্বপ্যপোদ্যতে॥"

লিখিয়া স্বীয় গ্রন্থে ত্রুটির আশঙ্কা জানাইয়াছেন, তখন মাদৃশ অল্পবিদ্যা অল্প বুদ্ধি মূঢ়জনের

গ্রন্থে যে পদে পদে ত্রুটির সম্ভাবনা, সেবিষয়ে সংশয়ই নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন, এরূপ কার্য্যে কাহারও ত্রুটি ঘটিলে, তজ্জন্য তাহার নিন্দা করা উচিত নহে। কিন্তু তর্কনিধি মহাশয় নিন্দাসহকারে আমার গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই আমার দুঃখ।

আর একটা অধিক দুঃখের কারণ আছে, তাহা বারান্তরে প্রকাশ করিব (১)।

তর্কনিধি মহাশয় যে ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই কি নির্দ্দোষ হইয়াছে? তাঁহার পুস্তকে সপ্তব্যাহৃতির ঋষ্যাদিতে "অগ্নিবায়ু…বিশ্বেদেবা দেবতাঃ" (সমাসের মধ্যে বিভক্তিযুক্ত বিশ্বে পদ), সূর্য্যশ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে জ্যোতিষির পর "পরমাত্মনি" পদ, চিত্রং দেবানাম্ ইত্যাদি মন্ত্রে "আপ্রা দ্যাবা পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং" (দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন দ্বিবচনার্হ। দ্যাবাপৃথিবী শব্দে দ্বিতীয়ার একবচন, তদন্তে চ, এবং অন্তরীক্ষ শব্দে দীর্ঘ ঈকার, যজুর্ব্বেদীয় তচ্চক্ষুর্দেবহিতং মন্ত্রের "অক্ষরাতীত পুর উষ্ণিক্ ছন্দঃ", উদ্বয়ং তমসম্পরি মন্ত্রের "হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ" ইত্যাদি কি অশুদ্ধ নহে?

তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া এবং তাহাতেই আমার দোষ প্রদর্শন করিয়া যদি নিবৃত্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমি কোনও কথাই বলিতাম না, এবং এতদিন তাই বলিও নাই। কিন্তু তিনি সমগ্র সমাজের চক্ষে আমার পুস্তকের হেয়তা এবং স্বীয় পুস্তকের উপাদেয়তা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উহার দোষ ব্রাহ্মণসমাজ পত্রে প্রকাশ করিতেছেন বলিয়াই আমাকে বাধ্য হইয়া এই সকল কথাবলিতে হইতেছে। তথাপি আমি জল্প বা বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত নহি; "বাদ"ই আমার উদ্দেশ্য।

(১) তিনি লিখিয়াছেন,—ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ইত্যাদি মন্ত্রে আমি কতক তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ও কতক অন্য বেদের পাঠ গ্রহণ করিয়া সকলের কর্ম্ম পণ্ড করিতেছি। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বশাখীর এবং অন্যান্য বেদের পাঠ সকলে চিরাভ্যস্ত 'সমুদ্রোঽর্ণব ইত্যাকারেই হইবে।

এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি যে কোনও স্থান হইতে তৈত্তিরীয় আরণ্যক আনাইয়া অথবা সেখানে গিয়া সকলেই দেখিবেন, উহার পাঠ—

ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্রিরজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্ বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো সুবঃ॥

এবং ঋগ্বেদ (মণ্ডল.১০। অনু ১২।৪৮ সূক্ত) খুলিয়া দেখুন, তাহার পাঠ অপর সর্ব্বাংশেই ঐরূপ; কেবল রাত্রিরজায়ত স্থলে রাত্র্যজায়ত, এবং সুবঃ স্থলে স্বঃ এইমাত্র বিশেষ। এতাবতা আমি ত সর্ব্বাংশে ঋগ্বেদের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি; তবে কতক এর, কতক তার, কিরূপে হইল যে, আমাকে সেই অপবাদের ভাগী করিলেন?

তাঁহার ঐরূপ লেখায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মূল সংহিতা না দেখিয়া কেবল দ্বৈতনির্ণয়ের ব্যবস্থার উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত তত্রত্য পঙ্‌ক্তির সারবত্তা আলোচনা করা আবশ্যক। তাঁহার মতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পাঠ রাত্রিরজায়ত, সমুদ্রো অর্ণবঃ, এবং অকল্পয়দ্দিবম্ এবং অপর সমস্ত বেদে ও সমস্ত শাখাতেই রাত্র্যজায়ত, সমুদ্রোঽর্ণবঃ এবং অকল্পয়ৎ দিবম্। কিন্তু উদ্ধৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অকল্পয়দ্দিবং নাই, হইতেও পারে না; যেহেতু ঐ মন্ত্রত্রয়ের অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ হওয়ায় 'অকল্পয়ৎ' এর পর এক দাঁড়ি থাকা উচিত, আছেও তাই; সুতরাং 'দিবম্'এর সহিত উহার সন্ধির সম্ভাবনাই নাই। ঋগ্বেদেও ত "অকল্পয়ৎ। দিবং" রহিয়াছে; সুতরাং উহাতেই বা সন্ধির আশঙ্কা কোথায়? তাঁহার প্রদর্শিত দাঁড়ি রহিত "অকল্পয়ৎ দিবং থাকিলে যে সন্ধি হয় না, তাহার সূত্র কি? মধ্যে দাঁড়ি না থাকিলে, সন্ধির প্রাপ্তিতেও অসন্ধির উদাহরণ, কোনও বেদের মন্ত্রে দেখাইতে পারেন কি? তার পর ঋগ্বেদে সমুদ্রো অর্ণবঃ, সংবৎসরো অজায়ত রহিয়াছে, এবং উভয়ত্রই অকারের উপর স্বরচিহ্ন আছে! অকার লুপ্ত হইলে স্বরচিহ্নের স্থান কোথায়? এবং "প্রকৃত্যান্তঃ-পাদমব্যপরে" ৬।১।১১৫) এই পাণিনিসূত্র দ্বারা ঐরূপ স্থলে অকারের লোপ হইতেই পারে না। "একাসিদ্ধৌ সর্ব্বাসিদ্ধিঃ" ন্যায়ে দ্বৈতনির্ণয়ের ঐ পঙ্‌ক্তি সর্ব্বথা অসিদ্ধ কি না, তাহা সুধীগণের বিচার্য্য। ঐরূপ লেখা আছে কেন? এ অনুযোগ দ্বৈতনির্ণয়কারকেই অর্হে। মূল বেদে না থাকিলে, কোনও নিবন্ধকারের বা টীকাকারের নির্দ্দিষ্ট পাঠে কি বৈদিক মন্ত্র পাঠ সিদ্ধ হইতে পারে? তবে আর্ষ গ্রন্থে থাকিলে অবশ্যই সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার্য্য।

তর্কনিধি মহাশয় চিরপ্রচলিত সমুদ্রোঽর্ণবঃ পাঠকেই যে, কাণ্বশাখার ও অন্যান্য সমস্ত বেদের বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কৈ তিনি মূল সংহিতার অধ্যায়াদি নির্দ্দেশ করিয়া বলুন ত কোথায় ঐরূপ পাঠ আছে। বিশেষতঃ উহা যে ঋগ্বেদীয় পাঠ্য নহে, তাহা ঋগ্বেদ দর্শকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে তিনি ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় ঐরূপ পাঠ কিরূপে বসাইয়াছেন?

(২) সূর্য্যশ্চ মন্ত্রেও আমি শাখাভেদে পাঠভেদ ভুলিয়া গিয়াছি লিখিয়াছেন; এবং আমি সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যায় উহার প্রকৃতি ছন্দঃ লিখিলেও, তাহার উল্লেখ না করিয়া, আমার অজ্ঞতাটাকে অখণ্ডনীয়রূপে সমর্থন করিবার জন্য, ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যায় যে "যদ্রাত্র্যোত্যারভ্য মন্ত্রীতান্তস্য পঙ্‌ক্তিপদা পঙ্‌ক্তিশ্ছন্দঃ" লিখিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিয়া "অকার্ষিং" পাঠে ছন্দো-দোষ দেখাইয়াছেন।

ঐ মন্ত্রটির যে প্রকৃতি ছন্দঃ, তাহা ভাষ্যকারও লিখিয়াছেন এবং আশ্বলায়নগৃহ্য পরিশিষ্টেও আছে। প্রকৃতি ছন্দে সমুদায়ে ৮৪ অক্ষর। সূর্য্যশ্চ হইতে জুহোমি পর্য্যন্তই মন্ত্র। জুহোমি থাকাতেই উহার শেষে স্বাহা বলিতে হয়। পিঙ্গলছন্দঃসূত্রেও প্রকৃতি ছন্দের উদাহরণে সূর্য্যশ্চ হইতে জুহোমি পর্য্যন্তই ধৃত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রাত্রিয়া ও অকারিষং পাঠ থাকায় উহাতে ৮৪ সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে; নচেৎ দুই অক্ষর ন্যূন হয়।

গৃহ্য পরিশিষ্ট প্রভৃতিতে রাত্র্যা ও অকার্ষং পাঠ আছে, আমিও দেখিয়াছি। সেরূপ

থাকিলেও অক্ষর সংখ্যাপূরণের জন্ত পিঙ্গলের "ইয়াদিপূরণঃ" সূত্রানুসারে তত্তৎ স্থলেও রাত্রি ও অকারিয়ং পড়িতেই হইবে। যেমন সর্ববেদে ঔ সর্বশাখায় "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং" পাঠ থাকিলেও বরেণিয়ং পড়িতে হয়, এখানেও সেইরূপ। যাঁহারা সেরূপ না পড়েন, তাঁহাদের উচ্চারণ অশুদ্ধই হয়। যেহেতু উক্ত "ইয়াদি পূরণঃ" সূত্রের উদাহরণই আছে "তৎ সবিতুর্ব্বরেণিয়ং, দিবং গচ্ছ সুবঃ পত।"

ঋগ্বেদি সন্ধ্যায় অনুরূপ ছন্দঃ লিখিবার কারণ প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এবারে লিখিলাম না। বারান্তরে লিখিব (২)।

"তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে পাঠ লিখিত থাকে, তাহাই সর্ববেদে ও সর্ব শাখায় থাকিবে" এমন কথা আমি কোথায় লিখিয়াছি, নির্দ্দেশ করিতে পারেন কি ?

আমি এইমাত্র লিখিয়াছি,

"যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পারক্যমবিরোধি চ।
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয় মগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মবৎ॥"

এই কাত্যায়নবচনকে প্রমাণ করিয়া, সন্ধ্যাপদ্ধতিকারগণ "প্রাতঃ সূর্যাশ্চ মেত্যুক্ত্বা সায়মগ্নিশ্চ মেতি চ। আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে কুর্য্যাদাচমনং ততঃ" ইত্যাদি বচন অনুসারে তৈত্তিরীয় আরণ্যকেরই তিনটী আচমনমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন॥

কেবল সন্ধ্যাপদ্ধতিকার নহে এবং কেবল মন্ত্রও নহে ; অন্যান্য সমস্ত পদ্ধতিকারগণই অনেক অনুষ্ঠান ও অনেক মন্ত্র পরশাখা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

যথা—গোভিলগৃহে অন্নপ্রাশন না থাকায় এবং সামবেদে মেখলাদি ধারণের মন্ত্র না থাকায় ভবদেব শাখান্তর হইতে ঐ সকল লইয়াছেন। এ কথা রঘুনন্দনের উক্তিতেও সমর্থিত হয়। যথা—"যদ্যপি গোভিলগৃহ্যে অন্নপ্রাশন সংস্কারো নাভিহিতঃ, তথাপি কৃত্যচিন্তামণিধৃত বচনেন সর্ব্বশাখিকর্ত্তৃকত্বেন আকাঙ্ক্ষিতঃ। যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং—ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ অন্য শাখোক্ত প্রকারেণ ছন্দোগেন কর্ত্তব্যঃ।" অপিচ "অজিন গ্রহণ মন্ত্রস্তু মিত্রস্য চক্ষু—ইতি তৈত্তিরীয় শাখা পঠিতো দ্রষ্টব্য ইতি ভট্টভাষ্যম্" ইতি (সংস্কারতত্ত্ব)। পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে "কর্কোপাধ্যায় বাসুদেবদীক্ষিত-রেণুদীক্ষিত প্রভৃতয়ঃ স্ব স্ব গ্রন্থে যজ্ঞোপবীত ধারণ মন্ত্রাবসরে লিখিতবন্তঃ—মন্ত্রমপি শাখান্তরীয়ং লিখিতবন্তঃ।" ইত্যাদি।

অতএব সূর্যাশ্চ মা ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় যখন তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতেই গৃহীত হইয়াছে, তখন সর্ববেদীরই তত্রত্য পাঠ করাই কর্ত্তব্য। যদি শাখাভেদে উহাদের পাঠভেদই থাকিত, তাহা হইলে, শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক, সর্ব্ববেদীর সন্ধ্যাতেই একইরূপ পাঠ কেন চলিয়া আসিতেছে ?

"শাখাভেদে পাঠভেদ" কথাটা কেবল মুখে না বলিয়া যদি কেহ অন্য কোনও শাখার অধ্যায়াদি নির্দ্দেশ করিয়া উহাদের পাঠভেদ (অর্থাৎ রাত্রিয়া স্থলে রাত্র্যা, অকারিয়ং স্থলে অকার্ষং, জ্যোতিষিয় পরে পরমাত্মানি ইত্যাদি) জ্ঞাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবিবর ঘটকর্পরের কথায় বলিতেছি—"তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ।"

বহুকাল হইতে আমার আহ্নিককৃত্যের বহু অংশের বহু প্রকার প্রতিবাদ বহুবারই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনওটারই সুমীমাংসা হয় নাই। যদি কখনও কেহ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি "চির প্রচলিত পাঠ পরিত্যাগ করা উচিত নহে" এবং "শাখাভেদে মন্ত্রের পাঠভেদ আছে" এইমাত্র বলিয়াই তত্ত্ববুভুৎসুদিগকে "অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"ই করিয়াছেন। এবার যখন শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির অধ্যাপক পরম অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত তর্কনিধি মহাশয় "বেদের ভাষা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, গৃহ্যসূত্র প্রভৃতির আলোচনার ফলে নিপুণভাবে" আমার আহ্নিক কৃত্যের ভ্রম প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা, ব্রাহ্মণ সমাজ, ব্রাহ্মণ সম্মিলনী, বৈদিক সমিতি প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য রক্ষাপরায়ণ সমিতি ও সাময়িক পত্র সমূহের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা,—তাঁহারা আর উদাসীন না থাকিয়া বেদজ্ঞ পণ্ডিতদিগের সহিত আমাদের উভয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি অপক্ষপাতে ও ধীর স্থিরচিত্তে আলোচনা করিয়া, আমার বাস্তবিক ভ্রমগুলি আমাকে জানাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ইতি—

স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের আলোচনা।

আজকাল কি সহরে কি পল্লীতে কি বক্তৃতায় কি প্রবন্ধ লেখায় সর্ব্বত্রই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। যাঁহারা বর্ণাশ্রমসমাজবক্ষে পদাঘাত করিয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক বর্ণাশ্রম সমাজধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা তো কাগজ কলমে ও সভাপ্রাঙ্গনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের শ্রাদ্ধ করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করিয়া থাকেনই। আর উঁহাদের লেখায় বা চিৎকারে হিন্দু সমাজ উপেক্ষাই করিয়া আসিতেছেন ও আসিবেন কিন্তু যাঁহারা বর্ণাশ্রমসমাজে এখনও বর্ত্তমান আছেন, বা যাঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে ভালবাসেন তাহারাও আজকাল সমাজ বহিষ্কৃত সেই সব মহোদয়গণের আন্দোলন তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য লইয়া ২।৪টী কথা বলিবার জন্য লেখনী গ্রহণ করিতেছি।

তুচ্ছ তৃণগাছি হইতে সমগ্র চরাচরবিশ্বকে ব্রহ্মময় বলিয়া বিশ্বাসকরাই যাহাদের আশ্রমোচিত ধর্ম্ম ক্ষুদ্র * পিপিলিকা হইতে সমগ্র জীবকে নারায়ণ বলিয়া ভাবিতে যাহাদের পুরাণশাস্ত্র * উপদেশপ্রদান করেন যাহাদের স্মৃতিশাস্ত্র ভগবানকে সর্ব্বময় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন * গীতায় জীবকে ভগবানের পরাপ্রকৃতি বলিয়া স্বয়ংই ঘোষণা করিতেছেন। তাহাদের শাস্ত্র কোন মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে উপদেশ করিবে এটি যাহারা ঘোষণা করেন তাহাদের সাহসকে

* সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম। জীবোনারায়ণঃ স্বয়ং।
* সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ো।
* জীবভূতাং ইত্যাদি।

ধন্যবাদ প্রদান করি, তাঁহারা মনুষ্যসমাজের কৃপার পাত্র, কিন্তু যাহারা তাহা শ্রবণ ও গ্রহণে অভিলাষী তাহাদিগকে অনুরোধ করি তাহারা কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়া সবজান্তা না হইয়া নিজেরাই একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, দেখিতে পাইবেন বর্ণাশ্রমী পিপিলিকাটীকে পর্য্যন্ত ঘৃনার চক্ষে দেখিবে না বা কোন জীবের প্রতি অসূয়া পরবশ হইবে না ধর্ম্মশাস্ত্র এই বাণী মুক্তকণ্ঠে শত মুখে ঘোষণা করিতেছেন।

যে স্মৃতি শাস্ত্রকে অসূয়ামূলক তথাকথিত বক্তাগণ বলিয়া থাকেন, সেই স্মৃতিশাস্ত্রেই দেখিতে পাইবেন শ্রদ্ধালু অসূয়া বিহীন মানব শতবর্ষ জীবিত থাকে। অসূয়াকারী খল কৃতঘ্ন দীর্ঘক্রোধী ব্যক্তিকে কর্ম্মচাণ্ডাল বলিয়া সেই স্মৃতিশাস্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই সকল বাণী ঘোষিত, সেই ধর্ম্মশাস্ত্রই শতমুখে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করিয়া গিয়াছেন। ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলিবার প্রয়োজন নাই, ইহা সকলেই প্রায় জানেন। সুতরাং হিন্দু আমরা বর্ণাশ্রমী আমরা স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিভাগ, ঘৃণা বা দ্বেষ মূলক বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার কেবল পরের প্রতিই করিতে শাস্ত্র বলেন নাই বর্ণাশ্রমির নিজ গৃহেও সে বিচার করিবার আদেশ আছে, আর এযাবৎ সে আদেশ প্রতিপালিতও হইয়া আসিতেছে। বর্ণাশ্রমী উপাসনা কালে নিজেরই অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মপত্নী অতিপ্রিয়তমাকেও স্পর্শ করিতে দেন না, ব্রাহ্মণ নিজ অনুপনীত পুত্রকেও দৈবকার্য্যের সময় স্পর্শ করিতে দেন না ইহাও কি ঘৃণামূলক বা দ্বেষমূলক বলিতে চাহেন, ? এই দল আবার বলেন হিন্দু-শাস্ত্র স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহাদের এ সাহসেও ধন্যবাদ, যাহাদের শাস্ত্র স্ত্রীজাতিকে মহাশক্তির অংশ বলিয়া ঘোষণা করে এবং স্ত্রীর অবমাননায় কুলদেবতা বিরূপ ও লক্ষ্মী বিরূপা হন, এবং মানব ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্ত্রীজাতির প্রতি যে সকল কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা একবার দেখিলে বালক পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে যে ধর্ম্মশাস্ত্রকার স্ত্রীজাতিকে কি গভীর শ্রদ্ধারচক্ষে দেখিতেন ? এই বিকৃত সমাজে এখনও কুমারী পূজারও সধবা স্ত্রীকে পূজা করার প্রচলন সেই শ্রদ্ধারই চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। তবু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা বিলাতী চসমা চক্ষে দিয়া যাহারা এহেন কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিয়া থাকেন তাঁহাদের কথার আলোচনা করিবার জন্য লেখনী গ্রহণ নহে, আমাদের বর্ণাশ্রমী ভায়াদিগকে আবার বলি স্ত্রীপুত্রের প্রতি স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে যেমন তোমরা ঘৃণা বিদ্বেষ বলিতে পারনা, সেইরূপ পরের সম্বন্ধে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারেও ঘৃণা বিদ্বেষের কোন সম্পর্ক নাই, স্পর্শকর্ত্তাও স্পর্শিতদের মধ্যে কখন ছিলও না। এখন পাশ্চাত্যভাব পাশ্চাত্য সংসর্গ ও শিক্ষা সমাজে ঢুকিয়া পাশ্চাত্য সমাজের বিচার বুদ্ধির উদ্ভব করিয়াছে। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য এই বিচার যে ঘৃণা বিদ্বেষ সম্ভূত নয় উহাতে যে স্নেহের শীতল ধারা প্রবাহিত তাহাই আগামীবারে আমরা সপ্রমাণ করিয়া দেখাইব।

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শত বর্ষাণি জীবতি। বিষ্ণু সংহিতা

অসূয়কঃ পিশুনশ্চ কৃতঘ্নোদীর্ঘরোষকঃ

চত্বারঃ কর্ম্মচাণ্ডালা জন্মতশ্চাপিপঞ্চমঃ। বশিষ্ঠ সংহিতা

সাড়া পড়িয়াছে।

লেখক—শ্রীমহিমচন্দ্র সান্যাল।

এইবার যেন সাড়া পড়িয়াছে। অসাড় অচেতন ব্রাহ্মণ-সমাজে যেন এইবার চৈতন্যের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। নিদ্রিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত মণ্ডলী যেন এইবার জাগিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। গৃহের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তথাপি গৃহস্থ সুখে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া প্রাণে বড়ই ভয় হইয়াছিল; চারিদিক হইতে দস্যু তস্কর আসিয়া গৃহে সিঁধ কাটিয়া গৃহস্থের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু গৃহস্বামী ঘোর নিদ্রা ঘোরে বিভোর হইব কিছুই জানিতে পারিতেছেন না দেখিয়া প্রাণে বড়ই আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল; নানাদিক হইতে অত্যাচার অমঙ্গলের সুতীক্ষ্ণ সূচী গাত্রে বিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তথাপি কিছুই যেন হইতেছে না ভাবিয়া গৃহী পরম আরামে আরাম করিতেছেন অবলোকন করিয়া আমাদের প্রাণে বড়ই বেদনা আসিতেছিল তাই আমরা কাতর প্রাণে ভগবানকে ডাকিতেছিলাম, ভগবন্! তুমিই সকলের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তুমি রক্ষা না করিলে কাহারও রক্ষার উপায় নাই। বিশেষতঃ তোমার নিজের জিনিস যাহা,—তোমার খাঁটি নিজস্ব ধন যাহা,—তাহা তুমি না রাখিলে আর কেইবা রাখিতে পারে? তাই বলি দয়াময়! তুমি দয়া করিয়া তোমার প্রাণের প্রিয় ধন সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা কর, তোমার সাধের হিন্দু সমাজকে বজায় রাখ,—আমাদিগকে বাঁচাও।

ভক্তাধীন ভগবান! ভগবান সব সহিতে পারেন কিন্তু ভক্তের কাতর ক্রন্দন সহ্য করিতে তিনি একান্তই অসমর্থ। তাই দেখিতেছি আমাদের কাতর ক্রন্দন তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তাই ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণমহাশয়ের "সদাচার ও স্বরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ "ব্রাহ্মণ-সমাজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি ভগবান্ দয়া করিয়া উদ্দেশ্যও সফল করিয় ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

ব্রাহ্মণগণই হিন্দুধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন। এবং ব্রাহ্মণগণই হিন্দু সমাজের মস্তক স্বরূপ। তাহাই প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াই স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব বাবু ব্রাহ্মণ—রক্ষা-কল্পে সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলীই শীর্ষস্থানীয়। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রাণ স্বরূপ। তাঁহাদের অস্তিত্বেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের অভাবেই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের বিলোপ অবশ্যম্ভাবি ইহা খাঁটি সত্য কথা।

যদিও সেকালের মুনি ঋষি কেহ এখন বর্ত্তমান নাই, তথাপি ইহাদিগকেই তাঁহাদিগের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহারাই ধর্ম্ম ও সমাজের সূত্র ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, তাই এখনও ধর্ম্ম ও সমাজ যথাযথভাবে বর্ত্তমান আছে, ইঁহাদের অভাব হইলেই সর্ব্ববিষয়ে অভাব ঘটিবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা ও দিন দিন শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে। তাঁহারা ও যেন আর তাঁহাদের সে পূর্ব্বভাব পবিত্রভাব রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, ক্রমশঃ কলুষিত হইয়া ব্রহ্মতেজ হারাইতেছেন এবং শক্তিহীন হইতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে। নইলে ধর্ম্ম ও সমাজের উপর বিধর্ম্মীর দল সুতীক্ষ্ম আঘাত করিতে উদ্যত হইলে ও তাঁহারা নীরবে রহিয়াছেন কেন? অসাড় অচেতনের ন্যায় সেই মর্ম্মান্তিক প্রাণঘাতী আঘাত স্বচ্ছন্দে সহ্য করিতেছেন কেন? রক্তমাংসের দেহের পক্ষে, সুস্থ ও সজীব পদার্থ জীবের পক্ষে তাহা একরূপ অসম্ভব। বর্ত্তমানে যেরূপ একাকারের ব্যবস্থা হইতেছে তাহাতে কোন নিষ্ঠবান ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু নীরব থাকিতে পারেন? কেহই নহেন। এতদিন যে নীরব আছেন ইহাই অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়। দেখিয়া শুনিয়া আমরা হৃদয়ে শতবৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু নিরুপায়ের মর্ম্ম বেদনানুভব ভিন্ন অন্য উপায় নাই। নইলে এক একবার এমনও মনে হইতেছিল যে, আমিট না হয় "যা-তা" দু'কথা লিখিয়া একটু প্রতিবাদ করিয়া মনের জ্বালা কথঞ্চিৎ নিবারণ করি, অথবা নিদ্রিত রথী মহারথীদিগকে উচ্চ চীৎকারে ডাকিয়া জাগ্রত করিয়া দিই। কিন্তু তাহাতেও শক্তির আবশ্যক। ঢাল তরবারি বিহীন হইয়া নিধিরাম সর্দ্দার সাজা বিড়ম্বনা মাত্র। বিদ্যা বুদ্ধিহীন ও পাণ্ডিত্যশূন্য হইয়া লেখনী ধারণ করিতে যাওয়া হাঁসির কথা, তাই নীরবে সব সহ্য করিতেছি। এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগে কিনা,—কাহারও সুখনিদ্রা ভঙ্গ হয় কিনা,—কেহ সাড়া দেন কিনা—দেখিবার নিমিত্ত উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিতেছি। সুদীর্ঘকাল পরে হইলেও সুখের বিষয় যে, কতিপয় অধ্যাপক বেদনা পাইয়া জাগিয়াছেন এবং সাড়া দিয়াছেন। তাই বলিয়াছি এইবার "সাড়া পড়িয়াছে।"

শ্রীযুক্ত গান্ধী মহাশয় তাঁহার অনুচর সহচর ও সেবকগণের নিকট মহাত্মা মহারাজ, দেবতা বা ভগবানের অবতার স্বরূপ হইলে ও প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট তাহা নহেন,তিনি জেলে যাইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে যে ঘোষণাবাণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে স্বরাজ লাভের উপায় স্বরূপ চারিটী শুভ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে—"to remove untouchability and to embrace the untouchablis" অর্থাৎ ছুতি স্পর্শ দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্পর্শীদিগকে সাদরে আলিঙ্গন করতঃ তাহাদিগের সহিত আচার বিহার ও অন্যান্য কার্য্য করিবার উপদেশটী অন্যতম স্তম্ভ। শুধু অন্যতম স্তম্ভ নহে, সর্ব্বপ্রধান স্তম্ভ। কেননা, এইটী না হইলে নাকি জাতীয় জীবনই গঠিত হইবে না। জানিনা এটী সঙ্ঘটিত হইলে কোন্ জাতীয় জীবন গঠিত হইবে!

যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত নহেন, হিন্দুধর্ম্মের কোনই ধার ধারেন না, তাঁহাদের মুখেই ঐসব কথা শোভা পায়, তাঁহারাই ঐরূপ বলিতে পারেন ও বলিয়াও থাকেন! কিন্তু কোন ধর্ম্মপ্রাণ খাঁটী হিন্দু ঐরূপ কথা বলিতে পারেন না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আশ্রম ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য আমি এক্ষণে ভাল মন্দের বিচার করিতেছি না। তাহার ইচ্ছা স্থানও

নহে, এবং আমি তাহার উপযুক্ত পাত্র ও নহি। সে সমস্ত শাস্ত্রীয় গুরু গভীর তত্ত্ব কথা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই উত্তমরূপে অবগত আছেন, এবং তাঁহারাই তাহা বলিবেন। আমি শুধু সাধারণ ভাবেই কথাটির আলোচনা করিতেছি মাত্র।

সুতরাং যাহার যাহা বৈশিষ্ট্য তাহা বাদ দিলে তাহার থাকে কি? যদি হিন্দুধর্ম্মের মূলোৎপাটন ও হিন্দু সমাজের উচ্ছেদ সাধনই একমাত্র সংকল্প হয়, যদি হিন্দু নামটাই জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলিবার ইচ্ছা থাকে; তাহা হইলে তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহা বোধ হয় কেহই আকাঙ্ক্ষা করেন না, অন্ততঃ করা কর্ত্তব্য নহে। কেননা আপনার জন্মসিদ্ধ পৈতৃক নামটী তুলিয়া দিয়া পরচুলা স্বরূপ পরকীয় নাম গ্রহণের প্রবৃত্তি প্রশংসাজনক নহে, আপনার নিজ স্বভাবগত অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া রূপান্তরিত হইয়া কিম্ভূত কিমাকাররূপে দর্শন দানের চেষ্টা ও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। তাহাতে যদি জাতীয় জীবন গঠিত না হয়, না হইল, তাহাও বরং শ্রেয়ঃ, তথাপি স্বধর্ম্ম ত্যাগ বা আত্ম বিসর্জ্জন বা অপমৃত্যু (?) শ্রেয়ঃ নহে। ধর্ম্মের বড় হিন্দুর নিকট জগতে অন্য কিছুই নহে। সেই ধর্ম্মের বিনিময়ে হিন্দু অন্য কিছুই চাহেন না বা চাহিতে পারেন না। যিনি চাহেন, তিনি চাহিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে কথনই হিন্দু খাঁটী হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে।

অতএব হিন্দুর অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে তাহার বৈশিষ্ট্যও অতীব যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে হইবে, অন্যথা হিন্দুর অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা। কারণ, বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বই হইতেছে প্রাণ স্বরূপ। প্রাণের বিনাশে হিন্দুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

বর্ত্তমান সময়ে এমন একদল দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্ম থাকুক আর নাই থাকুক তাহাদের সাধের জাতীয়-জীবন গঠিত হইলেই হইল। তাই সমগ্র ভারতবাসীকে এক সূত্রে গাঁথিবার চেষ্টা হইতেছে। এক বেশ, এক ভূষা, এক আহার, এক ভাষা—ইত্যাদি ভাবে ঠিক একাকারের চেষ্টা হইতেছে। যুগমাহাত্ম্যের প্রভাবে হয়ত তাঁহারা কৃতকার্য্যও হইতে পারেন, কিছুই অসম্ভব নহে। কেননা শাস্ত্রেই তাহা আছে। ভগবদ্বাক্যই তদ্রূপ আছে। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান কলিতে হইলেও সুদূর ভবিষ্যতে কলির শেষে হইবে। হায়! প্রারম্ভেই কি শেষের অভিনয় হইবে? ভগবানই জানেন তাঁহার কি ইচ্ছা।

যাক্ সে কথা ঐ সকল ধুরন্ধরগণ একাকারের পক্ষপাতী। সব ভাঙ্গিয়া এক করিতে, খিচুড়ী প্রস্তুত করিতে প্রয়াসী। অবশ্য খিচুড়ী খাইতে বেশ মুখরোচক বটে, কিন্তু পরিণামে দেহ বিকার সুনিশ্চিত। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? তথাপি তাহাই করিতেই হইবে, কেননা তাহা না হইলে জাতীয়-জীবনই নাকি গঠিত হইতে পারে না। বলি সবই যদি ভাঙ্গিলাম তবে রহিল কি? তাঁহাদের এই নব নির্ম্মিত তথাকথিত জাতীয়-জীবন কোন্ শ্রেণীর জাতীয়-জীবন হইবে? যাহার মূলে কোন জাতি নাই, তাহার আবার জাতীয়-জীবন কি বুঝিলাম না। অশ্বডিম্ব কাঁঠালের আমসত্ব প্রভৃতি শব্দই শ্রুতিগোচর হয় মাত্র। কিন্তু তৎপ্রতিপাদ্য কোন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। অথবা যাহার অস্তিত্ব নাই তাহাই বুঝাইবার

জন্যই এই সমস্ত শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু এবার দেখিতেছি তথাকথিত মণীষীগণের দুষ্কর শব্দগুলি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। এইবার চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিবে সন্দেহ নাই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা জাতিভেদ বা স্পর্শদোষ জাতীয়-জীবন গঠনের ঘোর অন্তরায়-স্বরূপ, অতএব উহা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য—ইহাই হইয়াছে এক শ্রেণীর মূলমন্ত্র। অবশ্য যাঁহারা হিন্দু নহেন অথবা হিন্দু হইয়াও ঘোর অহিন্দু তাঁহাদের ঐরূপ মূলমন্ত্র হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে, পরন্তু হওয়াই স্বাভাবিক। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত নহেন, আশ্রমধর্ম্ম-তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, জাতিভেদ বা স্পর্শদোষের গূঢ়রহস্য বা অর্থ আদৌ বুঝেন না, তাঁহারাই ঐরূপ বলিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা জানেন ও বুঝেন তাঁহারা যে ঐ ভাবের গঠন-সংস্কারের উপাদেয়তা উপকারিতা ও অদ্ভুত সূক্ষ্মভাব দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন ও সাদরে উহা গ্রহণ করেন ইহাই বস্তুতঃবিস্ময়কর।

প্রথম পাঠার্থী বালক পুস্তক দেখিলেই বিরক্ত হয়, শিক্ষক দেখিলেই মহাশত্রু মনে করিয়া শিহরিয়া উঠে, বিদ্যালয় দেখিলেই কারাগার বা শমনসদন জ্ঞান করিয়া হতজ্ঞান হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ঐগুলি অর্থাৎ পুস্তক বিরক্তিকর পদার্থ নহে, শিক্ষকও ঘোর শত্রু নহে, এবং বিদ্যালয়ও কারাগার বা শমনসদন নহে। তবে বালকের নিকট ঐরূপ প্রতীয়মান হইল কেন? অজ্ঞানতা নিবন্ধন বুঝিবার ভুলে। এইরূপ সকল বিষয়েই ঘটিয়া থাকে।

আমরা না বুঝিয়াই অনেক সময় উল্টা বুঝি। আমরা অজ্ঞতানিবন্ধনই সকল সময় সকল পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি না। কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তাহা বুঝি না বলিয়াই কখন ভালকে মন্দ বলি, কখন মন্দকে ভাল বলি। কিন্তু তাহাতে পদার্থের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, ক্ষতি বৃদ্ধি যাহা কিছু তাহা আমাদেরই।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জাতিভেদ বা স্পর্শদোষের মর্ম্ম ও অনবগত, তাই শতমুখে উহার নিন্দা করিয়া থাকি ও উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু আরও অতি মজার রহস্য এইটুকু যে, উহার মর্ম্ম ত বুঝিই না, কিছু বুঝিতেও চাই না, অথচ নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। "যাহাকে যাহার ভাল না লাগে, তাহার হাঁটাও বাঁকা দেখা যায়" এ একটী কথা আছে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাহাই হইয়াছে। উহার অর্থ বুঝি বা না বুঝি, বা বুঝিবার কোন দরকারই নাই, কিন্তু শব্দ শুনিয়াই উহাকে গালি দিতে হইবে এবং পারিলে সংকারও করিতে হইবে। কি চমৎকার ব্যাপার!

যাক্ তাঁহারা যাহাই ভাবুন, বস্তুতঃ উহা তাহা নহে। উহা অত্যন্ত অপকারী ও ঘোর সর্ব্বনাশ সাধক ত নহেই পরন্তু অতি উপকারী ও অশেষ কল্যাণজনক পদ্ধতি, উন্নতির অতি উচ্চ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক সোপান শ্রেণী। সুতরাং উহা দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবার সামগ্রী নহে, পরন্তু সাদরে কুড়াইয়া অতি সযত্নে অঞ্চল বদ্ধ করিয়া রাখিবার সামগ্রী। বস্তুতই মানবের রক্ষাকবচ-স্বরূপ। অতএব উহা সর্ব্বথা রক্ষণীয় ও ধারণীয়।

উহাকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে অনেক বিষয় বুঝিতে হয়। যদিও অত কথার ইহা স্থান নহে, তথাপি সংক্ষেপে দুটী একটী কথা বলা কর্ত্তব্য।

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি? সহজ কথায় বলিতে গেলে মনুষ্যত্ব লাভ বলিতে পারি। ইহাতে কাহারও মতানৈক্যও বোধহয় নাই। মনুষ্যত্ব লাভই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিচিত হইতে কে না চায়? সকলেই সাধ্যমত এই মনুষ্যত্ব লাভের নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকে। এবং যে যে পরিমাণ উহা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, সে সেই পরিমাণেই মনুষ্য বলিয়া পরিচিত।

মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে? যে গুণ থাকিলে মানুষ মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়, নাথাকিলে মানুষ মানুষই থাকে না, আর কিছুতে পরিণত হয়—তাহাই মনুষ্যত্ব। সুতরাং মনুষ্যত্ব বলিতে কতকগুলি গুণের সমষ্টি বই আর কিছুই নহে।

ধর্ম্মশব্দের যেরূপ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা আছে তাহাতেও মনুষ্যত্বই চরম লক্ষ্যস্থান। যাহা থাকিলে যাহার অস্তিত্ব বজায় থাকে, এবং যাহা না থাকিলে যাহার অস্তিত্বই আদৌ বজায় থাকে না, তাহার ধর্ম্ম তাহাই। যেমন জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ। অতএব ধর্ম্ম বলিতেও কতকগুলি গুণেরই সমষ্টি বুঝায় সুতরাং ধর্ম্মে ও মনুষ্যত্বে পার্থক্য দেখাযায় না। ধর্ম্ম বলিতেও যাহা বুঝা যায়, মনুষ্যত্ব বলিতেও তাহাই বুঝা যায়। ধর্ম্মও কতকগুলি গুণের সমষ্টি দ্বারাই নির্ম্মিত হয়। মনুষ্যত্বও কতকগুলি গুণের সমষ্টি দ্বারাই নির্ম্মিত হয়।

এই মনুষ্যত্ব লাভই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্বের পূর্ণতায়—দেবত্ব—বা ঈশ্বরত্ব বা মুক্তি। এহেন মনুষ্যত্ব লাভের নিমিত্ত প্রত্যেকেরই প্রাণপণে যত্নকরা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই।

মনুষ্যত্ব—কতকগুলি গুণের সমষ্টি তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই গুণগুলি কি? কোন কোন গুণের সমষ্টি দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছে? তাহা দেখা কর্ত্তব্য। গুণাবলী যথা—

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য অক্রোধ, বিবেক, বৈরাগ্য ঔদাসীন্য, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, সন্তোষ, শান্তি, আর্জ্জব, দাক্ষিণ্য, উপচিকীর্ষা, ব্রহ্মচর্য্য অহিংসা, মনশুদ্ধি তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান ইত্যাদি বহুপ্রকার।

ধর্ম্মের লক্ষণও তাহাই। মনুষ্যত্বও যেমন ঐ সকল গুণের সমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হয়, ধর্ম্মও তদ্রূপ ঐ সকল গুণের সমষ্টি দ্বারাই নির্ম্মিত হয়। ঐ সমস্ত গুণ বা ধর্ম্মের বীজ কেবল মনুষ্যেই আছে, অন্য কোন প্রাণীতে ইহার কিছুই নাই। সেই বীজ হইতে সকল প্রকার গুণ ধর্ম্মের বিকাশ হইয়া থাকে। এই ধর্ম্ম বা গুণগুলি আছে বলিয়াই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। এই গুণের দ্বারাই মানুষ অন্য শ্রেণী হইতে ভিন্ন। এই গুণসমষ্টি দ্বারাই মনুষ্য শরীর মনুষ্যাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুণগুলির হ্রাস হইলেই মনুষ্যত্বের হ্রাস এবং মনুষ্য শরীরেরও পরিবর্ত্তন হয়। ইহার উন্নতিতেই মনুষ্যত্বের উন্নতি, ইহার অভাবেই মনুষ্যত্বের অভাব, এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক উন্নতি অবনতি এবং আকৃতিগত পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহাই—মানবধর্ম্ম এবং আমাদের আর্য্যধর্ম্মও ইহাই।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বিজ্ঞানের অতি অচল অটল ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। বিজ্ঞানের

এমন সূক্ষ্ম বিচার, মানবদেহের ও মানবধর্ম্মের এমন সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার, জগতের যাবতীয় পদার্থের গুণের এমন সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণ জগতে আর কোথাও নাই। আর কোথাও এমনটী নাই, হয় নাই, হইবেও না।

সংক্ষেপতঃ সত্যই ইহার মূল, সত্যই ইহার প্রাণ, সত্যই ইহার সর্ব্বস্ব। তাই বহু শতাব্দীর বহু অত্যাচারে আজিও সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান আছে এবং থাকিবেও চিরকালই। ইহার কোনকালেও একবারে ধ্বংস নাই। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা অসংকোচে বলা যায় যে, জগতের সকল লোক একদিন হিন্দু হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর অন্য কিছু হওয়া সর্ব্বৈব অসম্ভব। ইহা খাঁটি সত্য কথা এবং ইহাই হিন্দু ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত গুণগুলি অর্জ্জন করিতে হইবে। যিনি যে পরিমাণ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে মানুষ হইবেন এবং সেই পরিমাণেই তিনি উন্নত হইবেন। সুতরাং ঐ গুণগুলি আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত সকলেরই প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু কেমন করিয়া যত্ন করিলে উহা অধিগত হইবে তাহাই বিশেষ বিচার্য্য বিষয়। গুণকে ত আহ্বান করিলেই আর গুণ আসিয়া হৃদয়ে হাজির হইবে না, অথবা যথেচ্ছভাবে চেষ্টা করিলেও উহা অর্জ্জিত হইবে না। অর্জ্জিত ত হইবেই না, আরও বহুদূরে পলায়ন করিবে।

সংসারের সকল কার্য্য সম্বন্ধেই ঐ এক ব্যবহার। পার্থিব অপার্থিব যে বিষয়েই হউক না কেন, সকল বিষয়েই যথাযথ ভাবে চেষ্টা না করিলে কোন বিষয়েই কখনও কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। হাঁসিয়া খেলিয়া আমোদ করিয়া—যথেচ্ছভাবে কোন বিদ্যা উপার্জ্জন বা কোন বিশেষ গুণ সঞ্চয় করা যায় না। বিধি পূর্ব্বক নিয়মপূর্ব্বক যত্ন ও চেষ্টা করিতে পারিলে সফলতা লাভ করা যাইতে পারে।

আধ্যাত্মিক ব্যাপারে আত্মশক্তির বিকাশে আরও কঠোরতার ব্যবস্থা আছে। বলা বাহুল্য সে ব্যবস্থা কোনরূপ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া করা হয় নাই, না করিলে নয় বলিয়াই করা হইয়াছে। যেমন দুই বা ততোধিক পদার্থ একত্র মিশ্রিত হইলেই রাসায়নিক শক্তি প্রভাবে কোন এক নূতন অভূতপূর্ব্ব ফলপ্রসব করিতে পারে, কিন্তু ঐরূপে মিশ্রিত না হইলে কদাচ উক্ত ফলপ্রসব করিতে পারেনা, ইহাও ঠিক তদ্রূপ। ঐসমস্ত নিয়ম বা বিধিনিষেধের ফল ঠিক রাসায়নিক ক্রিয়ার ন্যায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং উহা অবশ্য অবলম্বনীয় অন্যথা আধ্যাত্মিক রাজ্যে উন্নতিলাভ সুদূর পরাহত।

অতএব ঐ সমস্ত গুণ অর্জ্জন করিতে হইলে আপনাকে কতকগুলি নিয়মের অধীন করিতে হইবে। বহুপ্রকার বিধি নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে।

তাই হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও জাতিভেদ; তাই হিন্দুর আশ্রম ধর্ম্ম; তাই হিন্দুর এত নিয়ম কানুন, এত আচার বিচার, এত বিধি ব্যবস্থা। তাই হিন্দুর আহারে নিয়ম, বিহা. নিয়ম;

পরণ পরিচ্ছদে নিয়ম, শয়নে উপবেশনে নিয়ম, উঠিতে বসিতে নিয়ম, অধ্যয়নে আলাপনে নিয়ম; স্নানের নিয়ম, সংসর্গের নিয়ম, সন্ধ্যোপাসনার নিয়ম, পূজা অর্চনার নিয়ম; জপ তপের নিয়ম, যাগ যজ্ঞের নিয়ম, যোগাদির নিয়ম;—ইত্যাদি কত প্রকার যে নিয়মের ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। যেন নিয়মের অষ্টবজ্রের বাঁধনে হিন্দুর জীবন কঠোরভাবে বদ্ধ। এক পা এদিক ওদিক নড়িবার চড়িবার যো নাই। অমনি অধঃপতন বা অপমৃত্যু এই নিয়ম বা বাঁধনই সভ্যতা; যাহাদের নিয়ম নাই তাহারা অসভ্য বর্ব্বর, যে লোক যত নিয়মী সে তত সভ্য তত মানুষ।

সুতরাং যত কিছু নিয়ম তাহা সমস্তই আত্মার উন্নতি বিধায়ক উহার একটী ও উন্নতির বাধক ত নহেই, পরন্তু উন্নতির সাধক। শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে, পার্থিব অপার্থিব সর্ব্ব প্রকার উন্নতিরই ইহা সাধক ইহা শুধু কথার কথা নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, "ফলেন পরিচিয়তে"।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জাতিভেদ বা স্পর্শ দোষের উপর আরও নানা প্রকার দোষারোপ করা হইয়া থাকে। যেন উহা সর্ব্ব দোষের আকর। উহা অতি সংকীর্ণতার পরিচায়ক, বিশেষ দোষে দুষ্ট, মানুষের স্বকপোল কল্পিত, স্বার্থপরতামূলক ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য বাহিরের দৃষ্টিতে তাহাই কতকটা দেখা যায় বটে, বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বিপরীত। আত্মোন্নতির এমন সহজ শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কল্যাণজনক বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর নাই। শুধু বুঝিবার দোষে উল্টা দেখা যায়। একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে ইহার স্বরূপ তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তখন গুণে মুগ্ধ ও আনন্দে অধীর হইতে হয়।

ইহা কাহারও স্বকপোলকল্পিত নহে, স্বয়ং ভগবান কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট। সামান্য মানুষের ইহা নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতাও নাই। পরম কারুণিক পরমেশ্বর হইতে এই কল্যাণজনক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা অনাদিকাল সিদ্ধ। ইহাতে সংকীর্ণতা বা বিদ্বেষের ছায়াও নাই, উদার ও প্রেমময় ভাবই সর্ব্বত্র বিরাজিত। নীচ স্বার্থপরতার পূতিগন্ধ ইহাতে নাই। পদে পদে অতি উচ্চ ও মহান ত্যাগের পরিচয়ই পাওয়া যায়। একটু আয়াস স্বীকার করিয়া চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিলে সমস্তই সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে পারে, অতএব তজ্জন্য প্রমাণ প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ আপনার মঙ্গল কামনায় নিয়মবদ্ধ হইয়া চলা, সংযত হইয়া চলা, উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর স্বাধীনতা বর্জ্জন করিয়া চলা,—এক কথায় আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলা—অন্যায় বা নিন্দনীয় কার্য্য নহে, পরন্তু অতীব সুসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত কার্য্য।

আপনার মঙ্গল কামনা করিলেই যথাসম্ভব একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেই হইবে অন্যথা পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। জগতের প্রত্যেক পদার্থেই তজ্জাতীয় এক প্রকার শক্তি নিহিত আছে। মানুষেও আছে। দুই বা ততোধিক লোক একত্র হইলেই পরস্পরের সহিত সেই শক্তির বিনিময় হয়। ভাল মন্দ বা সদসৎ দুই প্রকার শক্তিই আছে। ভাল

বা সংশক্তি গ্রহণে ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে। কিন্তু মন্দ বা অসৎ শক্তি গ্রহণে বিশেষ ক্ষতি। এইজন্য সংসর্গের এত গুণ-দোষ বর্ণিত আছে। তাই সৎসংসর্গে অশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে এবং অসৎ সংসর্গ-প্রভৃত অমঙ্গলের নিদান-স্বরূপ।

সত্ত্ব, রজঃ, তমো এই ত্রিগুণাত্মিকা জগৎ। সুতরাং জগতের সকল লোকই ঐ তিনগুণ মিশ্রিত এবং কাজেকাজেই সকলেই ভাল মন্দ মিশ্রিত। সম্পূর্ণ ভাল বা সম্পূর্ণ মন্দ কেহই নহে। ভাল মন্দের মাত্রার ন্যূনাধিক্য অবশ্য থাকিতে পারে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো—এই তিনগুণ লইয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের ভাল মন্দের বিচার। সত্ত্ব ধর্ম্মের মূর্ত্তি, এবং রজঃ কর্ম্মের ও তমো অধর্ম্মের মূর্ত্তি। অতএব রজঃ ও তমোগুণকে বর্দ্ধন না করিয়া সত্ত্বগুণের বর্দ্ধন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য সেইজন্যই খাদ্যাখাদ্যের বিচার, সেইজন্যই স্পর্শদোষ বিচার। অন্ন ও জলের সহিত দোষ গুণ অতি সত্বর সংক্রামিত হয়,—এইজন্য এই বিষয়ে স্পর্শদোষের বিশেষ বিচার। এমন কি তজ্জন্য স্বপাক অন্ন ভোজনের পর্য্যন্তও ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। কেননা তাহা না হইলে যথাযথভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হয় না, এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না হইলে উন্নতিও সম্ভবপর নহে।

কারণ, আপনার স্বদেহই কত দোষের আকর; তারপর আবার অপরের দোষ আসিয়া জুটিলে আর নিস্তার নাই। অতএব অপরের দোষ সংক্রামিত হইবার সর্ব্ববিধ সুযোগ বর্জ্জন করতঃ নিজের দোষ ক্রমশঃ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণ লাভের চেষ্টা করিলে উন্নতি সাধিত হইতে পারে, অন্যথা নহে। তাই স্বাতন্ত্র্যরক্ষা বিষয়ে এতদূর কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব উহা সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

একটী বৃক্ষ রোপণ করিলেও লোকে তাহা সযত্নে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখে। উদ্দেশ্য শুধু—ছাগল, ভেড়া, গরু প্রভৃতির কবল হইতেই রক্ষা নহে, যাহাতে মানুষের হাওয়াও গায়ে না লাগে সে উদ্দেশ্যেও বটে। মানুষের হাওয়া গায় লাগিলে বা মানুষ সর্ব্বদা উহা নাড়াচাড়া করিলে উহা বিজাতীয় শক্তিপ্রভাবে ক্রমশঃ ম্লান হইতে থাকে ও পরিণামে উহা শুকাইয়া মারা যায়। ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে বিজাতীয় শক্তির ক্রিয়া ঠিক বিষের ন্যায় প্রাণান্তকর। উহাতে মঙ্গল ত নাইই; বিনাশও হইতে পারে। অতএব স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

কিন্তু;—তাই বলিয়া উহার কোনও মৌরুশিপাট্টাও নাই বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও নাই। অর্থাৎ চিরকালই যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে এমন কোন কথাই নাই। আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহা সর্পের পুরাতন খোলসের ন্যায় আপনা হইতেই পড়িয়া যায়, বৃক্ষের শুষ্ক বল্কলের ন্যায় আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়ে। যতক্ষণ রোগ ও দেহের রুগ্নাবস্থা ততক্ষণই ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা। রোগ সারিলে ও দেহ সুস্থ হইলে আর ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন কি? কিন্তু রোগের সময় ও দেহের রুগ্নাবস্থাকালে ঔষধ ও পথ্য অবশ্য সেবনীয়, অন্যথা মৃত্যু নিশ্চিত। তেমনি বলপূর্ব্বক সর্পের গাত্র হইতে খোলস তুলিতে গেলেও সর্পের

মৃত্যু সুনিশ্চিত, এবং বৃক্ষের ত্বক উৎপাটন করিতে যাইলেও বৃক্ষের মৃত্যু অবধারিত। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম ব্যবস্থিত। এমন সুন্দর সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর জগতে নাই।*

অতএব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা সংকীর্ণতাও বিদ্বেষ জনিত নহে, পরন্তু উন্নতি ও মঙ্গলকামনা জনিত। লোকে না বুঝিয়া বিপরীত ভাবেন ও দোষারোপ করেন। কিন্তু সুখের বিষয় হিন্দুগণ—খাঁটি হিন্দুগণ ইহা বেশ বুঝেন এবং এই সংস্কারই তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে, তাই নানা বর্ণের সকল লোকই পরস্পরের স্নেহসূত্রে আবদ্ধ আছে। তাই ব্রাহ্মণ চণ্ডালকে স্পর্শ না করিলেও ঘৃণা করেন না, অতিশয় দয়া ও স্নেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, এবং চণ্ডালও অস্পর্শী জ্ঞানে ব্রাহ্মণের প্রতি কোনওরূপ ঈর্ষা বা বিদ্বেষবুদ্ধি পোষণ করে না, পরন্তু অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ জানেন চণ্ডাল তাহার আপনার লোক এবং চণ্ডালও জানে ব্রাহ্মণ তাহার আপনার লোক—এই ভাবেই পরস্পর স্নেহের দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়াই চিরকাল একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে এবং বিপদ আপদে পরস্পর পরস্পরের সহায় স্বরূপ হইতেছে।

সুতরাং এভাবে জাতীয় জীবন গঠিত হইবার পক্ষে কোন বাধা বা অন্তরায় হইতে পারে না পূর্ব্বকালেও হয় নাই, এখনও হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পুরাকালে এই ভাবেই জাতীয় জীবন গঠিত হইয়াছিল, এবং স্বাধীনতার অমল-ধবল-সৌধ-শিখরেও চিরবসতি ছিল, এবং সর্ব্ববিধ উন্নতিরও পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি যুদ্ধনীতি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা বিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, স্থপতি বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা ও কলা বিদ্যা, ইত্যাদি সকল বিদ্যারই চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কখন কোন অন্তরায় বা বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

অতএব এখনও ঐ ভাবে জাতীয় জীবন গঠিত হইবার পক্ষে কোন বাধা হইতে পারে না। কেন হইবে? যাহা ব্যক্তিগত উন্নতির সাধক, তাহা সমষ্টিগত উন্নতিরও সাধক। আবার, ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। সুতরাং জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় জীবন গঠিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন যদি তাহাই হয় তাহা হইলে আমাদের মনে ঐরূপ বিরুদ্ধভাবের উদয় হইতেছে কেন; অর্থাৎ আমরা ঐ নিয়মাদিকে অন্তরায়রূপে গণনা করিতেছি কেন? তাহার কারণ স্বতন্ত্র। তাহার কারণ আমাদের স্বধর্ম্মচ্যুতি। আমরা দিন দিনই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছি, আমরা ক্রমশঃ অধর্ম্মপরায়ণ হইতেছি, তাই আমাদের মনের মধ্যে পাপবুদ্ধির উদয় হইতেছে। তাই মঙ্গলের নিদানকে অমঙ্গলের হেতু ভাবিতেছি, ভালকে মন্দ জ্ঞান করিতেছি। শুধু বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই এইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিজাতীয় শিক্ষার ফলে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া হিতকে অহিত এবং অহিতকে হিত ভাবিতেছি।

* পরব্রহ্মনিবিজ্ঞাতে সমস্তে নিয়বৈরলং তালবৃন্তেন কি কর্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে।

কুশিক্ষার ফলে ধর্ম্ম হারাইতেছি, কাজে কাজেই দল ছাড়িয়া বে-দলে মিশিতেছি! আরও মাধুর্য্য এই যে, দল ছাড়িয়া বেদলে যাইয়া পূর্ব্বের আসল দলের মূলোচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক কিম্ভূত কিমাকার এক নূতন দলের সৃষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি! বুদ্ধির বলিহারি যাই! পুনরায় দলে মিশিলেই যে সকল লেঠা চুকিয়া যায়, সে জ্ঞান নাই; পুনরায় স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলে যে কোন গোল থাকে না, তাহা বুঝিবার অবকাশও নাই দেশের ঘোর দুরদৃষ্ট !!

যাহা হউক এক্ষণে সাধু সাবধান! ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহী কাজে কাজেই স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারগণের মধুর বচনে যেন কেহ মুগ্ধ না হয়েন, মুগ্ধ হইয়া যেন সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া দলভ্রষ্ট না হয়েন ইহাই কায়মনে প্রার্থনা করি। এটুকু তাঁহাদের যেন বিশেষ ভাবে মনে থাকে যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্ম সাধনের এমন উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক প্রণালী আর জগতে নাই। আর জাতি ভেদ প্রথা বর্ত্তমান আছে বলিয়াই এখনও হিন্দু ধর্ম্মের স্বতন্ত্রতা রক্ষিত হইয়াছে, নইলে কোন দিন হিন্দু নামটী পর্য্যন্ত জগতের ইতিহাস হইতে উঠিয়া যাইত।

এ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু আমার ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধিহীনের পক্ষে তাহা বলা সম্ভবপর নহে। প্রাণের জ্বালায় তবু ও মূর্খের ন্যায় কিঞ্চিৎ "আবোল তাবোল" বকিলাম, আশা করি পণ্ডিত মণ্ডলী তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। দেশে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত অনেক আছেন, এই বিষয়ে বলিবার অধিকার তাঁহাদেরই। আশা করি তাঁহারা কেহই নিশ্চেষ্ট রহিবেন না। যাহা বলিবার তাহা বলিবার জন্য এবং যাহা করিবার তাহা কাজ করিবার তাঁহারা সচেষ্ট বা যত্নবান হইবেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত মহাশয় আসরে নামিয়াছেন দেখিয়া যারপর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "সদাচার ও স্বরাজ" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্তিলাভ করিয়াছি। প্রবন্ধ যেমন সারগর্ভ ও গভীর শাস্ত্রীয় যুক্তিপূর্ণ, তমনি সাময়িক। বলা বাহুল্য আরও পূর্ব্ব হইতেই এ চেষ্টা হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক আর কাল বিলম্ব না করিয়া অন্যান্য পণ্ডিত মহোদয়গণেরও উদ্যোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, দেশে যেরূপ হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে প্রাণে বড়ই আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অতএব আর নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে। সকলে মিলিয়া দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইয়া বিপক্ষের সহিত লড়াই করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা বিষয়ে প্রাণপণে যত্ন করিবেন ইহা আশা করিতে পারি।

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে

ব্রাহ্মণ-সমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

একাদশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা।

আশ্বিন।

সন ১৩২৯ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক খণ্ড ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা

REGISTERED No. C—675.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"।

একাদশ বর্ষ। ৮৪৩ শক, ১৩২৯ সাল, আশ্বিন। প্রথম সংখ্যা।

ব্রাহ্মণ।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ব্যাকরণতীর্থ।)

[১]

অতীতের শত শত স্মৃতি লয়ে বুকে,
স্বপনেতে আজো দ্বিজ! রয়েছ কি সুখে?
জাগো জাগো আঁখি মেলি দেখরে সংসার;
মনে কর ক্ষণতরে কীর্ত্তি আপনার।

[২]

ঢালিলে বিবেক বারি বিষয় বহ্নিতে,
বিরুদ্ধ ইন্দ্রিয় বাধা করিলে বিজয়।
বিপিনে বিজনে বসি বৈকুণ্ঠে যাইতে
জপিলে শ্রীহরিনাম চিরমধুময়।

[৩]

রাখিলে পবিত্র জটা, পরিলে বল্কল,
করিলে অজিনে বসি' যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
গভীর উদাত্ত স্বর ধরি অবিরল
গাইলে সে সুধামাখা পূত সামগান।

[৪]

প্রণব ঝঙ্কারে তুমি ধরা কাঁপাইয়ে,
দেবতা দানব সব করিলে স্ববশ।
জাতি বৈরী বহুজন্ম বিরোধ ভুলিয়ে
মিত্রভাবে পরস্পর করিল পরশ।

[৫]

শক্তি বলে এসংসারে সুরের সমান,
হইলে পূজিত নিত্য, এ বিশ্ব মণ্ডলে
পাইলে প্রতিভা বলে ভূপালের মান ;—
নৃপতি হইল নত চরণ যুগলে।

[৬]

হ'লেও ক্ষত্রিয় রাজা পালিলে ভুবন,
অনন্ত সুখের ঘরে করিলে বিহার,
কত শত সুখ শান্তি সাধিয়ে ধীমন্!
স্বদেহে গেলে চলি গোলোক মাঝার।

[৭]

স্বরগে দেবতা যথা তেমতি ধরায়,
ছিলে তুমি হে ব্রাহ্মণ! সবার প্রধান।
কেন আজি মোহ ঘুমে ঘুমাইয়ে হায়!
হারা'লে অক্ষয় কীর্ত্তি অমূল্য সম্মান।

[৮]

অতীতের এ কীর্ত্তিগাথা করিয়ে স্মরণ,
উঠো জাগো হে ব্রাহ্মণ! ত্যজিয়ে শয়ন।
কর কর্ম্ম ধর্ম্মে মতি রাখি' অনিবার,—
অতীতের দিন তব আসিবে আবার।
আর্য্যের গৌরব বহ্নি উঠিবে আবার
দূরে যাবে পৃথিবীর বিষাদ আঁধার
দেখিবে শ্রীহরি বক্ষে ভৃগুর চরণ,—
কনকের হার তাহে দোলে অনুক্ষণ।

———

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

নববর্ষ।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় ব্রাহ্মণসমাজ দশমবর্ষ অতিক্রম করিয়া একাদশ বর্ষে উপস্থিত। অখণ্ডদণ্ডায়মান আদিমধ্যান্তবিরহিত মহাকাল-সাগরের [illegible] সম দশ বৎসর অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও ব্রাহ্মণ-সভার মুখপত্ররূপী ব্রাহ্মণসমাজ দশ বৎসর মধ্যে কর্ম্মজগতে অনেক কার্য্যের অনেক ভাবের আদানপ্রদানে সহায়তা করিতে পারিয়াছে বলিয়া গ্রাহক অনুগ্রাহক পাঠকবর্গের বিরাগভাজন হয় নাই। বিরোধিসাধনসান্নিধ্যে ইহাই একমাত্র আমাদের ভবিষ্যদাশার মধুর দর্শন।

এই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দৈনিক সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রের বহুল প্রচার সত্ত্বেও প্রবল বিধর্ম্মিদলের অসার যুক্তিতর্কপূর্ণ কূটকৌশলময় আক্রমণ হইতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষণ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বের আবরণ উন্মোচন ও সন্দিগ্ধ বিষয়ে কর্ত্তব্যোপদেশ প্রভৃতি দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পোষণপ্রয়াসের অভাব উপলব্ধিই ব্রাহ্মণসমাজ পত্রের আবির্ভাবের কারণ দেশকাল ও অবস্থার প্রতিকূলতায় এই উদ্দেশ্যত্রয় সম্যক সংসাধিত না হইলেও আংশিক সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই একথা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই এই নববর্ষপ্রারম্ভে ব্রাহ্মণসমাজের শুভানুধ্যায়িগণের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যসিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় সভার নেতৃবর্গ নবীন উৎসাহ ও উদ্যমে ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্পাদনে অগ্রসর হইতেছেন। বিরুদ্ধমত খণ্ডনপূর্ব্বক আশ্রমধর্ম্মের তত্ত্বোপদেশ এবং আগামী মাসীয় ধর্ম্মকার্য্যের কর্ত্তব্যোপদেশের সংবাদ লইয়া প্রতি মাসান্তে ব্রাহ্মণসমাজের পাঠকবর্গসমীপে উপস্থিতি করিবার নিয়ম থাকিলেও নানাবিধ দৈবদুর্ব্বিপাকে সে নিয়মের অনেকটা ব্যতিক্রম সংঘটন হওয়ায় নেতৃবর্গ বিশেষ সংক্ষুব্ধ। নববর্ষে যাহাতে সেরূপ ব্যতিক্রম না হয় তাহার জন্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বিত হইতেছে। এখন শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপা।

আর্য্যসন্তান হৃদয়ে আর্য্যধর্ম্মবিরোধিভাবদলের দলনশক্তি লাভের জন্যই মহাশক্তিরূপিণী দুর্গতিনাশিনী চণ্ডিকার শারদীয় মহাপূজা সমাপন করিয়া অধর্ম্মভাববিজয়ার্থ আশ্বিন মাসেই ব্রাহ্মণসমাজ পত্রের আদিসম্পাদন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার প্রারম্ভ হইতে দশসংখ্যক শারদীয় আশ্বিন অতীত, এই দশবৎসর কাল মহামায়ার শারদীয় মহাপূজার উদ্যোগ আয়োজন করিয়াও পূজার ফললাভে বঞ্চিত, নতুবা অতীত দশবৎসর মধ্যেও আর্য্য হৃদয়রাজ্যের অধর্ম্ম অরাতিদল বিজয় হইল না কেন? ভগবান শ্রীশ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন করিয়া শারদীয় মাতৃপূজা সমাপন করিয়া এই আশ্বিনের শুক্লা দশমীতে অরাতি বিজয়পূর্ব্বক বিজয়যাত্রা সম্পাদন করিয়াছিলেন; সেই হইতেই আশ্বিনের শুক্লাদশমী বিজয়া দশমী আখ্যায় বিভূষিতা হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালেও তদবলম্বিত পন্থায় মাতৃভক্ত সাধক কেহ কেহ মাতৃপূজার ফলস্বরূপ বিজয়লাভ

করেন নাই এ ধারণা আমাদের নাই, আর এ ধারণা নাই বলিয়াই এই দশবর্ষব্যাপিনী চেষ্টার ও আমাদের মাতৃপূজা হয় নাই বলিয়াই মনে করি, তাই আমরা ব্রাহ্মণসমাজের শুভানুধ্যায়িগণের সহিত অতীত দশবৎসর কাল বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ করি নাই এবারও করিতে পারিলাম না। শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় একদিন পাঠকবর্গকে যথাযোগ্য বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাইতে পারিব, এই ভরসাই নববর্ষের নবীন উদ্যমের নিদান।

মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ী।

(গল্প)

(লেখক—শ্রীবলরাম সিদ্ধান্তশাস্ত্রী।)

পূর্ব্বাঞ্চলে পার্ব্বতীপুর নামে এক সমৃদ্ধিশালিনী নগরী আছে। পার্ব্বতীপুর বহু ভদ্রলোকের বাসে পরিপূর্ণ। বাগান, বাগিচা, রাস্তাঘাট, বাজার হাট ইত্যাদি সকলই বিশেষ সুব্যবস্থিত বলিয়া সাধারণের হৃদয়াকর্ষক। উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, দীনদরিদ্রের রোগ নিবারণ কল্পে স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় এবং শাস্ত্রচর্চ্চার নিমিত্ত যথাস্থলে একটী চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত। স্থানে স্থানে দেবালয়, হরিসভা, ইত্যাদি সদ্ভাবোদ্দীপক দৃশ্যের অভাব নাই। নগরের প্রান্তভাগে বাহ্যসুখ-তৃপ্তিকামী যুবকহৃদয়তৃপ্তিকর বারাঙ্গনাগণের বিলাসগৃহ। এক কথায় বলিতে হইলে নগরিটী ধর্ম্মাধর্ম্মকর্ম্মমিশ্রিত স্থান। নগরটী অতি প্রাচীনকাল হইতে রঘুরাম মিশ্রের শাসনাধীন এবং তাঁহারই একমাত্র যত্নে উহা শান্তিসুখময়ী হইয়াছিল; তাঁহার বাসবাটী ঐ নগরীর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। রঘুরাম পরম ধার্ম্মিক, কোন সিদ্ধ মহাত্মার নিকট দীক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মাচরণেই জীবন যাপন করিতেন, তাঁহার সাংসারিক সমস্ত কার্য্যভার নায়েব মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল, তিনিও সর্ব্ববিষয়ে প্রভুর সদৃশ ছিলেন, রঘুরাম দেহত্যাগ কালে তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবিন্দশরণকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে পরলোক গমন করেন। গোবিন্দশরণ শিক্ষিত ও ধীর প্রকৃতি ছিলেন। পিতার আদেশমত নায়েব মহাশয়ের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেন, কিন্তু মাত্র একটী বিষয়ে গোবিন্দশরণের নায়েব মহাশয়ের সহিত একমত হইত না। বহুকাল হইতে বাটীতে মায়ের মহাপূজা হইয়া আসিতেছে কিন্তু গোবিন্দশরণ পাশ্চাত্য শিক্ষিত বলিয়াই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক প্রতিমা পূজায় আদৌ আস্থাবান্ ছিলেন না। সতত নায়েব [illegible] ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইত। নায়েব মহাশয় যে কারণেই হউক শাস্ত্রীয় কি দ্বারা বুঝাইয়া অকৃতার্থ হইলে একদিন গোবিন্দশরণকে বলিলেন, গোবিন্দ, প্রতিমা বা

পটের পূজায় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায় না এ বিশ্বাস কি তোমার যাইবে না? গোবিন্দশরণ বলিল, প্রত্যক্ষ কিছু না করিলে আমার এ বিশ্বাস যাইবে না।" নায়েব তখন কেমন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের অনুপ্রেরণায় বলিলেন, গোবিন্দ, কিছুদিন অপেক্ষা কর—আমি তোমায় এই প্রতিমায় বিশ্বাসী করিব এবং তখন এই কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইবে।

নায়েব মহাশয় মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। মায়ের প্রতি অন্যের অবিশ্বাস তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া, অবিশ্বাসীর বিশ্বাস করণে চিন্তিত হইলেন, সকল কার্য্য করেন কিন্তু উদ্দেশ্যচ্যুত হন না। নায়েব মহাশয়ের প্রতি জমীদার মহোদয়ের এই আদেশ ছিল, গোবিন্দশরণের সমভিব্যাহারে সতত অবস্থান করা। গোবিন্দশরণও তাহাই করিত। গোবিন্দ যুবক। যুবার স্বভাব বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত যুবকের স্বভাব সায়াহ্নে সমীরণ সেবন, প্রকৃতি দর্শনে প্রাণ পরিতৃপ্তি করণ, গোবিন্দেরইবা সে স্বভাবের অভাব হইবে কেনও [illegible] করিত কিন্তু বৃদ্ধ নায়েব সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিতেন। একদিন গোবিন্দ নায়েব [illegible] অপরাহ্নে বায়ুসেবনে নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত, সেই অংশে একটী খাল [illegible] ধার দিয়ে একটা সুন্দর রাস্তা, সেই রাস্তার উপর বারাঙ্গনাদের বাস। নায়েব মহা[illegible] কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, গোবিন্দ তুমি এই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, নব বিবাহিত অবস্থা, এ সময় এই বারাঙ্গনা মহলে ভ্রমণ কদাপি বিধেয় নহে।" গোবিন্দ শুনিয়া একটু হাঁসিয়া বলিলেন, আমার চক্ষু যদি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রতিমা দর্শনে আমার অনুরাগ না আসিবার কথা কি? আমি বাহিরের ব্যাপারে নহি; ভিতরের কার্য্যে আমার অন্তর আকৃষ্ট হয়। নায়েব এই কথা শুনিয়া মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আপন অভিষ্টসিদ্ধির পথ দেখিতে পাইয়া মুখে বলিলেন, গোবিন্দ! তোমার মত সহজে কিছুতেই বারাঙ্গনার প্রতি আকৃষ্ট না হইতে পারে কিন্তু যদি কোন রূপসী যুবতী বিশেষ অনুরাগের সহিত তোমার রূপ যৌবন ঐশ্বর্য্যাদি গুণে তোমাতে আসক্তা হয়, এবং যদি তাহা তুমি জানিতে পার তাহা হইলে তুমি কি তাহাতে বিচলিত হও না। সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ আপন বিশ্বাসী যুবক গোবিন্দ বলিল, "কি বেশ্যার অনুরাগে আমার মন বিচলিত হইবে? কদাপি নহে; এত লঘু হৃদয় আমার নহে।" নায়েব প্রাচীন, যুবকের এইরূপ আত্মপ্রত্যয় সূচকবাক্যে দ্বিরুক্তি না করিয়া, অন্য কথা কহিতে কহিতে বাটী প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বাটী আসিয়া নায়েব মহাশয় গোবিন্দশরণের প্রতিমাতে অবিশ্বাস দূর করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট হইলেন।

নায়েব প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যানারোহণে সেই নগরের প্রান্তসীমায় বারাঙ্গনা পল্লীতে উপস্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এক সুন্দরী নবযুবতীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। যুবতী সহসা এই বৃদ্ধকে তাহার গৃহে সমাগত দেখিয়া কিছুক্ষণ বিস্মিত হইয়া রহিল—পরে আন্তরিক অনিচ্ছায় নিজ ব্যবসায় অনুরূপ অভ্যর্থনা করিল। পূতচরিত্র বৃদ্ধ নায়েব বলিলেন, মা তোমার নামটী কি? তখন যুবতী একটু সলজ্জভাবে বলিল, আজ্ঞে

...নোরমা আপনার আসিবার উদ্দেশ্য জানিতে পারি কি? নায়েব তাহার ... মুখী হইয়া বলিলেন, মা বিশেষ গোপনীয় কথা নির্জ্জনে বলিতে ইচ্ছা করি, যুবতী বলিল, আসুন উপরে যাই, সেখানে কেহ আসিবে না।" নায়েব উপরে গিয়া বসিলেন এবং ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। মা আমি কয়েক দিন হইতে তোমার এই রূপসৌন্দর্য্যে এত মুগ্ধ হইয়াছি যে ইচ্ছা করিয়াছি তোমাকে রাজরাণী করিব, আর তোমায় এইরূপ জঘন্যস্থানে ও ব্যবসায়ে থাকিতে হইবে না। শুন—আমার জমীদার পুত্র নবীন যুবক ও সুপুরুষ; তিনি তোমার রূপে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি বড়ই ভালবাসার প্রিয়, প্রণয়ই তাঁহার প্রাণ। তোমার যদি তাঁহার উপর অনুরাগ জন্মে এবং তিনি যদি বুঝিতে পারেন যে তোমার হৃদয় তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত, তাহা হইলে তোমার সহিত তাঁহার মিলন হইতে পারে। তাহা শুনিয়া মুগ্ধা যুবতী মনোরমা আশান্বিতা হইয়া বলিল, আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি কিন্তু আমি যে তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত তাহা কিরূপে তাঁহাকে বুঝাইব। শুনিয়াছি তিনি বড়ই সাধু স্বভাবের লোক, আমি ব্যভিচারিণী আমাতে বা অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? নায়েব বলিলেন, সেজন্য তোমার চিন্তা নাই, আজ হইতে আমার 'আজ্ঞানুসারে কাজ কর তাহা হইলে শীঘ্রই উভয়ের মিলন হইবে। এখন শুন তোমাকে যাহা করিতে হইবে বলিতেছি, তোমার বয়স অল্প, তুমি বাল্যাবধি শুদ্ধ আছ এইরূপ ভাবে গোবিন্দশরণে তোমার আসক্তি প্রকাশ করিতে হইবে। তোমার নিম্নতলের বারাণ্ডায় এই গোবিন্দের ফটো (এই বলিয়া নায়েব মহাশয় গোবিন্দ বাবুর একখানি ফটো তাহার হস্তে দিলেন) রাখিয়া পুষ্পাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া প্রাতঃকাল ও বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে তাহার সম্মুখে করযোড়ে কাতর হৃদয়ে রোদন করিতে করিতে বলিবে, প্রাণেশ্বর, তোমার এই প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বাল্যকাল হইতেই তোমাগত প্রাণ হইয়া এই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি, তোমায় কি আমি এ জন্মে পাইব না, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার মত সময় কি আমার হয় নাই—এ জীবন যৌবন সকলই তোমার চরণে অর্পণ করিয়াছি, আর যে পারি না, দাসী কি একদিনের জন্য ঐ পাদপদ্ম সেবা করিয়া এ জীবন যৌবন সার্থক করিতে পারিবে না' এইরূপে গোবিন্দ বাবুর উপর তোমার একান্ত অনুরাগ জানাইবে এবং দ্বিতীয় পুরুষ চিন্তা ত্যাগ করিয়া কিছু দিন তদ্গতচিত্তে অতিবাহিত করিলে তুমি অচিরকাল মধ্যে গোবিন্দের হৃদয়ানন্দদায়িনী হইয়া রাজরাণী হইবে। অদ্য হইতে কোন পুরুষ যেন তোমার বাটী না আসে। যতদিন তোমার অভিষ্ট সিদ্ধলাভ না হয় ততদিন তোমার সংসারের সমস্ত খরচ আমিই যোগাইব এবং মধ্যে মধ্যে আমি তোমার সংবাদ লইব; উপস্থিত ২০০৲ শত টাকা সংসার খরচ গ্রহণ কর।" মনোরমা যেন স্বপ্ন দেখিতেছে; সে সর্ব্ব বিষয়ে নায়েবের মতানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞা করিল, বড়ই আশা গোবিন্দ বাবুর আদরিণী হইবে, এইরূপে সে প্রত্যহ ঐরূপ ভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। কিছুদিন অতীত হইলে একদিন নায়েবের সহিত গোবিন্দ ভ্রমণ করিতে ঐ পথে আসিয়া পড়িলেন এবং ফিরিয়া যাইতে না যাইতেই তাঁহার নিজ প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে মনোরমাকে

ঐরূপ পূজা করিতে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু নায়েব মহাশয় সঙ্গে থাকায় গোবিন্দ বাবু কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলেন না, তিনি জানিতেন এ পথে ভ্রমণ করা নায়েবের আদৌ ইচ্ছা নহে, সুতরাং যেন তাঁহার ইচ্ছা এখনই এই পথ পরিত্যাগ করেন। গোবিন্দ বাবু মনের ভাব গোপন করিয়া নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, আমার শরীর ভাল বোধ হইতেছে না, সুতরাং ইচ্ছা এখনই গৃহে ফিরিয়া যাই।" নায়েব তাহাতে আপত্তি করিলেন না, ... গৃহে ফিরিলেন। গোবিন্দ বাবু যে হৃদয়ে ভ্রমণে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন ... হৃদয় লইয়া গৃহে ফিরিতে পারিলেন না, চিন্তা করিতে লাগিলেন, কে ঐ সুন্দরী ... প্রতিমূর্ত্তির নিকট কেনই বা করযোড়ে উপবিষ্টা! বৃদ্ধ বহুদর্শী, নায়েবের গোবিন্দের এই চঞ্চলতা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না মনে মনে সিদ্ধি অদূরবর্ত্তী ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং মহামায়ার শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দ চিন্তান্বিত হইয়া সহসা পরদিন সন্ধ্যায় গৃহ ত্যাগ করিয়া একাকী উক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সেই সুন্দরী ঠিক সেইভাবেই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতেছে ও কাতরভাবে সাশ্রু নয়নে কি বলিতেছে ঐ দৃশ্য দেখিয়া গোবিন্দ বাবু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না প্রচ্ছন্নভাবে সেই মনোরমার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, সুন্দরী তাঁহাতেই সংযুক্ত হইবার জন্য কাতরভাবে পাগলিনীর ন্যায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া করযোড়ে রোদন করিতেছে, যুবক গোবিন্দের নায়েবের নিকট পরিচিত সুদৃঢ় হৃদয় কামিনীর এ কোমল কঠিন, করুণ দৃশ্যে বিগলিত হইল, সহসা বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া মনোরমার হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া তাহার ... অনুরাগময়ী অবস্থা দর্শন করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন। মনোরমা সতী, ও যথার্থই বাল্যাবধি তদ্গতপ্রাণা, কোন জন্মান্তরীয় দৈববিড়ম্বনায় তাহার এই জঘন্য কদর্য্য স্থানে থাকিতে হইয়াছে। মনোরমা সরল প্রাণা একান্ত আমাগত প্রবীন সুতরাং এ অবস্থায় ইহাকে স্বপ্নেও বিস্মৃত হইলে পাপ হইবার সম্ভাবনা এই ভাবিয়া বলিলেন, সুন্দরি বুঝিয়াছি তুমি একান্ত আমাগত প্রাণ ও নিষ্পাপ অতএব তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার মহা অধর্ম্ম হইবে, এস সুন্দরি উভয়ে মিলিত হইয়া স্বর্গ সুখানুভব করি, তোমার সাধনার সিদ্ধি হইয়াছে, এই বলিয়া গোবিন্দ মনোরমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। মনোরমা অতি অল্পক্ষণ মধ্যে স্ব ব্যবসায় সুলভ হাবভাবে গোবিন্দকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। এইরূপে পরমসুখে কিছুদিন অতিবাহিত হইল।

এদিকে নায়েব সকল সংবাদ পাইয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। অবিশ্বাসীর বিশ্বাস প্রবল করিবার অবসর হইয়াছে বুঝিয়া পরমাহ্লাদে গোবিন্দ বাবুর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে আবার সেই প্রতিমাপূজার কথা উত্থাপন করিলেন ও এ সম্বন্ধে নানা তর্ক হইতে লাগিল, গোবিন্দ পূর্ব্বমত অবিশ্বাস লইয়াই প্রত্যুত্তর করিতেছেন। নায়েব কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, গোবিন্দ তোমাকে আমি প্রতিমায় মায়ের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করাইলাম তথাপি তুমি বৃথা তর্ক করিয়া আপনার জিদ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছ।" গোবিন্দ ইহাতে

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, কৈ মহাশয় কবে কোথায় আমাকে প্রতিমাতে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করাইলেন?" নায়েব বলিলেন, "যদি তোমার প্রতিমূর্ত্তিতে কাহাকেও অনুরাগবান্ দেখিয়া তাহার কপট কাল্পনিক প্রেমে একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাক, যদি তাহাতে তোমার প্রাণ কাঁদে এবং তাহার ফলে তাহাকে দেখা না দিয়া থাকিতে পার না তবে আমার মায়ের প্রতিরূপে ঘটে, পটে, যন্ত্রে প্রতিমার একান্ত আন্তরিক প্রেমে ভক্তি পূজায় করুণ আবেদনেও আত্মনিবেদনে কেনই বা মা আমার সন্তুষ্ট হইয়া ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতে দর্শন দিবেন না। ভক্তের পূজা পাঠ বেদবিধি বিহিত পরম পবিত্র। জীবের পরিত্রাণ কারণেই নির্দ্দিষ্ট। বেশ্যার বাহ্য অপবিত্র ঘৃণিত সুখ ভোগ কারণে কাল্পনিক ভাবের নহে। তুমি মনুষ্য তোমায় ভালবাসিলে তুমি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পার না। আর আজ আমার ভাবময়ী সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপা, সর্ব্বত্র বিদ্যমানা ব্রহ্মময়ী চিন্ময়ী ভগবতীর প্রতিমার কাছে, করুণ হৃদয়ে অনাবিল ভক্তি সহকারে একান্ত অন্তরে রোদন করিলে চিন্ময়ী মা আমার করুনা দৃষ্টিতে তাঁহার ভক্তের বিশ্বাস ও ভক্তির অনুরূপ প্রতিমায় অধিষ্ঠিতা হইয়া তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কৃপণতা করিবেন কেন? মা আমার কি এমনই পাষাণী? ধিক্ তোমার যুক্তি বিশ্বাস! এখন বুঝিলে প্রতিমায় ভাবনার অনুরূপ দেবতার আবির্ভাব হয় কিরূপে। তুমি মনুষ্য ভালবাসার ব্যভিচারে সরলতা দেখিয়া আপনা হারাইলে, কিন্তু ভগবান্ সর্ব্বান্তর্যামী তাঁহার নিকট ব্যভিচারের আদর সম্ভবে না, কপটতা, অপবিত্রতা কখনই স্থান পায় না। অব্যভিচারিণী অনুরাগময়ী ভক্তির একান্ত আকর্ষণে চিন্ময়ীমায়ের আসন টলিয়া উঠে। গোবিন্দ, বিশ্বাস কর এখন বুঝিতেছ কিরূপ, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। বৃথা আপন বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া অধঃপতনের পথ সাদরে গ্রহণ করিও না, কপটতা বিসর্জ্জন দিয়া সরলতা বরণ করিয়া লও, চির সুখশান্তি পাইবে।" ইত্যাদি বহু প্রকারে নায়েব মহাশয় গোবিন্দশরণকে সস্নেহ ভৎর্সনা করিয়া জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা তাহার হৃদয়ের সকল অবিশ্বাস দূর করিল। গোবিন্দশরণ নিজ কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া নায়েব মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার শাস্ত্রীয় কোন বিষয়ে অবিশ্বাস রহিল না, তিনি শাস্ত্রের সকল কার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতি করিতে যত্নবান্ হইলেন এবং সর্ব্বদা ভাবিতেন যথার্থই অনাবিল ভক্তিতে মৃণ্ময়ীতে চিন্ময়ীর আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আর্য্য-প্রতি...

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রী—

আদিযুগে ত্রিচক্র, দ্বিচক্র ও একচক্র যানের অস্তিত্ব প্রমাণ সাপক্ষে যে সমস্ত বৈদিক সূক্ত অধ্যাহার করা হইয়াছে, তাহাতেই বোধ হয়, সেই বৈদিক যুগে ঐ সকল যানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ নাই। তথাপি ঐ সম্বন্ধে কতিপয় পৌরাণিক প্রমাণ অধ্যাহার করিয়া আমাদের উক্তির দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান যুগেও অদ্যাপি কুত্রাপি একচক্র যান প্রচলিত হয় নাই। পরম্পরা শুনিতেছি সত্বরই পাশ্চাত্য দেশে এক-চক্রযানও প্রচলিত হইবে। তখন আর আমার প্রমাণিত একচক্রযান সম্বন্ধে কেহই কোন অসম্ভবত্ব দেখিবেন না। পুরাকালে ভারতে একচক্রযান ত ছিলই, অধিকন্তু সময় সময়, ঐ একচক্রযান অশ্ববাহিতও হইত। আমার প্রমাণ দৃষ্টে হয়ত আজকাল কেহ কেহ বলিবেন, একচক্রযান থাকিলেও, তাহা অশ্ববাহ্য হইতেই পারে না, কারণ অশ্ব দ্বারা একচক্রযান বহিত হইতে গেলেই তাহাপার্শ্বে পতিত না হইয়া পারে না। কিন্তু আর কিছুদিন পরে পাশ্চাত্য জগৎ যখন, অশ্বসাপেক্ষ ও অশ্ব নিরপেক্ষ উভয়বিধ একচক্রযান প্রচলিত করিবেন, তখন আমার এই উক্তির যাথার্থ সপ্রমাণ হইবে।

আমি পূর্ব্বে একচক্রযান সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক প্রমাণ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছি। এখন অন্যান্য পুরাণ হইতে তৎসম্বন্ধে আরও ২।১টী প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি। বায়ু পুরাণে বর্ণিত আছে।—

অতঃ সূর্য্যরথস্যাপ সন্নিবেশং নিবোধত।
সংস্থিতেনৈক চক্রেণ পঞ্চারেণ ত্রিনাভিনা॥
হিরণ্ময়েন ভগবান পর্ব্বনাভু মহৌজসা।
নষ্টবর্ষা ক্বিকারেণ ষটপ্রকারৈকনেমিনা।
চক্রেণ ভাস্বতঃ সূর্য্যাস্যন্দনেন প্রসর্পতি॥ বা, পু।

অর্থ।—এখন সূর্য্যরথের সন্নিবেশ শ্রবণ কর। এই রথ একটী চক্র, পাঁচটী অর (চাকার পাখি) তিনটী নাভি ও ষড়্‌বিধ ভেদযুক্ত একমাত্র নেমি (চক্রের প্রান্তস্থ কাষ্ঠ বা লৌহ) সমন্বিত। ঐ একচক্ররথ পথান্ধকারনাশক, অতিভাস্বর ও বেগবান। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের ষটপঞ্চাশাধ্যায়েও ঠিক ঐরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আরও বর্ণিত আছে।

ইত্যেষ একচক্রেণ সূর্য্যাতূর্ণং রথেনতু।
ভদ্রৈরশ্বৈরক্ষতৈরশ্বৈঃ সর্পতে হসৌ দিবিক্ষয়ে॥ ব্রঃ পুঃ ৫৭ অঃ

সেই সূর্য্য অক্ষত উৎকৃষ্ট অশ্বঃচালিত একচক্র রথে দিবাতে গমন করেন।

...চক্র, দ্বিচক্র ও একচক্রযানের অস্তিত্ব প্রমাণ জন্য আর প্রমাণ অধ্যাহার করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

এক্ষণে আমরা লৌহবর্ম্ম, বাষ্পীয়শকট ও জলযানের অস্তিত্ব প্রমাণপক্ষে চেষ্টা করিব। কেহ কেহ বলিবেন যে, সেই আদি যুগে লৌহবর্ম্ম থাকিলে তাহার একখানি লৌহ ও কি মৃত্তিকা নিম্নে দৃষ্ট হইত না? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগের যে সমস্ত নিদর্শন আজ ৩০।৪০ হাত মাটীর নিম্নে পাওয়া যাইতেছে তাহার অস্তিত্বে কি কেহ বিশ্বাস করিতেন? এখন ঐ সমস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আর কেহ অবিশ্বাস করিতে-... যুগের সহিত তুলনায় বৌদ্ধযুগ অতি অল্পদিনের। সুতরাং বৈদিকযুগের ...গুলি যে কত মৃত্তিকার নিম্নে থাকা সম্ভব তাহার ইয়ত্তা করাও ...ও আবিষ্কৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং বর্ত্তমানে ঐরূপ কোন ...। বেদে ও পুরাণাদিতে লৌহবর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হওয়াতে ...আদি যুগে যে ঐ সমস্ত ছিল তাহাই হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় সাধ্যানুসারে উহার সপক্ষে ...যে সমস্ত প্রমাণাদি পাইয়াছি তাহাই পাঠকগণের গোচর করিব।

২। লৌহবর্ম্ম, বাষ্পীয় শকট ও জলযান। অথর্ব্ববেদে বর্ণিত আছে।—

'সতং রথ্যা হিরণ্ময়াঃ।'

২০ কা। ৪র্থ অ।

শত শত লৌহময় পথ ছিল। স্থানান্তরে আছে।—

'হিরণ্ময়া পন্থান আসন।' ১ম। অ।

লৌহময় পথ ছিল।

ঋগ্বেদেও বহুস্থলে লৌহবর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র দেখান যাইতেছে।

"হিরণ্ময়ে রথে দস্রা হিরণ্ময়ে। ৩।১৩৯ সূ।১ম

হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা হিরণ্ময় (লৌহময়) পথে লৌহময় রথে আগমন কর।

"অত্যায়াতং দস্রা হিরণ্যবর্ত্তনি॥" ২।

আগচ্ছতং অশ্বিনা হিরণ্যবর্ত্তনি॥ ৩॥ ১ম

হে অশ্বিদ্বয় তোমরা লৌহময় বর্ম্মে আগমন কর। ঐ ঋগ্বেদের স্থানান্তরে আছে।—

"হিরণ্ময়া পন্থান্ আসন॥ ৫॥ ৭ম সূ। ৬ম। লৌহময় পথ সকল ছিল।

আবারও দেখুন। —এই দেব ময়োভূবাদস্রা হিরণ্যবর্ত্তনী। * * * * ॥১৮।৯২ সূ। ১ম

পদপাঠঃ।

আ ইহ। দেব। ময়ো। ভূবা। দস্র। হিরণ্যবর্ত্তনী।

ভাষ্যঃ।

দেবা দানাদি গুণযুক্তৌ আরোগ্য এ দাতারৌ

অশ্বিনৌ হিরণ্যবর্ত্তনি লৌহবর্ম্মনি আগচ্ছত॥

দানাদি গুণ যুক্ত আরোগ্য প্রদায়ক অশ্বিনী কুমারদ্বয় লৌহবর্ম্মে এখানে আসুন।

ঋগ্বেদের বহুস্থলেই এই হিরণ্য বর্ম্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাঠক বলিতে পারেন যে হিরণ্য শব্দে স্বর্ণই বুঝায় সুতরাং হিরণ্ময় বা হিরণ্ময় বলিলে লৌহময় কিরূপে বুঝিব। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে ঋগ্বেদে হিরণ্ময় বজ্র ও উল্লিখিত আছে আবার আয়স বজ্রও উল্লিখিত আছে। বজ্র একটা লৌহের একটা সোনার ছিল না, আর এক কথা সোনার বজ্র প্রাণনাশক হইতে পারে না। একই বজ্রের বিশেষণ হিরণ্ময় ও আয়স আছে। সুতরাং হিরণ্ময় শব্দেও আয়স হইবে। যথা।—

"বাহ্বো বর্জ্রমায়স মধারয়।" ৮৷৫২ সূ। ১ম,

বাহু দ্বারা লৌহ বজ্রধারণ করিয়াছিলেন। আবার ও বলিতেছেন।—

অভোনং বজ্রমায়সঃ।১২৷৮০ সূ।১ম

ইহাকে লৌহময় বজ্র দ্বারা বিনাশ করিয়া দিলেন।

হরিবান্দধে হস্তয়োর্ব্বজ্রমায়সং।১৷৮১ সূ। ১ম

হরিবান ইন্দ্র হস্তে লৌহ বজ্রধারণ করিয়াছেন। স্থানান্তরে বলিতেছেন—

ইন্দ্রস্য বজ্রশ্নথিতো হিরণ্যয়ঃ।২৷৫৭সূ৷১ম

ইন্দ্রের হিরণ্ময় বজ্র শত্রুহিংসনশীল। সকলেই জ্ঞাত আছেন ইন্দ্রের একই বজ্র। ঐ বজ্রকে কখন আয়স কখন হিরণ্ময় বলা হইয়াছে সুতরাং হিরণ্ময় ও আয়স একার্থবাচক। এখন দেখা যাউক অভিধানে কি জানা যায়। প্রচলিত অভিধানের মধ্যে অমর কোষই সর্ব্বজন সমাদৃত অমর কোষ হিরণ্য শব্দে স্বর্ণ ও রৌপ্যই বলিয়াছেন। অমর কোষ দেখিয়া কথঞ্চিৎ হতাশাস হইলেও নির্ঘণ্টুকার (১) হিরণ্য, হেম, কাঞ্চন, অয়ঃ ও লৌহ এক পর্য্যায়ে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এতাবতা হিরণ্য শব্দে যে লৌহ তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই রহিল না। পাঠক বলিতে পারেন হিরণ্ময় শব্দেই লৌহময় বুঝায় কিন্তু হিরণ্ময় শব্দের অর্থ কি? তদুত্তরে বক্তব্য যে আর্ষ ও বৈদিক প্রয়োগ হেতুই হিরণ্ময় স্থলে হিরণ্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। যাস্ক সায়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারেরাই এইরূপ বলিয়াছেন। আবারও বলিতে পারেন যে বর্ম্ম শব্দের [illegible] বর্ত্তন শব্দের অর্থ কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, বৃত্ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় করিয়া [illegible] বৃত্ ধাতু অর্থে গমনও বুঝায়। ঋগ্বেদের শত শত স্থলে 'গচ্ছতি' অর্থে বর্ত্ততে [illegible] হইয়াছে। ঐ বৃত্ ধাতুর উত্তর বৈদিক 'অন্' প্রত্যয় করিয়া বর্ত্তন্ সিদ্ধ হইয়াছে সুতরাং বর্ম্ম ও বর্ত্তন্ উভয়েই একার্থ বাচক।

লৌহবর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ হইল। এখন দ্রষ্টব্য ঐ সকল লৌহ বর্ম্ম কোন কোন স্থানে প্রসারিত ছিল।

ঋগ্বেদ বলিতেছেন।—

---

(১) হেম, চন্দ্রং, রুক্মং অয়ঃ, হিরণ্যং, পেশ, কৃশনং, লোহং, কনকং, কাঞ্চনং, ভর্ম অমৃতং মরুৎদত্তং, জাতরূপং ইতি পঞ্চদশ হিরণ্য নামানি। মঃ মাঃ নির্ঘণ্টু।

উদস্য বাহূশিথিরা বৃহন্তা
হিরণ্যয়া দিবো অন্তান্ অনষ্টাম্।
নূনং সো অস্য মহিমা পনিষ্ট
সূরশ্চিদস্মৈ অনুদাৎ অপস্যাম্ ২॥ ৩৫ সূ। ৭ম।

পদ পাঠঃ।

অস্য। শিথিরা। বৃহন্তা। বাহূ। হিরণ্যয়া। দিবো। অন্তান্। উৎ।অনষ্টাম্। নূনং। অস্য। সঃ। মহিমা। অপনিষ্ট। অস্মৈ। সূরশ্চিৎ। অপস্যাং। অনুদাৎ।

ব্যাখ্যা।—অস্য সবিতু শিথিরা শিথিলৌ প্রসারিতৌ বৃহন্তা বৃহন্তৌ সুদীর্ঘৌ বাহূ বাহুরূপৌ বাহুবৎ দিগন্ত প্রসারিতৌ যে লৌহ বর্ত্মনী দিবো দ্যুলোকস্য অন্তান্ পর্য্যন্তদেশান্ উৎ উদগু অনষ্টাংব্যাপ্নুতাং। নূনং নিশ্চিতং অস্য সবিতু দেবস্য মহিমা মহত্বং লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ জং যশঃ পনিষ্ট অপনিষ্ট সর্ব্বৈঃ কর্ত্তৃভিঃ কীর্ত্তিতং। অস্মৈ অসৌ (বিভক্তি ব্যত্যয়) সূরশ্চিৎ সবিত এব অপস্যাং অপরিসীমাং অনুদাৎ অনুকম্পামেব দাৎ অদাৎ দত্তবান্ প্রদর্শিতবান্ ইতি যাবৎ।

সবিতৃদেব দ্যুলোকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত লৌহবর্ত্মের বিস্তার করিয়াছেন। উহা অতি সুদীর্ঘ যেন দুইটি বাহু (শাখা) স্বরূপ। এতদ্দ্বারা তাঁহার লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ হেতু মহৎ যশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে জন সাধারণের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঐ ঋগ্বেদ বাষ্পীয় রথের কিরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিতেছেন, দেখুন।—

বাতস্যনু মহিমানং রথস্য
রুজন্নেতি স্তনয়ন্নস্য ঘোষঃ।
দিবিস্পৃকং যাত্যরুণানি কৃণ্বন্
উত এতি পৃথিব্যা রেণু মস্যন্ ॥ ১ ॥ ১৬৮ সূ।১০ম।

পদপাঠঃ। নু। বাতস্য। রথস্য। মহিমানং। অয়ং। রুজন্। অস্য। ঘোষঃ। স্তনয়ন্। এতি দিবিস্পৃক্। অরুণানি কৃণ্বন্। যাতি। উত। পৃথিব্যাং। রেণুং। অস্যন্। এতি।

ব্যাখ্যা। নু ভোঃ বাতস্য বাষ্পীয়স্য শকটস্য বাষ্পভরেণ চালিতস্য রথস্য বাষ্পীয় শকটস্য মহিমানং মারাত্ম্যং কিং ব্রবীমি ইতি শেষঃ। অয়ং রথঃ বাষ্পীয় শকটঃ রুজন্ পথিস্থিত স্থাবর জঙ্গমাদিশু পীড়য়ন্ ইব এতি গচ্ছতি আগচ্ছতিচ।

অস্য রথস্য ঘোষঃ শব্দং স্তনয়ন্ গিরিগহ্বরাদিষু প্রতিধ্বনিং উৎপাদয়ন্ এতি। অয়ং রথঃ দিবি স্পৃক্ একত্র উদীচ্যাং দ্যুলোকস্পর্শী, অয়ং রথঃ তস্মাৎ দ্যুলোকাৎ গমন সময়ে দিশশ্চ অরুণ বর্ণানি কৃণ্বন্ যাতি গচ্ছতি। অস্য রথস্য বাষ্পজনকস্য অগ্নে তেজোবশাৎ দিশশ্চ অরুণ বর্ণানি কৃণ্বন্ যাতি ইতি ভাবঃ। অপিচ অয়ং রথঃ পৃথিব্যা পৃথিব্যাং (বিভক্তি ব্যত্যয়) রেণুং অঙ্গার চূর্ণাদিকং অস্যন্ ক্ষিপন্ এতি গচ্ছতি আগচ্ছতি চ।

এই বাষ্পীয় শকটের মহিমা আর কি বলিব! ইহা যখন বেগে গমন করে তখন ইহার

বেগ ভরে স্থাবর জঙ্গমাদি যেন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় বলিয়াই বোধ হয়। ইহার শব্দ পর্ব্বতাদিতে প্রতিধ্বনি উৎপাদন করিতে করিতে যাতায়াত করে। যে বাষ্পের শক্তিতে এই শকট চালিত হয়। ঐ বাষ্পের জনক অগ্নি। যে আধারে ঐ প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে সম্ভবতঃ ঐ আধারের উপরে আবরণ না থাকায় ঐ অগ্নির তেজে শকট যেদিকেই চলিতে থাকে সেইদিক (উপরে ও চতুঃপার্শ্বে) অরুণ বর্ণ হইয়া যায়। এই শকট গমনকালে অঙ্গার চূর্ণাদি পৃথিবীতে নিঃক্ষেপ করিতে করিতে যায়। ঋগ্বেদের ঐ সূক্তেই পুনরায় বলিতেছেন।

অন্তরীক্ষ পথিভিরীয় মানঃ
ন নিবিশতে কত মচ্চনাহঃ।
অপাং সখা প্রথমজা কৃত বা
কস্বিৎ জাতঃ কুত আবভূব॥ ৩।১৬৮ সূ। ১০ম

পদপাঠঃ—অন্তরীক্ষ। পথিভিঃ। ঈয়মানঃ। কতমচ্চন। অহঃ। ন। নিবিশতে। কস্বিৎ। জাতঃ। কুত। আবভূব। অপাং সখা প্রথমজা। ঋত বা।

ব্যাখ্যা। অয়ং বাষ্পীয় রথঃ অন্তরীক্ষে অন্তরীক্ষ লোকে স্থিতৈঃ পথিভির্মার্গৈঃ লৌহবর্ত্মভিঃ ঈয়মানঃ গমন পরায়ণঃ। অয়ং রথঃ কতমচ্চন অহঃ কস্মিং শ্চিদপি অহনি। ন নিবিশতে তিষ্ঠতি। কদাপি গমনাগমনং ন বন্ধোভবতি। অয়ং রথঃ কস্বিৎ কুত্র জাতঃ? নির্ম্মিতঃ? কুতঃ কস্মাৎ বা আবভুব? কস্মাৎ বা চলিতুং প্রবৃত্তঃ? অপাংসখা অন্তরীক্ষ বাসিনং বান্ধবাঃ প্রথম জা পূর্ব্বকালীয়াঃ ঋষয়ঃ অস্য বাষ্পীয় রথস্য ঋতবাঃ ঋতবন্তঃ, ঋতং প্রাপ্তিং তদ্বন্তঃ গন্তারঃ নির্ম্মিতারঃ ইতি যাবৎ।

এই বাষ্পীয় রথ অন্তরীক্ষদেশস্থ পথ দিয়া গমনাগমন করে। ইহা একদিন ও বন্ধ থাকে না। প্রতিদিনই যাতায়াত করে। (এই পর্য্যন্ত বলিয়াই প্রশ্ন করা হইল।) ইহা কোথা হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ কোন স্থান হইতে প্রথমেই চলিতে আরম্ভ করিয়াছে? কাহারাই বা এই বাষ্পীয় যানের নির্ম্মাতা? (এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরও তৎক্ষণাৎ দেওয়া হইল, এজন্ত প্রশ্নোত্তর সকল একই মন্ত্রে সন্নিবেসিত।

উত্তর।—অন্তরীক্ষ দেশবাসিদিগের সখা অর্থাৎ বান্ধব পূর্ব্বকালীন ঋষিরাই এই বাষ্পীয় যানের নির্ম্মাতা এবং ঐ অন্তরীক্ষ দেশ হইতেই এই বাষ্পীয় যান চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আবারও দেখুন বাষ্পীয় শকট সম্বন্ধে ঋগ্বেদ পুনরায় কিরূপ বলিতেছেন।—

উদীরয়ন্ত বায়ুভি র্বাশ্রাসঃ পৃশ্নি মাতরঃ।
ধুক্ষন্ত পিপ্যুষীমিষং
বপন্তি মরুতো মিহং প্রবেপয়ন্তি পর্ব্বতান্।
যৎ যামং যান্তি বায়ুভিঃ॥ ৪।৭ সূ। ৮ম।

পদপাঠঃ।—বাশ্রাসঃ। পৃশ্নিমাতরঃ। উৎ। ঈরয়ন্ত। পিপ্যুষীং। ইষং। ধুক্ষন্ত। স। মরুতঃ। যামং। যৎ। বায়ুভিঃ। যান্তি। মিহং। বপন্তি। পর্ব্বতান। প্রবেপয়ন্তি।

ব্যাখ্যা। বাভ্রাণো বামমশীলাঃ শব্দকারিণঃ পৃশ্নিমাতরঃ পৃশ্নি স্তেনসোমাতা, উৎপত্তি যস্যাং স ইতি তাঃ (১) বায়ু বাষ্পঃ বাষ্পীয় যানা ইতি, উং উত্তরস্যাং দিশি ঈরয় গচ্ছতি পিপ্যুষীঃ পুষ্টিকরীঃ ইষং গোধুমাদি খাদ্য দ্রব্যং ধুক্ষন্ত অধুক্ষন্তঃ প্রতি স্থানং:ক্ষারিতবন্তঃ! স মরুতঃ ইন্দ্র সৈনিকস্য যামং যামাঃ যং যদা বায়ুভি বাষ্প ভরৈর্যান্তি, তদা তে যামা মিহং জল কণিকাং বপন্তি বিকীরয়ন্তি, তান পর্ব্বতান প্রবেপয়ন্তি প্রকম্পয়ন্তি। অন্তরীক্ষ দেশবাসী ইন্দ্র সৈনিক মরুদ্গণ ঐ অন্তরীক্ষ দেশবাসীদিগের বান্ধব ঋষিগণ নির্ম্মিত শব্দকরী বাষ্পীয় যানে উত্তরদিক হইতে যাইতে যাইতে প্রতি জনপদে (ষ্টেসনে) পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্য নামাইয়া দিতে দিতে যাইতেন। ঐ সকল বাষ্পীয় যান গমন সময়ে জলকণা বিকীর্ণ করিতে করিতে পর্ব্বত সকলকে প্রকম্পিত করিতে করিতে গমন করিত।

(১) তস্মাদ্বা এত স্মাদাকাশঃ সম্ভূতঃ।
আকাশাদ্বায়ু। বায়োস্তেজোঽগ্নিঃ।
অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। পৃথিব্যা ওষধয়ঃ ইত্যাদি। তৈঃ উ।

ঋগ্বেদের ৭ম মণ্ডলের ৭ম সূক্তে বলিতেছেন—

উদুত্যে অরুণপ্সবশ্চিত্রা যামেভিরীবতে।
বাশ্রা অধিস্নুনা দিবঃ। ৭।৭ সূ।৮ম।

পদপাঠঃ।—উ।ত্যে। অরুণপ্সবঃ চিত্রা। বাশ্রা। যামেভিঃ দিবঃ। অধি। স্নুনা। উৎ। ঈবতে।

ব্যাখ্যা।—উ ত্যেঃ তে৷ তে পূর্ব্বোক্তাঃ পৃশ্নিমাতরঃ মরুতঃ অরুণপ্সবঃ অরুণবর্ণদ্যোতকৈঃ চিত্রা বিচিত্ররূপৈঃ বাশ্রা শব্দকারিভির্যামেভিঃ বাষ্পীয়শকটৈঃ দিবঃ দ্যুলোকস্য অধি উপরি স্নুনা তুষারেণ উৎ উদীচীং ঈরতে গচ্ছতি।

সেই মরুদ্গণ অরুণবর্ণকারি-বিচিত্র শব্দকারি বাষ্পীয়শকটে আরোহণ করিয়া দ্যুলোকে তুষারসিক্ত হইতে হইতে উত্তর দিকে গমন করিতেছেন।

ঐ সূক্তেই অন্য মন্ত্রে বলিতেছেন—

উদু স্বানেভিরীরতে উদ্রথৈরুদু বায়ুভিঃ।
উৎস্তোমৈঃ পৃশ্নিমাতরঃ॥ ১১ ৭ সূ।৮ম

পদপাঠঃ। –পৃশ্নিমাতরঃ। স্বানেভিঃ। উদু। বায়ুভিঃ। উৎ। রথৈঃ। উৎ। স্তোমৈঃ। উদু ঈরতে।

ব্যাখ্যা।—পৃশ্নিমাতরঃ ইন্দ্র সৈনিক মরুতঃ স্বানেভিঃ স্বানৈঃ ধ্বনিভিঃ তথা বায়ুভি উৎ প্রবৃদ্ধিঃ প্রবল বাষ্পভরৈঃ চালিতৈঃ উদ্রথৈঃ উৎকৃষ্টরথৈঃ বাষ্পীয়রটৈঃ উৎ উচ্চৈঃ স্তোত্রৈঃ উচ্চৈঃ স্বরেণ স্তোত্রং গায়ন্তঃ উদু উদীচীং ঈরতে যান্তি।

অন্তরীক্ষপ্রভব মরুদ্গণ বাষ্পীয় রথে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে

করিতে:উত্তর দিকে যাইতেছেন। ঐ বাষ্পীয় শকট সকল প্রবল বাষ্পভরে: চালিত হওয়ায় অত্যুচ্চ শব্দ করিতে করিতে যাইতেছিল।

আবারও কি বলেন দেখুন—

হিরণ্যত্বক্ মধুবর্ণো ঘৃতস্নুঃ
পৃক্ষো বহন্নাবথো বর্ত্ততেবাম্।
মনোজবা অশ্বিনা বাতরংহাঃ
যেনাতিযাথো দুরিতানি বিশ্বা ॥ ৩।৭৭সূ।৫ম।

পদপাঠঃ।—অশ্বিনা। বাং। হিরণ্যত্বক্। মধুবর্ণঃ। ঘৃতস্নুঃ। মনোজবা। বাতরংহাঃ। রথঃ। পৃক্ষঃ। বহন্। আ। বর্ত্ততে। যেন। বিশ্বা।:দুরিতানি। অতিযাথঃ।

ব্যাখ্যা।—ভো অশ্বিনা অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ! বাং যুবয়োঃ হিরণ্যত্বক্ লৌহপত্রনির্ম্মিতো মণ্ডিতো বা অতএব মধুবর্ণঃ শোভনবর্ণঃ ঘৃতস্নুঃ ঘৃতস্রাতঃ ঘর্ষণজন্য অগ্ন্যুৎপাতভয়াৎ ইতি ভাবঃ মনোজবাঃ মনোবদ্বেগগামী বাতরংহা বায়ুবদ্বেগগামী রথঃ বাষ্পীয়যানঃ পৃক্ষঃ অন্নাদিকং বহন্ ধারয়ন্ আবর্ত্ততে অস্মদাভি মুখং আগচ্ছতি।:.যুবাং যেন রথেন বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি দুরিতানি দুর্গমমার্গান্ অতি অতিক্রম্য গচ্ছথঃ।

হে অশ্বিদ্বয় :তোমাদের লৌহপত্র নির্ম্মিত অথবা লৌহপত্র মোড়ান মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ঘৃত সিক্ত, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগগামী বাষ্পীয় রথ অন্নাদি বহন করিয়া আনে। তোমরা এই রথে অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া থাক।

বাষ্পীয়যানের অস্তিত্ব প্রমাণ:জন্য যে সমস্ত সূক্ত ঋগ্বেদ হইতে অধ্যাহৃত হইল তদ্দ্বারা সেই আদিযুগে যে বাষ্পীয়যান ছিল তাহা প্রমাণীকৃত হইল; তথাপি ঋগ্বেদ হইতে আর একটী মন্ত্রও অধ্যাহার করা গেল, দেখুন।

ক্রীলং বঃ শর্ধো মারুতমনর্ব্বাণং রথে শুভং।
কণ্বা অভিপ্রগায়ত ॥:১।৩৭সূ।:ম।

পদপাঠঃ।—কণ্বা। বঃ।:রথে। অনর্ব্বাণং। ক্রীলং। মারুতং। শুভং। শর্ধঃ। অভি। প্র। গায়ত।

ব্যাখ্যা।—ভো কণ্বা কণ্বাদিমহর্ষয়ঃ। বঃ যূয়ং। বিভক্তি ব্যত্যয় রথে রথস্য অনর্ব্বাণং :ঘোটক নিরপেক্ষং ক্রীলং বিহরণশীলং শুভং মঙ্গলদায়কং মারুতংবাষ্পীয়ংশর্ধোবলং অভিতশ্চতর্দ্দিক্ষু প্রকর্ষেণ গায়ত:ব্যাখ্যায়তাম্।

হে কণ্ব প্রমুখ মহর্ষিগণ!:.তোমরা ঐ রথের অশ্ব নিরপেক্ষ গমন শীল বাষ্পীয় বলের বিবরণ সকলের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেও।

এতাবতা বোধ হয় যখন বাষ্পীয়যান প্রথম আবিষ্কৃত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল, তখন ঐ বিবরণ সকলকে জানান প্রয়োজন হইল। তখন প্লাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল ও বিজ্ঞাপন দ্বারা কোন বিবরণ প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না, এজন্য দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচরগণ কণ্বপ্রমুখ মহর্ষিদিগের সর্ব্বত্র যাতায়াত থাকায় তাঁহাদিগকেই এই নবাবিষ্কৃত বাষ্পীয় রথের অভূত পূর্ব্ব বাষ্পীয় বেগের বিবরণ চারিদিকেই ব্যাখ্যা পূর্ব্বক প্রচার করিবার অনুরোধ করিলেন।

প্রাণ মম কি জানি কি চায় ?

লেখক—শ্রীতারকেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।

প্রাণ মম কি জানি কি চায় ?
কি চাহে বুঝিতে নারি
কি আক্ষেপে আঁখি বারি—
অলক্ষেতে ঝরি ঝরি হৃদয় ভাসায় ;—
কি জানি কি যেন নাই
কোথা গেলে তাহা পাই
কি অভাব কি যে চাই—কে বল সুধায় !
মনে পড়ে কত কথ
কত সুপ্ত মর্ম্মব্যথা —
প্রাণের করুণগাথা যেন শোনা যায় '
স্বর্ণরশ্মি গোধূলির
মণ্ডিত বিটপী শীর
সান্ধ্য সমীরণ ধীর পূর্ণ সুষমায় !
পাপিয়া আকুল সুরে
কোন্ কুঞ্জে গাহে দূরে
শুনি হিয়া কাঁদে ঝুরে মর্ম্মবেদনায় !
প্রাণ মম কি জানি কি চায় ?

কুঞ্জবনে ফোটে ফুল
মত্ত করি অলিকুল ;—
তটিনীর কুল্ কুল্ মৃদু শোনা যায়,
পাখীর কাকলী ছন্দ
মধুর ফুলের গন্ধ
ভেসে আসে মৃদুমন্দ দখিনা হাওয়ায়
কাননে শ্যামল শোভা
গগনে সুনীল আভা
জগজন মনোলোভা মাধুরী লীলায় !

চাঁদ ওঠে নীলাকাশে
প্রকৃতি পুলকে ভাসে
জোছনার নগ্নবাসে আবরিয়া কায়!
তখনি পরাণে জাগে
হৃদয়ের প্রান্ত ভাগে
কোন সুপ্ত অনুরাগে কিসের আশায়?
প্রাণ মম কি জানি কি চায়।

বিশুদ্ধ সন্ধ্যাপুস্তক ও বাদের উপসংহার।

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।)

শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির অধ্যাপক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয় বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া "ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি" প্রকাশ করিতে বাস্তবিকই যেরূপ কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এ কাল পর্য্যন্ত কেহই সময়ের অভাবে অথবা আলস্য ও ঔদাস্যে—সেরূপ করিতে পারেন নাই; ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াও আশা করা যায় না। সুতরাং তাঁহার পুস্তক আলোচনা করিলেই আর্য্যসন্তানগণের সন্ধ্যা শিক্ষার বিশুদ্ধ পুস্তক বিনির্ণীত হইবে।

তিনি স্বকীয় পুস্তকের মধ্যে নানা স্থানে আমার "আহ্নিককৃত্যের" ভ্রম প্রদর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া, ব্রাহ্মণ-সমাজে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কিন্তু বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বিরত আছেন। আমি এতকাল নীরব থাকিয়াও -এই নীরব থাকার জন্য, শ্রীহট্টের অনেকের মুখেই শুনিতেছি, তিনি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া আত্মগরিমা খ্যাপন করিতেছেন—অগত্যা এক্ষণে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, যাহা জীবনে করি নাই, তাহাই করিতে—তাঁহার পুস্তকের ভ্রম সাধারণকে দেখাইতে—প্রবৃত্ত হইলাম।

তিনি আমার সংশোধনকে "চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডীর ন্যায়" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন; এবং শ্রীহট্ট রাজকীয় কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালি চক্রবর্ত্তী এম, এ, বেদান্ততীর্থ মহোদয়ও তাঁহার পুস্তকের সম্বন্ধে যে অভিমত দিয়াছেন, তাহাতে তিনিও "ইনি...প্রাচীন প্রচলিত পাঠ কাটিয়া শুদ্ধ করেন নাই, ইহা একটি পরম ভাগ্যের কথা, কেন না আজকাল অনেকেই দুই চারিখানি পুস্তক দেখিয়া চিরপ্রচলিত পাঠ ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা দিয়া নিজের

পাণ্ডিত্য প্রকটনের চেষ্টা করেন। ইংরেজীনবীশ নূতন হিন্দুরা ঐ সকল পাঠ গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন না। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মেরও একটা কিছু নূতন করিতে চাহেন।" লিখিয়া আমার প্রতিই তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার সংশোধনটা কিরূপ হইয়াছে, তাহাই সমাজকে, পণ্ডিতমণ্ডলীকে এবং সংস্কৃত নবীশ পুরাতন হিন্দুকে দেখাইব। তৎপূর্ব্বে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

(ক) তিনি প্রচলিত সকল পুস্তকেই ঋগ্বেদি সন্ধ্যা সূক্তের অশুদ্ধ পাঠ দেখিয়া, বেদাদি নানা শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা উহার বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ে নিজের অসাধারণ গভীর গবেষণা খ্যাপন করিয়াছেন; কিন্তু আমার আহ্নিক কৃত্য প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিয়াও তাহাতে উহার কিরূপ পাঠ, কিরূপ ব্যাখ্যা, কিরূপ অনুবাদ আছে, তাহার উল্লেখে মূকতা অবলম্বন করিয়াছেন। কেন? নিজের অসাধারণ গবেষণা খ্যাপনের হানি হইবার আশঙ্কায় নয় কি? তিনি এত শাস্ত্র ঘাঁটিয়াও, অন্য সকলের প্রতি দোষারোপ করিয়াও, নিজেই গুঙ্ স্থলে গুগু হ্রস্ব উকার) লিখিয়া বাস্তবিক "গবেষণেরই পরিচয় দিয়াছেন বটে !!

(খ) যে সকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া তিনি সন্ধ্যাবিধি লিখিয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; দুঃখের বিষয়, আমার আহ্নিককৃত্যের নামটা সেই সঙ্গে উল্লেখ করেন নাই। একথা বলিবার কারণ—

(১ম) সকলেই তাঁহার ও আমার মন্ত্রানুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন, সর্ব্বত্রই একরূপ; কেবল স্থানে স্থানে প্রকাশমান স্থলে দৃশ্যমান, প্রলয় স্থলে লয় ইত্যাদিরূপ একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বাধীন অনুবাদ হইলে কি "বিশ্বস্য মিষতঃ" স্থলে মিষৎ শব্দের অর্থ দৃশ্যমান লিখিতেন? ভাষ্যকার "মিষতঃ প্রকটী ভবতঃ" লিখিয়াছেন। "নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষং ·· ·· প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে" মন্ত্রের অনুবাদে আমি "নারায়ণকে প্রণাম করিয়া... প্রাতঃসন্ধ্যা করি" লিখিয়াছি; তিনি প্রথম পৃষ্ঠায় একটু অধিক পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিয়া "নারায়ণকে" স্থলে "বিষ্ণুকে" লিখিয়াছেন, এবং মন্ত্রমধ্যে "প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত সংবর্ত্তবচন) স্থলে "প্রাতঃসন্ধ্যাং করোম্যহং" করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। "প্রাতঃসন্ধ্যা করিব"।। 'করোমি' এই বর্ত্তমানকাল ক্রিয়ার অনুবাদ কি 'করিব' (ভবিষ্যৎ) হয়? 'করি' লিখিলে আমার অনুবাদের সহিত মিল হয় বলিয়াই এইরূপ পরিবর্ত্তন নয় কি?

(২য়) ব্রহ্মযজ্ঞের চতুর্থ মন্ত্রের অনুবাদান্তে "সামবেদে শন্নো দেবী" ইত্যাদি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মন্তব্য ও তাহার ভাষা যে, আহ্নিককৃত্য হইতেই লইয়াছেন, যিনি দেখিবেন, তিনিই বলিবেন।

(৩য়) যজুর্ব্বেদী ও ঋগ্বেদীর গায়ত্রীবিসর্জ্জন মন্ত্রের অনুবাদে "দেহরূপ ক্ষেত্রে" ইত্যাদি ভাবার্থ ও তাহার ভাষা আহ্নিককৃত্যেরই নিজস্ব, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি।

(৪র্থ) গায়ত্রীশাপোদ্ধারে গায়ত্রীর শাপবৃত্তান্ত আহ্নিককৃত্যে আছে—

"ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র—ইঁহারা এক এক সময়ে স্বয়ং সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিবার

শক্তিলাভার্থে গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিলেন। গায়ত্রী প্রত্যক্ষ হইয়াও তাঁহাদের সেই অভীষ্ট পূর্ণ না করায়, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি হতপ্রভাবা হও। তাহাতে দেবতারা আসিয়া অনুনয় বিনয় করিলে তাঁহারা বলেন যে, এই এই মন্ত্র পাঠ করিলে গায়ত্রী আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।"

তাঁহার পুস্তকে আছে—

"ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইঁহারা এক এক সময় সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিবার শক্তিলাভের জন্য গায়ত্রীর উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গায়ত্রী তাঁহাদের তপস্যায় প্রত্যক্ষা হইয়া অভীষ্ট বরদানে বিমুখিনী হইয়াছিলেন, সেইজন্য ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন যে, তুমি হতপ্রভাবা হও। তাহাতে দেবতারা আসিয়া অনুনয় বিনয় করিলে তাঁহারা বলেন যে, কয়টি মন্ত্র পাঠ করিলে গায়ত্রী আমাদের শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।"

উভয়ের ভাষাটা মিলাইয়া দেখিতে, এবং কোন পদটাকে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া ভাষা দুষ্ট করিয়াছেন তাহাও প্রণিধান করিতে সকলকে অনুরোধ করি। ঐ তিনটি মন্ত্রের যে বিশুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও আহ্নিককৃত্য ভিন্ন আর কোনও পুস্তকে অবিকল ঐরূপ দেখাইতে পারিবেন না। সর্ব্বোপরি জিজ্ঞাসা করি, এই ইতিবৃত্ত তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? আমার ত সুদৃঢ়—অতি সুদৃঢ় ধারণা যে, আমি যাহা হইতে লইয়াছি, তাহা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি নাই। তিনি তাঁহার আদর্শ গ্রন্থের নাম ও তত্রত্য পঙ্ক্তি প্রকাশ করিয়া আমার সে ধারণা নিরাকৃত করিতে পারেন কি?

ঐ গ্রন্থের একটা পদ অস্পষ্ট থাকায় সেই স্থলে আমি স্বয়ং "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিবার শক্তি লাভার্থে" লিখিয়াছিলাম। তাহাই এতকাল চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহা মনঃপূত না হওয়ায় ১৩শ সংস্করণে তাহার পরিবর্ত্তে "অসাধারণ শক্তিলাভার্থে" করিয়াছি। ১৩২৭ সালের চৈত্র মাসে ঐ সংস্করণ হইয়াছে। তর্কনিধি মহাশয় উহা দেখিলে কোন্ পাঠটা লইতেন, পাঠান্তর বলিয়া দুইটাই লইতেন কি না, জানি না।

ইহাকেই বলে—

"বয়ং তত্ত্বান্বেষান্মধুকর হতাস্ত্বং খলু কৃতী।"

ইহাকেই বলে—"কেউ রেঁধে বেড়ে মরে।
কেউ ফুঁ দিয়ে গাল ভরে॥"

এবং ইহাকেই বলে—"যার শিল তার নোড়া।
তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া॥"

কলিকাতার এক বিদ্যাবিনোদ আহ্নিককৃত্যের এইরূপ অনুকরণে "আহ্নিক তত্ত্ব মালা" ছাপাইয়া, তাহাতে মুদ্রাঙ্কনের সাল তারিখ না দিয়া, আমি তাঁহার পুস্তক হইতে সব চুরি করিয়াছি, এই কথা লোকের কাছে কেবল মুখে বলিয়া বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। মার্জ্জিত বুদ্ধি তর্কনিধি মহাশয় আমার অগোচরে সুদূর শ্রীহট্টে পুস্তক ছাপাইয়া, তাহাতে

এবং তত্রত্য কতিপয় পত্রিকায় আমার ভ্রম দেখাইয়াও মাঝে মাঝে বিরত না হইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে কলিকাতার ব্রাহ্মণসমাজে আবার প্রকাশ করিয়া আপনার পায়ে আপনিই কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অতঃপর অনুতাপগ্রস্ত হইতে হইবে ভাবিয়া আমি নিতান্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইতেছি।

বিনা অনুমতিতে, অন্ততঃ বিনা নামোল্লেখে পরস্বাপহরণ কিরূপ শিষ্টাচার বহির্ভূত ও কিরূপ আইনবিরুদ্ধ, তাহা সকলেরই বিদিত। একজন প্রাণপণে খাটিয়া মরিবে, আর অন্যে তাহাই অপহরণ করিয়া অসংকোচে নিজের কৃতিত্ব খ্যাপন করিবে, তাহাতেও কি সমাজনেতা ব্রাহ্মণসমাজ, ব্রাহ্মণসভা প্রভৃতি চিরদিনই নীরব থাকিবেন? কোনও সুবিচার করিবেন না? যে সমাজের উপকারার্থে, আমি প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সে সমাজের নিকট আমার কি কোনও প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশা নাই?

আজ আমি সেই সমাজের নিকট সুবিচার প্রার্থনায়
এই অভিযোগ করিতেছি।

আমি তাঁহার সন্ধ্যাবিধি সমগ্র পাঠ করিতে অবসর পাই নাই, কেবল মূল অংশই দেখিয়াছি। তাহাতে যজুর্ব্বেদিসন্ধ্যায় ৪৪, ঋগ্বেদি সন্ধ্যায় ৫৫, সামবেদি সন্ধ্যায় ৩৩, ব্রহ্মযজ্ঞে ৩ (সাকল্যে ১৩৫টা) ভুল আছে। সমস্ত দেখাইতে হইলে ব্রাহ্মণসমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অধিকার করিবে বলিয়া কয়েকটি মাত্র দেখাইতেছি। আমি যেমন আহ্নিককৃত্যে বৈদিক প্রমাণে বেদমন্ত্রাদি সংশোধন করিয়াছি, তিনি যদি সেইরূপেই স্বীয় সংশোধন সমর্থন করিতে পারেন, তবেই পুনর্ব্বার অগ্রসর হউন; নচেৎ তাঁহার কিঞ্চিৎ ভাষণ না করাই শোভন হইবে।

তিনি পণ্ডিত লোক হইয়াও যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার পরিণতি ও নিষ্কৃতি শাস্ত্রে এইরূপ আছে—

"যস্ত্বিহ বৈ স্তেয়েন বলাদ্ বা হিরণ্যরত্নাদীনি
ব্রাহ্মণস্যাপহরতি, অন্যস্য বা অনাপদি পুরুষঃ,
তম্ অমুত্র রাজন্ যমপুরুষা অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ
সন্দংশৈঃ ত্বচি নিষ্কুষন্তি।" (ভাগ ৫।২৬।১৯)।
"রাজা স্তেনেন গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা।
আচক্ষাণেন তৎ স্তেয়-মেবংকর্ম্মাস্মি শাধি মাম্॥
স্কন্ধেনাদায় মুষলং লগুড়ং বাপি খাদিরম্।
শক্তিঞ্চোভয়তস্তীক্ষ্ণা—মায়সং দণ্ডমেব বা॥

(মনু ৮।৩১৪—৩১৫)

অতএব তিনি জ্ঞানকৃত উক্তরূপ কার্য্যের জন্য রাজতুল্য সমাজ শীর্ষস্থদিগের সমক্ষে

উক্তরূপ নিরুক্তি করিয়া ব্রাহ্মণসমাজে খ্যাপন করিলে, তারপর এই বাদ-প্রতিবাদে সম্ভাষণযোগ্য হইবেন।

(ভ্রম প্রদর্শন)

(১) তিনি পুস্তকে মন্ত্রে সমুদ্রো অর্ণবঃ স্থলে যে দ্বৈতনির্ণয়ের প্রামাণ্যে সমুদ্রোঽর্ণবঃ পাঠ ধরিয়াছেন, তাহার লিপিচাতুর্য্য পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

(২) অন্তরিক্ষ স্থলে সর্ব্বত্রই অন্তরীক্ষ করিয়াছেন। বেদে কুত্রাপি অন্তরীক্ষ প্রয়োগ নাই। তজ্জন্য নিরুক্তকার আকাশ পর্য্যায়ে কেবল অন্তরিক্ষ শব্দ ধরিয়া তদনুরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। অমরের টীকাতেও আছে "বেদে তু অন্তরিক্ষমিতি হ্রস্বেকারং পঠন্তি, তচ্ছান্দসমিতি জাতরূপঃ।"

(৩) সপ্তব্যাহৃতির ঋষ্যাদিতে বরুণেন্দ্র বিশ্বদেবাঃ স্থলে বিশ্বেদেবাঃ করিয়া, তাহার সাধুত্ব সপ্রমাণ করিবেন লিখিয়াছেন। কোথায় কিরূপ করিয়াছেন, তাহা দেখি নাই। পূর্ব্ব প্রতিবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ (শব্দকল্পদ্রুম, শব্দসার প্রভৃতির প্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়া) বলিয়াছিলেন, উহা অলুক্ সমাস নিষ্পন্ন পদ। কিন্তু প্রথমা ও দ্বিতীয়ার অলুগ্‌বিধায়ক সূত্র কোনও ব্যাকরণে নাই। অলুক্ সমাস নিষ্পন্ন হইলে বিশ্বেদেব শব্দের দ্বিতীয়াদি বিভক্তিতে বিশ্বেদেবান্, বিশ্বেদেবৈঃ ইত্যাদি রূপ হয়; তাহা অর্দ্ধজরতীর ন্যায় নিতান্ত হাস্যাস্পদ—বিশেষণে প্রথমা, বিশেষ্যে অন্য বিভক্তি। পাণিনির "বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়াম্" (৬।২।১০৬) সূত্রের উদাহরণ "বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেবঃ, আবিশ্বদেবম্। বহুব্রীহৌ কিম্? বিশ্বে চ তে দেবাশ্চেতি বিশ্বদেবাঃ। সংজ্ঞায়াং কিম্? বিশ্বদেবঃ।" এতাবতা সংজ্ঞায় ও অসংজ্ঞায় সর্ব্বসমাসেই বিশ্বদেব হয়। প্রয়োগও যথা—অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ (দেবীসূক্ত), বৈশ্বদেব বলি ইত্যাদি। যে সকল বচনেও শ্রাদ্ধমন্ত্রে বিশ্বেদেবাঃ আছে, সে সকলে উহা অসমস্ত পদ —বিশ্বে দেবাঃ। যেমন—বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে, নমো বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ বিশ্বেষাং দেবানাং শ্রাদ্ধম্ ইত্যাদি।

(৪) সর্ব্ববেদি সন্ধ্যায় প্রাণায়ামেই গায়ত্রীর অন্তেও প্রণব বসাইয়া ১১টি প্রণব করিয়াছেন। ছন্দোগপরিশিষ্টের "এতা এতাং সহানেন তথৈভির্দশভিঃ সহ" বচনে ১০টি মাত্র প্রণব বলিবার বিধি আছে।

(৫) সূর্য্যশ্চ মন্ত্রে রাত্রিয়া স্থলে রাত্র্যা এবং অকারিষং স্থলে অকার্ষং লিখিয়া আমার ভুল দেখাইয়াছেন। বেদে রাত্রিয়া ও অকারিষং আছে, অন্যত্র রাত্র্যা ও অকার্ষং লেখা থাকিলেও ঐরূপই পড়িতে হইবে, পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ঐ মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশেও রাত্রিস্তৎ স্থলে অহস্তৎ, যৎকিঞ্চ স্থলে যৎকিঞ্চিৎ, ইদমহং মাং স্থলে ইদমহমাপঃ, জ্যোতিষি জুহোমি স্থলে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি রাখিয়াছেন। আমার সংশোধিত পাঠ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, উহার সায়ণভাষ্যে, তদুদ্ধৃত গ্রন্থিতে (ইহাও ঐ আরণ্যকের), নারায়ণোপনিষদে ও আশ্বলায়ন-গৃহ্য পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

(৬) অগ্নিশ্চ মন্ত্রেও উক্তরূপ প্রচলিত পাঠ সমস্তই রাখিয়াছেন। সামবেদি সন্ধ্যায় আবার যদহ্না স্থলে যদ্রাত্র্যা করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৭) আপঃ পুনন্তু মন্ত্রে পৃথিবী পূতা স্থলে পৃথ্বী পূতা রাখিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৮) আপোহিষ্ঠা মন্ত্রে চক্ষসে স্থলে চক্ষুষে করিয়া তাহার টীকাতেও "চক্ষুষে (চক্ষষে)" লিখিয়াছেন।

(৯) সূর্য্যোপস্থানে সর্ব্ববেদীয় সন্ধ্যাতেই "ভূমৌ সংলগ্নগুল্ফতলঃ" হইয়া দাঁড়াইতে বলিয়াছেন। কৃতাঞ্জলি বা উর্দ্ধবাহু হইয়া ঐরূপে দাঁড়াইলে, তাহাকে আর সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে না; অপঘাতে সদ্যই মহাপ্রস্থান করিতে হইবে। ঐরূপে দাঁড়ানটা তর্কনিধি মহাশয় তাঁহার ছাত্রদিগকে দেখাইয়া দেন কি? ছান্দোগপরিশিষ্টে আছে "তদসংলগ্নপার্ষ্ণির্বা" অর্থাৎ গোড়ালিটা ভূমি হইতে একটু তুলিয়া সমগ্র পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া।

(১০) চিত্রং মন্ত্রে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং স্থলে দ্যাবাপৃথ্বীঞ্চান্তরিক্ষং রাখিয়াছেন, তাহা যে সর্ব্বথা অশুদ্ধ পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিয়াছি। যজুর্ব্বেদি সন্ধ্যায় আবার অন্তরিক্ষ‌ঁ করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদে শ ষ স হ র পরে থাকিলে অনুস্বারের যে আকৃতি হয়, তাহার উচ্চারণ গুঁ। তাহাকেই বোধ হয় ক্ষ‌ঁ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাহাও হইবে না। যেহেতু ঐ মন্ত্রটি, যজুর্ব্বেদি সন্ধ্যায় ধৃত হইলেও, যজুর্ব্বেদের মন্ত্র নহে; ঋগ্বেদের মন্ত্র। শুক্লযজুর্ব্বেদে (৭।৪২) যে ঐ মন্ত্র আছে, তাহার অন্তে স্বাহা আছে। স্বাহা পর্য্যন্তই মন্ত্র বলিয়া উহার ভূরিগার্ষী ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দঃ উক্ত হইয়াছে। যে বেদের যেরূপ মন্ত্র, তাহার সেইরূপ পাঠ না করিলে মন্ত্র স্বরহীন ও বর্ণহীন হইয়া "যজমানং হিনস্তি"। ব্রহ্মযজ্ঞে ঋগ্বেদীয় অগ্নিমীড়ে মন্ত্রে যজুর্ব্বেদী কি "হোতারগুঁ রত্নধাতমং" পড়িবেন?

(১১) তচ্চক্ষুঃ মন্ত্রে প্রব্রবাম (ব্রুবাম) পাঠান্তর দেখাইয়াছেন। নিত্য, অভ্রান্ত, কূটস্থ, অপৌরুষেয় বেদে, কাব্যাদির ন্যায়, পাঠান্তর থাকিতেই পারে না। তদুপরি ব্রুবাম পদ ব্যাকরণসিদ্ধও নহে।

(১২) সূর্য্যার্ঘ্যদানে ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ স্থলে ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রণবাদিসমাযুক্তং নমস্কারান্তকীর্ত্তিতম্। স্বনাম সর্ব্বদেবানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে। অনেনৈব বিধানেন গন্ধপুষ্পে নিবেদয়েৎ॥" (ব্রহ্মপুরাণ) গন্ধপুষ্পে ইত্যুপলক্ষণং পাদ্যাদীনামপি।

(১৩) ঋগ্বেদিসন্ধ্যায় অপ্সু মে সোমো অব্রবীৎ মন্ত্রে "অপ্সু মে সোমোঽব্রবীৎ" করিয়াছেন এবং তাহার তৃতীয় চরণে "অগ্নিশ্চ বিশ্বশম্ভুবং" স্থলে "আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ" পাঠান্তর দেখাইয়াছেন। "প্রকৃত্যান্তঃ পাদ মব্যপরে" (পা ৬।১।১১৫) সূত্র দ্বারা এখানে অকারের লোপ হইবে না। বেদমন্ত্রের পাঠান্তর নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তার উপর ঋগ্বেদের (১।২।১১) অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভিঃ ইত্যাদি পঞ্চর্চ সূক্তের মধ্যে যে অপ্সু মে মন্ত্র আছে, তাহার তৃতীয় চরণ ঐ "আপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ"কে আপোহিষ্ঠেত্যাদি এই নবর্চ্চসূক্তস্থ অপ্সু মে

মন্ত্রে বসাইলে "মুখং প্রক্ষালয়ব টঃ। রৌক্তিতে নগরে কুকু"র ন্যায় "উদোর পিণ্ডী বুদোর ঘাড়ে চাপান" হয় না কি?

(১৪) উক্ত মন্ত্রের পরে আহ্নিকচন্দ্রিকা দেখিয়া সঞ্চ্রবী ইত্যাদি মন্ত্রটি ধরিয়াছেন। যদিও চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছেন "অয়ং মন্ত্র আহ্নিককারৈর্ন সংগৃহীতঃ, ভাষ্যকারৈরব্যাখ্যাতশ্চ," তথাপি তর্কনিধি মহাশয় নিজের অসাধারণ শাস্ত্রালোচনা ও বেদাভিজ্ঞতার পরিচয় দিবার জন্য মন্ত্রটিও ধরিয়াছেন, তাহার ভাষ্যও করিয়াছেন। মন্ত্রটি উক্ত নবর্চ্চ সূক্তেরই পরিশিষ্ট। তিনি মূল বেদ না দেখিয়া, চন্দ্রিকার আলোকে যেরূপ লিপিকরপ্রমাদকৃত পাঠ দেখিয়াছেন, সেইরূপেই সঞ্চ্রবীঃ স্থলে সশ্রবীঃ, তদপসঃ স্থলে তদপশঃ, বরেণ্যক্রতূঃস্থলে বরেণ্যং ক্রতূঃ, অবসে স্থলে অব শে করিয়াছেন। ভাষ্যটিও সর্ব্বপ্রকারে হাস্যজনক। একটু নমুনা দেখাইতেছি—

(ক) অপশঃ অপসমূহং (বারিসমূহকে) বহুবর্গার্থাং শস্। (খ) তদ্ব্রহ্মস্বরূপং কিন্তুতং বরেণ্যং বরার্হমিতি যাবৎ। (গ) দেবী দ্যোতমানা দ্বিগুণযুক্তাঃ। (ঘ) সশ্রবীরিতি শ্রু গতৌ সন ছান্দসত্বাৎ অভ্যাসঃ উকারলোপঃ ঙাপপুষোদবাদি সঃ বা। (ঙ) শে কল্যাণায়, শে কল্যাণেঽব্যয়ং বিদুঃ। (চ) ক্রতূ ক্রতূণি কর্ম্মাণি কর্ত্তুং ক্রতূশব্দঃ কর্ম্ম-বাচকঃ নকারলোপশ্ছান্দসঃ।"

(ক) জলবাচী অকারান্ত 'অপ' শব্দ কেহ কোথাও দেখিয়াছেন কি? অপ্ শব্দ বহুবচন বলিয়া সেই অপ শব্দও কি বহুবচন? বহুবর্থ বলিতে কি বহুবচনান্ত শব্দ? (খ) যে ব্রহ্ম বর পাইবার যোগ্য, সে ত কিন্তুতই বটে; কিন্তু কোনও পদের একটা মাত্র অর্থ লিখিয়া, তার পরে 'ইতি যাবৎ' লেখাটা অদ্ভুত। (গ) অর্থটা কেহ বুঝিলেন কি? যদি বলেন ওটা ছাপার ভুল; দ্যোত মানাদি গুণযুক্তাঃ হইবে। তাতেও বলি, দ্যোতমান কি গুণ? অভিনব ভাষ্যকারের সে অর্থ অভিপ্রেত হইলে দ্যোতমানত্বাদি বা দ্যোতনাদি লিখিতেন। সুতরাং অনুমিত হইতেছে, তর্কনিধি মহাশয়ের কোনও অমূল্য ভাবনিধি ঐ স্থানে অন্তর্নিহিত আছে। (ঘ) সন্ প্রত্যয়ে লৌকিকে বুঝি অভ্যাস হয় না? উহার শেষ অংশটা শ্রীহট্টের সংস্কৃত, কি বর্ম্মার সংস্কৃত বুঝিতে পারিলাম না; পাঠকগণ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। (ঙ) ঐ অভিধানখানা তর্কনিধি মহাশয়ের স্বকৃত, কি নানাশাস্ত্র আলোচনায় প্রাপ্ত, জানি না। (চ) ক্রতূণি পদে ণত্ব হইল কোন্ সূত্রে? কর্ত্তুং ক্রিয়া কি কোথাও উহ্য থাকে? ক্রতূ (দীর্ঘ-উকারান্ত ক্লীবলিঙ্গ) শব্দ যে কর্ম্মবাচক, কোন্ অভিধানে আছে? নিরুক্তে ত কর্ম্মপর্য্যায়ে ক্রতুঃ (হ্রস্ব উকারান্ত পুংলিঙ্গ) আছে। দীর্ঘস্বরান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ ত্রিভুবনের কোনও ব্যাকরণে বা অভিধানে আছে কি? ক্রতূণির নকারের লোপ হইলে 'ক্রতূ-ই' থাকে, সন্ধি করিলে ক্রত্বি হয়; ক্রতূ কিরূপে হইল? মূলে ক্রতূঃ ধরিয়া ব্যাখ্যায় করিয়াছেন ক্রতূ, ইহাও অদ্ভুত।

(১৫) প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার আর একটা ভাষ্যের নমুনাও দেখাইতেছি। আতবেদসে মন্ত্রের

সায়ণভাষ্য হেয় করিয়া তিনি স্বয়ং ভাষ্য করিয়াছেন। তাহাতে "নাবেব সিন্ধুং" এর ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন "নৌ এব সিন্ধুং যথা কেবলং নৌকা এব সিন্ধুং তারয়িতুং সমর্থা ভবং।" নৌ-এব = নাবেব, এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদ করিয়া 'নৌ'কে কর্ত্তা করিয়াছেন। নৌশব্দের প্রথমার একবচনে বিসর্গ নৌ পদ হয়, অজ্ঞ আমি এত কাল জানিতাম না; তর্কনিধি মহাশয় ভিন্ন আর কোনও বিজ্ঞ লোকে জানেন কি না, বলিতে পারি না। তারপর নৌকাই কেবল সমুদ্র পার করে, অথবা নৌকাই সমুদ্রকে কেবল পার করে, এ কথাও জানিতাম না। অপিচ নৈয়ায়িক বিবেকের ভাষায় 'কেবলং' যদি নৌকার বিশেষণ হয়, তাহা হইলে দাঁড়ী মাঝী না থাকিলেও কেবল নৌকাই যে পার করিতে পারে, এ কথাও কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই; এখন তাঁহার পুস্তকে স্বচক্ষে দেখিতেছি। তর্কনিধি মহাশয়ের ন্যায় ব্যাকরণজ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া, শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া, নৌকার গতিবিধি না দেখিয়া, সায়ণাচার্য্য কোন্ সাহসে বেদের ভাষ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, জানি না। তিনি ঐ স্থলে লিখিয়াছেন "যথা কশ্চিৎ কর্ণধারো গ্রাহাদিভির্হিংসকৈরাকুলাং নদীং নাব তারয়তি তদ্বৎ।"

(১৬) গোভিল সূত্রে স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে মৃত্তিকালেপনে যে মন্ত্রের বিনিয়োগ আছে, সেই "পাবকা নঃ" এইটি সামবেদিগণের সূর্য্যার্ঘ্যের পূর্ব্বে ধরিয়া তাহাতে "যজ্ঞং বষ্টু বিয়াবসুঃ" স্থলে "যজ্ঞঃ বষ্টু ধিয়া বসুঃ' করিয়া ভাষ্য করিয়াছেন "যজ্ঞং বষ্টুং কাময়তাং। ধিয়া বসুরিতি ধিশব্দঃ কর্ম্মপ্রবচনঃ।" বশ ধাতুর লোট লুপে বষ্টু হয়; বষ্টুং কোন্ বিভক্তির পদ? "অনুস্বারং দিলে সংস্কৃত হয়" বলিয়াই বুঝি অনুস্বার দিয়াছেন! নিরুপপদ ধি শব্দ আছে কি? এবং তাহার তৃতীয়ার একবচনে কি ধিয়া হয়? তর্কনিধি মহাশয় সন্ধ্যাবিধির ন্যায় "নানান শাস্ত্র দেখিয়া" যদি একখানা ব্যাকরণ "বহি" ও লেখেন, তাহা হইলে শ্রীহট্টরাজকীয় কলেজের এবং শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির ছাত্রগণের "পরমভাগ্যের কথা" হয়।

তর্কনিধি মহাশয়ের সন্ধ্যাবিধি একপ্রকার অপূর্ব্ব মধুচক্র। তাহার যেখানে খোঁচা মারা যায়, সেইখান হইতেই মধু ঝরিয়া পড়ে। সেই প্রত্যেক নির্ঝর "স্বাদু স্বাদু পদে পদে।" সুতরাং পাঠকগণকে কোন্টা ছাড়িয়া কোন্টার আস্বাদ উপভোগ করাইব ভাবিয়া, এবং নিজেও তন্মধুপানে উন্মত্ত হইয়া, পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়া এত কথা লিখিয়া ফেলিলাম। সম্পাদক মহোদয় ও পাঠক মহাশয়গণ ক্ষমা করিবেন, আর একটা কথা লিখিয়াই উপসংহার করিব।

(১৭) সামবেদি সন্ধ্যায় "ওঁ নমো ব্রহ্মণে নমো ব্রাহ্মণেভ্যো··· নমো বায়বে চ মৃত্যবে চ বিষ্ণবে চ নমো বৈশ্রবণায় চোপজায়ত" স্থলে "ওঁ নমো ব্রহ্মণে, ওঁ নমো ব্রাহ্মণেভ্যঃ,— ···ওঁ নমো মৃত্যবে .....নম উপজায়" লিখিয়া প্রত্যেক মন্ত্রে জল দিতে বলিয়াছেন।

উহা সামবেদীয় বংশ ব্রাহ্মণের প্রথম অংশ। প্রাচীন নবীন সমস্ত সন্ধ্যা প্রয়োগেই অবিকল

ঐরূপ পাঠ আছে। কেবল "বামদেব চ" ইত্যাদির অনুকরণে কোনও অভিবুদ্ধি লিপিকর ভ্রমবশতঃ উপজায়ন্তকে উপজায় চ করায় তদবধি সর্ব্বত্র সেই পাঠই প্রচলিত। সায়ণাচার্য্য 'উপজায়ন্ত'কে ক্রিয়াপদ (উপজন্+লঙ্ অ, অড়াগমাভাব ছান্দস) বলিয়া অর্থ লিখিয়াছেন "অধ্যয়ন করিয়াছেন।" উহার কর্ত্তা প্রবক্তা ঋষি উহ; ওঁ নমো ব্রহ্মণে হইতে বৈশ্রবণায় চ পর্য্যন্ত গ্রন্থারম্ভে নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ। কে কাহার নিকট সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা উহারই পর হইতে গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত—প্রবক্তা ঋষির গুরু হইতে ব্রহ্মার গুরু ব্রহ্ম পর্য্যন্ত—গুরু শিষ্য পরম্পরা নির্দ্দেশে—উক্ত হইয়াছে। ঐ এক উপজায়ন্ত ভিন্ন সমগ্র গ্রন্থে আর কোনও ক্রিয়াপদ নাই; আছে কেবল গুরু ও শিষ্যের নাম গোত্র অর্থাৎ অপাদান ও কর্ত্তা কারক। যথা—"শর্ব্বদত্তাৎ গার্গ্যাৎ, শর্ব্বদত্তো গার্গ্যঃ রুদ্রভূতেঃ ঐদ্রবিভাৎ" ইত্যাদি।

গোভিলসূত্রে আছে "উদু ত্যং চিত্রম্ ·ইতি ঋগ্ভিঃ সবিতুরুপস্থানং নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদ্য-পজায়ন্তেত্যন্তেনাগ্নিস্তূপাদিভিঃ চ ভূপান্তাং বা সর্ব্বত্র সব্যোনৈতাং স্তর্পয়েৎ।··ততঃ প্রত্যুপস্থানং গায়ত্র্যাষ্ট শতাদীনি জপ্ত্বা···।"

ছন্দোগ পরিশিষ্টকার ঐ স্থলে "উচ্চিত্রমিত্যৃগ্‌দ্বয়েন চোপতিষ্ঠেদনন্তরম্। মধ্যে সূর্য্যোদয়ে চৈব বি ভ্রাড়াদীচ্ছয়া জপেৎ॥" এই কথা প্রদীপোক্ত বচন ধরিয়া, বিভ্রাড়াদি এই আদিপদে মণ্ডল ব্রাহ্মণাদির উল্লেখ করিয়া, মন্ত্রগুলি জপেৎ) পাঠ করিতে বলিয়াছেন।

রঘুনন্দন লিখিয়াছেন "নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদ্যুপজায়ন্তেত্যন্তেনোপস্থানমুক্ত্বা গোভিলেন, অগ্নিস্তূপাদিভ্যাদিনা তর্পণ মভিধায়, ততঃ প্রত্যুপস্থানং গায়ত্র্যাষ্টশতাদীনি জপেত্যুক্তি সূত্রান্তরেণ গায়ত্রীজপরূপোপস্থানংমুক্তম্। ততশ্চ ছন্দোগানামুপজায়ন্তেত্যন্তমুপস্থানং, ততস্তর্পণাধিকারে তর্পণং বিধায় গায়ত্রী জপং কুর্য্যাৎ।"

রঘুনন্দনের প্রচলিত আহ্নিকতত্ত্ব গ্রন্থে লিপিকার "উপজায় চ" করিয়াছে, তদনুসারে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ও নিজকরে স্বসম্পাদিত গোভিলগৃহ্যসূত্রে "উপজায় চ" লিখিয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রচলিত "উপজায় চ"ই প্রকৃত পাঠ বলিলে সায়ণভাষ্য অপ্রমাণ হয়, এবং মূল গ্রন্থেরও অর্থ সঙ্গতি হয় না; যেহেতু ঐ যে কর্ত্তা ও অপাদান কারক, কোন্ ক্রিয়ার সহিত উহাদের অন্বয় হইবে? তার উপর "নম উপজায়" পাঠে উপজ কে? কেহ বলিতে পারেন কি?

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্পাদিত পুস্তকে চেত্যন্তে ও নাগ্নির মধ্যে অবকাশ (ফাঁক) থাকায় তর্কনিধি মহাশয় চেত্যন্তেৎ পর্য্যন্তই সূত্র ভাবিয়া, ঐ পর্য্যন্তই উদ্ধৃত করিয়া, প্রত্যেক মন্ত্রে জলদানরূপ স্বমত সমর্থনের জন্য লিখিয়াছেন "এই স্নানসূত্রের ভাষ্যে তর্কালঙ্কার লিখিয়া-ছেন যে, 'চকারসহিত পাঠেঽপি সবিতুরুপস্থানমিত্যনুবর্ত্তত এব' অর্থাৎ উপজায় চ, এই চকারে সূর্য্যোপস্থানকেই অনুবর্ত্তিত করিতেছে।"

তাঁহার উদ্ধৃত (পূর্ব্বপ্রবন্ধে লিখিত) দ্বৈতনির্ণয়ের পঙ্‌ক্তি দেখিয়া "বালঃ পায়সদগ্ধো দধ্যাপি নমু ফুৎকৃত্য ভুঙ্‌ক্তে" বলিয়া আমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভাষ্য খুঁজিলাম, ঐ পঙ্‌ক্তি

কোথাও পাইলাম না। উক্ত সূত্রের টিপ্পনীতে এইমাত্র আছে” চেতাম্বে ইতি বীরমিত্রোদয়ে পাঠঃ। চেতাম্বো ইতি সম্বকারঃ পাঠঃ কাঃ মুঃ।”

পরন্তু যদিই তিনি কোথাও ঐরূপ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ সংস্কৃতের তর্কনিধিকৃত উক্ত অনুবাদ কি ঠিক হইয়াছে? পণ্ডিতগণ কি বলিবেন জানি না; কিন্তু আমার যে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত জ্ঞান আছে, তাহাতে আমি উহার অর্থ এই বুঝি যে, (গোভিল সূত্রে উপজায় চ পাঠে চকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সবিতুরুপস্থানং এর অনুবৃত্তি; পরন্তু উপজায় এইরূপ) চকার-রহিত পাঠ থাকিলেও সবিতুরুপস্থানং অনুবৃত্ত আছেই।

যাহা হউক, গোভিলের মতে, রঘুনন্দনের মতে, তর্কালঙ্কারের মতে, আমার অনুবাদে এবং তর্কনিধির স্বকৃত অনুবাদেও 'উপজায় চ' (উপজায় ত) পর্য্যন্ত সূর্য্যোপস্থানই বুঝাইতেছে, এবং ছন্দোগ পরিশিষ্টের মতে ঐ মন্ত্রটি অবিকৃতরূপে পাঠাই হইতেছে। তাহাতে প্রত্যেক মন্ত্রে জলদানের সমর্থন কি হইল যে, উক্ত প্রমাণে মন্ত্রটিকে ঐরূপ বিকৃত করিয়াছেন? তিনি আমার সংশোধনকে চণ্ডী কাটিয়া মুণ্ডী বলিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং যে সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ এইখানে, শিব গড়িতে বাঁদর গড়িয়াছেন, তাহা লক্ষ্য নাই। “কর্ণার্দ্ধং কটু কূজতীতি বত হা কাকঃ পিকং নিন্দতি।”

(১৮) তাঁহার পুস্তকে ভাষাগত ও বর্ণগত দোষও প্রচুর পরিমাণে আছে। যথা—

(সংস্কৃতে) প্রাচোশানুদীচ্যাস্তর মুখঃ –উদীচ্যাতে আকার এবং বহুবস্ত নির্দ্দেশের পরে অন্তর শব্দের প্রয়োগ।

সূর্য্যামুপাতষ্ঠেৎ—সর্ব্বত্রই পরস্মৈপদ। দক্ষনাসাপুটে ধৃত্বা —(দুই স্থানে)::কর্ম্মে সপ্তমী। ইতি প্রত্যেকং জলাঞ্জলিনা সূর্য্যোপস্থানং কুর্য্যাৎ—'প্রত্যেকং' কোন্ বিভক্ত্যন্ত ও কাহার সহিত অন্বিত? ঐশান্যাভিমুখঃ। (দধ্যঙ্-আথর্ব্বণঃ) দধ্যঙ্গাথর্ব্বণঃ। ইত্যাদি—ইত্যাদি।

(বাঙ্গালায়) শিরোধার্য্য ক্রমে। সায়ন (সর্ব্বত্রই)। বৈসম্পায়ন (সর্ব্বত্রই) সূর্য্যাভিমুখী (সর্ব্বত্রই)। বিমুখিনা। পংক্তি। পবিত্র শালিনী। পৃথিবীবতী। মৃণ্ময় —মূর্দ্ধনা ণ (সর্ব্বত্রই)। ইত্যাদি—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

প্রাণপনে, উৎবর্গ, গীতস্ত সান, অপরিমিতঃ, রথে সম্বন্ধাভিঃ ইত্যাদি—তাঁহার বা ছাপার ভুল বলিয়া সন্দিগ্ধ পদও—প্রচুর।

উপাধি দ্বারাই জানা যাইতেছে তিনি নৈয়ায়িক পণ্ডিত। সুতরাং তাঁহার “অর্থাণি তাৎপর্য্যাং শব্দাণি কোশ্চিন্তা” হইলেও সাধারণের ত শব্দ ও অর্থ উভয়ত্রই চিন্তা ও তাৎপর্য্য আছে।

তর্কনিধি মহাশয় যজুর্ব্বেদীয় দশকর্ম্ম পদ্ধতি প্রভৃতি যে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকলেও মন্ত্রাদি সংশোধনের পরিচয় সন্ধ্যাবিধিতেই পাওয়া যাইতেছে—“দিগম্বরেণ নিবেদিতং বসু।” এখন তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করা উচিত কি না, সমাজ তাহা বিবেচনা করুন। সাক্ষাৎ শ্রুতিই বলিয়াছেন—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থ মাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

স্বরহীন ও বর্ণহীন মন্ত্রের উচ্চারণ বৃথা; তাহাতে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায় না। অধিকন্তু তাহা বাক্যরূপ বজ্র হইয়া যজমানকে নষ্ট করে; যেমন ত্বষ্টা, পুত্রহন্তা ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার জন্য, যে, "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব স্বাহা" মন্ত্রে আহুতি দিয়াছিলেন, তাহাতে উচ্চারণের দোষে, বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হইলেও, সেই ইন্দ্রহস্তে নিহত হইয়াছিল।

আমি ত "দুই চারিখানি পুস্তক দেখিয়া চিরপ্রচলিত পাঠ ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা দিয়া নিজের পাণ্ডিত্য প্রকটনের চেষ্টা" করিয়াছি; তর্কনিধি মহাশয় "নানান শাস্ত্র আলোচনা করিয়া" প্রচলিত পাঠ কিরূপ রক্ষা করিয়াছেন এবং কিরূপ পাণ্ডিত্য প্রকটন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ এম্.এ. মহোদয় তাহা এখন একবার প্রণিধান করিবেন কি? করিলে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক "পরিতুষ্ট" হইবেন। "নানান টীকা দেখিয়া ইনি মন্ত্রাদির অর্থ করিয়াছেন, উহার দ্বারা অর্থজ্ঞানকামীদিগের সাহায্য হইবে" বনমালী বাবুর এ কথাটা যে "অতি সত্য," তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। তিনি যে আশা করিয়াছেন "তর্কনিধি মহাশয়ের বহিদ্বারা অনেকের চক্ষুরুন্মীলন হইবে," সে আসা সত্য সত্যই ফলবতী হইয়াছে। তর্কনিধি মহাশয়ের সংশোধিত মন্ত্রে সন্ধ্যাদি ক্রিয়াকলাপ করিয়া বনমালী বাবু অতঃপর তাঁহার "পরম ভাগ্যের কথা"টা অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধারণকে জানাইবেন কি?

শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতি "বড় বিদ্যা"র সুনিপুণ এহেন "বড় পণ্ডিত" শ্রীযুক্ত তর্কনিধি মহাশয়ের উপর "ভাষ্য ও অনুবাদ সহ ত্রিবেদীয়, সন্ধ্যাবিধি প্রকাশ ও সমিতির শাখায় বালকগণকে শিক্ষাদানের ভার ন্যস্ত করিয়া" যেরূপে ব্রাহ্মণ্যরক্ষণে, সমাজের হিতসাধনে ও বালকগণের সুশিক্ষাবিধানে তৎপর হইয়াছে, তাহাতে তাহার কীর্ত্তিলতা দিগন্তব্যাপিনী হইয়া তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের ভাজন করিবে সন্দেহ নাই।

সর্ব্বশেষে একটি গূঢ় কথা ব্যক্ত করিবার জন্য বক্তব্য—আমি মন্ত্র সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়া, গ্রন্থাদির অভাবে দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া, নিতান্ত কাতর প্রাণে নিয়ত ইষ্ট-দেবতাকে ডাকিয়াছিলাম। অনন্তর তৃতীয় বারের উদ্যোগে অভাবনীয় সুযোগে ইচ্ছামাত্রেই অভিমত গ্রন্থ পাইতে থাকিয়া ৮।১০ বৎসর পর্য্যাপ্ত আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছি। তৎকালে এ অজ্ঞজনের অন্তঃকরণে এমন আশ্চর্য্য জ্ঞানের প্রস্ফুরণ হইত, এবং কোনও বিষয়ে সংশয় ঘটিলে স্বপ্নে তাহার এমন ভঞ্জন হইয়া যাইত যে, নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, ব্রহ্মণ্যদেবেরই কৃপা ভাবিয়া, তত কষ্টেও, অনির্ব্বচনীয় আনন্দ

করিতাম এবং দ্বিগুণ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হইতাম। তদবধি আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়া আছে যে, আমার পুস্তক কুত্রাপি পরাভূত হইবে না এবং আমার পুস্তকই অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের উপজীব্যও হইবে। সে ধারণার পরিচয়ও পদে পদেই পাইয়া আসিতেছি। এক্ষণে (অন্যান্য অজ্ঞ অনুকারী ও প্রতিবাদীদিগের কথা ধর্ত্তব্যই নহে) শ্রীহট্ট বৈদিক সমিতির অধ্যাপক, নানা শাস্ত্রের আলোচক, সুবিজ্ঞ তর্কনিধি মহাশয়ও এরূপ অসার প্রতিবাদ করায়, এবং আমার পুস্তক তাঁহারও সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য হওয়ায়, সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া দৃঢ়তর হইয়াছে। সুতরাং এখন সুনিশ্চিত বুঝিতেছি যে, আমার আহ্নিককৃত্য, গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের ন্যায়, "আভূতসংপ্লবং" অক্ষুণ্ণ থাকিয়াই, সদর্পে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া, আক্রমণকারী মহামহাবীরদিগকেও ভ্রূকুটিভঙ্গীতে উপহাস করিবে। সকলই লীলাময়ের লীলা!

আমার পুস্তকে কোনও দোষ নাই, এমন কথা বলিতে সাহস করি না; কিন্তু যাহা সর্ব্বপ্রধান—যাহা বাগবজ্র—যাহা যজমানং হিনস্তি—সেই মন্ত্রগত দোষ একটিও নাই, এ বিষয়ে আমি স্থিরনিশ্চয়। মহাকবি বলিয়াছেন—

"অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য
হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥"

এক্ষণে ব্রাহ্মণসমাজের সম্পাদক মহোদয়গণ, পাঠকগণ, সমাজনিয়ন্ত্রী অধ্যাপকমণ্ডলী, ব্রাহ্মণসভা প্রভৃতির পরিচালক মহোদয়গণ, এবং সমাজমূর্দ্ধন্য ব্রাহ্মণগণ, সন্ধ্যা শিক্ষার জন্য কোন্ পুস্তক গ্রহণীয়, তদ্বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত, ব্রাহ্মণসমাজে এবং সমস্ত সংবাদপত্রে ও সভাস্থলে, ব্যক্ত করিয়া উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই সবিনয়ে প্রার্থনা।

প্রতিবাদীর এরূপ গর্হিতাচরণপূর্ব্বক বৃথা অপবাদ-ঘোষণাজনিত উত্তেজনার বশে লিখিতে লিখিতে আত্মসংযম হারাইয়া যে অপরাধ করিলাম, তাহার অপনোদনের জন্য—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

তথা—"আ সত্যলোকাদ্, আ পাতালাদ্, আ লোকালোক পর্ব্বতাৎ।
যে সন্তি ব্রাহ্মণা দেবা-স্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥"

শান্তিঃ—শান্তিঃ—শান্তিঃ।

উপায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।)

আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তলাসি
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধরে শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজায় বাঁশী।
মা আমার রামরূপে ধরে ধনু, কালীরূপে করে অসি॥

যাঁহারা কালী, তারা, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্ম সাধনায় লঘু গুরু ভেদ দৃষ্টিতে পরস্পরের প্রাধান্যের ন্যূনাধিক্য মনে করিয়া—নরকের পথে অগ্রসর হন, এবং ধর্ম্মজগতে দ্বেষাদ্বেষিভাবের পুষ্টিসাধন করিয়া সমাজের অকল্যাণ সাধন করেন তাহাদের কোন কালে কল্যাণ নাই।

ব্রহ্মসাধনায় কালী তারা দুর্গা, রাম কৃষ্ণ বিষ্ণু ও শিব যেমন অভেদ, সেইরূপ ইহাদের উপাসনা-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন পথ হইলেও তাহা অভেদ। যিনি যে পথ দিয়া অগ্রসর হউন, সকল উপাসকই অগ্রপশ্চাৎ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইবেন।

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতি মতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

(মহিম্নঃ স্তোত্র)

ব্রাহ্মণগণের বেদে অধিকার, উঁহারা কলিকালে বৈদিকধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উপেক্ষা করিয়া আচারভ্রষ্ট ব্যভিচারী এবং অখাদ্যভোজী হইলে উঁহাদিগকে নানাবিধ বিপদে পতিত হইতে হয়, নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এবং গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইতে বারম্বার যাতায়াত জন্য অশেষবিধ যাতনা সহ্য করিতে হয়।

ভগবান্ স্রষ্টা, জীবকে ভোক্তা ও ত্যাগী উভয়রূপে তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং জীবের ভোগ সংগ্রহের মোক্ষপ্রদ এবং অপকৃষ্ট নিরয়োৎপাদক কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ভগবদ্দত্ত, বহু জন্মজন্মান্তরে ভোগলালসার তৃপ্তি ঘটিলে জীব ত্যাগী হইতে পারে। নচেৎ সাধারণতঃ নিম্নাধিকারী সাধারণ জীব ভোগকে উপেক্ষা করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। অথবা ভোগ ত্যাগ না করিতে পারিলে সংসারবন্ধনের নিবৃত্তি নাই। যে চিত্ত শত সহস্র জন্ম হইতে প্রবৃত্তির ভোগাস্বাদনে অভ্যস্ত, তাহাকে সহসা ভোগ বৈরাগ্য ঘটাইয়া নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্মে,

নিরত রাখিবার ব্যবস্থা অসমীচীন। আর্য্য ঋষিগণ তাহা বুঝাইয়াছিলেন, তজ্জন্ত নিম্নাধিকারী জীব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী বলিয়া প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কেবল তাহাদের জন্ত নিবৃত্তিমার্গে আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এষ বৈ পরমো যোগো মনসঃ সংগ্রহঃস্মৃতঃ।
হৃদয়জ্ঞত্বমন্বিচ্ছন্দম্যস্যেবার্ব্বতো মুহুঃ॥

ভাগবত ১১।২০।২১।

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবে মনের নিয়মন নিতান্ত অসম্ভব। মনোবৃত্তির অনুসরণে ধীরে ধীরে মনকে নিবৃত্তি করিতে হইবে। মনোবৃত্তির নিরোধই পরমযোগ, কিন্তু ভোগচরিতার্থপথে প্রতি পদে কণ্টক বিদ্ধ হয়, পদস্খলন হয়, নিরয়ের পথ উন্মুক্ত হয়। দয়ারসাগর ভগবান্ সেই আশঙ্কা নিবারণ জন্ত পতনোন্মুখ মানবকে রক্ষা করিবার হেতু, স্বয়ং শ্রুতি স্মৃতিরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, ঐ সকল জীবের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন, ঐ অধিকারী নরনারী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলে ধীরে ধীরে প্রবৃত্তিমার্গ উত্তীর্ণ হইয়া নিবৃত্তিমার্গে ফিরিতে সমর্থ হইবে, তদ্ধেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই আর্য্যজাতির ধর্ম্ম। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মই মনোনিগ্রহের উপায়, আর ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈদিক-কর্ম্মই মনোনিগ্রহ সাধনের উপায়।

দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতঞ্চ কর্ম্মাণিচ সদ্ব্রতানি।
সর্ব্বে মনোনিগ্রহ লক্ষণান্তাঃ পরোহি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥
সমাহিতং যস্য মনঃ প্রশান্তং দানাদিভিঃ কিংবদতস্য কৃত্যং।
অসংযতং যস্য মনো বিনশ্যদ্দানাদিভিশ্চেদপরং কিমেভিঃ॥

ভাগবত ১১।২৩।৪৫।৪৬।

দান, স্ব স্ব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, যম, নিয়ম, বেদাদি অধ্যয়ন, তীর্থাদিতে গমন, একাদশ্যাদি উৎকৃষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ দ্বারা ক্রমে নিবৃত্তিপথে গতির প্রত্যাবর্ত্তন হয়।

নিম্নাধিকারী নরনারীর ভোগলালসাবৃত্তির প্রবলতা দেখিয়া শাস্ত্র সে প্রবৃত্তিকে একবারে নিবৃত্ত না করিয়া কথঞ্চিৎ উপভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আবার পাছে বিত্তভোগে আসক্ত হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তৎপ্রতিবিধানের আর ও উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন,

ধার্য্যমানং মনোর্যর্হি ভ্রাম্যদাস্যানবস্থিতং।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ॥

ভোগাকাঙ্ক্ষার দিকে মনের বেগ অদম্য হইয়া চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিবে, তাহা বলপূর্ব্বক নিরোধ না করিয়া কথঞ্চিৎ ভোগার্থ প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন এবং ধীরে ধীরে মনের অনুকূল পথে কিয়ৎপরিমাণে ভোগলালসার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া ক্রমশঃ মনকে বশীভূত করিবার চেষ্টা শাস্ত্রসিদ্ধ।

শাস্ত্র বলেন—যমাদি অষ্টাঙ্গযোগের অনুশীলন, আত্মতত্বের বিচার, ভক্তিসহকারে ভগবৎ মূর্ত্ত্যাদির পূজা, পরমাত্মস্বরূপে ভগবৎ চিন্তন :—

যমাদিভির্যোগপথৈরান্বীক্ষিক্যাচ বিদ্যয়া।
যমার্চ্চোপাসনাভির্কান্যৈর্যোগ্যাং স্মরেন্মনঃ॥

বেদ পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়, কারণ ঐ সকল শাস্ত্রালোচনায় জগতের অনিত্যতার বিষয় স্মরণ হইবে, ইহা কালে ধ্বংস হইবে, সুতরাং এই মনুষ্যদেহ দুদিনেই নাশ হইবে, কয়দিনের জন্য ভোগসুখ, কাহার জন্য আসক্তি, এইরূপ চিন্তা হইতে ভোগাকাঙ্খার বিষয়াসক্তির নিবৃত্তি হইবে।

সহি বা আত্মযাজী যোবেদইদং মে অনেন অঙ্গং।
সংস্ক্রিয়তে ইদং যে অনেন অঙ্গম বপধীয়তে॥ (শ্রুতি)

বৈদিক যাগাদি কার্য্যে নিষ্পাপ হইয়া পুণ্যযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, কর্ম্মকর্ত্তা তৎক্ষণাৎ পুণ্যময় হন, এই কর্ম্মই জ্ঞানপূর্ব্বক কৃতকর্ম্ম আর এই জ্ঞানই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। যশ্চৈতে অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারাঃ যাঁহাদিগের বেদমতে আটচল্লিশটি সংস্কার হইয়াছে তাঁহারাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের উপযোগী। প্রত্যেক হিন্দুর অধিকার অনুসারে বৈদিক কর্ম্মমার্গের এবং জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করা ভিন্ন শ্রেয়ো লাভের আর গত্যন্তর নাই।

নির্ম্মলী ফল যেমন ফলাভ্যন্তরস্থ ধূলি অধঃসংগৃহীত ও পাতিত করিয়া পরিশেষে নিজেই গলিয়া যায়, সেইরূপ কর্ম্ম অবিদ্যাত্মক হইলেও অন্য অবিদ্যা সকলকে বিনষ্ট করিয়া সে নিজেও বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্ম ভগবদুপাসনায় সহকারি হইয়া অবিদ্যা উচ্ছেদ দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত্যভিমুখে আনিতে সমর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সমস্ত নিবৃত্তপর নরনারী, আমাদের নেত্র গোচর হয়। বেদ বিহিত কর্ম্মই তাহাদিগকে এককালে অন্য জন্মে প্রবৃত্তির অতলস্পর্শ হইতে উপরে উত্তোলন করিয়াছেন, ইহাতে কোন ভ্রান্তি নাই। কর্ম্ম হইতে ধর্ম্ম বিশেষের উৎপত্তি হয়, আর সেই ধর্ম্ম বিশেষ অনুষ্ঠাতা জীবাত্মাকে আশ্রয় করে, ঐ ধর্ম্ম বিশেষের আশ্রয় সংস্কাররূপ মৃত্যুর পর স্বর্গাদি ভোগ ও তৎপর পরজন্মে উচ্চাধিকার প্রদান করেন, কর্ম্মের সংস্কার ধ্বংস হইবার নহে। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।"

যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা।

(বনপর্ব্বের ২৯ অধ্যায়)

(লেখক—শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ,—সম্পাদক)

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে পাণ্ডবগণের সাধারণ ভাবে ক্ষমার পরিচয় দিয়াছি এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের ক্ষমার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

কপট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ও হৃতসর্ব্বস্ব পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে প্রবেশ করিলে—মনস্বিনী দ্রৌপদী পরিতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে তদানীন্তন দুঃখের কথা স্মরণ করাইয়া উত্তেজিত করিতে লাগিলেন এবং ক্ষমা পরিত্যাগ করতঃ—তেজঃ প্রকাশ করিতে পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—তখন ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির তাহার উত্তরে স্বভাবসুলভ ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিতে লাগিলেন—"ক্রোধই মনুষ্যের বিনাশক ও কল্যাণপ্রদ,—সুতরাং কল্যাণ ও অকল্যাণ—এতদুভয়ই ক্রোধমূলক বলিয়া জানিও—"ক্রোধমূলৌ ভবাভবৌ।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধকে সম্বরণ করিতে পারে—তাহারই কল্যাণ হয় এবং যে পুরুষ ক্রোধকে সহ্য করিতে পারে না—পরম-দারুণ ক্রোধ তাহার বিনাশেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে—"যো হি সংহরতে ক্রোধং ভবস্তস্য সুশোভনে! যঃ পুনঃ পুরুষঃ ক্রোধং নিত্যং ন সহতে শুভে! তস্যাভাবায় ভবতি ক্রোধঃ পরমদারুণঃ।" যখন ইহলোকে ক্রোধকে প্রজাবিনাশক দেখিতেছি, তখন মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে সেই লোকনাশক ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে? ক্রুদ্ধ মনুষ্য হইতে বিবিধ পাপকর্ম্ম হয়—ক্রুদ্ধ ব্যক্তি গুরুগণকেও বিনষ্ট করে "(ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্‌গুরূনপি)।" ক্রোধী ব্যক্তি নিষ্ঠুরবাক্য দ্বারা শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকেও অবমানিত করে,—কুপিত ব্যক্তির কখনই বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না, ক্রোধান্ধ মনুষ্যের অকর্ত্তব্য কার্য্য নাই এবং অবক্তব্য বাক্যও নাই—"(নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে তথা)" ক্রোধাকুল মনুষ্য আপনিই আপনাকে যমসদনে প্রেরণ করে—"(আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্‌যমসাদনম্)।" মনীষিগণ এই সকল দোষ দেখিয়া ইহ ও পরলোকে পরমোৎকৃষ্ট কল্যাণের অভিলাষে ক্রোধকে জয় করিয়াছেন,—"(জিতঃ ক্রোধো মনীষিভিঃ, ইচ্ছদ্ভিঃ পরমং শ্রেয়ঃ—ইহ চামুত্র চোত্তমম্)।" ধীরগণ যে ক্রোধকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—মাদৃশ ব্যক্তি সেই ক্রোধ কিরূপে আচরণ করিতে পারে? যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করে না,—সেই ব্যক্তি আপনাকে ও অপরকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে,—সুতরাং সেই ব্যক্তিকে আপনার ও অন্যের দোষাপহারক চিকিৎসক বলা যায়—"(আত্মানঞ্চ পরাংশ্চৈব ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ, ক্রুধ্যন্তমপ্রতিক্রুধ্যন্‌ দ্বয়োরেষ চিকিৎসকঃ)।" যদি অশক্ত মনুষ্য বলবান্ মনুষ্য কর্ত্তৃক ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তবে সেই মূঢ় আত্মা দ্বারাই আত্মাকে পরিত্যাগ করে, অতএব অশক্ত ব্যক্তির ক্রোধ সংযত

কর্ত্তব্য বলিয়াই পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন ("মূঢ়ো যদি ক্লিশ্যমানঃ ক্লিশ্যতে শক্তিমান্নরঃ বলীয়সাং মনুষ্যাণাং ত্যজত্যাত্মানমাত্মনা,—তস্মাদ্ধ্যোপদ্যাশক্তস্য মন্যোর্নির্যমনং স্মৃতম্")। * বিজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কর্ত্তৃক ক্লিশ্যমান হইলে—আপনি সমর্থ হইয়াও ক্লেশদাতাকে বিনাশ না করিয়া পরলোকে সুখী হন—("বিদ্বাংস্তথৈব যঃ শক্তঃ ক্লিশ্যমানো ন কুপ্যতি,—অনাশয়িত্বা ক্লেষ্টারং পরলোকে চ নন্দতি")। জ্ঞানী পুরুষ—সবলই হউন বা দুর্ব্বলই হউন্—তাঁহাদের সর্ব্বদাই আপৎকালেও ক্ষমাবলম্বন কর্ত্তব্য বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন—("তস্মাদ্বলবতা চৈব দুর্ব্বলেন চ নিত্যদা ক্ষন্তব্যং পুরুষেণাহুরাপৎস্বপি বিজানতা")। সাধুব্যক্তিরা ক্রোধসংযমকে প্রশংসা করিয়া থাকেন—ক্ষমাশীল সাধু ব্যক্তির সর্ব্বদাই জয় হয়, ইহা পণ্ডিতেরা নিশ্চয় করিয়াছেন—("মন্যোর্হি বিজয়ং কৃষ্ণে। প্রশংসন্তীহ সাধবঃ—ক্ষমাবতো জয়ো নিত্যং সাধোরিহ সতাং মতম্")। অনৃত অপেক্ষা সত্য এবং নিষ্ঠুরতা অপেক্ষা অনিষ্ঠুরতা শ্রেষ্ঠ হয় অতএব মাদৃশ ব্যক্তি দুর্য্যোধনের বধার্থে কিরূপে সাধু বিবর্জ্জিত ও নিষ্ঠুরতাদি বহুদোষের আকর সেই ক্রোধকে অবলম্বন করিতে পারে ?

দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতেরা যাহাকে তেজস্বী বলেন—তাহার মনে কখনই ক্রোধ থাকে না। যে ব্যক্তি সমুৎপন্ন ক্রোধকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিবারণ করিতে পারে, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ তাহাকেই তেজস্বী বলিয়া স্বীকার করেন।—"যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ"। ক্রুদ্ধ মনুষ্য কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম প্রকৃতরূপে দেখিতে পায় না, ক্রোধান্ধ জনের কার্য্য বা মর্য্যাদার প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকে না—("ন কার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোঽনুপশ্যতি")।

অতএব তেজস্বী ব্যক্তির ক্রোধ দূর করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্রোধাভিভূত হইলে মনুষ্য কর্ম্মদক্ষতা, শত্রুর অপকার চিন্তন, শূরতা ও আশুকারিতা—এই সকল তেজোগুণ প্রাপ্ত হইতে পারে না।—"দাক্ষ্যং হ্যমর্ষঃ শৌর্য্যঞ্চ শীঘ্রত্বমিতি তেজসঃ, গুণাঃ ক্রোধাভিভূতেন ন শক্যাঃ প্রাপ্তুমঞ্জসা")। পুরুষ ক্রোধপরিত্যাগ করিলেই সম্যক্‌রূপে তেজঃ প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং ক্রোধের বশীভূত হইলে যথোচিতকালে তেজঃ প্রকাশ করিতে পারে না। অপণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ক্রোধকে তেজ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকে। "ক্রোধস্ত্বপণ্ডিতৈঃশশ্বৎতেজইত্যভিনিশ্চিতঃ"। কিন্তু রজোগুণের পরিণাম সেই ক্রোধ লোকবিনাশের নিমিত্তই মনুষ্যের অন্তঃকরণে বিহিত হইয়াছে, অতএব স্বধর্ম্মানতিক্রমশীল

* বলবান প্রতিপক্ষের প্রতি দুর্ব্বলের ক্রোধ যে নিজেরই ধ্বংসের কারণ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। হৃতসর্ব্বস্ব, বনবাসী যুধিষ্ঠির নিজের তৎকালীন দুরবস্থা ও প্রাপ্তরাজ্য প্রবলপ্রতাপ দুর্য্যোধনের বলবত্তা পর্য্যালোচনা করিয়া ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক ক্ষমাবলম্বনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ গান্ধিও প্রবল প্রতিপক্ষের প্রতি ক্ষমাবলম্বন এই কারণেই শ্রেয়ঃ মনে করেন। অপিচ যুধিষ্ঠিরের মত গান্ধিরও মূল সূত্র হইল অহিংসা।

পুরুষ ক্রোধের বশীভূত হন না—ইহা নিশ্চিত আছে।—সদাচারণশীল ভদ্র ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।—("তস্মাচ্ছশ্বৎ ত্যজেৎ ক্রোধং পুরুষঃ—সম্যগাচরন, শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মানপগো ন ক্রুদ্ধ ইতি নিশ্চিতম্")। যদি বুদ্ধিহীন অনবহিতচিত্ত ব্যক্তিরা সমস্ত অনিন্দিত পথ অতিক্রম করে,—তবে সেই দৃষ্টান্তে কি আমার তুল্য ব্যক্তি তাহা করিতে পারে? যদি মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথিবীতুল্য ক্ষমাশীল ব্যক্তি না থাকে, তবে তাহাদিগের পরস্পর সন্ধি হইতে পারে না,—কেননা বিগ্রহের মূলই হইল ক্রোধ।—"যদি ন স্যুর্মনুষ্যেষু ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ ন স্যাৎসন্ধির্মনুষ্যাণাং ক্রোধমূলো হি বিগ্রহঃ")। মনুষ্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাপিত হইলে তাহাকে তাপ প্রদান করিবে এবং কেহ গুরুজন কর্তৃক আহত হইলে গুরুজনকে আঘাত করিবে—এরূপ বিধি হইলে সমস্ত প্রাণীর বিনাশ ও অধর্ম্মের প্রথা হয়। কোন পুরুষকে কেহ কটুবাক্য কহিলে অনন্তর সেই পুরুষও তাহাকে কটুবাক্য কহিবে, কেহ আহত হইলে সেও আঘাত করিবে,—হিংসা করিলে ঐ হিংসিত ব্যক্তিও তাহাকে হিংসা করিবে। পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, পতি ভার্য্যাকে, ভার্য্যা পতিকে হনন করিবে। এইরূপ সমস্ত লোকই কুপিত হইলে—সংসারে আর কোন মনুষ্যের জন্মই হইতে পারে না,—কেননা প্রজাপরম্পরার উৎপত্তি কেবল সন্ধিমূলক।—("আক্রুষ্টঃ পুরুষঃ সর্ব্বং প্রত্যাক্রোশেদনন্তরম্, প্রতিহন্যাদ্ধতশ্চৈব তথা হিংস্যাচ্চ হিংসিতঃ,—হন্যুশ্চ পিতরঃ পুত্রান্ পুত্রাশ্চাপি তথা পিতৄন্। হন্যুশ্চ পতয়ো ভার্য্যাঃ পতীন্ ভার্য্যাস্তথৈব চ। প্রজানাং সন্ধিমূলং হি জন্ম বিদ্ধি শুভাননে")।—অতএব ক্রোধই প্রজাগণের বিনাশ ও অনৈশ্বর্য্যের কারণ—(তস্মান্মন্যুর্বিনাশায় প্রজানামভবায় চ")। সংসারমধ্যে পৃথিবীতুল্য ক্ষমাশীল ব্যক্তি অনেক থাকাতেই প্রাণিগণের উৎপত্তি ও কল্যাণ হইতেছে। অতএব সংসারে আপৎকালমাত্রেই পুরুষের ক্ষমা-অবলম্বন করা সমুচিত—"ক্ষন্তব্যং পুরুষেণেহ সর্ব্বাপৎসু সুশোভনে"।

যে মনুষ্য বলীয়ান ব্যক্তিগণ কর্তৃক আক্রুষ্ট বা তাড়িত হইয়াও তাহাদিগের প্রতি ক্ষমা করে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে সর্ব্বকালে জয় করে—তাঁহাকেই বিদ্বান ও উত্তম পুরুষ বলা যায়—এবং তাঁহার অক্ষয় সনাতন লোক প্রাপ্তি হয়—"আক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সঃ, যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধঃ বিদ্বানুত্তমপুরুষঃ। প্রভাববানপি নরস্তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ" * আর—ক্রোধনব্যক্তি অল্পপ্রজ্ঞ এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তির

---

* শ্রীমদ্ গান্ধিও এই ক্ষমানীতির প্রচারক। অপকারীর প্রতি প্রত্যপকার করিবার শক্তি থাকিলেও, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া—নীরবে ঐ অত্যাচার বা অপকার সহ্য করিতেই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তিগণকে বরাবর বলিতেছেন। ইহাই ত প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও ইহাই প্রকৃত তেজঃ। প্রবল প্রতিপক্ষের ঘোর অত্যাচার ও নির্ম্মম উৎপীড়ন সত্বেও গান্ধি ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন। তাই জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে এবং ভারতবাসীর ক্ষমাগুণে চমৎকৃত হইয়াছে।

ইহ ও পরকাল বিনষ্ট হয়—"ক্রোধনস্তন্নবিজ্ঞানঃ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি"।

এ বিষয়ে স্বয়ং ক্ষমাশীল মহাত্মা কাশ্যপ যে গাথা গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা কীর্ত্তন করা উচিত।

মহর্ষি কাশ্যপের ক্ষমা বিষয়ক গাথা।

ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেব জানাতি স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ১ ॥
ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতঞ্চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ ॥ ২ ॥
অতিযজ্ঞবিদাং লোকান্ ক্ষমিণঃ প্রাপ্নুবন্তি চ।
অতিব্রহ্মবিদাং লোকানতি চাপি তপস্বিনাম্ ॥ ৩ ॥
অন্যে বৈ যজুষাং লোকাঃ কর্ম্মিণামপরে তথা।
ক্ষমাবতাং ব্রহ্মলোকে লোকাঃ পরমপূজিতাঃ ॥ ৪ ॥
ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ, ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।
ক্ষমাঃ সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ ॥ ৫ ॥
ক্ষন্তব্যমেব সততং পুরুষেণ বিজানতা।
যদা হি ক্ষমতে সর্ব্বং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৬ ॥
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
ইহ সম্মানমর্হন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্ ॥ ৭ ॥
যেষাং মন্যুর্মনুষ্যাণাং ক্ষময়াভিহতঃ সদা।
তেষাং পরতরে লোকাস্তস্মাৎ ক্ষান্তিঃ পরা মতা ॥ ৮ ॥
ইতি গীতাঃ কাশ্যপেন গাথা নিত্যং ক্ষমাবতাম্।"

অর্থাৎ—ক্ষমাই ধর্ম্ম,—যজ্ঞ, বেদ ও শাস্ত্র—ক্ষমাহীন ব্যক্তির ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান বিফল—ইহা যে ব্যক্তি জানেন তিনিই সকল বিষয়ে ক্ষমা করিতে পারেন। ১। ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ,—ক্ষমাই তপস্যা ও শৌচ—ক্ষমাই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ২। অতি যাজ্ঞিক,—অতি ব্রহ্মজ্ঞ ও অতি তপস্বী ব্যক্তিরা যে সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন,—ক্ষমাশীল ব্যক্তি সেই সকল লোকে গমন করেন। ৩। যজুর্ব্বেদী বা ত্রেতাগ্নিসাধ্য যজ্ঞকারিগণ ও বাপীকূপাদি পুণ্যকর্ম্মকারিগণ ভিন্ন ভিন্ন লোকে গমন করিয়া থাকেন,—কিন্তু ব্রহ্মলোকে যে সকল পরম পূজিত লোক আছে,—ক্ষমাবান ব্যক্তিরা সেই সকল লোকে গমন করিয়া থাকেন। ৪। ক্ষমাই তেজস্বিগণের তেজ,—তপস্বিগণের ব্রহ্ম এবং সত্যপরায়ণদিগের সত্য,—ক্ষমাই শান্তি। ৫। জ্ঞানিপুরুষের সর্ব্বদা ক্ষমা করা উচিত। কারণ পুরুষ যখনই সকল বিষয়ে ক্ষমা করেন, তখনই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ৬। ক্ষমাশীল পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় রক্ষা হইয়া থাকে,—ইহলোকে সম্মান ও পরলোকে উত্তমগতি লাভ হয়। ৭।

যে ব্যক্তির ক্রোধ ক্ষমা দ্বারা সর্ব্বদা বাধিত হয়, তাহাদিগের উৎকৃষ্টতর লোকপ্রাপ্তি হয়—সুতরাং ক্ষমাই উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।" ৮।

মহর্ষি কাশ্যপের এই ক্ষমাবিষয়ক গাথা শ্রবণ করাইয়া ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক ক্ষমা অবলম্বনের উপদেশ প্রদান করিলেন। এবং আরও বলিলেন—

"পিতামহঃ শান্তনবঃ শমং সংপূজয়িষ্যতি।
কৃষ্ণশ্চ দেবকীপুত্রঃ শমং সংপূজয়িষ্যতি॥
আচার্য্যো বিদুরঃ ক্ষত্তা শমমেব বদিষ্যতঃ।
কৃপশ্চ সঞ্জয়শ্চৈব শমমেব বদিষ্যতঃ॥
সোমদত্তো যুযুৎসুশ্চ দ্রোণপুত্রস্তথৈবচ।
পিতামহশ্চ নো ব্যাসঃ শমং বদতি নিত্যশঃ॥

অর্থাৎ—পিতামহ ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ, আচার্য্য দ্রোণ, ক্ষত্তা বিদুর, কৃপ, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুযুৎসু, অশ্বত্থামা, পিতামহ ব্যাস—এই মহাত্মগণ সকলেই ক্রোধ সংযম ও ক্ষমা বা শান্তির পক্ষপাতী—এবং উক্ত গুণেরই নিত্য প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইঁহারা সকলেই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ন্যায় ও ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া শান্তিস্থাপনার্থ নিয়তই উপদেশ করিবেন,—ধৃতরাষ্ট্র লোভপরবশ হইয়া ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিলে আপনিই বিনষ্ট হইবেন—("নঃ চেদ্যোত্তারশিষ্যতি") *। উপসংহারে যুধিষ্ঠির বলিলেন—

"এতদাত্মবতাং বৃত্তমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ক্ষমা চৈবানৃশংস্যঞ্চ তৎকর্ত্তাস্ম্যহমঞ্জসা॥

ক্ষমা ও অনৃশংসতা অবলম্বন করা জ্ঞানিদিগের কার্য্য ও সনাতন ধর্ম্ম—সেই হেতু আমি যথার্থত তাহারই আচরণ করিব।

বিদুরের ক্ষমা।

পাণ্ডুরাজের স্বর্গগমনের পর হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন অবধি পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনাদির যে নৃশংস অত্যাচার অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন এবং অদম্য ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছিলেন,—ধর্ম্মের অবতার মহাত্মা বিদুরের শিক্ষাই ইহার মূল। মহাত্মা বিদুর তাঁহাদিগকে বরাবরই নীরবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণও তাঁহার উপদেশমত অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং পাণ্ডবগণের ও যুধিষ্ঠিরের যে ক্ষমার পরাকাষ্ঠা—তাহা বিদুরের উপদেশেরই ফল। অন্য কথায় বিদুরের ক্ষমাগুণের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল—তাঁহার শিষ্যস্থানীয় পাণ্ডুতনয়গণের চরিত্রে।

* পণ্ডিত শ্রীমালব্য প্রভৃতি শমবাদি ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রকে ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত কার্য্য করিতে পরামর্শ দিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের সে উপদেশ অরণ্যে রোদন হইতেছে।

পাণ্ডবগণের বনাবস্থানকালে বিদুর তাঁহাদিগের নিকট গমন করতঃ তাঁহার পূর্ব্ব উপদেশ স্মরণ করাইয়া বলিলেন—

"ক্লেশৈস্তীব্রৈর্যুজ্যমানঃ সপত্নৈঃ ক্ষমাং কুর্ব্বন্ কালমুপাসতে যঃ।
সংবর্দ্ধয়ন্ স্তোকমিবাগ্নিমাত্মবান্ স বৈ ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমেক এব" ॥

বনপর্ব্ব ৫ অধ্যায়।

যে ব্যক্তি শত্রু কর্ত্তৃক তীব্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া ক্ষমাবলম্বন করতঃ সময় প্রতীক্ষা করে সেই বুদ্ধিমান পুরুষ একাকীই অল্পপরিমিত অগ্নিকে সবর্দ্ধিত করার স্তায় সমগ্র পৃথিবী ভোগ করে। বিদুর অপরকে ক্ষমাধর্ম্মের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না,—তাঁহার মহনীয় আদর্শ নিজ চরিত্রও ক্ষমাগুণে মণ্ডিত ছিল। ধর্ম্মপ্রাণ নিস্পক্ষপাত বিদুর—পাণ্ডবগণের অক্ষক্রীড়াবসানে বনগমনের পর ধৃতরাষ্ট্রকে ধর্ম্মসঙ্গত স্তাষ্য বাক্য দ্বারা কপটক্রীড়া দ্বারা অপহৃতরাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু উভয়পক্ষের হিত ও পথ্য সেই উপদেশ অন্ধনৃপতি ধৃতরাষ্ট্রের রুচিকর না হওয়ায়—তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া বিদুরকে কহিলেন—"যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ।" পুনশ্চ—"যস্মিন শ্রদ্ধা ভারত তত্র যাহি। নাহং ভূয়ঃ কাময়ে ত্বাং সহায়ং মহীমিমাং পালয়িতুং পুরং বা ॥—তোমার যেখানে খুসী সেখানে গমন কর—এই রাজ্য বা পুররক্ষা বিষয়ে আমি আর তোমাকে চাহি না। ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক এইভাবে নিরাকৃত হইয়া তিনি কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের সহিতই অবস্থান করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু নীতিজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র যখন দেখিলেন যে বিদুরের মত বিচক্ষণ ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি হাতছাড়া হইলে—এবং শত্রুপক্ষের সহায় হইলে তাঁহার সমূহ ক্ষতি,—তখন সঞ্জয়কে দিয়া বিদুরকে প্রত্যাগমনের জন্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। বিদুরও ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধ শ্রবণমাত্র—পূর্ব্ব ব্যবহার সম্যক্ বিস্মৃত হইয়া তখনই হস্তিনাপুরে প্রস্থিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে পুনরাগত দেখিয়া কৃত্রিম স্নেহপ্রকাশপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন—"ক্ষম্যতাং ভারত মেহস্ত যদুক্তোহসি ময়া রুষা"। আমি রোষ প্রযুক্ত তোমার প্রতি যে কটূক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম তাহাতে তুমি রাগ করিও না। বিদুর প্রত্যুত্তরে কহিলেন—

"ক্ষান্তমেব ময়া রাজন্ গুরুর্ন্নে পরমো ভবান্।
এবোহহমাগতঃ শীঘ্রং ত্বদ্দর্শনপরায়ণঃ" ॥

আপনি আমার পরম গুরু,—আমি যখন আপনার দর্শন পরায়ণ হইয়া শীঘ্র এখানে আসিয়াছি, তখনই ক্ষান্ত হইয়াছি—জানিবেন।

কটুবাক্য দ্বারা ভৎর্সিত হইয়া নির্ম্মমভাবে বিতাড়িত হওয়ার পর—পুনরায় শঠতাপূর্ণ কপটস্নেহদ্যোতক অনুরোধমাত্র পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন—অতীব উচ্চ ক্ষমাগুণের পরিচায়ক। বিদুরের এই ক্ষমাগুণ আদর্শস্থানীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেশবাসী—ইহার অনুবর্ত্তন করিয়া ধন্ত হউন।

শারদীয় সঙ্গীতম্ ।

লেখকঃ—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধিঃ

জগতি জয়তি জনতারা ।
পরা প্রকৃতি রবিকারা ॥ ১
শ্রুতিততিদর্শন, সংহতিমর্শন,
কিঞ্চিদনধিগতপারা ॥ ২
(জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা)
অমর্ষিতান্তর, সম্মিলিতামর,
শক্তি বিকসদবতারা ।
কোটিতপনসম, তনুরুচিরনুপম,
সংস্থিতিললিতাকারা ॥ ৩
(জয়তি জনতারা —জগতি জয়তি জনতারা)
দশকরধারণ, ক্রতুরিপুমারণ
করণপ্রহরণমারা ।
বিবিধবিভূষণ, বৃন্দবিদূষণ,
মণিবিলসিতফণিহারা । ৪
(জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা
জিতমৃগশাবক, রবিশশিপাবক,
নয়নত্রয়চলতারা !
বরমণিকোটি, কিরীটকোটি,
বিলিখিতদিবিষদগারা ॥ ৫
(জয়তিজনতারা—জগতি জয়তি জনতারা)
তরল মুকুটতল— বিলম্বিবিধুদল—
সতত গলদমৃতধারা ।
স্মরণতিরোহিত, হৃদয়গুহাহিত,
সংহত তমঃপ্রসারা ॥ ৬ ॥
(জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা
বিশ্ব বিশেষ, প্রোজ্জ্বলবেষ,
ক্রিমিজবিশেষকশারা ।

অদ্ভুত মুখসর,   সিন্ধুকৃতসাদর,
ধৃতশশিকান্তিনিকায়া ॥ ৭

(জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা)
প্রবলমহিষমিষ,   নির্জ্জরবিদ্বিষ,
কৃতিকৃতজগদুপকারা।
অপাঙ্গবিক্ষণ,   শমিতবিলক্ষণ,
রবিতনুজজনুরধিকারা ॥ ৮

[জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা]
কেসরিকাসর,   পরিচিত পদভর,
শঙ্কিতধরণিবিদারা।
সুরমুকুটোজ্জ্বলি,   তাংঘ্রিনখাবলি,
ধৃতবৃষধসুরমুকারা ॥ ৯

[জয়তিজনতারা—জগতি জয়তি জনতারা]
রজ্জাবহিহিব   তেজসি বারিব
চাঞ্চনি জগদাকারা।
ভাতী সম্পদি   জড়জনমাপদি
চাবিতুমিদম্প্রকারা ।১০

[জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা]
শরদি শরদি সুখ-   শরদি দ্বিপমুখ-
ষণ্মুখ মুখপরিবারা।
উপচিত হর্ষে   ভারতবর্ষে
প্রচরদ্রুচিত পরিচারা ॥ ১১

[জয়তি জনতারা   জগতি জয়তি জনতারা]
ভক্তি সমাহিত-   ভক্তজনাহিত-
কতি কতি বিধোপচারা।
ভক্তাধীনা-   তানপি হীনা-
নামৃণতী সমুদারা ॥ ১২

[জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা]
বিধৃত শ্রীকল-   তরুণধকণদল-
বিরচিত মাল্যসুতারা।

সকলদলিকুল- পরিমলসঙ্কুল-
সরোজরজঃপদারা ॥ ১৩
[জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা]
যচ্চরণং প্রতি যস্ত ন মতিরতি-
রমুমহ সংসৃতিকারা।
অনিশং বাধয়তি মনুজাধমনতি-
দুঃসহদুর্গতিধারা। ১৪
[জয়তি জনতারা—জগতি জয়তি জনতারা]
অনুপমধামা- হৃশিব হরনামা
গৃহীত সমস্ত ভারা।
অনন্ত শরণ- শ্যামাচরণ-
স্বান্ত নলিন সুবিহারা ॥ ১৫
[জয়তি জনতারা জগতি জয়তি জনতারা]

প্রার্থনা।

দুর্গে ত্বং ভববারিণি প্রণমতাং সর্ব্বার্ত্তিসংহারিণী,
দুর্গেহহং ভববারিণি প্রপতিতঃ সীদামি সর্ব্বাত্মনা।
মাতস্ত্বং ভববারিণি প্রতিরুধো নেত্রাণি কালোহন্তিকে
মাতর্ম্মে ভববারিণি প্রকুরুতে শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥*

* যে তুমি [প্রতিসর্গে] শিবকে [পতিত্বে] বরণ কর সেই হে দুর্গে! তুমি প্রণত জনের সর্ব্বদুঃখসংহারিণী। আমি দুর্গম ভব-[সিন্ধু]-জলে পতিত হইয়া সমস্ত দেহ মনের সহিত অবসন্ন হইতেছি। অতএব হে [সর্ব্বজনে] মঙ্গল সংবিভাগকারিণি! তুমি চক্ষু মুদিয়া রাখিও না; হে মা সংসৃতিবারিণি! মৃত্যু যে আমার নিকটে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত [ব্যাঘ্রের ন্যায় কূর্দ্দন] করিতেছে। [এই কবিতাটির ছন্দের নামও শার্দ্দূলবিক্রীড়িত]।

দশম বর্ষের বর্ণানুক্রমে বিষয়-সূচী।

(সন ১৩২৮ আশ্বিন হইতে ১৩২৯ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

ইতঃপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের "খাদ" প্রবন্ধটীর দুই দফা প্রকাশিত হইয়াছে। [১] ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যায় ও [২] জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। তন্মধ্যে বৈশাখ সংখ্যায় শুদ্ধিপত্র—

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩২৭	৮	বিবচনার্হ।	বিবচনার্হ [ছেদ হইবে না
"	২০	সকলে	সকলের
"	"	'সমুদ্রোহর্ণব	'সমুদ্রোহর্ণবঃ'
৩২৮	১৮	ক্ষাব	কাব
৩২৯	১	রাত্রি	রাত্রিয়া

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পং	শুদ্ধপাঠ
১৭	৩০	"জীবন্নরো ভদ্রশতানি পশ্যেৎ"।

অন্তরীক্ষ অশুদ্ধ—সর্ব্বত্রই "অন্তরিক্ষ"—[রি]—হইবে বেদে কুত্রাপি অন্তরীক্ষ নাই। নিরুক্তেও অন্তরিক্ষই আছে। প্রুফ সংশোধকের ক্রটীবশতঃই এই সকল ভুল ও আরও অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। আমরা এজন্ত প্রবন্ধ লেখকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

জ্যৈষ্ঠ—পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	২৩	আদিরেকস্ত	আদি রেকস্ত।
১৯	১৪	বীষন্যো	বীভুন্যো।

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে

ব্রাহ্মণ-সমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট্, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

A Non Political Hindu Religious & Social Magazine.

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

একাদশ বর্ষ—দ্বিতীয় সংখ্যা।

সন ১৩২৯ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রত্যেক খণ্ড।০ চারি আনা

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—873.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"।

একাদশ বর্ষ। { ৮৪৩ শক, ১৩২৯ সাল, কার্ত্তিক। } দ্বিতীয় সংখ্যা।

শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা।

(লেখক—শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।)

রুধির সিক্তা বসন রিক্তা
আয় মা ভীষণা শ্যামা,
লোলুপ রসনা, আঁধার বরণা
বিকট দশনা বামা।

রঞ্জিত করি আন তরবারি,
দোলায়ে মালিকা নরশিরসারি,
মাংস লোলুপ জীব অনাহারী
নাচুক পুলক রঙ্গে,
উঠুক শোণিতে প্রলয় তুফান,
বাজুক বিশ্বে মরণ বিষাণ,
পতির বক্ষে পদ করি দান
আয় মা পিশাচী সঙ্গে।

মানব হস্তে মেখলা করিয়া,
আয় মা দানবী মূরতি ধরিয়া
সাদরে আলয়ে লইতে বরিয়া
এসেছিত যেথা আজি,

ভীষণা মূরতি মৃত্যুসমান,
হউক নিদয় পাষাণ পরাণ,
নাহি তাহে ভয় মুমবয়ান
এসেছি যে সবে সাজি।

মরুতে বিন্দু আহরে যে সুধা,
দেয় তাতে নিধি কঠিন বসুধা,
মরণ মিটায় সে বিপুল ক্ষুধা
অমর অমিয় দানি,

আজি যে জননী তোর ওচরণে,
কত শত শির রয়েছে শয়নে
পরাণ হরণ তরবারি সনে
শুনেছি অভয় বাণী।

রুদ্রে কি ভয় দেখাবি বল মা,
তুই যে মোদের জননী শ্যামা,
তোরই তনয় হর মনোরমা,
ভয়ে কি শুনিয়া ভেরী?

ঊষাসূক্তম্।

(৮)

(৫ম মণ্ডলস্থ ৮০তম সূক্তম্।)

(শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্,এ।)

ওঁ সত্যশ্রবা ঋষিঃ,—ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ,—ঊষাদেবতা,—প্রাতরনুবাকে ঊষস্যে ক্রতৌ আশ্বিন-শস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ॥

ওঁ॥ দ্যুতদ্যামানং বৃহতীমৃতেন
ঋতাবরীমরুণাপ্সুং বিভাতীম্।
দেবীমুষসং স্বরাবহংতীং
প্রতি বিপ্রাসো মতিভির্জরংতে॥১॥

ভাষ্যানুবাদ। দ্যুতদ্যামানং [দীপ্তরথা] বৃহতীং [মহতী] ঋতেন ঋতাবরীং (সত্যবতী বা যজ্ঞবতী) অরুণাপ্সুং অরুণরূপা বিভাতিং [দীপ্যমানা, দেবী [দ্যোতমানা] এবং বিশ্বগুণময়ী উষসং [ঊষাকে, স্বরাবহংতীং (সূর্য্যের প্রতি গমনকারিনী) এইরূপ মহানুভাবা, ঊষাকে বিপ্রাসঃ (মেধাবি ঋত্বিকগণ) মতিভিঃ [স্তুতিদ্বারা] প্রতি জরংতে—[স্তব করিয়া থাকেন]।

বঙ্গানুবাদ। উজ্জলরথারূঢ়া মহতী সত্যবতী বা যজ্ঞবতী অরুণবর্ণা দীপ্যমানা সূর্য্যের প্রতি গমনকারিনী ঊষাদেবীকে মেধাবী বিপ্রগণ স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন॥

এষা জনং দর্শতা বোধয়ংতী
সুগান্ পথঃ কৃণ্বতী যাত্যগ্রে।
বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা
ঊষা জ্যোতির্যচ্ছত্যগ্রে অহ্নাং॥২॥

ভাষ্যানুবাদ। দর্শতা দর্শনীয়া] এষা ঊষা—বোধয়ংতী [নিদ্রিত প্রাণিবর্গকে প্রবোধিত বা জাগরিত করিয়া পথঃ [সুখে গমন করা যায় এমন পথ] কৃণ্বতী (সম্পাদন করতঃ অর্থাৎ অন্ধকার বিদূরিত করিয়া পথাদি সুগম করতঃ,—অগ্রে [সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া, যাতি (গমন করিতেছেন) বৃহদ্রথা [সুবৃহৎরথারূঢ়া] বৃহতী [মহতী বিশ্বমিন্বা [বিশ্বব্যাপিনী অথবা বিশ্বতর্পণা ঊষা) অহ্নাম্ অগ্রে [দিনমুখে] জ্যোতিঃ [তেজঃ (যচ্ছতি) প্রদান করিয়া থাকেন]।

বঙ্গানুবাদ। দর্শনীয়া এই ঊষা দেবী নিদ্রিত প্রাণিবর্গকে জাগরিত করিয়া আলোক বিকাশ দ্বারা পথাদি সুগম করতঃ সূর্য্যের অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া গমন করিয়া থাকেন। সুবৃহৎ রথারূঢ়া মহতী বিশ্বব্যাপিনী ঊষা দিবসের অগ্রভাগে স্বকীয় তেজঃ বিকীর্ণ করিয়া থাকেন।

এষা গোভিররুণেভির্যুজানা
অস্রেধংতী রয়িমপ্রায়ু চক্রে।
পথো রদংতী সুবিতায় দেবী
পুরুষ্টুতা বিশ্ববারা বিভাতি ॥৩॥

ভাষ্যানুবাদ। এষা [এই উষা] অরুণেভি গোভিঃ [অরুণবর্ণবৃষভ দ্বারা—অরুণবর্ণ গোগণ উষার বাহন বহুবার উক্ত হইয়াছে] যুজানা [রথ যোজিত করিয়া] অস্রেধংতী [অক্ষীণা] রয়িং [ধন] অপ্রায়ু [অবিচলিত] চক্রে—করিয়া থাকেন। লট স্থানে লিটের রূপ—"ছন্দসি লঙ্ লুঙ্ লিটঃ।" সুবিতায় (ভালরূপ গমনের জন্য) পথঃ [রাস্তা বাট রদংতী [প্রকাশিত করতঃ],—দেবী [দ্যোতমানা] পুরুষ্টুতা [বহুজনকর্তৃক স্তুতা] বিশ্ববারা [সকলের বরণীয়া] বিভাতি [প্রকাশ করিয়া থাকেন]।

বঙ্গানুবাদ। এই উষাদেবী অরুণবর্ণ গোগণ দ্বারা রথ যোজিত করিয়া—স্বয়ং অক্ষীণা যজমানের ধন অবিচলিত বা অক্ষীণ করিয়া থাকেন। নির্বিঘ্ন গমনের জন্য আলোকদ্বারা পথ বাট প্রভৃতি প্রকাশিত করতঃ দ্যোতমানা—বহুজন কর্তৃক স্তুতা,—সকলের বরণীয়া উষাদেবী বিকাশ প্রাপ্ত হয়েন।

এষা ব্যেনী ভবতি দ্বিবর্হা
আবিষ্কৃণ্বানা তন্বং পুরস্তাৎ।
ঋতস্য পংথামন্বেতি সাধু
প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ। এষা [এই উষা] ব্যেনী [=বি+এনী—বিশেষরূপে শুভ্রাকৃতি] ভবতি [হইতেছেন],—দ্বিবর্হা—[উর্দ্ধ ও মধ্য অন্তরীক্ষ অবস্থান কারিনী পুরস্তাৎ [পূর্ব্বদিকে] তন্বং (স্বীয়তনু) আবিষ্কৃণ্বানা প্রকটিকৃতকরতঃ),—ঋতস্য সত্যরূপ আদিত্যের) পংথাং (=পন্থানং—) পথ কর্ম্মকা) সাধু (সম্যক্) অন্বেতি (অনুগমন করিয়া থাকেন)। এবং প্রজানতীব (বিশ্বকে প্রজ্ঞাপিত বা প্রবোধিত করিয়া) ন দিশো মিনাতি (দিকসমূহের প্রতিহিংসা করেন না, প্রত্যুত দিকসমূহকে উদ্ভাসিত করেন।

বঙ্গানুবাদ। উষা বিশেষরূপে শ্বেতবর্ণা,—উর্দ্ধ ও মধ্য অন্তরীক্ষরূপ দুই প্রদেশে অবস্থানকরতঃ পূর্ব্বদিকে স্বীয়তনু প্রকটিত করিয়া আদিত্যের পথ সম্যক্ অনুগমন করেন। এবং বিশ্বকে প্রবোধিত করিবার জন্যই দিকসমূহকে উদ্ভাসিত করেন।

এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানো-
র্দ্ধেস্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ।

অপ দ্বেষো বাধমানা তমাংসি-
উষা দিবো দুহিতা জ্যোতিষাগাৎ ॥৫॥

ভাষ্যানুবাদ। এষা (এই উষা) শুভ্রা ন শুভ্রবর্ণা নির্ম্মলা সুষ্ঠুরূপে অলঙ্কৃতা রমণীর মত) তন্বঃ (অঙ্গসমূহ) বিদানা (প্রজ্ঞাপিত বা প্রকটিত করতঃ) স্নাতী (স্নান করিয়া ঊর্দ্ধে—(উত্থিতার —অর্থাৎ সদ্যঃস্নানোত্থিতার মত) নঃ (=অস্মাকম্,—আমাদিগের) পুরস্তঃ (সম্মুখে)—দৃশয়ে (সকলের দর্শনার্থ অস্থাৎ [=উদস্থাৎ,—উত্থিত হইতেছেন। দ্বেষঃ [দ্বেষ্য]—তমাংসি [অন্ধকার] অপবাধমানা [অপনোদিত করতঃ] দিবোদুহিতা [দ্যুলোকের বা সূর্য্যের কন্যাস্থানীয়া] উষা,—জ্যোতিষা (তেজঃপুঞ্জ মণ্ডিত হইয়া) সহার্থে তৃতীয়া—অগাৎ [অগ্রসর হইতেছেন]।

বঙ্গানুবাদ। এই উষাদেবী শোভনবেশা রমণীর মত অঙ্গসমূহ প্রকটিত করতঃ সদ্যঃস্নানোত্থিতার ন্যায় আমাদিগের সম্মুখে উদিত হইতেছেন। দ্বেষ্য্তাজন অন্ধকার অপনোদিত করতঃ তেজঃপুঞ্জ মণ্ডিত হইয়া অগ্রসর হইতেছেন।

এষা প্রতীচী দুহিতা দিবো নৄন্
যোষেব ভদ্রা নিরিনীতে অপ্সঃ।
ব্যূর্ণ্বতী দাশুষে বার্য্যানি পুন-
র্জ্যোতির্যুবতি পূর্ব্বথাঽকঃ ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ। দিবো দুহিতা দ্যুলোকের বা সূর্য্যের দুহিতৃস্বরূপা এষা (এই উষা) প্রতীচী পশ্চিমাভিমুখা হইয়া নৄন্ (সর্ব্বপ্রাণিবর্গের প্রতি) ভদ্রা যোষের কল্যাণ বেশা রমণীর মত) অপ্সঃ (রূপ—কর্ম্ম) নিরিনীতে প্রেরণ করিয়া থাকেন। কিঞ্চ, দাশুষে (হবিঃ প্রদানকারী যজমানকে) বার্য্যাণি (বরণীয় ধন) ব্যূর্ণ্বতী প্রদানকারিণী যুবতিঃ (নিত্য যৌবনা) পুনঃ অদ্যাপি পূর্ব্বথা [পূর্ব্বেরমত] জ্যোতিঃ (তেজঃ) অকঃ (=করোতি,—লট্‌স্থানে লুঙ্—করিতেছেন অর্থাৎ বিকাশ করিতেছেন)।

বঙ্গানুবাদ। দ্যুলোক দুহিতা এই উষা পশ্চিমাভিমুখা হইয়া অর্থাৎ ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হওত,—শোভনবেশা রমণীর মত সর্ব্বপ্রাণিবর্গের নিকট স্বকীয়রূপ বিকাশ করিয়া থাকেন। আরও হবিঃপ্রদানকারি যজমানকে বরণীয় ধন প্রদানকারিণী—নিত্য যৌবনা উষাদেবী পূর্ব্বের মত অদ্যাপিও তেজঃ বিকীরণ করিতেছেন।

কন্যাদায়।

(লেখক—শ্রীরামরঞ্জন রায় শর্ম্মা।)

অধুনা আমরা ভদ্রনামধারি মনুষ্যগণ প্রায় সকলেই কন্যাদায়ে বিব্রত। পূর্ব্বে কন্যা জন্মিলে লোকে পুত্র জননের মতই প্রায় আনন্দ অনুভব করিত এবং কন্যাদান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিত। কিন্তু এক্ষণে কন্যারত্ন জাত মাত্রেই ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশ আশঙ্কায় প্রায় সকলেই আনন্দ অনুভব করিতে পারে না, অধিকন্তু পুনঃ পুনঃ কন্যা জন্মিলে বজ্রাহতের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? মূলতঃ কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া বরদক্ষিণার পরিবর্ত্তে বরপণ গ্রহণ আরম্ভ হওয়ায় এইরূপ অবস্থান্তর সংঘটিত হইয়াছে। যাহা আমাদিগের উন্নতির জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, কালসহকৃত অদৃষ্ট দোষে, উপযুক্ত সমাজ পরিচালকের অভাবে, তাহাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ হইল। এই সাংঘাতিক পণপ্রথা রহিত করিবার জন্য সহৃদয় মহোদয়গণ সভাসমিতি বক্তৃতাদি দ্বারা অনেক চেষ্টা করিলেও কোনই ফল হইতেছে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে আমরা অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করিতে শিক্ষা করিয়াছি ও করিতেছি। কিছুতেই অর্থের লোভ বা মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। অর্থঃ পাদরজোপমঃ "অর্থ পদধূলির ন্যায়" এই শিক্ষা আমাদের নাই; অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ। "অর্থের দ্বারা সকলেই বশ হয়" এই শিক্ষাই পাইতেছি এবং বাল্যকাল হইতেই বিলাসে অভ্যস্ত হইতেছি এবং বিলাস বাসনা তৃপ্ত করিবার জন্য অর্থ উপার্জ্জনই একমাত্র করণীয় হইয়াছে। তাহা ন্যায় অন্যায় যে ভাবেই হউক তাহাতে আপত্তি নাই বরং যথেষ্ট আগ্রহই আছে। শিক্ষা সংশোধন পূর্ব্বক এই সকল দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে এই ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকায় বিশেষভাবে আলোচনা হইতেছে। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। আমি অন্য একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। কন্যা জননের আধিক্যও একটি সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে এবং বরপণ বৃদ্ধি করিতেছে। অনেক অল্প উপার্জ্জনশীল যুবক কন্যাদায়ের ভয়ে বিবাহ করিতেছে না। এদিক দিয়াও সমাজের অর্থাৎ দেশের মহা অনিষ্টের আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। কারণ, যে সব যুবক বিবাহ করিতেছে না, তাহারা অবশ্য সকলেই জিতেন্দ্রিয় নহে, এরূপ অবস্থায় তাহাদিগের চরিত্র স্খলিত হওয়ারও সম্ভাবনা অধিক। অতএব এই কন্যা পুত্র জন্ম সম্বন্ধে আমাদিগের কত দূর হাত আছে, সে বিষয়ে সকলেরই জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং সেই নিয়ম মত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেইরূপভাবে চলিলে আংশিক ফল অবশ্যই হইবে। পাশ্চাত্য মনীষিগণও এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিতেছেন এবং পুস্তকও প্রণয়ন করিতেছেন। আমাদিগের প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ চরক ও সুশ্রুত সংহিতা ও ধর্ম্ম গ্রন্থ মনুসংহিতা প্রভৃতি আলোচনা কারণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমরা

ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথে গমন করায় আমাদিগের এইরূপ ভাগ্য বিপর্য্যয় হইতেছে। একটু সূক্ষভাবে বিবেচনা করিলেই অনুভূত হইবে, আমরা বরের পণ গ্রহণ করার সঙ্গে কতটা অশান্তি গ্রহণ করিতেছি। একপভাবে পুত্র-বধূ গৃহে আনা আর মূর্ত্তিমতী অশান্তি আহরণ করা সমান কথা।

পিতৃকুলের সর্ব্বনাশকারী শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি বধূগণ কখনই ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারে না পরন্তু একটা অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাবই পোষণ করে। আর ইহা অস্বাভাবিক নয়, স্বতঃই সকলের এইরূপ হইয়া থাকে। বিবাদ মাথায় করিয়াই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। অর্থের সহিত একটা মহা অনর্থ গৃহে স্থাপন করা হয়। ইহা কিন্তু কাহারও বাঞ্ছনীয় হওয়া উচিত নহে, কারণ সকল লোক সুখই চায়, সুখই জগতে একমাত্র কাম্য। সুখং হি জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জায়তে। এই সুখের উদ্দেশ্যেই লোকে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যে অর্থ উপার্জ্জনে সুখের পরিবর্ত্তে অশান্তির সৃষ্টি করে তাহা কখনই প্রার্থনীয় নহে। আর এইরূপ বিবাহ অনেক সময় যথার্থ দাম্পত্য প্রণয়ের হানিকারক। এবং ইহার আরও কতকগুলি দোষ আছে। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহি। কারণ তাহাতে ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক। সে কথা প্রকাশ করিলে চোরকে গুপ্তদ্বারের সন্ধান দেওয়ার মত কাজ করা হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র (ধর্ম্মসংহিতা) এবং আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ পুত্র জন্মের আধিক্যের পক্ষে এবং কন্যা জননের বিপক্ষে কি যুক্তিসিদ্ধ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সব বিষয়ের যুক্তি শারীর বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে, অতএব সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানের অন্তর্গত সূত্রগুলি প্রধানতম আলোচ্য। এবং এই আলোচনার দ্বারা অল্প বয়স্কা কন্যার বিবাহ যে শাস্ত্র সম্মত এবং যুক্তি সম্মত তাহা প্রমাণিত হইবে। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে অল্প বয়স্কা কন্যার (রজোযোগের পূর্ব্বেই) বিবাহের ব্যবস্থা আছে তাহা উন্মত্ত প্রলাপ নহে, যুক্তিসিদ্ধ, তাহা অভ্রান্তরূপে প্রমাণিত হইবে। সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে "তত্র শুক্র বাহুল্যাৎ পুমান্ আর্ত্তব বাহুল্যাৎ স্ত্রী, সাম্যাদুভয়ো র্নপুংসকমিতি" অর্থাৎ পুরুষের শুক্রবাহুল্য জন্য পুত্র সন্তান এবং স্ত্রীর আর্ত্তব অধিক হইলে কন্যা অপিচ উভয়ের সাম্যে নপুংসক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এবং এই হেতুই মন্বাদি সংহিতাকারগণ অল্প বয়স্কার সহিত অধিক বয়সের বিবাহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্ট বর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সহিত বার বৎসরের মনোজ্ঞা কন্যার বিবাহ দিবে। আর আট বৎসরের কন্যার সহিত তাহার ত্রিগুণ বৎসর বয়সের বরের [২৪ বৎসর] সহিত বিবাহ দিবে। ইহার অন্যথা করিলে ধর্ম্ম বিষয়ে অবসাদ গ্রস্ত হইবে। সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানে তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

"মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যান্তদার্ত্তবং।
ঈষৎ কৃষ্ণং বিগন্ধঞ্চ বায়ুর্যোনি মুখংনয়েৎ॥
তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাৎ কালে বর্ত্তমান মসৃক পুনঃ।
জরা পক শরীরাণাং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ং॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের আর্ত্তব অর্থাৎ ধাতু সম্বন্ধীয় রজঃ মাসে মাসে নির্গত হয়। তৎপরে উক্ত সংহিতার শারীর স্থানের দশম অধ্যায়ে—

"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতি বর্ষায় দ্বাদশ বর্ষাং পত্নীমাবহেৎ।
"পিত্র্য ধর্ম্মার্থকাম প্রজাঃপ্রাপ্স্যাতি" এইরূপ লেখা আছে।

ইহার অর্থ এই যে পঁচিশ বৎসর বয়সের পুরুষের সহিত দ্বাদশ বর্ষের কন্যার বিবাহ দিবে। তাহাতে যে সন্তান হইবে তাহা পিতৃভক্ত, ধর্ম্মার্থ কাম পরায়ণ হইবে। এক্ষণে উক্ত উক্তি গুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হইবে যে অল্প বয়স্কার আর্ত্তব বাহুল্য না থাকায় এবং পূর্ণ যুবকের শুক্রাধিক্য থাকায় এইরূপ মিলনের ফলে পুত্রোৎপাদন অধিক হইয়া থাকে বলিয়াই প্রধানতঃ এইরূপ বাঞ্ছনীয়। এবং আদ্য ঋতুতেই যে সংস্কারপূর্ব্বক স্ত্রীগমন একান্ত কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহারও ইহাই তাৎপর্য্য। পূর্ব্বকালে এরূপভাবে বিবাহ ও ঋতুরক্ষা হইত বলিয়াই পুত্র সন্তান অধিক জন্মিত ও কন্যার সংখ্যা কম ছিল বলিয়া কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হইত। এবং উক্ত কুপ্রথা নিবারণ জন্য কন্যা শুল্ক গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, আর পুত্রের পণ গ্রহণ করার আশঙ্কা ছিল না বলিয়া স্পষ্ট নিবারণের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা ষোল বৎসরের কম বয়স্কা কন্যারও পাঁচশ বৎসরে ন্যূন বয়স্কের বিবাহে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া উহা নিবারণ জন্য বহু চেষ্টা ও আন্দোলন করিয়া থাকেন তাঁহারা সুশ্রুত সংহিতার দশম অধ্যায়ের একটি উক্তি উল্লেখ করিয়া মহা আস্ফালন করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্লোকগুলি যে বঙ্গদেশে এমন কি বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত সুশ্রুত সংহিতায় সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণরূপে উল্লিখিত আছে তাহা প্রমাণিত হইলে বোধ হয় আর কেহ বিপক্ষ বাদিগণের কুহকে ভুলিবেন না এই রূপ বিশ্বাস করি। তদ্যথা—

"ঊন ষোড়শ বর্ষায়ামপ্রাপ্তঃপঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেজ্জীবেদ্ বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥"

এই যুগ্মক বচনটী বঙ্গদেশীয় সুশ্রুত সংহিতাতে এই আকারে আছে কিন্তু বোম্বাই দেশীয় দেব নাগরে মুদ্রিত পুস্তকে "ঊন ষোড়শ বর্ষায়াং" এই স্থানে টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন যে "ঊন দ্বাদশ বর্ষায়াং" ইতি হস্ত লিখিত পুস্তকদ্বয়ঃ পাঠঃ॥

অতঃপর সম্যক আলোচনা করিলে "ঊনদ্বাদশ বর্ষায়াং" এই পাঠই যে ঠিক তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

প্রিয় পাঠকগণ আসুন একবার এ বিষয়ে আলোচনা করা যাউক। এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ "ষোল বৎসরের কম বয়সের স্ত্রীকে পঁচিশ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ গর্ভাধান (সন্তানোৎপাদন ক্রিয়া) করিবেন না। যদি সেইরূপ করেন তবে সন্তান গর্ভের মধ্যে নষ্ট হইবে কিম্বা জন্মিলেও অধিকদিন বাঁচিবে না কিম্বা যদিও বাঁচে দুর্ব্বল হইবে; এই হেতু অত্যন্ত বালায়াং অর্থাৎ অত্যন্ত বালিকা স্ত্রীতে গর্ভাধান করিবে না। ইহাতে প্রথমে উক্ত হইয়াছে "ষোল বৎসরের কম বয়সের কন্যাতে গর্ভাধান করিবে না। পরে বলিলেন অত্যন্ত বালিকাতে গর্ভাধান করিবে না, এইরূপ বলায় ষোল বৎসরের কম অর্থাৎ পনর বৎসর এগার মাস বয়সের স্ত্রীলোক অতি বালিকা হইয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু কখনই ইহা হইতে পারে না। আপনারা বোধ হয় সকলেই জানেন যে ষোড়শীকে যুবতী বলে এবং তাহার পূর্ব্বাবস্থা কিশোরী, তাহার পূর্ব্বাবস্থা বালিকা, এবং তাহার পূর্ব্বাবস্থা অত্যন্ত বালিকা। ফলকথা অত্যন্ত বালিকা কচি মেয়েকেই বুঝায়, তাহা কখনই পনর বৎসরের কন্যা হইতে পারে না। কিন্তু যদি "ঊনদ্বাদশ বর্ষায়াং" অর্থাৎ দ্বাদশ বৎসরের কম বয়সের কন্যাতে গর্ভাধান করিবে না এরূপ বলা যায় তবে কোনও অসঙ্গতি থাকিতে পারে না। কারণ দ্বাদশ বৎসরের কম বয়সের স্ত্রীলোককে কোন প্রকারে অতি বালিকা বলা যাইতে পারে। আর এই শ্লোকের পূর্ব্বের লিখিত "অথাস্মৈ" শ্লোকের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে। আর তদ্বর্ষাৎ দ্বাদশাৎ" এই শ্লোক দ্বারা যে উক্ত হইয়াছে দ্বাদশ বৎসরের বয়সের কন্যার মাসিক ঋতু হয় এবং স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে উক্ত ঋতু রক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য এই সব কথার সঙ্গতি রক্ষা হয়। পক্ষান্তরে ঋতু রক্ষা না করিলে যে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্যহানি হয় এবং অপস্মার প্রভৃতি (বর্ত্তমান হিষ্টিরিয়া) পীড়া হয় তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় ধারায় প্রমাণ করিতে পারা যায়। এ প্রবন্ধে সে সব আলোচনার বিষয় নহে বলিয়া অদ্য ক্ষান্ত থাকিলাম, বারান্তরে দুই চারি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। আর এক বিষয় ভাবিবার আছে। হিন্দু শাস্ত্র গভীর ভাবে আলোচনা করিলে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে আমরা জাতি চাই কিন্তু জাত্যাভিমান চাই না। কিন্তু বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথা জাত্যভিমান ভিন্ন কিছুই নহে; ইহাতে "নবধাকুললক্ষণং নাই; আছে কেবল কুকার্য্যোলীন এই অর্থে কুলীন। আমরা যদি এই কৌলিন্য পরিত্যাগ করিয়া এমন কি রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র সমাজ এক করিয়া কন্যাদানাদি করিতে আরম্ভ করি তাহাতেও অনেক অসুবিধা দূর হইতে পারে।

শাস্ত্রীয় হিসাবে এইরূপ মিলনে কোনও দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এইক্ষণে উভয় শ্রেণীতে আহার সম্বন্ধে কোনও আপত্তি দেখা যায় না, আপত্তি কেবল বিবাহ সম্বন্ধে। দুই চারিজন ধনবান্ এবং সমাজপতির জন্য সমুদায় ব্রাহ্মণ-সমাজ কষ্টভোগ করিতে থাকিবে ইহা কখনই সঙ্গত নহে। হে যথার্থ ধার্ম্মিকগণ! আপনারা অগ্রসর হইয়া

সমাজের মঙ্গলকামনা করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। এবিষয়ে ফরাসীদেশীয় বিদ্বদ্গণ অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যাহারা বিলাসী এবং শ্রমকাতর তাহাদিগের সন্তান প্রায় হয় না এবং যদিও হয় তাহা হইলেও কন্যার সংখ্যাই অধিক। এই কথাও আমাদিগের সম্পূর্ণ শাস্ত্র ও শারীর বিজ্ঞান সম্মত।

অদ্য প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না। বারান্তরে বিশেষভাবে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ইতি—

বেদের উপবৃংহণ।

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।)

পণ্ডিতমাত্রেই জানেন, বেদই সর্ব্বশাস্ত্রের মূল, উপজীব্য ও চরম প্রমাণ।

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি॥"

এতদ্বচনানুসারে পুরাণে ও ইতিহাসে সেই বেদার্থ কিরূপে উপবৃংহিত হইয়াছে, তাহার একটা উদাহরণ আজ দেখাইতেছি।

ঋগ্বেদে আছে—(মন্ত্র)

(১) ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।
জঘান নবতীর্নব॥ (১।৬।৭।৩)

(২) অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং
ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা
অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ॥ (১।২।৩৬।২)

(৩) অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংস-
মিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনা বিবৃক্ণা-
হিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥ (১।২।৩৬।৫)

(৪) নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ
ন যাং মিহমকিরদ্ধ্রাদুনিঞ্চ।
ইন্দ্রশ্চ যদ্ যুযুধাতে অহি-
শ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে॥ ১।২।৩৬।১৩

(৫) অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং
কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরম্।
বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো
দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ॥ (১।২।৩৭।৫)

(নিরুক্তি)

উক্ত ঋক্‌পঞ্চকস্থিত কতিপয় শব্দের বেদ ও ইতিহাসসম্মত অর্থ * যথা—

ইন্দ্র—পুরাণে দেবরাজ। বেদে বায়ু। ইরা—দৃ+রন্ (ঔণাদিক)। ইরা=অন্ন, লক্ষণা দ্বারা তৎসম্পাদক মেঘ। 'ইরাং' মেঘকে 'দৃণাতি' ধারাকারে যে বিদীর্ণ করে।

দধ্যাচ্—পুরাণে মুনিবিশেষ (দধীচি মুনি)। বেদে সূর্য্য। ধ্যান—অন্‌চ্+কিপ্, পৃষোদরাদিত্ব হেতু ধ্যান শব্দ স্থানে দধি আদেশ। 'ধ্যানম্' লোকের কৃতাকৃতবিষয়ক জ্ঞান অঞ্চতি' যিনি পাইয়া থাকেন অর্থাৎ লোকের পাপপুণ্যকর্ম্মের সাক্ষী। যথা মহাভারতে—

আদিত্যচন্দ্রাবনিলানলৌ চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

অস্থি—অভিধানে হাড়। অস্ (ক্ষেপে) 'অস্যতে' যাহা ক্ষেপণ করা যায়। উক্ত অর্থে সূর্য্যকিরণকেও বুঝায়।

মঘবন্ পুরাণে ইন্দ্র। বেদে মহনীয় (পূজনীয়)।

ত্বষ্টৃ—পুরাণে তমোমক দেবতাবিশেষ ও বিশ্বকর্ম্মা। বেদে সূর্য্য। ত্বিষ্+তৃন্ (ঔণা) নিপাতনে ই স্থানে অ। 'ত্বেষতি' যে দীপ্তি পায়।

কাষ্ঠা পুরাণে দিক্ বেদে অপ্ (জল)। ক্রান্ত্বা' আক্রমণ করিয়া (গগনমণ্ডল ব্যাপিয়া) 'স্থিতাঃ' যাহারা থাকে।

বৃত্র—পুরাণে অসুরবিশেষ। বেদে মেঘ। বৃ+ক্ত্র। 'বৃণোতি' যেসমগ্র আকাশকে আবরণ করে। অথবা বৃত্+রক্। 'বর্ত্ততে' যে আকাশে গমন করে। কিম্বা বৃধ+ত্রন্ 'বাহুলকে ধ স্থানে ত। 'বর্দ্ধতে' বর্ষাকালে যাহা বৃদ্ধি পায়। এই ত্রিবিধ অর্থই ব্রাহ্মণসম্মত। যথা—"স ইমাঁল্লোকানবৃণোৎ তদ্বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্। স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষঙ্ঙবর্দ্ধত।" সে সমস্ত লোককে আবরণ করে (বৃণোতি) বলিয়া বৃত্র। সে ইষুমাত্র ইষুমাত্র (বাণের পরিমাণ ১ একহাত করিয়া) নিয়ত বৃদ্ধি পায় (বর্দ্ধতে)। সে বিষঙ্ বিষু-অন্‌চ্+কিপ্, সম্যক্ গমন করিয়া থাকে (বর্ত্ততে। অভিধানেও বৃত্র শব্দের অর্থ 'মেঘ' আছে। যথা—"বৃত্রো রিপৌ ঘনে ধ্বান্তে শৈলভেদে চ দানবে" (মেদিনী)।

---

* বেদসম্মত অর্থ নিরুক্তে, এবং পুরাণ ও ইতিহাস সম্মত অর্থ অভিধানে দ্রষ্টব্য।

অহি—পুরাণে বৃত্রাসুর। বেদে মেঘ। আঙ্—হন্+ইণ্, আঙের হ্রস্ব অ), ইণের ডিৎ সংজ্ঞা হেতু অন্ ভাগের লোপ। 'আ হন্তি' সমস্তাৎ গমন করে (হন হিংসাগত্যোঃ)।

(ভাষ্য)

পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌পঞ্চকের নিরুক্তসম্মত ভাষ্যের অনুবাদ—[১] 'অপ্রতিষ্কুতঃ' প্রতিকূল শব্দরহিত অর্থাৎ সকলের প্রশংসনীয় 'ইন্দ্রঃ' বায়ু 'দধীচঃ অস্থভিঃ' সূর্য্যের কিরণাবলী দ্বারা (কার্য্য কারণে অভেদ হেতু তদুৎপন্ন বৈদ্যুতাগ্নি বা বজ্র দ্বারা)
নব নবতীঃ (৯×৯০) ৮১০ সংখ্যক 'বৃত্রাণি' গগনমণ্ডলের আবরক মেঘজাতকে 'জঘান' নষ্ট করে (অর্থাৎ জলধারাকারে পরিণত করে *। বিবরণ মেঘাভিমানিনী দেবতা প্রথমতঃ ত্রিভুবনকে অভিভূত করিবার জন্য ৩ ভাগে বিভক্ত হয়। তারপর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালবর্ত্তী তত্রত্য লোকদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উহাদের প্রত্যেকে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া (৩×৩) ৯ হয়। পুনর্ব্বার প্রভাব. উৎসাহ ও মন্ত্র, এই ত্রিবিধ শক্তি অনুসারে উহাদের প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া (৯+৩) ২৭ হয়। আবার সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ ভেদে প্রত্যেকে ত্রিবিধ হইয়া (২৭×৩) ৮১ হয়। দশদিকে অবস্থান করিবার জন্য তাহারা প্রত্যেকে দশধ অর্থাৎ (৮১×১০) ৮১০ সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া থাকে ?

সূর্য্যকিরণ হইতে বৈদ্যুতাগ্নির উৎপত্তি এবং সূর্য্য হইতে বায়ুর তৎপ্রাপ্তি নিম্নলিখিত ঋগর্দ্ধে বর্ণিত আছে।

আ দূতো অগ্নিমভরদ্বিবস্বতো
বৈশ্বানরং মাতরিশ্বা পরাবতঃ॥ (৬।৫।১০।৪)

'দূতঃ' বেগবান্ 'মাতরিশ্বা' বায়ু 'বৈশ্বানরং' সূর্য্যসমীপে বিদ্যমান বৈদ্যুতাগ্নিকে 'পরাবতঃ' দূরদেশে অবস্থিত 'বিবস্বতঃ সূর্য্য হইতে আ' অভরৎ আহরণ করে।

(২) ইন্দ্র অর্থাৎ বায়ু 'পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং' পর্ব্বত আশ্রিত 'অহিং মেঘকে 'অহন্' নষ্ট করে। 'ত্বষ্টা সূর্য্য নিজ রশ্মিদ্বারা 'অস্মৈ' এই বায়ুর জন্য 'স্বর্য্যং বজ্রং' শোভনরূপে প্রেরণীয় এমন বজ্র 'ততক্ষ' নির্ম্মাণ করে সেই বজ্র দ্বারা মেঘ নষ্ট হওয়ায় 'আপঃ' জলসমূহ 'স্যন্দমানাঃ' ক্ষরিত হইয়া 'অঞ্জঃ' অনায়াসে 'সমুদ্রমৃব অবজগ্মুঃ' সমুদ্রে গমন করে। তাহার দৃষ্টান্ত 'বাশ্রাঃ ধেনবঃ ইব' হম্বারবকারিনী ধেনু সকল যেমন বৎসের নিকট ধাবমান হয়।

(৩) 'ইন্দ্রঃ' বায়ু 'বৃত্রং' মেঘকে 'আহন্' নষ্ট করিয়া থাকে। বৃত্র কিরূপ ? 'বৃত্রতরং' অতিশয় আবরক ; অথবা অপেক্ষাকৃত বড় মেঘকেও নষ্ট করে ; কিরূপে নষ্ট করে ? 'বাংসং যে রূপে তাহার সন্ধিবন্ধন বিচ্ছিন্ন হয়। অপিচ 'মহতা বধেন' বিশিষ্টরূপে বিনাশের নিমিত্ত কুলিশেন' বজ্র দ্বারা, 'বিবৃক্ণা বিশিষ্টরূপে ছিন্ন 'স্কন্ধাংসি ইব' বৃক্ষশাখার ন্যায়, সেই 'অহিঃ' মেঘ ছিন্ন হইয়া 'পৃথিব্যাঃ উপপৃক্ পৃথিবীর সম্পর্কে আসিয়া 'আ শয়তে' অবস্থান করে।

(৪) 'যৎ' যখন ইন্দ্রশ্চ অহিশ্চ বায়ু ও মেঘ পরস্পর 'যুযুধাতে' যুদ্ধ করে, তখন 'ত্বিৎ

* "ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ" (পা ৩।৪।৬) বেদে সর্ব্বকালেই বিকল্পে লুঙ্ লঙ্ লিট্ হয়।

অস্মৈ ন সিষেধ,' মেঘসেনারূপ বিদ্যুৎ সেই বায়ুর নিকট যাইতে পারে না (তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না)। 'ন তন্যতুঃ' গর্জ্জনও পারে না। 'ন যাং মিহং হ্রাদুনিং চ অকিরৎ' যে বর্ষণ ও নির্হ্রাদ (বৃহৎ শব্দ) বিক্ষেপ করে, তাহারাও পারে না। 'উত, পরন্তু 'মঘবা' মহনীয় (পূজনীয় বা প্রশংসনীয়) বায়ু 'অপরীভ্যঃ' মেঘকৃত অপরাপর আক্রমণকেও পরাস্ত করিয়া 'বিজিগ্যে' জয়লাভ করে (মেঘকে জলধারাকারে পরিণত করিয়া নষ্ট করে)।

বিবরণ বায়ু-আবেষ্টিত বৈদ্যুতাগ্নির তাড়নায় মেঘ বৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এইরূপে মেঘ ও জ্যোতির যে সংঘর্ষ, তাহাই রূপককল্পনায় যুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) 'মধ্যে' স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত যে 'কাষ্ঠানাং' অপ্ (জলরাশি), তাহাদের 'শরীরং নিহিতং' মেঘনামক শরীর বিধাতা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অপ্ কিরূপ? 'অতিষ্ঠন্তীনাং একস্থানে স্থিত হয় না অর্থাৎ মেঘাশ্রিত বলিয়া মেঘ চলিতে থাকিলেই চলিতে থাকে। আর কিরূপ? 'অনিবেশনানাং' যতক্ষণ জলাশয় না পায় ততক্ষণ অন্য কোথাও প্রবেশ করে না। (অর্থাৎ জলাশয়েই প্রবেশ করে)। সেই 'আপঃ' জলরাশি বৃত্রস্য নিণ্যং' মেঘ যে স্থান দিয়া নীচে নামে, সেই স্থানেই 'বিচরন্তি' বিচরণ করে। জলরাশি বিচরণ রিতে থাকিলে, মেঘও স্বীয় শরীরের বৃদ্ধি দ্বারা 'দীর্ঘং তমঃ' গাঢ় অন্ধকারময় হইয়া 'আশয়ৎ' অবস্থান করে। মেঘ কিরূপ? 'ইন্দ্রশত্রুঃ' ইন্দ্র অর্থাৎ বায়ুই তাহার বিনাশক।

উক্ত অর্থ অবলম্বন করিয়া পুরাণে বৃত্রাসুরবধ বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ের অর্থগত ও শব্দগত সৌসাদৃশ্য প্রদর্শনেরজন্য ভাগবতের (স্কঃ৬।অঃ৯--১২) কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

এক সময়ে ইন্দ্রের অপরাধে সুরগুরু বৃহস্পতি সুদীর্ঘকাল অন্তর্হিত হওয়ায়, দেবতারা ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে গুরু করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ অসুরকুলোৎপন্না জননীর অনুরোধে পরোক্ষে অসুরদিগের জন্য এবং প্রত্যক্ষে দেবতাদিগের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতেন। এ সংবাদ অবগত হইয়া ইন্দ্র ক্রোধবশে তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন।

(ক) হতপুত্রস্ততস্ত্বষ্টা জুহাবেন্দ্রায় শত্রবে।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব মাচিরং জহি বিদ্বিষম্॥

ত্বষ্টা পুত্রহন্তা ইন্দ্রের বিনাশের জন্য, হে ইন্দ্রশত্রু (ইন্দ্রের বিনাশকর্ত্তা পুরুষ)! হোমকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হও এবং শীঘ্র শত্রুকে বিনাশ কর বলিয়া,আহুতি দিয়াছিলেন।

জ্ঞাতব্য—ব্রাহ্মণে আছে "ইন্দ্রশত্রুর্বর্দ্ধস্ব" হে অগ্নি, তুমিই ইন্দ্রশত্রু হইয়া পুরুষাকারে উৎপন্ন হও। ত্বষ্টা ইন্দ্র শত্রুপদে ইন্দ্রের শত্রু (শাতয়িতা বিনাশকর্ত্তা) এই অর্থে ষষ্ঠীতৎ-পুরুষ সমাস অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু উচ্চারণের দোষে উহা বহুব্রীহিতে পরিণত হইয়া, ইন্দ্র হইয়াছে শত্রু যার এই অর্থ প্রকাশ করিয়াছিল॥ তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বোক্ত ভাগবতীয় শ্লোকে ইন্দ্রশত্রু শব্দ আছে, [৫] ঋকেও ইন্দ্রশত্রু শব্দ রহিয়াছে।

(খ) অগ্নাবাহার্য্যপচনাদুত্থিতো ঘোরদর্শনঃ।

দক্ষিণাগ্নি হইতে ভীষণাকৃতি বৃত্রাসুর উত্থিত হইল।

মেঘও "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" বলিয়া অগ্নি হইতে উত্থিত এবং ঘোরদর্শনও বটে।

(গ) বিষ্বগ্ বিবর্দ্ধমানং তমিষুমাত্রং দিনে দিনে।

দগ্ধশৈলপ্রতীকাশং সন্ধ্যাভ্রানীকবর্চ্চসম্॥

বৃত্রাসুর দিন দিন ইষু পরিমাণে সমন্তাৎ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দগ্ধশৈলের ন্যায় তাহার আভা, এবং সন্ধ্যাকালের মেঘের ন্যায় প্রভা।

বৃত্র শব্দের নিরুক্তিতে উদ্ধৃত ব্রাহ্মণেও আছে "স ইষুমাত্রমিষুমাত্রং বিষ্বঙ্ ঙবর্দ্ধত।" মেঘেরও দগ্ধশৈলের ন্যায় আভা, এবং সন্ধ্যাকালে সূর্য্যকিরণে তাহার প্রভাও হয়।

(ঘ) দরীগম্ভীরবক্ত্রেণ পিবতা চ নভস্তলম্।

লিহতা জিহ্বয়র্ক্ষাণি গ্রসতা ভুবনত্রয়ম্॥

মহতা রৌদ্রদংষ্ট্রেণ জৃম্ভমাণং মুহুর্মুহুঃ।

বিদ্রুতা দুদ্রুবুর্লোকা বীক্ষ্য সর্ব্বে দিশো দশ॥

সেই বৃত্রাসুর গিরিগুহার ন্যায় মুখের দ্বারা নভস্তলকে পান করিতে লাগিল; জিহ্বা দ্বারা নক্ষত্র সকলকে লেহন করিতে লাগিল; ত্রিভুবনকে গ্রাস করিতে লাগিল; ভয়ঙ্কর বৃহৎ দন্ত বিকাশ করিয়া পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদান করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত লোক ভীত হইয়া দশদিকে ছুটিতে লাগিল।

মেঘও নভস্তল ও নক্ষত্রমণ্ডলকে পান, লেহন ও গ্রাস (আবরণ) করে। বিদ্যুতের দ্বারা বিকাশপ্রাপ্তও হয়। নিবিড় ঘনঘটা দেখিলে লোকে ভয় পাইয়া গৃহাভিমুখে ধাবিতও হয়।

(ঙ) যেনাবৃতা ইমে লোকাস্তপসা ত্বাষ্ট্রমূর্ত্তিনা।

স বৈ বৃত্র ইতি প্রোক্তঃ পাপঃ পরমদারুণঃ॥

যে ত্বষ্টার পুত্র, এই সমস্ত লোককে স্বীয় প্রতাপে আবৃত করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার নাম বৃত্র হইল।

বৃত্র শব্দের নিরুক্তিতে উদ্ধৃত ব্রাহ্মণেও আছে "যং ইমান্ লোকান্ আবৃণোৎ, তৎ বৃত্রস্য বৃত্রত্বম্।"

(চ) এবং কৃতব্যবসিতো দধ্যঙ্ ঙাথর্ব্বণস্তনুম্।

পরে ভগবতি ব্রহ্মণ্যাত্মানং সন্নয়ন্‌জহৌ॥

অথেন্দ্রো বজ্রমুদ্যম্য নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।

... ...

বৃত্রমভ্যদ্রবচ্ছক্রমসুরানীকযূথপৈঃ।

পর্য্যস্তমোজসা রাজন্ ক্রুদ্ধো রুদ্র ইবান্তকম্॥

দেবতাদিগের প্রার্থনায় দধ্যঙ্ (দধীচি) মুনি অস্থিদানে কৃতনিশ্চয় হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, ইন্দ্র সেই বজ্র লইয়া অসুরসেনাপতিগণে পরিবৃত বৃত্রাসুরকে আক্রমণ করিলেন।

(১২ ঋকে) দধ্যঙ্ এর অস্থি হইতে (অর্থাৎ সূর্য্যের কিরণ হইতে বজ্রের উৎপত্তি, ত্বষ্টা (সূর্য্য) সেই বজ্রের নির্ম্মাতা, এবং সেই ত্বষ্টা হইতেই ইন্দ্র (বায়ু) উহা প্রাপ্ত হয়।

(ছ) দৃষ্ট্বা বজ্রধরং শক্রং রোচমানং স্বয়া শ্রিয়া)
নামৃষ্যন্নসুরো রাজন্ মৃধে বৃত্রপুরঃসরাঃ ॥
দৃষ্ট্বাহভ্যপ্যত সংক্রুদ্ধ ইন্দ্রশক্রমর্ষিতঃ।
ব্যনদৎ সুমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেতসঃ ॥

স্বীয় প্রভায় দীপ্যমান ইন্দ্রকে যুদ্ধস্থানে দেখিয়া বৃত্রের অনুচরেরা সহিতে পারিল না। মহাবলশালী ইন্দ্রশত্রু বৃত্রও ক্রুদ্ধ হইয়া শব্দ করিতে লাগিল। সেই শব্দে সকল লোক মূর্চ্ছিত হইল।

(৪ঋক্) বায়ু-আবেষ্টিত বৈদ্যুতাগ্নির প্রভায় বায়ুও দীপ্যমান হয়। (৫) ঋকেও "ইন্দ্রশত্রুঃ" পদ আছে। মেঘও কদাচিৎ এমন শব্দ করে, তাহাতে কত লোক মূর্চ্ছিত হয়।

(জ) খ আপতৎ তদ্ বিচরদ্ গ্রহোল্কবন্-
নিরীক্ষ্য দুষ্প্রেক্ষমজাতবিক্লবঃ।
বজ্রেণ বজ্রী শতপর্ব্বণাচ্ছিনদ্
ভুজঞ্চ তস্যোরগরাজভোগম্ ॥

বৃত্রাসুরনির্ম্মুক্ত সেই শূল, গ্রহ ও উল্কার ন্যায়, শূন্যে আসিতেছে দেখিয়া ইন্দ্র বজ্র দ্বারা সেই শূল ছেদন করিলেন এবং তাহার বাহুও ছেদন করিলেন।

মেঘ হইতেও উল্কাপাত হয়, এবং বায়ুও মেঘকে ছিন্নভিন্ন করে।

(ঝ) পশ্য মাং নির্জ্জিতং শক্র বৃক্ণায়ুধভুজং রণে।
ঘটমানং যথাশক্তি তব প্রাণজিহীর্ষয়া ॥

(বৃত্র বলিল) দেখ ইন্দ্র ! আমি তোমার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি। আমার অস্ত্র ও বাহু বৃক্ণ (ছিন্ন) হইয়াছে, তথাপি তোমার প্রাণহরণের ইচ্ছায় যথাশক্তি ঘটমান (উদ্যুক্ত) হইতেছি।

বায়ু ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলে মেঘখণ্ডসমূহ আবার ঘটমান (পরস্পর মিলিত) হয়। ইহাতেও বৃত্রের বাহু বিবৃক্ণ আছে, [৫] ঋকেও "স্কন্ধাংস ইব" বৃক্ষশাখার ন্যায়] কুলিশেন আ আ" বিবৃক্ণা" আছে।

(ঞ) ইতি ব্রুবাণাবন্যোন্যং ধর্ম্মজিজ্ঞাসয়া নৃপ।
যুযুধাতে মহাবীর্য্যাবিন্দ্রবৃত্রৌ যুধাং পতী ॥

এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র ও বৃত্র পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল।

[২] ঋকে আছে, বায়ু ও মেঘ পরস্পর যুদ্ধ করে। "যুযুধাতে" :পদ ইহাতে ও আছে, তাহাতেও আছে।

(ট) জগ্রাস স সমাসাদ্য বজ্রিণং সহবাহনম্।
মহাপ্রাণে মহাবীর্য্যো মহাসর্প ইব দ্বিপম্॥

বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে পাইয়া গ্রাস করিয়াছিল।

মেঘ ও বায়ুকে গ্রাস করে অর্থাৎ মেঘের অভ্যন্তরেও বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে।

(ঠ ভিত্ত্বা বজ্রেণ তৎকুক্ষিং নিষ্ক্রম্য বলভিদ্ বিভুঃ।
উচ্চকর্ত্ত শিরঃ শত্রোর্গিরিশৃঙ্গমিবৌজসা॥

ইন্দ্র বজ্র দ্বারা তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া, তন্মধ্য হইতে নির্গত হইয়া, গিরিশৃঙ্গের ন্যায় তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

বায়ুও মেঘকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে (ইন্দ্র শব্দের নিরুক্তি দ্রষ্টব্য)। মেঘের কোনও কোনও অবয়ব গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হয়।

(ড) বজ্রস্তু তৎকন্ধরমাশুবেগঃ
কৃন্তন্ সমন্তাৎ পরিবর্দ্ধমানঃ।
ন্যপাতয়ত্তাবদহর্গণেন
যো জ্যোতিষাময়নে বার্ত্রহত্যে॥

বেগবান্ বজ্র বৃত্রের গ্রীবা ছেদন করিয়া, তাহাকে নিপাতিত করিল সুতরাং ইন্দ্রেরই জয় হইল)।

বায়ু আবেষ্টিত বৈদ্যুতাগ্নি মেঘকে ছিন্ন করিয়া থাকে মেঘ তখন জলধারাকারে পৃথিবীতে পতিত হয় ৩ ঋক্। সুতরাং বায়ুই জয়লাভ করে (৪ ঋক্)।

কো বেদ তত্ত্বমখিলং বদ সাধু বেদ,
ত্বঞ্চেৎ পুরাণ নিখিলং বিদিতং পুরা ন।
তত্ত্বং পুরাণনিহিতং, যদি বা পুরা ন
ত্বাং বেদ বেদ সকলং, বদ কো নু বেদ॥*
বেদা বিদ্যাঃ পুরাণানি সেতিহাসানি সর্ব্বশঃ।
যস্য নিশ্বসিতং তস্মৈ মহতে মহসে নমঃ॥†

---

* হে পুরাণ, তোমাকে যদি অগ্রে সম্পূর্ণরূপে না জানে তবে বেদের সমগ্র তত্ত্ব কে জানে বল। হে বেদ, যদি অগ্রে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে না জানে তবে পুরাণের অন্তর্নিহিত তত্ত্বই বা কে জানে বল।

† সমস্ত বেদ, বিদ্যা, পুরাণও ইতিহাস যাঁহার নিশ্বাসপ্রসূত, সেই মহৎ তেজঃপদার্থকে প্রণাম।

ব্রাহ্মণ।

(লেখক—শ্রীপঞ্চানন তর্কতীর্থ।)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
"বোদ্ধারো মৎসরগ্রস্তাঃ প্রভবঃ স্মর দূষিতাঃ।
অবোধোপহতাশ্চান্যে জীর্ণমঙ্গেষু ভাসিতম্॥"

যে ব্রাহ্মণ বিরাটপুরুষ ব্রহ্মার প্রধানাঙ্গ বদন-কমল হইতে নির্গমনানন্তর স্বাভাবিক ব্রহ্ম-জ্যোতি সমুদ্ভাসিত হইয়া জগৎ আলোকিত করিয়া ছিলেন যিনি গুরুতা গ্রহণ করিয়া সকলের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দেশ ধর্ম্মময় কবিয়া ছিলেন। যিনি তপস্যাদ্বারা দেশ সুরক্ষিত করিয়া ছিলেন। যাঁহার অমোঘ কল্যাণ কামনায় জগৎ নির্ব্বিঘ্ন ছিল। অকালমৃত্যু, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দেশের অশান্তিকর প্রতিবন্ধকগুলি যাঁহার তপঃপ্রভাবে জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বিশ্বরাজ্যের সম্রাট্ জগদীশ্বরের কর্ম্মকোষের ভার যাঁহার পুতহস্তে সুরক্ষিত ছিল। জগৎবাসী লোক সকল যাঁহার চরণতলে মন প্রাণ সকলই অর্পিত করিয়াছিল।

সর্ব্বজ্ঞ মনু ধর্ম্মকোষ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উচ্চৈঃস্বরে যাঁহাকে ঈশ্বর পর্য্যন্ত বলিয়া: গিয়াছেন। যাঁহার অসীম শক্তিবলে রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি দোষগুলি কাহারও অনুভূত হইত না। যিনি সর্ব্বত্যাগী হইলেও দেশের স্বার্থবিধানে সর্ব্বদা মন প্রাণ সমর্পিত করিয়াছিলেন।

যাঁহারই বিধানানুসারে বলবীর্য্য বানিজ্য সেবা প্রভৃতি বৃত্তি সকল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অবনত মস্তকে বহন করিত। যাঁহারই ভয়ে ঐ বৃত্তিগুলি বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হইত না। জগৎ প্রতি-পালনের জন্য যিনি বিধিনিষেধ জ্ঞাপক শাস্ত্রগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যিনি সরলতা শমদম তিতিক্ষা ঔদার্য্য ধর্ম্মবক্তা প্রভৃতি সদ্গুণের জীবন্ত মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন।

যিনি তপস্যাব্যাপৃত হইয়া ঘৃতাহুতি দ্বারা গগনমণ্ডলে যথাসময়ে জলধরমণ্ডল আবির্ভূত করিয়া মেদিনীকে নানাবিধ খাদ্য, নানাবিধ পেয় বস্তুদ্বারা সর্ব্বদা অলঙ্কৃত করিতেন। যাঁহারই দয়ায় প্রাণীর প্রাণ সুরক্ষিত থাকিত।

এইজন্যই কথিত আছে —

"অগ্নৌ দত্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা॥"

ব্রাহ্মণ্যশক্তি সমুদ্ভাসিত যাঁহার অপরিমিত প্রতিভাবলে বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, ন্যায়, পাতঞ্জল স্মৃতি অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি জ্ঞানভাণ্ডার শাস্ত্রগুলি আবির্ভূত।

অভীষ্টপ্রদ দেবগণ যাঁহার রচিত যাগ যজ্ঞ প্রদেয় আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া প্রত্যুপকাররূপে এই মেদিনীকে সুরক্ষিত করিতেন। যিনি সমস্ত ঐহিক লালসা ত্যাগ করিয়া

স্বয়ং বল্মিক স্তূপে পরিণত হইয়া ও কত কোটি কোটি বৎসর সেই মঙ্গলময় গভীর অরণ্যে বসিয়া জগদীশ্বরের ধ্যানে নিরত থাকিয়া জগত মঙ্গলময় রাখিতেন।

হে ব্রাহ্মণ! সেই তুমি এক্ষণে কোথায় গিয়াছ?

পুনরায় সেই শক্তি বিকাশ কর। দেশরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হও। বিশ্বরাজ্য সম্রাট্ জগদীশ্বরের এবং প্রজাপালক পৃথিবীপতির সহায়তা গ্রহণ কর।

জগৎরক্ষার একমাত্র হেতু ধর্ম্মকোষভাণ্ডার তুমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছ। এই ভার গ্রহণে তুমি জগদীশ্বরের নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ। ইহার অন্যথা করিলে তুমি রাজার নিকট দণ্ডিত না হইলেও জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই দণ্ডিত হইবে। তোমার নিজকর্ত্তব্যও তুমি শাস্ত্রে বিহিত করিয়াছ, তোমার ঔদাস্যে আজ পৃথিবীর এই বিষম দুর্দ্দশা। সেই সমস্ত কর্ত্তব্য শাস্ত্রদ্বারা স্থির করিয়া লও।

জীবিকা অর্জ্জন তেমার মার্গ নহে। বৈশ্যবৃত্তি তোমার কুপথ। তোমার মার্গভ্রংশ সকলের মার্গভ্রংশের হেতু। ক্ষত্রিয় সমাজ, বৈশ্যসমাজ, এবং শূদ্রসমাজ তোমারই প্রতিষ্ঠিত। সামান্য লোকও পুরুষপরম্পরাগত কীর্ত্তি রক্ষাব জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি ব্রাহ্মণের সুমতি দান কর। আর ব্রাহ্মণকে ঐহিক লালসানিদ্রায় ব্যাপৃত রাখিও না নচেৎ তোমারই সৃষ্ট বিলুপ্ত হইবে। আজ চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যভ্রংশে এই তোমারই প্রিয়তম চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজে কাহারও বৃত্তি স্থায়ী হইতেছে না। প্রতি পদে পদে সকলের বৃত্তি জীবিকার্জ্জনের প্রবল তাড়নায় ব্যাহত হইয়া বিপর্য্যাসপ্রাপ্তরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। ইহার ফলে তোমার বিশ্বরাজ্যের এই দুঃসহ দুর্দ্দশা ক্রমশঃ আরও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে। এই সকল দুর্দ্দশা দেখিয়া তোমারই রাজ্যের প্রতি কোন কবি কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরপার মারদচিরা দাচারিতা চোরিতা
ধর্ম্মোনর্ম্ম বভূব কর্ম্মচ দদৌ মর্ম্মস্পৃশং যাতনাম্।
নীতি র্ভীতি মুপাগতা ধৃতিমতী প্রেতে প্রযাতোন্নতিঃ
কিং ভো মার্গ পরিচ্যুতা ভরতভূদেবা যূয়ং তিষ্ঠথ॥

হে ব্রাহ্মণ! ঐহিক লালসাকৃষ্ট চিত্তনিবন্ধন ধনমদগর্ব্বিত ধনীর ভ্রূকুটিযুক্ত বদনের দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া না থাকিয়া স্বয়ং অর্থে তৃণজ্ঞান করিয়া সেই নিজ চিরপ্রচলিত আবৃত ব্রাহ্মণ্য শক্তি সমুদ্ভাসিত করিয়া ঐ সকল ধনীকে আদেশ পরিচালিত কর। এবং বল—

"ত্বং রাজা বয়মুপাসিত গুরুপ্রজ্ঞাভিমানোন্নতাঃ
খ্যাতস্ত্বং বিভবৈর্যশাংসি কবয়ো দিক্ষু প্রতন্বন্তি নঃ।
ইত্থংমানদ নাতিদূরে মুভয়ো রপ্যাবয়োরন্তরং
যদ্যস্মাসু পরাঙ্মুখোঽসি বয়মপ্যেকান্ততো নিস্পৃহাঃ॥

হে ব্রাহ্মণ! আবার সমজ্ঞান দেখাইয়া জগৎকে সমজ্ঞানের সুশিক্ষা দেও। নতুবা

সংসার দৃঢ়তামূল সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত আর সংসার নিষ্পেষক সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদূরিত হইবে না,। সমজ্ঞান বিধায়ক শাস্ত্রের উপদেশামৃতপান কর।

"অহৌ বা হারে বা বলবতি রিপৌ বা সুহৃদিবা
মনৌ বা লোষ্ট্রে বা কুসুমশয়নেবা দৃষদিবা।
তৃণে বা স্ত্রৈণে বা মমসমদৃশোযান্তু দিবসাঃ
সদা পুণ্যে হ্রণ্যে শিব শিব শিবেতি প্রজপতঃ॥

হে ব্রাহ্মণ! তোমারই এইসকল অনুষ্ঠিত কার্য্যকলাপ দেখিলে সকলেই সেই পথের পথিক হইবে।

হে ব্রাহ্মণ! কেবল জাতিগত ব্রাহ্মণ্য লইয়া অভিমান সেবা করিলে চলিবে না। সেই জগজ্জ্যোতিঃ আত্মস্থ ব্রাহ্মণ্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হও। দেখিবে যে চির অকল্যাণকর কুবৃত্তিসকল দূরে পলায়ন করিবে। পুনরায় জগৎ আলোকিত হইবে। পৃথিবী শস্য শ্যামলা হইয়া শান্তিময়ী হইবে।

প্রাপ্ত পত্র।

(লেখক—শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।)

মহাশয়!

অদ্য কএক মাস হইতে আপনাদের পত্রিকায় জাতীয়শিক্ষা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধসকল বাহির হইতেছে, উহার অধিকাংশ প্রবন্ধই বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দোষ কীর্ত্তন বা কুফল বর্ণনে পরিপূর্ণ(আমি নিজেও গত বৈশাখ সংখ্যায় ঐরূপ একটি প্রবন্ধ দিয়াছিলাম।)

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যে নিতান্তই কুফল প্রসূ তাহা একরূপ সর্ব্ববাদি সম্মত, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কিরূপ শিক্ষার প্রচলন আবশ্যক তাহা এযাবৎ কেহই লেখেন না। কেবল আপনার প্রবন্ধেই ঐ সম্বন্ধে বহু সার গর্ভ আলোচনা দেখিতে পাইলাম। এবং প্রথম শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহাই এখন আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়"—কিন্তু তারপর? অর্থাৎ যাঁহারা জাতীয়ভাবে উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা নাই; আভাসমাত্র আছে। উহারই একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রার্থনীয়। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আমার প্রাণের ভাব যাহা তাহার আভাস ব্যক্ত করিলাম মাত্র; যদি অযোগ্য না হয় আপনাদের পত্রিকায় এসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব।

এখনও বহু স্বধর্মনিষ্ঠ অধ্যাপক মহোদয়গণ নিজের আর্থিক উন্নতির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া ভিক্ষালব্ধ অর্থ অকাতরে ব্যয়করিয়া বহুছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যা দানকরিতেছেন, ছাত্রগণও নিয়ত গুরুগৃহে বাসকরিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়া কেহবা পঞ্চতীর্থ কেহবা সপ্ততীর্থ হইয়া ঘরেফিরিতেছেন] কিন্তু ঐ সকল তীর্থ সেকেলে পানা পুকুর অপেক্ষাও পবিত্র কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ। কারণ—তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় তেজস্বিতা; সদাচারপরায়ণতা, ত্যাগশীলতা, লোভশূন্যতা প্রভৃতি জগৎ পবিত্রকর গুণনিকর খুব কমই দেখা যায়। উহার হেতু যে প্রথম শিক্ষারদোষ তাহা আপনিই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য সন্দেহ নাই। আমার মনে হয় উহা ছাড়া আরও একটি হেতু আছে; সে হেতু বর্ত্তমান টোলের শিক্ষা প্রণালী। এখন দেখিতে পাই টোলের অধ্যাপকগণও স্কুল কলেজের অধ্যাপকের ন্যায় ছাত্রের পাঠ অভ্যাস হইল কিনা তাহার পরীক্ষা করিয়া নূতন পাঠ দিয়াই নিজ কর্ত্তব্যের শেষ করেন এবং যাহাতে গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষায় ছাত্র উত্তীর্ণ হইতে পারে দিবানিশি কেবল সেইজন্যই তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। ছাত্রের চরিত্র গঠনের জন্য একমুহূর্ত্তও চিন্তা বা চেষ্টা করেন না। ছাত্রগণ তাহাদের অবশ্য করনীয় সন্ধ্যোপাসনাদি করিল কিনা? শৌচাচার পালন করে কিনা? ইত্যাদি বিষয়ের সন্ধান লওয়া বা যাহাতে ছাত্রগণ ঐ সব বিষয়ে অনুরক্ত হয় সে জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যেন তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের বাহির মনে করেন। স্কুল কলেজের অধ্যাপক গণও যেরূপ ছাত্রগণকে উপদেশ দিয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ করেন; ছাত্র তাহা প্রতি পালন করিল কিনা তাহা দেখা আবশ্যক মনে করেন না বা দেখিবার সুযোগওপাননা; টোলের অধ্যাপকগণও দেখিবার সুযোগ সত্বেও তাহা দেখা আবশ্যক মনে করেন না। টোলে পাঠার্থি ছাত্রগণের সম্বন্ধে কতকগুলি ধরাবাঁধা নিয়ম থাকা খুব প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত প্রাতঃকৃত্য গুলি যথারীতি অনুষ্ঠান করিবে এবং তাহা করিল কিনা অধ্যাপক তাহার সন্ধান লইবেন, এবং পর পর যামার্দ্ধে যাহা যাহা বিহিত সমস্তই অনুষ্ঠান করাইতে হইবে এবং একাগ্রতা অভ্যাসার্থে কিছুক্ষণ আসন প্রাণায়ামাদি অভ্যাস, স্তোত্রপাঠ বা অধিকারানুসারে গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি পাঠ করাইতে হইবে। বেশভূষাপরণপরিচ্ছেদের একটা ধরা বাঁধা নিয়ম থাকিবে, মোটকথা ব্রহ্মচারী আশ্রমের পালনীয় বিধি নিষেধগুলি দেশকাল পাত্রানুসারে যতদূর সম্ভব পালন করিতে হইবে। কিন্তু এখনকার অধ্যাপকবর্গ এ বিষয়ে কোনই লক্ষ্য লন না। পূর্ব্বে লইতেন। একদা বাল্যকালে আমি আহার করিতে বসিয়া আমার একটি সহপাঠী বালকের সহিত সেইদিনকার স্কুলের পাঠ সম্বন্ধীয় একটি ইংরাজী কথার আলোচনা করিতেছিলাম তচ্ছ্রবনে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে বাবা আমার পাঠ্যাবস্থায় একদিন আমার গুরুপত্নী অতিশয় তপ্ত অন্ন আমাকে পরিবেশন করিলে আমি বলিয়াছিলাম যে, "এই জ্যৈষ্ঠ গরমের সময় কি এমন গরম ভাত খাওয়া যায়? তচ্ছ্রবনে আমার অধ্যাপক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে কি!—ব্রাহ্মণের ছেলে আহার করিতে বসিয়া

পারস্ত ভাষা উচ্চারণ! —এই বলিয়া আমাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া উঠাইয়া দিলেন এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তের স্বরূপ সেদিন আমাকে অনাহারে থাকিতে হইল। আর তুমি বাপু! দুই দিন স্কুলে যাইতে না যাইতে আহার করিতে বসিয়া কাট্‌ ফুট করিতে আরম্ভ করিয়াছ। তুমি বালক—শব্দের শক্তি বুঝ না, মনের দুর্দ্দমনীয়তা বুঝ না, ঐ এক কথায় ভিতর দিয়া ধীরি ধীরি ছদ্মবেশে তোমার হৃদয়ে যে অনাচার ব্যভিচার প্রবেশ করিবে শেষে শত চেষ্টাতেও তাহা উন্মূলিত করিতে পারিবে না। অতএব অদ্য হইতেই তোমার স্কুলে পড়া বন্ধ হইল, (আমিও হয়ত তখন মনে মনে বড়ই খুসি হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে কি মহেন্দ্রক্ষণেই মুখ দিয়া কথাটি বাহির হইয়াছিল যে এক কথাতেই স্কুলে যাওয়ার দায় হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইলাম যাহা শতবার পলায়ন করিয়াও পাই নাই।)

কিন্তু আমি যখন টোলে পড়িয়াছি তখন স্বচক্ষে দেখিয়াছি ; ধনী অধ্যাপকের আদুরে ছেলে স্কুল কলেজের ছেলের ন্যায় তুল্য বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া টোলে পড়িতেছেন অধ্যাপক তাহার জন্য কিছুই বলেন না। যাহাহউক এইসব বিষয়ের আলোচনা আপনার প্রবন্ধে বিশদরূপে না থাকিলেও আভাস আছে।

দ্বিতীয় কথা অধ্যাপনাপ্রণালী ও বিষয় লইয়া এখন অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিষয় হইতেছে ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ ইহাই প্রধান ; পুরাণ ও জ্যোতিষ অল্প সংখ্যক লোকই পড়ে। কিন্তু অঙ্ক ভূগোল, ইতিহাস শিল্প প্রভৃতি অপরা বিদ্যার আলোচনা সংস্কৃত ভাষায় একেবারেই নাই। আমাদের শাস্ত্র বলেন যে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাচৈবাপরাচ" —পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাই জানিতে হইবে। আমার মনে হয় ইহারই আভাস চণ্ডীর;— "দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচি ত্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন স্তুল্যদৃষ্টয়ং— এই শ্লোকে নিহিত আছে। ইহার অর্থ আমি এইরূপ বুঝিতে চাই ;—কতকগুলি প্রাণি [অত্যন্ত বিষয়াসক্ত জীব] প্রকাশস্বভাব হেতু দিবাস্থানীয় আত্মতত্ত্বে অন্ধ ; আর কতক গুলি প্রাণী [বাহ্যজ্ঞানবিরহিত সদা সমাহিত আত্মারামগণ] আবরণস্বভাব হেতু রাত্রি স্থানীয় বহীরাজ্যে অন্ধ ; কতকগুলি প্রাণী (একান্ত জড় স্বভাব যাহারা] উভয়রাজ্যেই অন্ধ, আর কতকগুলি প্রাণী উভয়রাজ্যেই তুল্য দৃষ্টিসম্পন্ন। ব্যাস বশিষ্ঠ :প্রমুখ ঋষিগণ তাঁহারা যেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞ তেমনই রাজনীতিজ্ঞ ও কলাশাস্ত্রবিৎ ব্যবহারাভিজ্ঞ। মহর্ষি মেধসের মতে তাহারাই পূর্ণজ্ঞানী, তাই অপরাবিদ্যানভিজ্ঞগণকে ঋষি যেন অসম্পূর্ণ মনে করিয়াই "রাত্র্যন্ধা বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, এইরূপ অর্থ কেবল আমারই মনঃকল্পিত নহে। চণ্ডীর গুপ্তবতী নাম্নী টীকাতেও এই অর্থের আভাস আছে যথা—"বেদান্তিনস্তু বানিশাসর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তিসংযমী ইত্যাদি গীতার্থপরত্বেন যোজয়ন্তি,"—অন্তর্জ্জগতের উন্নতিরজন্য যেমন পরাবিদ্যার প্রয়োজন, বহির্জ্জগতের উন্নতির জন্য তেমনই অপরা বিদ্যার প্রয়োজন, আবার অন্তর্জ্জগতের উন্নতি ও বহির্জ্জগতের উন্নতি পরস্পর, সাপেক্ষ, দীনহীন হৃতসর্ব্বস্ব অন্নচিন্তা পরায়ণ ব্যক্তি অধ্যাত্ম চিন্তার অবকাশই পায়না,—

বস্তু সাংসারিকী চিন্তা চিন্তা চিন্তামনেঃ কুতঃ
তত্রৈবচশিরঃকম্পঃ হৃশিরোমণিধারণং—

আবার অধ্যাত্ম চিন্তা বিহীন ধনলোলুপ দস্যু অকালে আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত করে। এখনকার টোলে যদিও সেই সর্ব্বোত্তম পরাবিদ্যারই আলোচনা হয় কিন্তু দুঃখের:বিষয় যে সেও শালগ্রামশিলা দিয়া বাটনা বাটার স্থায় অপরা বিদ্যার উদ্দেশ্যেই পরা বিদ্যার আলোচনা হয়। ইহাতে অধ্যাপকমণ্ডলীর বিশেষ দোষ দিতে পারিনা, কারণ,—"সর্ব্বংহন্তি বুভুক্ষয়া"—তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের একটি উপায় চাইত। পূর্ব্বে সেজন্য রাজকোষ উন্মুক্ত ছিল, বিধর্ম্মী রাজার অভ্যুদয়ে সমাজ সে ভার বহন করিতেন, এখন বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে সমাজ উহাকে ক্রমে অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য করিতেছেন গতিকেই দায়ে ঠেকিয়া অধ্যাপক মণ্ডলীও দুঃখের সহিত তাঁহাদের সেই সযত্ন রক্ষিত শালগ্রামশিলা দিয়া অশ্রুজলের সহিত বাটনা বাটিতে বাধ্য হইতেছেন। উহার প্রতিকার না হইলে শত সহস্র সভা সমিতিকর, বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত কর কিছুতেই কিছু হইবে না।

সংস্কৃতভাষায় অপরাবিদ্যার আলোচনা উঠিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেগিয়া কেহ কেহ বলেন যে উহা এখন নিষ্ফল সুতরাং অনাবশ্যক। কারণ, অপরা বিদ্যা অর্থকরী সংস্কৃত ভাষায় উহার আলোচনা করিলে কেহ চাকুরী দিবে না সুতরাং উহাতে ফল কি আছে? দাসীকন্যা কল্পনা করিতেছে—আমি যদি ভাগ্যক্রমে রাজরাণী হইতে পারি তাহ'লে আর পায়ে হেটে ঠাকুরবাড়ী বাসন মাজতে যেতে হবে না, তখন হয় হাতী চড়ে নয় পাল্কী চড়ে বাসন মাজ্‌তে যাব!! হায়রে কপাল! চাকুরী মাত্রৈকলক্ষ্য দাস জাতীর যোগ্য উক্তিই বটে! চাকুরীই কি একমাত্র অর্থ উপার্জ্জনের উপায়? আজকাল যাহারা ধন কুবের তাহাদের মধ্যে চাকুরীজীবি কয়জন? বলিতে পারেন সংস্কৃত ভাষায় শিল্পবিজ্ঞান রসায়নাদি শাস্ত্র কৈ? যাহার দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারে? আছে বৈ কি!

"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎ কচিৎ—

তবে অনেক যে লুপ্ত সুপ্ত গুপ্ত অবস্থায় আছে, তাহা নিশ্চয়, তাহারই উদ্ধার করিতে আমার এই করুণ ক্রন্দন, একটু চেষ্টা করিলে তাহার অনেক এখনও উদ্ধার করা যায়। কএক বর্ষ পূর্ব্বে পরম শ্রদ্ধাস্পদ ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্ত ভূষণ মহাশয় বঙ্গবাসী কাগজে ধারাবাহিকরূপে লুপ্ত রত্ন উদ্ধারশীর্ষক প্রবন্ধ বাহির করিতেন। উহাতে প্রচীনকালের উদ্ভিদ বিদ্যা শস্য শস্যাদিতে পান দেওয়ার বিষয় ইত্যাদি বাহির হইত। তদবধি উক্ত মহাত্মার সহিত আলাপ করিবার বাসনা বলবতী হয় এবং অচিরকাল মধ্যে আমার সে বাসনাও ফলবতী হয়। যে বৎসর কালীঘাটে ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন হয় সেই বৎসর আমি ৺কাশী-ধাম দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করি। তখন উক্ত সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় কাশীবাস করিতেছিলেন, আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আনন্দলাভ করিলাম। বস্তুতঃই তিনি - ঋষিকল্প বস্তুতঃই তিনি দিবারাত্রিতে তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। একদিকে যেমন কঠোর তপস্বী অন্যদিকে

তেমনই দেশহিতার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তাঁহার নিকট ঐ সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করায়; তিনি অতীব আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে তাহার আবিষ্কৃত সমস্ত তথ্যের যথাসম্ভব পরিচয় আমাকে দিলেন। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক "কোদার মা" নামক রেল ষ্টেশনের সন্নিহিত দুর্গম পাহাড়ের মধ্য হইতে গাছড়া সংগ্রহ করিয়া বাসনের পর কলাই করিবার উপাদান প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছেন। আরও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী নানাবর্ণের কার্পাস প্রস্তুত প্রণালী সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু অর্থাভাবে উহার পরীক্ষা করিতে না পারিয়া কোন ধনীর দ্বারে সাহায্য প্রার্থী হইলে, তিনি বলিলেন যে, আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ আপনার ওসব তথ্যে কাজ কি? (ধনীটি বোধ হয় রাতকাণা) তিনি তার উপযুক্ত উত্তর দিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন তাহার পর আর উক্ত মহাত্মার কোনই সংবাদ রাখিতাম না; সম্প্রতি ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকায় পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহার দর্শন পাইয়া সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় আনন্দানুভব করিলাম। এই প্রবন্ধগুলিতেও তাঁহার অনুসন্ধিৎসার প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞতার ও প্রাচীন পক্ষপাতিতার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাঁহার সম্বন্ধে আমার ধারণার সম্যক পরিচয় দিলে লোকে হয়ত আমাকে তাহার স্তাবক বিবেচনা করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি তাহাকে চিনিলেও খুবসম্ভব তিনি এখন আমাকে চিনেন না।

যাক্ সে কথা, আমি আশা করি তাহার দ্বারা প্রাচীন,শিল্পশাস্ত্রের অনেক আবিষ্কার হইতে পারে। কিন্তু এই সমুদয় পরীক্ষার জন্য বহু অর্থ ব্যয় প্রয়োজন, সে পক্ষে দেশের ধনীগণের সাহায্য প্রার্থনীয়।

ক্রমশঃ—

আচমনে পুনরালোচনা।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।)

দীর্ঘদিন হয়—সন্দেহ নিরসন মানসে "ব্রাহ্মণ-সমাজের" পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় "সন্ধ্যার সন্দেহ" প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের আহ্নিককৃত্যোক্ত আচমনা দ মন্ত্রের সমালোচনা করিয়াছিলাম। তদুত্তর দীর্ঘদিন পর তাঁহার আহ্নিক কৃত্যের ১৩শ সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সময়ে ঐ ব্রাহ্মণসমাজের ১০ম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় লিখিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয়ের "পৌরহিত্য ও মন্ত্র" প্রবন্ধে তদালোচনা দর্শন করিয়া উপকৃত এবং তিনিও তৎ সংশোধনে ব্রতী হইয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। বর্ত্তমান শেষ সংস্করণের সংশোধিত আহ্নিককৃত্য সন্নিবিষ্ট কবিরত্ন মহাশয়ের উত্তর এবং পুস্তক দেখিয়া তর্কনিধি মহাশয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সাহায্য পাইবেন বলিয়া

বোধ হয়। বৈদিক পুস্তকের অভাবে আমি সম্যগালোচনায় সুযোগ পাইতেছি না বটে তথাপি এ সামান্ত আলোচনায় তাঁহাদের কার্য্যের যথাকথঞ্চিৎ সাহায্য সম্ভাবনা হইলে সুখী হইব। দীর্ঘ দিন পুস্তকের অপ্রকাশ, অভাব এবং বেদের পঠন পাঠনের অব্যবস্থা হেতু মন্ত্রে প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। চিরাচরিত অভ্যাসের পরিবর্ত্তনে আপত্তিও অস্বাভাবিক নহে। সংস্কারক মহাশয়দের পুস্তকের পরিবর্ত্তন এবং মতভেদ মুহুর্মুহু ঘটিতেছে দেখিয়া (ঘটিবারই কথা) সে চিরাভ্যাস বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেও পারে। সুতরাং তজ্জন্য প্রতিবাদকারিদের কথায় বিরক্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ হইলেও বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করাই উচিত। বেদের কোন এক শাখার পাঠ দেখিয়াই শাখাভেদে মন্ত্র ভেদের বিবেচনা না করিয়া আমাদের চিরাচরিত পাঠকে (যে পাঠ অসঙ্গত নহে) হঠাৎ অশ্রদ্ধার সহিত উঠাইয়া দিতে সাহস করিলে ভবিষ্যৎ অশ্রদ্ধার ভাজন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সুতরাং তৎ স্থলে পণ্ডিত সমাজকে আলোচনার অবসর দেওয়াই উচিত। নিজের প্রমাদ অবগত হইয়াও প্রমাদ বাক্যকে যশঃ আকাঙ্খায় এ দুর্দ্দিনেও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিতর্ক দ্বারা বাদী নিরাসে প্রয়াস পাওয়া সঙ্গত নহে। কবিরত্ন মহাশয়ের প্রতিবাদ, গ্রন্থের সহিত প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণসমাজাদিতে প্রকাশ পাইলে অনেকেরই আলোচনার সুবিধা হইত, যথাসম্ভব বিশুদ্ধ পুস্তক প্রকাশ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার পুস্তকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাও রহিয়াছে, তথাপি আমাদের বিশ্বাস সত্বেও স্বকপোল কল্পিত পাঠ না হইলেও তিনি অভ্রান্ত নহেন ইহা মনে রাখিয়া সত্যানুসন্ধানে যত্নবান থাকা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। তাঁহার প্রতি আমাদের যেরূপ শ্রদ্ধা তাহাতে আমরা যদি তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া যে পাঠ বিরুদ্ধ বা অসঙ্গত নহে তাদৃশ চিরাচরিত অভ্যাসের উচ্ছেদপূর্ব্বক প্রমাদে নিপতিত হই, তাহা হইলে হয়ত তৎপাপ তাঁহাকেও স্পর্শ করিবে।" প্রয়োজিতা অনুমন্তা কর্ত্তাচেতি সর্ব্বে স্বর্গ নরকফল ভোক্তারঃ সুতরাং তাহা মনে রাখিয়া সতর্কতা নেওয়া সুসঙ্গত।

প্রাতরাচমন মন্ত্রে রাত্র্যা আকর্ষং পাঠ করিলে এবং স্বাহা শব্দ প্রকৃতি ছন্দের অন্তর্গত না হইলে ৮২ অক্ষর হয়। সুতরাং প্রকৃতিচ্ছন্দে ৮৪ অক্ষর হইবে বলিয়া ছন্দোভঙ্গ জন্য "ইয়াদি পূরণ" এই পিঙ্গল সূত্রের নির্দ্দেশানুসারে যদি পাদপূরণ পূর্ব্বক "রাত্রিয়া" অকারিষং পাঠ বিহিত বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলে "গায়ত্র্যা বসবঃ" এইসূত্র নির্দ্দিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ভঙ্গ হয় বলিয়া গায়ত্রী মন্ত্রে "বরেণ্যং" স্থলে ইয়াদি সূত্রে বরেণিয়ং বলিবার আদেশ থাকিলেও বরেণিয়ং বলিতে হইবে কি না। সন্ধ্যায় সন্দেহ প্রবন্ধে কবিরত্ন মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তদুত্তর ১৩শ সংস্করণের আহ্নিককৃত্যে প্রতিবাদ প্রবন্ধের কোনে লিখিয়াছেন বরেণিয়ং পড়িতে হয়। কিন্তু মন্ত্রে বরেণ্যংই লিখিয়াছেন।" শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্যও বরেণিয়ং লিখিতে সাহস পান নাই। অকারিষং উচ্চারণ করিতে হয় মনে করিয়া আকার্ষং পাঠ সত্বেও শিক্ষার সুবিধার জন্য অকারিষং লিখিতে সাহস পাইলেন কিন্তু বরেণিয়ং লিখিতে ঠেকিলেন কেন? ইহা কি চিত্তের দুর্ব্বলতা? যদি বেদে গায়ত্রী মন্ত্রে

বরেণিয়ং এইরূপ পদ দৃষ্ট না হয়, তাহাহইলেও বরেণিয়ং বলিতে হইবে? "ইয়াদি পূরণ" ইত্যঃ কেবল বরেণিয়ং প্রয়োগ উপদিষ্ট হইয়াছে, উহা কেবল গান বিষয়ে উচ্চারণীয় কিনা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। বাস্তবিক গানের প্রকার নির্দ্দেশেই ঐরূপ উচ্চারণীয় উপদেশ পাওয়া যায়। গানেই মন্ত্রোচ্চারণের বৈষম্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। বহুগ্রন্থে গায়ত্রীর উল্লেখ আছে, বহুপ্রকার গায়ত্রী ব্যাখ্যাও দৃষ্ট হয় কিন্তু কুত্রাপি বরেণিয়ং বলিবার আভাস পাওয়া যায় না, পিঙ্গলাচার্য্য ইয়াদি পূরণ বলিয়া যে কার্য্য অতি সংক্ষেপে সমাধান করিয়াছেন "কাতন্ত্র ছন্দঃ প্রক্রিয়া নামক বৈদিক ব্যাকরণে বহু সূত্রদ্বারা প্রয়োগানুসারে বহু প্রকার আদেশের উল্লেখপূর্ব্বক তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তরূপে "তাজাদয়ারিয়া ডিয়া ডে ডাড্যায়েন্তে (২৫) বহুলং তম্বাদিষু (৭১) "ক্ষুদৃমৃ রুহিভ্যোঽনদ্যতন্যাং বা (১৮) ইত্যাদি সূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত "সূত্রে ইত্যেতে আদেশা বহুলং ভবন্তি" বলা হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্রই গায়ত্র্যা স্থলে গায়ত্রিয়া রাত্র্যা স্থলে রাত্রিয়া তম্বং স্থলে তনুবং হইবে না। তাদৃশ প্রয়োগ দেখিয়া য ব ইয় উব ইত্যাদি আদেশ দ্বারা তাহার সমাধান করিতে হইবে। এই জন্যই "বহুলং" বলা হইয়াছে, প্রয়োগ দেখিয়া তৎসাধন জন্যই ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যথা সর্ব্বত্র "ইয়াদি পূরণ" দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধির কল্পনা হইলে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও "রাত্র্যা" "আকর্ষং পাঠেরই নির্দ্দেশ থাকিত। "বহুলঃ তম্বাদিষু" সূত্রে বেদ ও শাখাভেদে ইয়াদি পূরণের প্রভেদের দৃষ্টান্ত বহু প্রকারে অর্থাৎ প্রয়োগানুসারে কোন স্থলে য ব কোন স্থলে ইয়্ উব্ আদেশ উল্লিখিত হইয়াছে যথা "তম্বং পুষেম তনুবং পুষেম স্বর্গো লোকঃ সুবর্গো লোকঃ [কাং] "ত্র্যম্বকং যজামহে" [ঋ ৭।৫৯।১২] "ত্রিয়ম্বকং যজামহে" [মাং ৩।৬] ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে" ত্র্যম্বকমন্ত্রের অনুষ্টুপ ছন্দঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম পাদে ৭ অক্ষর হইলেও মাধ্যন্দিনী শাখায় ইয় পূরণ দ্বারায় ছন্দঃ পূর্ণ হইতেছে। কিন্তু ঋগ্বেদে য আদেশের ব্যবস্থা করায় তাহা অপূর্ণই থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং বেদে বরেণ্যং পাঠ থাকিলেও সর্ব্বত্র বরেণিয়ং বলিতে হইবে—কবিরত্ন মহাশয়ের এক কল্পিত আদেশ অতি সাহসের পরিচয় প্রদান করিতেছে। সর্ব্বত্রই য স্থানে ইয় উচ্চারণের নিয়ম থাকিলে "ময়াপত্যা জরদষ্টি" স্থলে পতিয়া বলিতে ব্যাকরণকারের আপত্তি উত্থাপিত হইত না। এবং বিভিন্নরূপে য ব ইয় উব আদেশের ব্যবস্থা নিষ্প্রয়োজন হইত। যদি সর্ব্বত্র বরেণিয়ং উচ্চারণই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে পুরুষ পরম্পরা আচার্য্যগণ শিষ্যকে "বরেণ্যং" উচ্চারণে উপদেশ করিতেছেন কেন? শ্রুতিপাদের সার্থকতা এখন পর্য্যন্ত গায়ত্রীতেই দেখা যায়। ইহাতেও কি আচার্য্যগণের প্রমাদ ঘটিয়াছে বলিয়া কবিরত্ন মহাশয় মনে করেন। গায়ত্রীতন্ত্রে বরেণ্যং পদোল্লেখেই গায়ত্রীর উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষ তদ্‌গ্রন্থে গায়ত্রী মন্ত্র যেরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; বর্ণবিশ্লেষণাদিদ্বারা তাহার অন্যথা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যথা—

"নচাত্র বর্ণবিশ্লেষং নচ বা পদদূষণং।
নাত্র সন্ধির্ন্নহেশানি ন চাত্র শ্লোকযোজনা॥ ৪ পটল ৭২

কেবল গায়ত্রী কেন, অন্যত্রও প্রাপ্ত মন্ত্রের অন্যথা করা নিষেধ হইয়াছে যথা—গায়ত্রী তন্ত্রে—

"সর্ব্ব মন্ত্রেষু বিদ্যাসু নাস্তি বৈ পদ দূষণং
পদানাং সাধনং কৃত্বা গায়ত্রীং প্রজপেদ্যদি
ব্রহ্ম বিদ্যাচ গায়ত্রী সহসা কৃত্রিমা ভবেৎ ॥ ৭৭

বরেণ্যং শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যোগি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্ম সংসার ভীরুভিঃ।" ১৪

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

"আদৌ তৎসবিতুঃ পশ্চাদ্ বরেণ্যং পদমুচ্চরেৎ" গায়ত্রী কবচে ও হৃদয়ে—"বরেণ্যং কটিদেশেতু" কিং বরেণ্যং? সবিতাদিত্যোরং বৈ বরেণ্যং॥ সর্ব্বত্র বরেণ্যং পদ দুষ্ট হইলেও চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা বৈ গায়ত্রী।" "চতুর্ব্বিংশত্যথৈতানি গায়ত্র্যা অক্ষরানিতু।" যোগি যাজ্ঞবল্ক্য। ইত্যাদি বহু প্রমাণে গয়াত্রীর ২৪ অক্ষর প্রমাণিত হইয়াছে। ঐ ২৪ অক্ষরের বিভাগ ন্যাস কবচাদিতে বর্ণ বিশ্লেষ দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রতি অক্ষর দ্বারা গায়ত্রী ন্যাস ও প্রত্যেক অক্ষরের ধ্যান ও দেবতা গায়ত্রী তন্ত্রে মহাদেব বলিতেছেন—

"রে কারং গুহ্য দেশে চ ণ কারং বৃষণেন্ন্যসেৎ।
"যং কারং কটিদেশেচ ওকারং নাভিমণ্ডলে।"
"রেকারং বহ্নিসঙ্কাশং ণকারমতি নির্ম্মলং
যং কারং তড়িদাকারং ওকারং কৃষ্ণ মেবচ ॥ ২১
রেকারং ষচতত্ত্বঞ্চ ষচ সিদ্ধিপ্রদায়কং
ণকারং প্রাণ তত্ত্বঞ্চ প্রাণ সিদ্ধি প্রদায়কং
বায়ু বীজং ততো তন্ত্রে বিন্দুনা সহিতং প্রিয়ে ॥"২২

এ সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বর্ণবিশ্লেষণে বরেণয়ং বুঝাইতেছে। অন্যত্র আগম সন্দর্ভেও গায়ত্রী কবচ দ্বারা ঐরূপ অক্ষর বিভাগ প্রতীতি হয় যথা—

"ওঁ ণ ওঁ পাতু মে অক্ষং সর্ব্বতত্ত্বৈক কারণং
ওঁ যং ওঁ পাতু মে শ্রোত্রং শ্রবণস্যচ কারণং॥"

কবিরত্ন মহাশয় আহ্নিক কৃত্যে যে গায়ত্রী কবচ লিখিয়াছেন, তাহাতে বরেণিয়ং পদেরই অক্ষর বিভাগে মাহাত্ম্য বলা হইয়াছে। ঐ পাঠ পিঙ্গল বাক্যানুসারে সংশোধিত কিনা তিনিই জানেন যথা—

"ণিকারং ওষ্ঠ দেশেতু অধরে যং প্রকল্পয়েৎ।

এখন ঐপ্রকার অক্ষর বিভাগ দেখিয়া অসংযোগরূপে "বরেণ্যং" "বরেণিয়ং" কিংবা আমাদের চিরপ্রচলিত প্রমাণপঞ্জ বরেণ্যং পদের উচ্চারণ করিতে হইবে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন। ঐ প্রকারে অনুষ্টুপের ২৪ অক্ষরের বিভাগ করিয়া তাহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হইয়াছে মাত্র; বাস্তবিক গান ভিন্ন অন্যত্র বরেণ্যংই উচ্চারণ করিতে হইবে এ সিদ্ধান্ত সমীচীন

বলিলে তদ্রূপ অদ্যাবও বেদ বা শাখা ভেদে কদাচিৎ ছন্দোভঙ্গ দোষ স্বীকার্য্য বলিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত সূত্রানুসারে এক মন্ত্রেরই শাখা ভেদে ব ইয় ব উব্‌ ইত্যাদি আদেশ ভেদে তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে। অক্ষর ন্যূন জন্য ছন্দোভঙ্গে স্বর বিশেষের আবির্ভাবের দ্বারা ছন্দোরক্ষার বিধান আছে কি না জানি না।

গায়ত্রী সম্বন্ধে সমীচীন সিদ্ধান্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দের নিকট সবিনয় প্রার্থনা করিতেছি। গায়ত্রী সম্বন্ধে এ প্রমাদ বা সংশয় বাস্তবিকই গভীর দুঃখজনক সন্দেহ নাই।

আচমন মন্ত্রের আলোচনা করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে গায়ত্রীর আলোচনায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিয়া পুনঃ প্রকৃত বিষয়ের আলোচনায় মনোনিবেশ করিলে সুখী হইব। কবিরত্ন মহাশয় লিখিতেছেন "সূর্য্যশ্চ হইতে জুহোমি পর্য্যন্তই মন্ত্র ......কোনও কোনও গ্রন্থে "রাত্র্যা" "অকার্ষং" লিখা থাকিলেও "রাত্রিয়া" "অকারিষং" পড়িতে হইবে। সন্ধ্যাপদ্ধতিকারগণ পরশাখানুসারেই স্বমন্ত্রক আচমন লিখিয়াছেন। এই জন্যই সর্ব্ব বেদীয় পদ্ধতিতেই একরূপ পাঠ দেখা যায়" ইত্যাদি। পদ্ধতিতে দেখিতেছি স্বাহা পর্য্যন্তই মন্ত্র। ঋগ্বেদী সন্ধ্যায় আচমন মন্ত্রে তিনিই লিখিতেছেন—"ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহেত্যন্তস্য দশাক্ষর পদাভ্যামুপেতা বিরাট ছন্দঃ" ইত্যাদি। স্বাহা শব্দ মন্ত্রের অন্তর্গত হইলেই চিরাচরিত "রত্র্যা" "অকার্ষং" পাঠ আচরণে রাখিয়া প্রাতঃ সায়ং আচমন মন্ত্রের প্রকৃতি ছন্দঃ অর্থাৎ ৮৪ অক্ষরের সম্ভব হইতেপারে, অন্যথা স্বাহাশব্দ মন্ত্রান্তর্গত নাহইলে এবং "রাত্রিয়া" 'অকারিষং' পাঠ করিতে হইলে, প্রাতর্ম্মন্ত্রে ৮৪ অক্ষর হয় বটে, কিন্তু সায়ং মন্ত্রে "বদহ্না অকারিষং" বলিলে ৮৩ অক্ষর হওয়ায় প্রকৃতি ছন্দঃ ভঙ্গ হয়, "যদ্রাত্রিয়েত্যারভ্য মরীতান্তস্য পঞ্চপদা পঙ্ক্তিঃ তিনিই ২৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন। পংক্তি ছন্দে ৪০ অক্ষর হইবে। পঞ্চপদা পংক্তির প্রমাণ ব্রাহ্মণসমাজের ১০ম বর্ষের ৩য় সংখ্যায় তর্কনিধি মহাশয় দেখাইয়াছেন। পিঙ্গল সূত্রেরমতে উহাকে পথ্যাপংক্তি বলা যাইতে পারে। যথা "পঞ্চভিরষ্টাক্ষরৈঃ পাদৈঃ পথ্যানাম পংক্তির্ভবতি" আহ্নিক চন্দ্রিকায় প্রাতরাচমন মন্ত্র ঐ প্রণালীতেই লিখিত হইয়াছে যথা—"যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং। মনসা বাচা হস্তাভ্যাং। পদ্ভ্যা মুদরেণ শিশ্না। রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎকিঞ্চ দুরিতং ময়ি," গণনা করিয়া দেখুন ৪০ অক্ষর। কিন্তু কবিরত্ন মহাশয় পংক্তিছন্দের হিসাব দিয়া "রাত্রিয়া" অকারিষং লিখিতেছেন, অক্ষর ৪২ হইতেছে।

"জুহোমি বলাতেই স্বাহা বলিয়া জলপান করিতে হয়, কিন্তু স্বাহা মন্ত্রান্তর্গত নহে।" এ উক্তির প্রমাণ কি? কোনও কোনও গ্রন্থে রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ থাকিলেও কুত্রাপি রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ উচ্চারণীয় নহে। কিন্তু কোন গ্রন্থে রাত্রিয়া অকারিষং থাকায় সর্ব্বত্রই রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ সত্বেও রাত্রিয়া অকারিষং বলিতে হইবে। ইহারই বা বিনিগমনা কি? শাখা বিশেষের বিহিত মন্ত্র এবং চিরাভ্যাসের উচ্ছেদ হইলেও ছন্দোরক্ষাই যদি উহার হেতু হয় তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্তি অনুসারেই উহা নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

রাত্র্যা, অকার্ষং এবং যাহা মন্ত্রান্তর্গত হইলেই বরং সর্ব্বত্র ছন্দো রক্ষা, প্রায় সর্ব্বত্র তুল্য পাঠ, প্রায় সর্ব্বত্র সকলের অভ্যস্ত পাঠ রক্ষিত হইতে পারে। তিনি আহ্নিকের ২৪ পৃষ্ঠায় উত্তর দিতে যাইয়া আশ্বলায়ন গৃহ্য পরিশিষ্ট হইতে ঐরূপ মন্ত্রই লিখিয়াছেন, কিন্তু পদ্ধতিতে "রাত্রিয়া" "অকারিষং" লিখিয়া ঋগ্বেদীয় দিগকেও তাহাদেরই গৃহ্য ধৃত মন্ত্র পাঠ উপেক্ষা করিয়া ছন্দো ভঙ্গ হইলেও যজুর্ব্বেদীয় আরণ্যকের মন্ত্রানুরূপ পাঠ করিতে বলিতেছেন। আরণ্যকের প্রতি এ ভক্তির হেতু কি খুঁজিয়া পাইতেছি না। তিনিই আহ্নিকের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন "বেদ ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া গোভিলাদি মহর্ষিগণ গৃহ্য সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন"। ঐ গৃহ্যকার ঋষি আমাদের মত প্রমাদে না পড়িয়া ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এবং অবিহিত স্থলে অন্য শাখা হইতেও শাস্ত্রসম্মত মন্ত্রেরই উদ্ধার করিয়া থাকিবেন, কখনও বিহিত মন্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। যেহেতু স্বশাখায় অবিহিত মন্ত্রাদিই অবিরোধি পরশাখা হইতে গ্রহণ করিবার শাস্ত্র রহিয়াছে। কিন্তু স্বশাখোক্ত মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে কাত্যায়ন তারস্বরে নিষেধ করিতেছেন। যথা—

স্বশাখাশ্রয় মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ন্তু যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্মেধা মোঘং তস্যতু যৎ কৃতং॥

সুতরাং স্বগৃহ্যোক্ত মন্ত্র পাঠ উপেক্ষা করিয়া আরণ্যকাশ্রয় গ্রহণের উপদেশ কি দূষনীয় নহে? কবিরত্ন মহাশয় কি ঋগ্বেদ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ মন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। সুতরাং গৃহ্যকার আরণ্যক হইতে ঐ মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। সত্য হইলেও "রাত্রিয়া অকারিষং পাঠ গ্রহণ না করিয়া রাত্র্যা অকার্ষং" লিখিয়া বিকৃতি করিলেন কেন? লেখকের প্রমাদ হইয়া থাকিলে আরণ্যকেও সে আশঙ্কা হয় না কেন? যদি সমস্তবেদ না দেখিয়া থাকেন তাহা হইলে গৃহ্যকারের ধৃত পাঠ উপেক্ষা করিয়া, কাত্যায়নের বাধা না মানিয়া, আরণ্যকোক্ত পাঠ সমাদরে সকল বেদে গ্রহণ করিবার উপদেশ দান কি অতি সাহসের পরিচয় নয়? শাখা বা বেদ ভেদে মন্ত্রভেদের অনুসন্ধান না নিয়া, কোন এক শাখার অবিহিত পাঠ দেখিয়াই বৈষম্য হেতু আমাদের সকলেরই অভ্যস্ত পাঠ প্রমাদপূর্ণ বলিয়া কবিরত্ন মহাশয়ের ধারণা, সত্য বলিয়া মনেকরিলে দেখুন—ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যামন্ত্রের ব্যাখ্যাকার ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কি রকম মোহে পড়িয়াছেন। তাঁহার লিখা দেখিয়া বোধ হইতেছে তিনি আরণ্যকও দেখিয়াছিলেন কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তথাপি তাঁহার মোহ ভাঙ্গে নাই। আমাদের অভ্যস্তানুরূপ পাঠেরই সমর্থন করিতেছেন, যথা—"সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তা মিত্যন্ত মন্ত্রস্য চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরাত্মক গায়ত্রীছন্দঃ। যদ্রাত্র্যা ইত্যারভ্যমর্ষীত্যন্ত মন্ত্রস্য পঞ্চপদাত্মক পঙ্‌ক্তিছন্দঃ ইদমহমিত্যারভ্যাম্বাহেত্যন্ত মন্ত্রস্য দশাক্ষর পাদত্র্যোমুপেত বিংশত্যক্ষরাত্মক বিরাট ছন্দঃ। তথাচ আপস্তম্বসংহিতো সূর্য্যমন্যু মন্যুপতয়ো রাত্রিশ্চ দেবতা গায়ত্রী পঙ্‌ক্তি বিরাটছন্দাংসি আচমনে বিনিয়োগঃ। সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ ইত্যাদি। গৃহ্যপরিশিষ্টঞ্চ। ঋগ্বেদিপ্রয়োগ বক্তা চতুর্ব্বিংশতি প্রভৃতি ব্যাখ্যাতা দাক্ষিণাত্য সংগ্রহকারের অভিপ্রায়ও ব্যাখ্যাকর্ত্তা উদ্ধার করিয়া প্রমাণ

করিয়াছেন যথা—সূর্য্যশ্চেতি মন্ত্রস্য যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদৃষিঃ সূর্য্যমন্যুমন্যুপতয়ো রাত্রিশ্চ দেবতা গায়ত্রী পংক্তি বিরাট্ ছন্দাংসি রক্ষস্তা মিতাত্মা গায়ত্রী দুরিতং মন্ত্রীভাত্মা পংক্তি সাবেত্তাত্মা দশাক্ষর পদদ্বয়োপেতা বিরাট্।" "মন্ত্রার্থস্ত—অতীতয়া রাত্র্যা তস্যাং রাত্র্যৌ যৎপাপ মকার্ষং কৃতবানস্মি। অকার্ষমিতি লৌকিকঃ। অকারিষমিতি বৈদিকঃ ছন্দোঽনুরোধাৎ লৌকিকস্যাপি গ্রহণং। ...অহস্তদবলুম্পতু অহরভিমানী দেবো বিনাশয়তু। তৈত্তিরীয়োপনিষদি আরণ্যক পঞ্চবিংশানুবাকীয় শ্রুতৌ গৃহ্য পরিশিষ্টে চ—"সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চেত্যাদি মন্ত্রে রাত্রিস্তদবলুম্পতু ইত্যেব দৃশ্যতে। পরন্তু আপস্তম্বেন রাত্রের্দ্দেবতাত্বস্বীকারাৎ পরিশিষ্টে অগ্নিশ্চেতি মন্ত্রে রাত্রিরহ ইত্যুপদেশাচ্চ রাত্রিস্তদবলুম্পতু ইত্যেব পাঠো যুক্ততরঃ প্রতিভাতি।" জুহোমি প্রক্ষিপামি অহমনেন তৎসর্ব্বং ভস্মী করোমি ইত্যর্থঃ। তদর্থমিদমতি মন্ত্রিতং জলং স্বাহা মদীয় বক্ত্রাগ্নৌ স্বাহুতমস্তু।"

দেখুন ব্যাখ্যাকর্ত্তাও স্বাহা মন্ত্রান্তর্গত বলিতেছেন। অথচ তাহার ব্যাখ্যাও করিতেছেন। প্রতিছন্দের অক্ষর সংখ্যা নির্দ্দেশ এবং স্পষ্টোল্লেখ দ্বারা রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ করিতে বলিতেছেন। ছন্দোঽনুরোধে বৈদিক অকারিষং পাঠ না করিয়া লৌকিক অকার্ষং পাঠ করিতে উপদেশ করিতেছেন। অথচ তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়াও গৃহ্যকারের ধৃত পাঠ উপেক্ষা করিয়া রাত্রিয়া অকারিষং পাঠ লিখিতে সাহসী হইতেছেন না। আশ্চর্য্য! এইরূপ পাঠ আছে বলিয়াও কটাক্ষ করিলেন না। হলায়ুধও ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ লিখিয়া তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

এ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া এখন মনে হইতেছে অন্ততঃ কাণ্বশাখি বাজসনেয়ীদের "ইদমহ মাপোঽমৃতযোনৌ" এইরূপ হলায়ুধ সম্মত পাঠই করা সঙ্গত। ব্যাখ্যাকারগণ ইদং শব্দের ব্যাখ্যা "আপঃ করিয়াছিলেন তাহাই প্রমাদবশতঃ মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছে।" এইরূপ কল্পনার অবসর হলায়ুধ হইতে পাওয়া যায় না। "আপ ইতি। তথা সর্ব্বমাপোময়ং জগদিতি সকারান্ত আপঃ শব্দঃ তত্তায়মর্থঃ।" ইত্যাদি তল্লিখিত ব্যাখ্যাদ্বারা তাদৃশ কল্পনার আবির্ভাব হইতে পারে কি? অন্যত্রও দেখা যায় "আপঃ শব্দঃ সান্তঃ কর্ম্মপরশ্চ তদিদং আপঃ অহং জুহোমি।" হলায়ুধ কাণ্বশাখিদের বৈদিক গ্রন্থ না দেখিয়াই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বাজসনেয়ীদের সমস্ত বৈদিক গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও ঐ কল্পনায় উপনীত হইতে সাহস হয় না। তৈত্তিরীয় শাখিদের পুস্তকে অন্যরূপ পাঠ দেখিয়াই কাণ্বশাখিদের ব্যাখ্যাতা মন্ত্রব্যাখ্যাতা হলায়ুধের ব্যাখ্যাসহ ধৃত পাঠকে উপেক্ষা করা এবং কাণ্বশাখিদের অভ্যস্ত পাঠের উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হওয়া কি সঙ্গত? আশ্বলায়ন গৃহ্যে এবং ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে যখন আচমন মন্ত্রে ব্যাখ্যাসহ রাত্র্যা অকার্ষং পাঠ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে এবং উহারা বেদ দেখিয়া ব্যাখ্যাও গৃহ্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে আরণ্যকে, এবং নারায়ণোপনিষত্তিন্ন অন্যত্র ঐ মন্ত্র নাই বলিয়া দম্ভ করা কি চলে? সমস্ত শাখার সমুদয় গ্রন্থ না পাওয়া বা না দেখাও উহার কারণ হইতে পারে। বৌদ্ধযুগে ধর্ম্মগ্রন্থ অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা ভোজরাজ

কায়ধেয়গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞ পাঠক! ঐ সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান দিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। প্রতি শাখার পুস্তক না দেখিয়া একদেশদর্শী হইয়া কল্পনায় হাত দিবেন না। কবিরত্ন মহাশয়ের পুস্তকে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া চিরভ্যস্ত পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করিতেও ত্রুটী করি নাই কিন্তু এ সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে কবিরত্ন মহাশয় ঋষি নন। সুতরাং তাহার কল্পনায় প্রমাদ হইতে পারে। অতএব যাহা ছিল তাহার কথায় তাহা সহসা পরিত্যাজ্য নহে। হতাশ হইয়া আবার কোন কোন স্থলে পূর্ব্বাভ্যস্ত পাঠকেই সমাদরে গ্রহণ করিতে হইতেছে। বাস্তবিক "পরীক্ষকানামপি সহসা প্রাচামাচারস্য দুরাচারোক্তির্ন যুক্তা, কিন্তু তৈরপি চিরন্তনস্যানুগমায় যতিতব্যং।" এই মহাজন বাক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংশোধনে যত্নবান হওয়া উচিত। আরণ্যকে রাত্রিয়া অকারিষং পাঠ থাকিলে তৎশাখিদের সম্বন্ধেই তাদৃশ পাঠ প্রথমতঃ বলা উচিত। যেমন বেদ ভেদে "ত্র্যম্বকং" "ত্রিয়ম্বকং" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদেরই পাঠ্য স্বাম্‌ং প্রাতর্মন্ত্রের ছন্দ সম্বন্ধেও অনুরূপ সমাধান করিতে হইবে। অন্যত্র অবিহিত মনে করিয়া তাদৃশ মন্ত্র গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তত্তৎ শাখার পুস্তক বিশেষরূপে দেখিয়া এবং তৎ সম্বন্ধীয় অন্যান্য পুস্তক আলোচনাও ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠান নিরত পণ্ডিত গণের আচরণ অবগত হইয়া সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন মনে হইতেছে।

উপসংহারে আচমন সম্বন্ধে আরও ২।১টী কথা বলিয়া শেষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

কবিরত্ন মহাশয় আচমন জলপানে লিখিতেছেন "...মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক একবার জলপান করিয়া বিনামন্ত্রে আরও দুইবার জলপান করিতে হইবে।" টিপ্পনীতে যুক্তি দিতেছেন "এখানে তিনবার জলপানে একবার আচমন হয় বলিয়া মন্ত্রও একবারই পাঠ্য" ইত্যাদি। কর্ম্মাবৃত্তৌ মন্ত্রাবৃত্তিঃ শাস্ত্র থাকিলেও কর্ম্মের একত্ব নিবন্ধন মন্ত্রাবৃত্তি হইবে না।" দৃষ্টান্তরূপ বরাহণে "সকৃন্মন্ত্রেণ দ্বিস্তূষ্ণীং" এই গোভিল ভাষ্যের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

আমরা কিন্তু বারত্রয় জলপানে বারত্রয়ই মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকি। শিষ্টগণের ব্যবহারও প্রায় তাহাই দেখিতেছি। বারত্রয় জলপান এক আচমনের শাস্ত্রেরমত, প্রতি জলপানের আচমনত্বও শাস্ত্রে বহু দৃষ্ট হইতেছে। বারত্রয় জলপানের শাস্ত্রযুক্তিও দুর্লভ নহে। সুতরাং আচমন বা জলপানাবৃত্তিতে মন্ত্রাবৃত্তিও শাস্ত্রানুসারেই হইতে পারে। ক্রমশঃ তাহার যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

প্রতিপানের আচমনত্বে প্রমাণ যথা—

"হৃদ্গতাভিরশব্দাভি স্ত্রি চতুর্ব্বাদ্ভিরাচমেৎ।"—প্রচেতা
"চতুর্ব্বেতি ভাবশুদ্ধ্যাপেক্ষয়া বিকল্পঃ।"—(রঘুনন্দন)
"ত্রিরাচামেৎত্রিঃপ্রমৃজীত পাদাবভ্যুক্ষ্য শিরোঽভ্যুক্ষেৎ।"—(গোভিল)
"ত্রিঃ পিবেদম্বুবীক্ষিতং।"—(দক্ষ
"ত্রিরপো হার্দ্দীশ্চ পিবেৎ।"
"বার মজ্জন মাত্রাস্তু সংগৃহ্য ত্রিঃ পিবেদপঃ।"—ভরদ্বাজ। ইত্যাদি।

তিনবার আচমন্ করিবে বলাতে প্রতিজলপানের আচমনত্বই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। ‘সূর্য্যশ্চেত্যনুবাক্যেন প্রাতঃকালে পিবেদপঃ।” ইত্যাদি বচন দ্বারা আচমন বা জলপান মাত্র প্রতীতি হইতেছে, ১ বা ৩ বার জলপান, স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে না। আশ্বলায়ন এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মতীর্থেন হৃদয় প্রাপি ত্রিঃপীত্বা পাণিং প্রক্ষাল্য—” ইত্যাদি লিখিয়া বারত্রয় জলপানের ব্যবস্থা করিতেছেন। কোন কোন সন্ধ্যাবিধিতে ইতি মন্ত্রেণ জল গণ্ডুষএয়ং :পীত্বা যথা.বধি আচমনং কুর্য্যাৎ বলিয়া সমন্ত্রক তিনবার জলপান করিতে বলিতেছেন। পুনরাচমন প্রমাণ শূন্ত নহে। আশ্বলায়ন তাদৃশ সমন্ত্রক আচমনের পর পুনরাচমনের বিধান করিয়াছেন। একবার জলপানের আচমনত্ব যদি শাস্ত্রবিহিত হয় তাহা হইলে তিনবার আচমনের শাস্ত্র আছে বলিয়া তাদৃশ আচমন কর্ম্মের আবৃত্তিতে “কর্ম্মাবৃত্তৌ মন্ত্রাবৃত্তিঃ” শাস্ত্রানুসারে সমন্ত্রক বারত্রয় আচমন হইবে না কেন বুঝিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা একবার জলপানও আচমন নামে অভিহিত বলিয়া প্রতীতি হওয়ায় অমন্ত্রক দুইবার আচমন ব্যতিরেকেও সমন্ত্রক একবার জল পান বা আচমন বুঝাইতে পারে, এইরূপ ব্যবহারও আছে। সুতরাং “ভাবগুহ্যাপেক্ষয়া বিকল্পঃ” এই স্মার্ত্ত সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া সমন্ত্রক বারত্রয় আচমনের মীমাংসা করা যাইতে পারে। পারস্কর গৃহ্যের বিবাহ প্রকরণে আচমন প্রসঙ্গে ভাষ্যকার হরিহর কিন্তু সমন্ত্রক একবার জলপানের বিধান করিয়াছেন। দ্বিস্তূষ্ণীং লিখেন নাই, যথা আমাগন্ যশসেত্যনেন মন্ত্রেণ.চামতি সকৃৎ প্রাশ্নাতি জলং ততঃ স্মার্ত্তমাচমনংকরোতি মধুপর্ক প্রাশনের পরও আচমনং সকৃন্মন্ত্রেণ ততঃ ক্রিয়াচম্য এবং সর্ব্বত্র স্মার্ত্তমাচমনং কৃত্বা ইত্যাদি লিখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া “একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থো বাধকং বিনা অন্যত্রাপি তথা কল্প্যতে” এই নিয়মের অনুসরণ করিলে সমন্ত্রক একবার জলপান মাত্রই প্রতীতি হয়। দ্বিস্তূষ্ণীং বলিয়া অমন্ত্রক বারদ্বয় আচমনের আশঙ্কাই হয় না। ভাষ্যকারদের এই মত ভেদ স্থলে গোভিল ভাষ্যের দ্বিস্তূষ্ণীং লিখার প্রতি আচমনের একত্ব ভিন্ন বিশেষ কোন যুক্তি বা প্রমাণ না থাকায় তন্মতই অবলম্বনীয় কিনা বিবেচ্য। অথবা গোভিলানুযায়ি সামবেদীয়গণই তন্মত অবলম্বন করিতে পারেন। যুক্তি এবং পারস্কর ভাষ্য বিরুদ্ধ বলিয়া সকলের তন্মত আচরণ সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে অন্ততঃ ভাবগুহ্যাপেক্ষায় বারত্রয়ানুষ্ঠান সমন্ত্রক সকলের পক্ষেই বলা যাইতে পারে।

একানুষ্ঠানে পান ভোজনের একত্ব প্রায়শ্চিত্ত তত্বে নির্ণীত হইয়াছে। যথা “একস্মিন প্রয়োগে সকৃদেব পানমভ্যাসঃ। প্রয়োগভেদেনৈবাভ্যাস এব। .... “প্রয়োগভেদাদেবাশন ভেদঃ।” কিন্তু তাদৃশ পান ভোজনে একত্বের সম্ভাবনাতেও অর্থাৎ বারত্রয় মধুপর্ক প্রাশনে অনুষ্ঠানের একত্বেও বারত্রয়ই মন্ত্রাবৃত্তি করিতে পারস্কর ভাষ্যকার বিবাহ প্রকরণে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং বারত্রয় জলপানে আচমনানুষ্ঠানের একত্ব হইলেও সাংসৃষ্টিক-ন্যায়ানুসারে পানবৃত্তিতে মন্ত্রাবৃত্তিই সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। ভাষ্যোক্তি যথা—“মধুপর্কস্য একদেশমাদায় যন্মধুনো মধব্যমিত্যাদিনা মন্ত্রেণ সকৃৎপ্রাশ্য পুনস্তেনৈব মন্ত্রেণ উচ্ছিষ্ট এব দ্বিতীয়বারং প্রাশ্য তৃতীয়ং প্রাশ্নাতি।”

সমন্ত্রক বারত্রয় জলপান একবারমাত্র মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিনবার জলপান অথবা একবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক একবার মাত্র জলপানরূপ আচমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বটে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শিষ্টাচার যুক্তি প্রমাণ বাহুল্য দেখিয়া সমন্ত্রক বারত্রয় জলপান সমুচিত বলিয়া বোধ হইলেও এবং সাংদৃষ্টিক ন্যায়াবলম্বী কবিরত্ন মহাশয় সর্ব্বত্র সমন্ত্রক বারত্রয় জলপানের আচমনত্ব দেখিয়াও এখানে তন্ন্যায়ানুসারে তদ্রূপ কল্পনা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। সম্ভবতঃ সামবেদীয় বলিয়া গোভিলানুরক্তিই উহার হেতু। ক্রমশঃ—

মুষ্টিযোগ।

(১) কাঁচা হরিদ্রা, নিমপাতা ও যজ্ঞডুম্বুর প্রত্যেকের চারিআনা মাত্রা চূর্ণ একত্র করিয়া চারি আনা পরিমাণ বিশুদ্ধ গব্যঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমান্বয়ে তিন দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় সমপরিমাণে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ বমি হইতে শূল বেদনা পর্য্যন্ত নিবারিত হয়।

(২) তে-পল্তে পাতার সোজা অর্থাৎ বাহিরের পিঠ ৫।৭ দিন পটীর মত বিষজ ক্ষতে লাগাইয়া রাখিলে আরোগ্য হইবে।

প্রকারান্তর—চেতলমাছের আঁইস ও তিলের খোলভস্ম গব্যঘৃত বা দুগ্ধের সারের সহিত মিশ্রত করিয়া সেই মলম লাগাইলে বিষজ ক্ষত আরোগ্য হয়।

ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন—

(৺কামাখ্যাধামে প্রস্তাবিত অধিবেশন সম্বন্ধে বক্তব্য)।

লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য এম, এ—

"বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম—এই কামরূপে শ্রীশ্রী৺কামাখ্যাধামে অনায়াসে ব্রাহ্মণ-সম্মিলন করা যায়—অভ্যাগতের আহারের ও বিশ্রামের বন্দোবস্ত অথবা অধিবেশনার্থ সভাগৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদনার্থ বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। কামাখ্যার পাণ্ডাগণ এবং কামরূপ ব্রাহ্ম-সভার সদস্যগণ খুব আগ্রহ সহকারে এই সকল কার্য্যের ভারগ্রহণ করিতে সমুৎসুক। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দিগকে পাথেয় স্বরূপ কিছু দিবার যে নিয়ম ও রীতি আছে। তাহা এখানে পালন করা অসম্ভব।" *

কেবল কতকগুলি মন্তব্য লিখিয়া উদাসীন ভাবে বসিয়া থাকা অনুচিত মনে করিয়া যাহাতে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন সত্বর এবারই ৺কামাখ্যাধামে করা যায়, তদর্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে সম্মিলনের কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটে পত্র লিখি। এই সংকল্পের দুইটী উদ্দেশ্য ছিল ; প্রায় তিন বৎসরকাল পূর্ব্বে ময়মনসিংহ সহরে যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার পর এযাবৎ কুত্রাপি ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে নাই—এ ব্যাপার এতদিন পড়িয়া থাকাটা বড়ই অগৌরবের বিষয় ; দ্বিতীয়তঃ—এবং ইহাই খুব বড় কথা—ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শক্তিপীঠে সমবেত হইয়া, এই ঘোর দুর্দ্দিনে যাহাতে ব্রহ্মণ্যশক্তি উদ্বুদ্ধ হয় তদর্থে, শ্রীশ্রী৺জগন্মাতার নিকটে সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর কাতর প্রার্থনা একান্ত আবশ্যক ; কেন না, অসুর কর্ত্তৃক উপদ্রুত দেবতামণ্ডলী হিমালয়ে গিয়া জগদম্বিকার স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বাধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, আমার পত্র পাইয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু লিখেন—"আপনার প্রস্তাব ব্রাহ্মণ সভার কর্ত্তৃপক্ষ নিকট উপস্থিত করিব। * * * নাটোরে গিয়া কথাবার্ত্তা অনেকটা ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু বড় মানুষের সাধারণতঃ যেরূপ হয়—পেছনে অনবরত কেহ

* "ব্রাহ্মণ সমাজ" দশম বর্ষ ১ম সংখ্যা (আশ্বিন ১৩২৮) ৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য:
মুদ্রিত প্রবন্ধে ভ্রমতঃ 'এখানে'র পরিবর্ত্তে এক্ষণে ছাপা হইয়াছে।

† আগামী অধিবেশন নাটোরে হইবে এই সংবাদ ময়মনসিংহের অধিবেশনে নাকি ঘোষিত হইয়াছিল।

‡ "হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্।"

*　　　　*　　　　*

ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্ যযুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ। (চণ্ডী)

না থাকিলে কিছুই তাঁহারা করিতে পারেন না—এস্থলেও তদ্রূপই হইল। আমাদের ক্রটীর তো কথাই নাই। এবার তর্করত্ন মহাশয় এদেশে নাই—তাহাও কতকটা অবনতির কারণ।"

ইহার কিছুদিন পরে 'ব্রাহ্মণ সভার' সহকারী সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ মহাশয় হইতে একখানি পত্র পাই, তাহাতে তিনি লিখেন :—

"১। সম্মিলন করা যে স্থানে হয় ঐ স্থানের লোকগণ উহার খরচ বহন করিয়া থাকেন উহা তথায় (অর্থাৎ ৺কামাখ্যায়) সংগ্রহ হইতে পারিবে কিনা।

২। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের পাথেয় দেওয়া হয়। পাথেয়ের টাকা তথায় সংগ্রহ হইবে কিনা॥

৩। পণ্ডিত ও সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর থাকার ও আহারের ব্যবস্থা তথাকার অনুষ্ঠান সমিতি করিতে পারিবেন কিনা।

আপনার উত্তর পাইলেই মহাসম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটী আহ্বান করিব।"

উত্তরে আমাকে নূতন কিছুই প্রায় বলিতে হয় নাই—'ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকায় বিগত বর্ষের আশ্বিন সংখ্যায় (৩১ পৃষ্ঠায়) যাহা লিখিত হইয়াছিল—এবং এই বক্তব্যের সর্ব্বপ্রথমেই যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহারই উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অর্থাৎ কেবল পণ্ডিত মহাশয়দের পাথেয় ব্যয়বহন ভিন্ন অন্যান্য ব্যাপারের সম্পাদন এখানে অনায়াসেই হইতে পারিবে।

কবিরাজ মহাশয়ের চিঠিখানির উত্তর দিবার সপ্তাহকাল পরেই—বৈশাখের শেষ সপ্তাহে—আমি কলিকাতায় যাই—এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুরও আহ্বান ছিল। আমার প্রস্তাবে ইহাও ছিল, যেন জ্যৈষ্ঠমাসেই সংক্রান্তি ভর করিয়া অধিবেশন করা হয়—অকালে ৺কামাখ্যা দর্শন নিষিদ্ধ হইলেও সংক্রান্তিতে দর্শনে কালাকাল বিচার নাই; অতএব নূতনকল্পে কেহ ৺কামাখ্যা ধামে সম্মিলন উপলক্ষে আসিলে যেন তাঁহার পীঠদর্শনে বাধা না জন্মে। পাণ্ডাগণেরও ঐরূপ অভিপ্রায় ছিল। তাই কলিকাতায় গিয়া সভাপতি নিয়োগ তথা আমন্ত্রণ পত্র মুদ্রণ ইত্যাদি কার্য্য সত্বর সম্পাদন করিয়া ফেলিব...ইহাই কলিকাতায় যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারে জানিলাম যে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়েরও অভিপ্রায় আছে, যে নাটোরে যখন সম্মিলন হইতেছে না তখন এবার ৺কামাখ্যাতেই সম্মিলনের অধিবেশন কর্ত্তব্য। নাটোর সম্বন্ধে চূড়ান্ত জবাব পাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু এবং কবিরাজ মহাশয় আমাকে সঙ্গে লইয়া ছোট তরপের জমিদার বাবুর বাসা বাড়ীতে যান; সেখানে কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল যে নাটোরে সম্মিলন হওয়া অসম্ভব। তবে রাজসাহীর অন্যত্র হইতে পারিবে কিনা তৎসম্বন্ধে পরামর্শের নিমিত্তে পরদিন পুনশ্চ যাইতে জমিদার বাবু অনুরোধ করেন। পরদিন কোনও কারণে মনোমোহন বাবু যাইতে পারেন নাই, কবিরাজ মহাশয়ও আমি যাই এবং গিয়া জানা গেল রাজসাহীতে সম্মিলনাধিবেশন হইতে পারিবে না—৺কামাখ্যা ধামেই হইবে। ঐ জমিদার বাবু পণ্ডিতগণের পাথেয় প্রদান সম্বন্ধে সাহায্যের জন্য সম্ভাবিত চাঁদার একটী ফর্দ্দ করেন—তাহাতে নিজেও কিছু দিবেন স্বীকার করেন। এইরূপ

চাঁদা ধরিয়া ৭।৮ শত টাকা আদায় হইবে বলিয়া বিবেচিত হয়। মনোমোহন বাবু ইহার দিন দুই পরে দেশে চলিয়া যান—তাঁহার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎকার না হইলেও কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অবশ্যই দেখা হইয়াছিল এবং তাঁহার বাচনিক তিনি দ্বিতীয়দিনে নাটোরের জমিদার বাবুর সঙ্গে যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই অবগত হইয়াছিলেন।

অতঃপর ৺কামাখ্যা ধামে সম্মিলনের অধিবেশন করা সম্বন্ধে আর কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবে না বিবেচনা করিয়া সভাপতি নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁহাকে সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধও করি। তিনি সভাপতি হইতে সম্মতি জ্ঞাপন না করিলেও ৺কামাখ্যা ধামে সম্মিলনে উপস্থিত থাকিতে চেষ্টা করিবেন, এইরূপ আশা দিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে নিয়া সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিবার নিমিত্ত শান্তিপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে যাই। ইনি আসামের রাজ-গুরু বংশীয় "পর্ব্বতীয়া গোস্বামী" উপাধিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন। গৌহাটিতে একবার তাঁহার সঙ্গে এই সম্মিলন ৺কামাখ্যায় করা সম্বন্ধে আলাপ হইলে তিনি বেশ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিতে পারিলে পণ্ডিত মহাশয়দের পাথেয় প্রদান বিষয়ে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবারই কথা ছিল। কিন্তু তিনি পারিবারিক নানা অসুবিধা বশতঃ আমাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। তবে সম্মিলন হইলে ইঁহার ও তদ্বংশীয় অন্যূন একজন হইতে কিঞ্চিৎ চাঁদা পাওয়া অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল। অতঃপর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে অধিবেশন করার সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। শ্রাবণ মাসের পরে হইলে জমিদারবর্গের টাকা পয়সা দেওয়া সম্বন্ধে কিছুটা সুবিধা হইতে পারে—কবিরাজ মহাশয় এই মত প্রকাশও করিয়াছিলেন।

গৌহাটিতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কামরূপ ব্রাহ্মণ-সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির এবং ৺কামাখ্যাতে অধিবেশন হইলে ঐ স্থান নিবাসী যিনি অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হইবেন এরূপ কথা ছিল, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হয় যে আশ্বিনের ২।৩।৪ দিন শুদ্ধকাল এবং ৩১শে ভাদ্র সংক্রান্তি বলিয়া ঐ সময়ে অধিবেশন করা হইবে—৩১শে রবিবার ও ১লা আশ্বিন সোমবার এই দুইদিন অধিবেশন করিলেই নানা কারণে শোভন হইবার কথা। এদিকে গৌহাটীস্থ সনাতন ধর্ম্ম-সভার সম্পাদক দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ গৌহাটীর উকীল সরকার রায় শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন বাহাদুর দ্বারা রেলওয়ে কন্‌সেশন পাইবার জন্য চেষ্টা করা হয়; শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর আবেদন পত্রখানি কামরূপের ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব * নিকট স্বয়ং পেষ করিয়া তাঁহার দ্বারা

* এ ব্যাপারে ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ঈদৃশ সহায়তা গ্রহণের অবান্তর উদ্দেশ্য ইহাও ছিল যে সম্মিলন অধিবেশন এই জেলায় হইবার পক্ষে গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে কোনও আপত্তির সম্ভাবনা ঘটিত না।

বিশেষভাবে 'রেকমেণ্ড' করাইয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিকটে প্রেরণ করেন। অবশ্য, ঈদৃশ 'কন্‌সেশন' দেওয়ার আইন নাই বলিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উত্তর দিয়াছিলেন বটে,—পরন্ত, কাউন্সিলের ব্রাহ্মণ মেম্বর—যথা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র বাবু ও কুমার শ্রীযুক্ত শিবশেখরেশ্বর বাহাদুর দ্বারা ঐ বিষয় সমধিক চেষ্টা করাইবারও অভিপ্রায় পোষণ করা হইয়াছিল।

অপিচ, আসাম অঞ্চলের একমাত্র ব্রাহ্মণ জমিদার বিলাসীপাড়ার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী যাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়া পণ্ডিত মহাশয়দের পাথেয় প্রদানে সাহায্য করেন—তদর্থেও চেষ্টা করা হইতেছিল; উক্ত জমিদার বাবুর শ্বশুর হেতমপুরের মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী বাহাদুরের সঙ্গেও এ সম্বন্ধে পত্রালাপ করা হইয়াছিল। এবং যদিও উক্ত জমিদার বাবু এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া এ ব্যাপারে প্রস্তাবানুরূপ যোগদানে অসমর্থ, তথাপি সম্মিলনে অবশ্যই যোগ দিতেন এবং সামান্য কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্যও করিতেন।

যাহা হউক, এখানকার চেষ্টার কথা---কন্‌সেশনে আবেদন পত্রখানির নকলসহ সমস্তই—বিস্তারিত পত্র দ্বারা শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে যথাসময়ে জ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। এবং ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন সম্মিলনের অধিবেশন দিবস ধার্য্য করিতে এবং সভাপতি নিযুক্ত করিতেও অনুরোধ করা হয়। তিনি তদুত্তরে ৩১শে ভাদ্র ও ১লা আশ্বিন হইলে কতকগুলি অসুবিধার কথা লিখিয়া আমাদের অভিমত সত্বর জানাইতে বলেন। তদনুসারে তাঁহার প্রদর্শিত অসুবিধার হেতু খণ্ডনপূর্ব্বক ঐ সময়ই যে প্রশস্তকাল—সর্ব্বতোভাবে সুবিধার সময়—তাহা বিস্তারিত পত্র দ্বারা জানান হইয়াছিল।"

তৎপর সংবাদ আসে যে ৩২শে আষাঢ় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলন বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন হইবে—এবং সর্ব্বশেষ শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর পত্রে জানা গেল, ঐ সমিতি স্থির করিয়াছেন যে "রাজসাহীতে মহাসম্মিলন না হইলে মহাসম্মিলনের বড়ই অগৌরবের কারণ হইবে। রাজসাহী সম্মিলনে অর্থাভাবও হইবে না। এজন্য স্থিরীকৃত হইল যে ৺শারদীয়া পূজার পরে কাছারী খুলিলে যাহাতে রাজসাহীতে অধিবেশন হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হয়। তজ্জন্য কয়েকজনের উপর ভারার্পণ করা হইল।

যে ব্যাপারে অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে বিজড়িত, তদ্বিষয়ে কোনও কথা বলিতে প্রকৃতই সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। পরন্ত ৺কামাখ্যা ধামে এবার সম্মিলনের অধিবেশন হইবে—ইহা আসাম ও বঙ্গদেশে অনেকেই জানিয়াছিলেন—বিশিষ্ট রাজপুরুষদের মধ্যেও কেহ কেহ ইহা অবগত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় হঠাৎ এখানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সম্মিলনের কর্তৃপক্ষ এতদর্থে ছইমাসকাল যাবৎ যে ব্যক্তি যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছিল তাহাকে কি অবস্থায় পতিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই; সমিতির সংকল্পেও এতজ্জন্য ঐ ব্যক্তির উপর কোনও রূপ সহানুভূতির ভাবও প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া (অন্ততঃ মনোমোহন বাবুর পত্র হইতে) বোধ হইল না।

এখন বক্তব্য এই সম্মিলনের অধিবেশন "নাটোরে" হইবে এই কথাই ঘোষিত হইয়াছিল। নাটোরে হইবেই না স্পষ্ট দেখা গেল। তখন রাজসাহী জেলায় অন্যত্র অধিবেশন হইলে নাটোরের প্রত্যাখ্যানের অগৌরব দূরীভূত কিরূপে হইবে তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অপিচ ইতিমধ্যে ৺কামাখ্যাক্ষেত্রে কামরূপ ব্রাহ্মণ সমাজ সহ সম্মিলিত হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ সম্মিলন করিয়া তৎপর রাজসাহীতে সম্মিলন করিলে ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের গৌরবের কিভাবে হানি হইত তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। বরং এতদ্দ্বারা যে নাটোর সম্মিলন প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহারই অগৌরবের কারণ হইত—এবং সেরূপ একটা শিক্ষা ইহার হওয়াই উচিত ছিল।

রাজসাহী সম্মিলনে অর্থাভাবও হইবে না। এইরূপ বাক্য হইতে অনুমান করিতেছি, যে পণ্ডিত মহাশয়গণের পাথেয় প্রদানার্থ এখান হইতে অর্থ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সম্মিলন এখানে (৺কামাখ্যাধামে) হওয়া বাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই অনুমান ঠিক হইলে ইহাও আক্ষেপেরই কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—৭।৮ শত টাকা বঙ্গ দেশ হইতেই এতদর্থে সংগৃহীত হইবার কথা ছিল—এখানেও যে একেবারেই কিছু হইত না এমন নহে। পর্ব্বতীয় গোস্বামিগণ এবং বিলাসীপাড়ার জমিদার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবশ্যই দিতেন। এবং শ্রীযুত মনোমোহন বাবু সম্মিলনের অধিবেশন সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আসিয়া চেষ্টা করিলে গৌহাটী হইতেও অবশ্যই কিছু হইত। দেশে (৺ কামাখ্যা ক্ষেত্রে) কালে (পিতৃ পক্ষে) ও পাত্রে (ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়দের নিমিত্তে) দানের এইরূপ সুযোগ খুব কমই ঘটে। হয়তো সমাগত বিষয়ী ব্রাহ্মণগণও সানন্দে কিছু কিছু দিতেন। আমি ইহাও জানাইয়াছিলাম যে এবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আমন্ত্রণ সংখ্যা কিছু কম করা হইলেও ক্ষতি নাই। এমন কি আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যেও হয়তো দু একজন এ ক্ষেত্রে পাথেয় বলিয়াও অর্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতেন—এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রী ৺মহামায়ার মহাপীঠ দর্শন হইয়া গেল—ইহাই পরম লাভ মনে করিতেন। অপিচ একাধিক অধিবেশনের আমন্ত্রণ পত্রে দেখিয়াছি লেখা হইয়াছিল। অনুষ্ঠান সমিতি পাথেয় দিতে অক্ষম, অথচ তত্তদধিবেশনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণ অনেকেই পাথেয় পাওয়া যাইবে না মনে করিয়াও সভাস্থ হইয়াছিলেন, যদিও পরিশেষে পাথেয় প্রায় সর্ব্বত্রই দেওয়া হইয়াছে। অতএব এখানেও পাথেয়ের প্রত্যাশা না করিয়াও অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধিবেশনে যোগ দিতেন। এবং স্বল্প হইলেও কিয়ৎসংখ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়গণ পাথেয় পাইতেনই—কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—৭।৮ শত টাকার চাঁদার এষ্টিমেট কলিকাতায় বসিয়াই করা হইয়াছিল। এ ছাড়া স্থানীয়ও কিছু চাঁদা অবশ্যই হইত। যদিও তাহা প্রচুর পরিমাণ না হইবারই সম্ভাবনা ছিল।

সে যাহা হউক ৺ কামাখ্যা মহাপীঠে ব্রাহ্মণমহাসম্মিলন হইল না—সেই নিমিত্ত কাহাকেও সমষ্টি বা ব্যষ্টি ভাবে দায়ী করা যাইতে পারে না। যিনি সর্ব্বস্ত বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতা—তাঁহারই প্রেরণায় তদধ্যুষিত ধামে সম্মিলন অধিবেশনের প্রস্তাব হইয়াছিল। আবার তাঁহারই কল্যাণময়ী ইচ্ছায় তাহা অবশেষে ঘটিয়া উঠিল না। আমরা সকলেই সেই নিরাকুলেচ্ছাময়ীর হস্তে ক্রীড়নক মাত্র।

তথাপি যখন বহুলোকেই জানিয়াছিলেন এবার ৺ কামাখ্যায় ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইবে এবং তদর্থে এ অধমকে নানা প্রকারে চেষ্টা উদ্‌যোগ করিতেও দেখিয়াছেন, তখন ইহা না হওয়ার মূলে যে এ পক্ষের যথাসাধ্য যত্ন চেষ্টার বিশেষ কোনও ত্রুটি ছিল না, ইহা সাধারণের অবগতির নিমিত্তে বিজ্ঞাপিত করা আবশ্যক মনে করিলাম।

শ্রীভগবতী ব্রাহ্মণ সভার—তথা তদঙ্গীভূত অনুষ্ঠান সমূহের কল্যাণ বিধান করুন। ইতি—

পুস্তক পরিচয়

গৌতমসূত্র বা ন্যায়দর্শন ও তাহার বাৎস্যায়ন ভাষ্য দ্বিতীয় খণ্ড বিস্তৃত অনুবাদ বিবৃতি টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনূদিত ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত।

কলিকাতা ২৪৩।১ অপর সারকুলার রোড বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য সাহিত্যপরিষৎ সদস্যগণের সম্বন্ধে ২।০ সাধারণের পক্ষে ২৸০।

মহর্ষি গৌতমের ন্যায়দর্শন এবং তাহার বাৎস্যায়ন প্রণীত ভাষ্য পণ্ডিত সমাজে অপরিচিত নহে। নব্যন্যায়ের জন্মভূমি বঙ্গদেশে—অনেক দিন হইতে নব্যন্যায়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিশেষ ভাবেই প্রচলিত, কিন্তু ন্যায়দর্শন বিশেষতঃ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অধ্যাপনা অনেক দিন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতে হইলে উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক এবং বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়তাৎপর্য্য টীকা ও উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থের বিশেষরূপ অধ্যয়ন আবশ্যক। কালপ্রভাবে সম্প্রদায়ের অভাবে, ঐ সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের অধ্যয়নাদির বিলোপ প্রযুক্ত অনেক স্থলে বাৎস্যায়ন ভাষ্যের প্রকৃত পাঠের বিলোপ ও বিকৃতি সংঘটিত হওয়ায় পূর্ব্বতন অনেক বড় নৈয়ায়িক ও নব্যন্যায়ের ন্যায় বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অধ্যাপনাও করিতে পারেন নাই।

আমাদের বড়ই সুখের বিষয়—যশোর জেলার মূর্ত্তিমান্ গৌরব পাবনা দর্শনটোলের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক বর্ত্তমানে কাশীবাসী নানা শাস্ত্র পারদর্শী প্রতিভাবান্ নৈয়ায়িক প্রবর শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় অতি কঠোর পরিশ্রম পূর্ব্বক ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেশের একটী গুরুতর অভাব বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রচুর অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য উক্ত সাহিত্যপরিষদের নিকট সর্ব্বদেশীয় বিদ্বৎসমাজ চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড পাইয়া যথাকালে "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রে তাহার সমালোচনা

প্রকাশ করিয়াছিলাম। সংপ্রতি দ্বিতীয় খণ্ড পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। পণ্ডিতপ্রবর তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই অনুবাদ কেবল আক্ষরিক অনুবাদ্ নহে। অনুবাদের অনেক স্থলে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাও আছে এবং সর্ব্বত্রই টিপ্পনীর দ্বারা বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অতিদুর্ব্বোধ তাৎপর্য্য প্রাঞ্জলভাষায় ব্যক্ত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ বহুস্থলে ন্যায়বার্ত্তিক এবং তাৎপর্য্য টীকা প্রভৃতি বহুতর প্রাচীন গ্রন্থের অনেক কথা টিপ্পনীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা যতদূর বুঝিতেছি এই গ্রন্থে কেবল বাৎস্যায়ন ভাষ্যেরই ব্যাখ্যা হয় নাই। স্বনামধন্য তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার অসাধারণপ্রতিভা ও ভূয়োদর্শিতার ফলে এই প্রসঙ্গে অনেক প্রাচীন অপ্রচলিত গ্রন্থেরও ব্যাখ্যা করিয়া এদেশে প্রচীন ন্যায়শাস্ত্র বিচারের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই পুস্তক বর্ত্তমান সময়ে দেশের যে কিরূপ উপকার সাধন করিবে এবং এই পুস্তকের বিশিষ্টতা কি! তাহা যিনি এই পুস্তক অধ্যয়ন করেন নাই তাহাকে বুঝান যাইবে না, আমরা এজন্য পণ্ডিত মাত্রকেই এই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি। এপর্য্যন্ত কোন দার্শনিক গ্রন্থের এই ভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই। এবং ন্যায় শাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু দুর্ব্বোধবিষয় বঙ্গভাষায় এমন সুন্দর ভাবে প্রকাশিতও হয় নাই। ইহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। আর ইহাও অসঙ্কোচে বলিতে পারিব তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই নির্ম্মল কীর্ত্তি দিধীতিই তাহাকে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে অনন্তকাল নব বিভাকররূপে সমুদিত রাখিয়া তাঁহার যশঃ শরীরের অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করিবে। দুঃখের বিষয় বলিতে বাধ্য হইলাম স্থানাভাব বশতঃ এবারে আমরা এই পুস্তকের বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

মহারাজ পঞ্চকোটাধিপতি পুরোহিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত।

শ্রী শ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী।

ভবিষ্যপুরাণোক্ত সত্যনারায়ণ ব্রতকথার বঙ্গানুবাদ সত্যনারায়ণ পূজাপদ্ধতিসহ

প্রাচীন বঙ্গকবির অনুকরণে বাঙ্গলা পদ্যে শ্রীসত্যনারায়ণের পাঁচালী অনেকেই প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা ৺সত্যনারায়ণের পূজাপদ্ধতির সহিত এইভাবে বাংলা পাঁচালীও প্রণয়ন করিয়াছেন, সুতরাং বহুতর মুদ্রিত সত্যনারায়ণের পাঁচালী আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে কিন্তু উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাঁচালীর ন্যায় ভবিষ্যপুরাণোক্ত (সত্যনারায়ণ ব্রত) কথার অবিকল অনুবাদ আর কাহারও দেখিয়াছি. বলিয়া স্মরণ হয় না। কেবল ইহাই নহে খাটী অনুবাদের ভাষায় এতাদৃশ প্রাঞ্জলমাধুর্য্য ও কবিত্ব খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঁচালী পাঠ করিলে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শক্তিমত্তার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না, বাজারে প্রচলিত পাঁচালী মধ্যে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পাঁচালী সর্ব্বথা আদরণীয় বলিয়াই মনে হওয়ায় এই পুস্তক সম্বন্ধে এতটা পরিচয় পাঠক বর্গকে জানাইতে প্রযত্নপরায়ণ হইলাম। এই পাচালী, পুথির আকারে মুদ্রিত কিন্তু মূল্যের কোন কথা প্রকাশ না থাকায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই পুস্তকবিনিময়ে অর্থ গ্রহণের কামনা নাই বলিয়াই অনুমিত হয়, উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় সঙ্কলিত ৺সত্যনারায়ণ পূজাপদ্ধতি সহ ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রতকথা (সংস্কৃত) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে ; পুস্তক গাত্রে তাহার মূল্য ।০ আনা মুদ্রিত আছে, আর তাঁহার প্রণীত পাচালী পুস্তকে কোন মূল্যই মুদ্রিত হয় নাই—ইহাও তাঁহার একটী উদারতার পরিচয়। তাঁহার প্রকাশিত শতচণ্ডীসমাপ্তি প্রয়োগপদ্ধতিও আমরা পাইয়াছি, স্থানের অল্পতা বশতঃ এবার তাহার পরিচয় প্রদান করিতে পারিলাম্ না। বারান্তরে ঐ পুস্তকপরিচয় পাঠক বর্গ সমীপে উপস্থিত করিতে বাসনা থাকিল।

বেদান্তানুশীলনের প্রয়োজন।

পদার্থ দ্বিবিধ লৌকিক এবং অলৌকিক। প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তাহাকে লৌকিক পদার্থ এবং লৌকিক কোন প্রমাণের দ্বারা যে সকল পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারা যায় না তাহাকে অলৌকিক পদার্থ কহে। আমরা ব্যবহার জগতে যে সকল পদার্থ চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং অনুমান করিয়া থাকি, সেই বাহ্য পদার্থসমূহ লৌকিক পদবাচ্য এবং আত্মা, মন, জন্মান্তর, পরমেশ্বর, ধর্ম্মাধর্ম্ম, স্বর্গ, নরক প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ আমরা ব্যবহার জগতে কোনও প্রমাণের দ্বারা অনুসন্ধান করিতে পারি না, তাহাদিগকে অলৌকিক পদার্থ কহে। এই অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে অলৌকিক প্রমাণ অপেক্ষিত হইয়া থাকে। অলৌকিক প্রমাণ দ্বিবিধ, যোগিপ্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্র, সংযতচিত্ত যোগিগণ সত্ত্বগুণের প্রভাবে যাবতীয় অলৌকিক পদার্থ অন্তঃকরণের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন সুতরাং তাহাদের প্রত্যক্ষ একটী অলৌকিক প্রমাণ। অসংযতচিত্ত অবিদ্যান্ধ মানবগণ ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়েন না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণস্বরূপ, অতএব তাহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বা শাস্ত্রজ্ঞ প্রাচীনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অলৌকিক পদার্থসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। শাস্ত্র অলৌকিক বাক্য, সুতরাং অলৌকিক পদার্থের প্রমাণস্বরূপ। যেমন লৌকিক বাক্য লৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে একটী অন্যতম প্রমাণ—ইহাও তদ্রূপ। আমরা লোকের মুখে বাক্য শুনিয়া অনেক পদার্থের উপলব্ধি করিয়া থাকি। সংবাদপত্রস্থিত বাক্যসমূহ তাহার একটী অন্যতম প্রমাণ। এইরূপ বাক্যের প্রমাণতা স্বীকার না করিলে লৌকিক কোনও ব্যবহারই নিষ্পন্ন হইতে পারে না, সুতরাং লৌকিক বাক্য যেমন লৌকিক পদার্থের একটী প্রমাণ, সেইরূপ শাস্ত্রবাক্যও অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্বে প্রমাণস্বরূপ; ইহা বেদান্ত প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রসম্মত। সুতরাং অলৌকিক পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে যোগিগণের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলেও অবিদ্যান্ধ জীবের পক্ষে শাস্ত্র ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই, অতএব আমরা যুক্তির অধীন হইয়া পরমেশ্বরাদির অস্তিত্ব স্বীকার করি না, পরন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পিতা পিতামহ বা অন্য কোনও আপ্তজনের বাক্যেই পরমেশ্বরাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকি। এই শাস্ত্র অনাদি, যেমন পৃথিবী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি ঈশ্বর-সৃষ্ট পদার্থসমূহ জগতে অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করিতেছে, সর্ব্বজ্ঞ যোগিগণ ঈশ্বর-গতচিত্ত হইয়া অলৌকিক পদার্থসমূহের অনুভবপূর্ব্বক যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বা পরমেশ্বরের মহিমায় লোকশিক্ষার নিমিত্ত যাহা বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের হৃদয়ে ব্যক্ত এবং মুখে উচ্চারিত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে; তাহাই শাস্ত্রনামে অভিহিত। এইরূপ শাস্ত্রে অবিশ্বাস করা বুদ্ধিমানগণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। শাস্ত্রশব্দে প্রধানতঃ বেদশাস্ত্র অভিহিত হইয়া থাকে, পুরাণ এবং

তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের বেদশাস্ত্রই মূলস্বরূপ। উক্ত বেদশাস্ত্র প্রধানতঃ দ্বিবিধ, কর্ম্মপ্রকাশক বেদ, এবং তত্ত্বপ্রকাশক বেদ, এই তত্ত্বপ্রকাশকই উপনিষদ্ বা বেদান্তনামে অভিহিত হইয়া থাকে। পুরাকালে উপনয়ন সংস্কারের পর দ্বিজবালকগণ গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বেদ অধ্যয়ন করিত, এবং অধ্যয়নান্তে নিজ নিজ অধিকার মত ধর্ম্ম মার্গ বা তত্ত্বজ্ঞান মার্গ অবলম্বন করিত। পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বেদের প্রতিপাদ্যভেদে ধর্ম্মও দ্বিবিধ, প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম এবং নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মের ফলে জাগতিক নশ্বর সুখলাভ পূর্ব্বক সংসারে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মের ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক সংসার হইতে নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থ মোক্ষের লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের ফল সংসার এবং নিবৃত্তি-লক্ষণধর্ম্মের ফল মোক্ষ। এই দুইটী ফল সম্পূর্ণ বিভিন্ন হওয়ায় উহাদের কারণস্বরূপ কর্ম্মশাস্ত্র ও জ্ঞানশাস্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উক্তশাস্ত্রদ্বয় ভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিলেও উহাদের পরস্পর বিরোধ নাই প্রত্যুত সামঞ্জস্য আছে; তাহা ক্রমশঃ প্রতিপাদিত হইতেছে। সমগ্র বেদ অধ্যয়নের পর যাহাদের সাংসারিক সুখ বিষয়ের কামনা হইয়া থাকে, তাহারা উক্ত কামনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত পুনরায় গুরুর নিকটে গমন করিয়া সাংসারিক সুখের কারণস্বরূপ প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, এবং ধর্ম্ম কতপ্রকার, কি প্রকারে তাহাদের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাদের ফল কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক সমুদয় প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্মের বিষয় অবগত হইয়া তাহারা ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার ফলে নশ্বর সুখদুঃখ পরিপূর্ণ সংসার ভোগ করিয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ বেদের মীমাংসার জন্য যে দুইটী দর্শনশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমটি মহর্ষি জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা এবং দ্বিতীয়টি মহর্ষি ব্যাসদেব কৃত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্তশাস্ত্র। সাংসারিক ফলকামী ধর্ম্ম জিজ্ঞাসুর পক্ষে প্রথম শাস্ত্রটি প্রবৃত্ত বলিয়া উক্তশাস্ত্রের "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ প্রথমসূত্র বিরচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সমগ্রবেদ অধ্যয়নের পর জন্মান্তরীন সুকৃতির ফলে যাহাদের হৃদয়ে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য বা অনাস্থা উদিত হইয়া থাকে, তাহারা উক্ত বৈরাগ্যের প্রভাবে সাংসারিক সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী এবং আপাতরমণীয় এবং পরিণামে দুঃখকর বিবেচনা করিয়া সংসারে অনাস্থা অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারের নিবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী পরমানন্দলাভরূপ মোক্ষের কামনায় সদ্‌গুরুর সমীপে গমন করিয়া পরিদৃশ্যমান জগতের একমাত্র কারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতঃ ব্রহ্মবিচার এবং নিদিধ্যাসনাদি যোগপ্রভাবে পরমেশ্বর তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া সাংসারিক পরম দুঃখ হইতে অত্যন্ত বিমুক্ত এবং মোক্ষরূপ চিরসাম্রাজ্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব উপনিষদ্ শাস্ত্রের মীমাংসার জন্য প্রবৃত্ত বেদান্ত দর্শনের প্রথমে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" ইতি সূত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। জন্মান্তরেই হউক বা বর্ত্তমান জন্মেই হউক কর্ম্মপ্রকাশক বেদশাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান না হইলে কোনও প্রকারে মানবের হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় না এবং বৈরাগ্যের সঞ্চার না হইলে চিত্ত ব্রহ্মবিচারে অনুকূল হয় না বুঝিয়া দুইটী শাস্ত্র পরস্পর বিরুদ্ধ নহে; পরন্তু কর্ম্মশাস্ত্র

জ্ঞান শাস্ত্রের উপায় স্বরূপ। অতএব ভোগ এবং মোক্ষরূপ ফলদ্বয়ের উপায়স্বরূপ দ্বিবিধ শাস্ত্র এবং তাহাদের অধিকারীর ভেদ সংক্ষেপে উক্ত হইল। সম্প্রতি মোক্ষরূপ চিরশান্তি লাভই যে জীবগণের একমাত্র চরম উন্নতি এবং বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ববিচার জন্য তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে উক্ত উন্নতির লাভ সর্ব্বতোভাবে অসম্ভব—তাহা জীবের স্বভাব বর্ণন পূর্ব্বক ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক সুখ প্রাপ্তিকে পুরুষার্থ কহে। এই পুরুষার্থ চারিপ্রকার, ধর্ম্ম,অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, ধর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মলভ্য সুখ,অর্থশব্দে অর্থলভ্য সুখ এবং কামশব্দে স্ত্রীপুরুষ সংযোগ জাতসুখ কথিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ বৈষয়িক সুখমাত্রই উক্ত ত্রিবিধ পুরুষার্থ মধ্যে গণনীয়। উক্ত ত্রিবিধ পুরুষার্থ অতিক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ চিরদিনের জন্য দুঃখনিবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী অসীম সুখপ্রাপ্তি ঘটে না, এইজন্য উক্ত ত্রিবিধ ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ, যেহেতু মোক্ষে সর্ব্বথা দুঃখের চিরনিবৃত্তি এবং চিরস্থায়ী অসীম সুখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। জীবমাত্রই পুরুষার্থপ্রবণ, তবে মায়ার কুহকে আচ্ছন্নচিত্ত জীবগণের মোক্ষসুখে বিশ্বাস জন্মে না, তাহারা ভোগাসক্ত হইয়া স্ব স্ব অধিকার অনুসারে ধর্ম্মাদি ত্রিবিধ পুরুষার্থের সেবা করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে যাহাদের অনুকূল নিয়তিবশে মায়াবন্ধন শিথিল হওয়ায় মোক্ষসুখে বিশ্বাস জন্মে, তাহারা বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থের ভজনা করিয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রকারের জীবকে ভোগাসক্ত এবং দ্বিতীয় প্রকারের জীবকে মুমুক্ষু কহে। এই ভোগাসক্ত জীবের স্বভাব এবং অভিলষিত সংসারের স্বভাব বর্ণিত হইতেছে। ক্রমশঃ—

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২৮ সালের আশ্বিন হইতে ইহার দশম বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা স্থলে নূতন আইন অনুসারে রেজেষ্টারী খরচসহ দুই টাকা ছয় আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাক মাশুলও এক আনা লাগিবে। প্রতিসংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন মাস হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পর মাসে। দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ-সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরত পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য মণিঅর্ডার দ্বারা পাঠাইলে, অনর্থক ভিঃ পিঃ ও রেজেষ্টারী খরচ দরুণ পাঁচ আনা লাগিবে না।

ছাত্র শিক্ষক, উকীল, ব্যারিষ্টার, হাকিম, ইঞ্জিনিয়ার, হিসাবনিকাশ-কার্য্যরত ইত্যাদি মস্তিষ্ক-শ্রমী মহোদয়দেরও নানা পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত বন্ধু।

ইহা নানাবিধ মস্তিষ্ক-পীড়া, আলস্য, অনিদ্রা, স্মৃতিহীনতা, মাথাঘোরা, মাথাধরা, দুর্ব্বলতা, উন্মত্ততা, স্নায়বীয় কোষ্ঠবদ্ধতা ও ডিস্পেপসিয়া, অতিরিক্ত চিন্তা ও পঠনাদিতে বা বার্দ্ধক্যে ক্লান্ত মস্তিষ্ক, মাথা গরম বা শূন্য শূন্য বোধ, শুক্রতারল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য ইত্যাদিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ১৲। তিন শিশি ২৷৹।

এসেন্স মসুর।

প্রকৃতই জীবনের জীবন, অমৃত-বিশেষ। মসুরের নামান্তর Vegetable Meat.

বল, তেজ এবং সঞ্জীবনী-শক্তি রক্ষার্থ অদ্বিতীয়।

রোগান্তে দুর্ব্বলতায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট টনিক। মাংসের যুষ এবং ব্রাণ্ডি অপেক্ষাও এতদ্দ্বারা উৎকৃষ্টতর ফল পাইবে।

ম্যালেরিয়া জ্বর, টাইফায়ড্ জ্বর, নিউমোনিয়া, রেমিটেণ্ট জ্বর, বৈকারিক অবস্থাদি, বহুবিধ টাইফয়েড অবস্থা এবং ওলাউঠাদি পীড়ানিচয়ে রোগী low লো বা নিস্তেজ হইয়া পড়িলে এতদ্দ্বারা বিশেষ ফল পাইবে। এমন কি আসন্নকালে কণ্ঠে ঘড়-ঘড়ী আরম্ভ হইলেও ১৫।২০ মিনিট অন্তর অন্তর ইহা খাইতে দিলে অনেক সময় শ্লেষ্মা কাটিয়া যায়। ওলাউঠায় মূত্র না হইলে মূত্র আনে। মসুরডালে প্রস্তুত এই এসেন্স ত্রিদোষঘ্ন। অক্ষুধা, অজীর্ণ, উদরাময়, নানাবিধ ডিস্পেপসিয়া অম্বল, শোথ-রোগ, কালাজ্বর ইত্যাদির মহৌষধ।

ইজিপসিয়ানবাম—Egyptian Balm.

অনন্ত বিষহারিণী বিশল্যকরণী বিশেষ। তাই অগণ্য ব্যাধি বিনাশিনী ও বেদনাহারিণী।

বাত, বেদনা, হ্রিউমেটিজম্, গাউট, সায়েটিকা লাম্বেগো আদি ঘোর যন্ত্রণাদায়ক পীড়াচয়ের মহৌষধ। বৃশ্চিক ও বোল্‌তাদির দংশন, শুঁয়াপোকা লাগা, ওষ্ঠব্রণ, বিস্ফোটকাদির অসহ্য যন্ত্রণায় লাগাইবামাত্র সদ্য ফল পাইবেন। ইহা পোড়াঘায় এবং তাহার যন্ত্রণায় সদ্য ফলপ্রদ অমোঘ ঔষধ। কার্ব্বাঙ্কেল, কুষ্ঠাদি রোগ, বসন্ত ইত্যাদির উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শ ও মলদ্বারের দারুণ কষ্টদায়ক যন্ত্রণায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় ঔষধ নাই। কাণ কটকটানির দারুণ যন্ত্রণায় ২ ফোটা কাণে দিবামাত্র যন্ত্রণার উপশম। ইহার মালিশ ও বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়। তদ্দ্বারাই আশ্চর্য্য ফল পাইবেন। এতদ্দ্বারা গরমীর ঘা, দুরারোগ্য ক্ষতাদি ও খোস, পাঁচড়া অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

৪ আঃ শিশি ১৷৷৹ টাকা মাত্র।

C. KYLYE & Co.

CHEMIST & DRUGISTS, SPECIALLY OF INDIGENOUS DRUGS.

Office:—150 Cornwallis Street, Calcutta.

Telegrams :--MASURBRAIN, CALCTTA.

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে

ব্রাহ্মণ-সমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ-যন্ত্রে

শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

একাদশ বর্ষ একাদশ সংখ্যা।

শ্রাবণ।

সন ১৩৩০ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি,

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

REGISTERED NO. C—675.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"।

একাদশ খ। { ১৮৪৫ শক, ১৩৩০ সাল, শ্রাবণ। } ১১শ সংখ্যা।

উদ্বোধন।

(লেখক—সপ্তবিদ্যাকুলজ শ্রীরমাবিলাস কাব্যবিনোদ।)

আরামের শয্যা দূরে ফেলে দিয়ে
ব্রাহ্মণ তুমি জাগো হে।
তোমার দ্বারেতে কত যে অতিথি
নয়ন মেলিয়া দেখ হে॥

মোহ নিদ্রালস্য ছিল না যা কভু
এখন তাহাই সার।
সেই হেতু আজ ধর্ম্মত্যাগী জন
নোয়ায় না মাথা আর॥

মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্যাস বাল্মীকি
জনমিল তব কুলে।
মনু পরাশর যোগী যাজ্ঞবল্ক্য
তাও গেছ কি হে ভুলে?

শিব অবতার আচার্য্য শঙ্কর
রেখে ছিল তব মুখ।
ভৃগু পদ চিহ্ন লয়ে ভগবান্
উজ্জল করিলা বুক॥
যে বীর সাধক সর্ব্বানন্দ দেব
প্রাদুর্ভূত তব বংশে।
বৈষ্ণবের গুরু শ্রীচৈতন্য দেব
জনমিল তব অংশে॥
এ সকল কথা স্মরণ করিয়ে
নিদ্রালস্য পরিহর।
ধর্ম্মের নামেতে উন্মাদ হইয়ে
কাঁসর শঙ্খ ধর॥

হিন্দুজাতির ভগবদ্ ভক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রীশরৎকমল কাব্যব্যাকরণ ন্যায়স্মৃতিতীর্থ।)

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্"

বাহ্যবস্তু সমূহ হইতে চিত্তকে উঠাইয়া লইয়া ধ্যেয় বস্তুতে যে তাহার একাগ্র প্রবাহ তাহাই ধ্যান ইহাই উক্ত সূত্রের তাৎপর্য্য *

যখন আমি আমার ইষ্টকে ভাবিব তখন আমার মন কেবল তাহাতেই থাকিবে অন্য কোন বাহ্যবস্তুতে যাইবে না; সহজ কথায় ইহাকেই ধ্যান বলাযাইতে পারে। যখন শিবকে ভাবিব তখন "রজত গিরিতুল্য" সেই মহেশমূর্ত্তিই হৃদয়ে থাকিবে, সেই শিবচিন্তার মধ্যে অন্য কোন চিন্তা আসিয়া বাধা দিবে না, ইহারই নাম ধ্যান। এই ধ্যানাভ্যাস রসই নিদিধ্যাসন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখানে রস শব্দের প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, রস শব্দের দ্বারা ধ্যানের পরিপক অবস্থা বুঝাইতেছে। অপক ধ্যানের দ্বারা রসোৎপত্তি অসম্ভব, যে ধ্যান

---

* অত্রাপি পুরাণম্—তদ্রূপপ্রত্যয়ৈকাগ্রাসন্ততিশ্চান্যনিস্পৃহা। তদধ্যানং" ষড়্দর্শন টীকাকার বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্ববৈশারদী টীকা।

উত্তমযোগের (ভগবৎ সাক্ষাৎকারের) কারণ তাহাতে রস থাকিবেই, রস না থাকিলে "রসো বৈ সঃ" ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে কেন? এই সব তাৎপর্য্য কি ঐ রস শব্দদ্বারা জানা অসম্ভব হইবে? ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদের "স্মরণরূপ সাধনভক্তি" "ধ্যানাভ্যাস রস" এবং "নিদিধ্যাসন" এক পদার্থ কি না ইহা চিন্তা করা উচিত। যে স্মরণের বলে ভগবানের স্ফটিকস্তম্ভে নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব তাহা সাধারণ চিন্তা নহে, যে স্মরণ প্রহ্লাদকে অস্ত্র পর্ব্বত অনলে জলে "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ" করিয়াছিল তাহা সাধারণ চিন্তা হইতেই পারে না। যে স্মরণের দ্বারা সাধ্যভক্তির উদয় হয় তাহা সাধারণ চিন্তা কিরূপে হইবে? কারণ ভক্তিবাদে সাধ্যভক্তি পরম পুরুষার্থ, সুতরাং যে, স্মরণ পরমপুরুষার্থসাধক তাহা যে অতি উচ্চ সাধন ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এই স্মরণ দ্বারা কিন্তু প্রহ্লাদের ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, অতএব পূর্ব্বোক্ত ধ্যানাভ্যাস রস শ্রুত্যুক্ত নিদিধ্যাসন এবং প্রহ্লাদের এই স্মরণরূপ সাধনভক্তি এক পদার্থ কি না তাহা তত্ত্বদর্শী ভক্তসাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন। নিদিধ্যাসন শ্রুত্যুক্ত উচ্চসাধন, কারণ ইহার পরেই আত্মসাক্ষাৎকার তদ্দ্বারা মুক্তি ইহা জ্ঞানবাদীসাধকের অনুভব। ধারণা ধ্যান এবং সমাধি ইহা যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ, সুতরাং ভক্তিপথে জ্ঞান এবং যোগের প্রয়োজন আছে কি না তাহা সহজেই অনুমেয়। "শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" এই শ্রুতিতে শ্রবণকে একটী উপাসনা বলা হইয়াছে এই শ্রুত্যুক্ত শ্রবণ এবং শ্রবণরূপ সাধনভক্তি এক কিনা ইহাও অনুভব করা কর্ত্তব্য। মহর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে উপদেশ করিলেন—

"জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া॥" ভাগবত ২।১।২৩

এই শ্লোকে যোগশাস্ত্রোক্ত "আসন" "প্রাণায়াম" 'সঙ্গত্যাগ' "ব্রহ্মচর্য্য" এবং ধারণার কথা আছে। আসনসিদ্ধি প্রাণায়ামসিদ্ধিপূর্ব্বক নিঃসঙ্গভাবে ব্রহ্মচারী হইয়া ভগবানের স্থূল রূপে মনকে ধারণা করিতে হইবে, ইহাই উক্ত উপদেশের সার। মহর্ষি পতঞ্জলির "দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" এই সূত্র ব্যাখ্যাকালে ষড়্দর্শন টীকাকার প্রতিভার অবতার বাচস্পতি মিশ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা এই—

অত্রাপিপুরাণম্—

প্রাণায়ামেন পবনং প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ম্।
বশীকৃত্য ততঃ কুর্য্যাচ্চিত্তস্থানং শুভাশ্রয়ে॥
শুভাশ্রয়াঃ বাহ্যা হিরণ্যগর্ভবাসব প্রজাপতি প্রভৃতয়ঃ।

ইদঞ্চতত্রোক্তং— মূর্ত্তং ভগবতোরূপং সর্ব্বোপাশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥
তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যদ্বিচিন্ত্যং নরাধিপ।
তৎশ্রূয়তা মনাধারা ধারণা নোপপদ্যতে॥

প্রসন্ন বদনং চারু পদ্মপত্র নিভেক্ষণম্।
সুকপোলং সুবিস্তীর্ণং ললাটফলকোজ্জ্বলম্॥
সমকর্ণান্ত বিন্যস্ত চারুকুণ্ডলভূষণম্।
কম্বুগ্রীবং সুবিস্তীর্ণং শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষসম্॥
বলীবিভঙ্গিনা মগ্ননাভিনা চোদরেণ চ।
প্রলম্বাষ্টভুজং বিষ্ণুমথবাপি চতুর্ভুজম্॥
সমুচ্ছিতোরুজঙ্ঘঞ্চ সুস্থিরাংঘ্রি করাম্বুজম্।
চিন্তয়েদ ব্রহ্মভূতং তং পীতনির্ম্মলবাসসম্॥
... ...
.. ..
চিন্তয়েৎ তন্ময়ো যোগী সমাধায়াত্মমানসম্।
তাবদ্ যাবদ্ দৃঢ়ীভূতা তত্রৈব নৃপ ধারণা॥
এতদাতিষ্ঠতোহন্যদ্বা স্বেচ্ছয়া কর্ম্ম কুর্ব্বতো।
নাপযাতি যদা চিত্তং সিদ্ধাং মন্যেত তাং সদা॥"

উদ্ধৃত সন্দর্ভ দ্বারা ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে ভক্তিপথে যোগের অন্তরঙ্গ অঙ্গ "ধারণা" বিশেষ প্রয়োজন, এবং প্রাণায়াম প্রত্যাহার ও উপেক্ষণীয় নহে সুতরাং যোগপ্রণালী ভক্তের বর্জ্জনীয় নহে, বরং অবশ্যই গ্রহণীয়। মহাভারতে আছে যে, নারদ দক্ষপ্রজাপতির সহস্রপুত্রকে মোক্ষপ্রতিপাদক অত্যুত্তম সাংখ্যজ্ঞান পড়াইয়াছিলেন। * ঋষি সনৎকুমারের নিকটে আত্মজ্ঞান প্রতিপাদকশাস্ত্র জানেন না বলিয়া নারদ শোক করিয়াছেন, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ১। পরমর্ষি নারদ পরমভক্ত, জ্ঞান যদি ভক্তির বিরোধী হইত তবে নারদজীবনে এ সব কাহিনী শ্রুত হয় কেন? সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ জগতের আদি ভক্ত বৈষ্ণব, মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত ধৃতরাষ্ট্রপ্রজাগরপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি জ্ঞানমার্গের উপদেশ ঋষি সনৎসুজাতমুখে শ্রুত হয়। জ্ঞানবাদী আচার্য্য শঙ্কর উহার ভাষ্য করিয়াছেন। জগতের আদি ভক্তের মুখে জ্ঞানের উপদেশে কি বুঝা যায়? জ্ঞানপথ যদি নীরস বা ভক্তিশূন্য হইত তবে ঐসব পরমভক্ত পরমর্ষিগণ সে পথের উপদেশ করিলেন কেন? ভাগবতে দত্তাত্রেয় অবতার বর্ণনে এইশ্লোক দৃষ্ট হয়।

---

* সহস্র সংখ্যান্ সম্ভূতান্ দক্ষপুত্রাংশ্চ নারদঃ
মোক্ষমধ্যাপয়ামাস সাংখ্য জ্ঞানমনুত্তমম্॥"
(মহাভারত। আদি ৭৫অঃ। ৭

১। সোহহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি, নাত্মবিৎ; শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্য স্তরতি শোক মাত্মবিদিতি। সোহহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি। আমি আত্মাকে জানিনা জন্য শোকসাগরে নিমগ্ন, হে ভগবন্ আমাকে আত্মোপদেশ দিয়া সেই শোকসাগর হইতে উদ্ধার করুন ভক্ত নারদের ইহাই প্রার্থনা।

"ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্॥" ভাগবত ।৩।১১

এখানে শ্রীধরস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন "আন্বীক্ষিকীং আত্মবিদ্যাং। তাহা হইলে ভক্ত প্রহ্লাদও "জ্ঞানশাস্ত্র" আলোচনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান দত্তাত্রেয়রূপে অবতীর্ণ হইয়া অলর্ক এবং প্রহ্লাদাদি ভক্তদিগকে আত্মবিদ্যা (জ্ঞানশাস্ত্র) উপদেশ করিয়াছিলেন ইহা উদ্ধৃত ভাগবতশ্লোকে সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক অনন্তাবতার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ "ভক্তি জ্ঞানেরই প্রকার বিশেষ' এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পরম আদরের গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃতে নিম্নলিখিত পয়ারটি দৃষ্ট হয়।

"শাস্ত্রযুক্তি সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।
উত্তমাধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ।২২

শাস্ত্রযুক্তি সুনিপুণ কথাদ্বারা কৃতশ্রবণ এবং কৃতমনন ব্যক্তিকে উত্তমাধিকারী বলা হইয়াছে, উহা চৈতন্যদেবের উক্তি, সুতরাং তাঁহার মতে ভক্তদিগের শ্রবণ মনন প্রভৃতি উপনিষদ উক্ত সাধনা অবশ্য কর্ত্তব্য উপনিষৎ "জ্ঞানশাস্ত্র"। জ্ঞান ভক্তিপথের বিরোধী হইলে চৈতন্যদেব ঐরূপ উক্তি করিলেন কেন?

ভক্ত সম্প্রদায়ের পরম আদরের গ্রন্থ পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলা হইয়াছে. সেই জ্ঞানরূপ তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় ইহাও বলা হইয়াছে।(১) সুতরাং ভক্তিপথের সঙ্গে জ্ঞানপথের বিরোধ কোথায়? ইহার পরেই ভাগবতে এইশ্লোক দৃষ্ট হয়।

"তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞান বৈরাগ্যযুক্তয়া
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যাশ্রুত গৃহীতয়া॥

এই শ্লোকে "ভক্তিকে জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত" এবং "শ্রুতগৃহীত" এই দুইটী বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী এই স্থানে বলিয়াছেন যে উহাদ্বারা ভক্তির দৃঢ়ত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে (২।

"স্থাবর জঙ্গম না দেখে দেখে তাঁবই মূর্ত্তি
যাঁহা যাঁহা নেত্রপড়ে তাঁহা ইষ্ট স্ফূর্ত্তি॥" —

চৈতন্য চরিতামৃত।

১। বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভাগবত ।১।২।১১।

২। শ্রুতেন বেদান্ত শ্রবণেন গৃহীতয়া প্রাপ্তয়া
ইতি ভক্তে দার্ঢ্যমুক্তম্॥ শ্রীধরস্বামী।

ভক্তদিগের এই উক্তির সঙ্গে জ্ঞানবাদীগণের—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ)

এই উক্তির কোনই ভেদ বুঝা যায় না। এই ভাবে শাস্ত্র এবং সাধক জীবন আলোচনা করিলে কোন পথের সঙ্গে কোন পথের বিরোধ আছে ইহা বলা চলিবে না, অথবা "ঐ মত ভাল এই মত মন্দ" ইহাও বলা চলিবে না। বিচিত্র কর্ম্মফলে বিচিত্ররুচি লইয়া মানবগণ এই পৃথিবীতে আসিয়াছে, তাহাদের রুচি এবং শক্তি অনুসারে শাস্ত্র অধিকার ভেদে নানা উপদেশ করিয়াছেন, এইমূল কথা মনে থাকিলেই আমাদের অনেক সন্দেহ দূর হইবে। প্রসঙ্গতঃ বহুদূরে আসিয়াছি, এখন মূল কথা এই—

ভগবদ্‌ভক্তি সাধ্যসাধনরূপে দুই প্রকার, "সাধ্যভক্তি" পরমপুরুষার্থ (ভক্তিবাদে) উহা শ্রবণাদি ৯ প্রকার সাধনভক্তি দ্বারা লাভ করা হয়, উহা লাভ করাই মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, উহা লব্ধ হইলে, মানব কৃতকৃত্য হয়, তাহার "ভগবৎ সেবা" ভিন্ন আর কোন কাম্য থাকে না। মহারাজ পরীক্ষিৎ হইতে দৈত্যরাজ বলি পর্য্যন্ত যে ৯ জন সাধকের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

"শ্রোতব্যঃ" বলিয়া শ্রুতিতে যাহা বলা হইয়াছে—"শ্রবণ ভক্তি" তাহা হইতে ভিন্ন নহে। "কীর্ত্তন"কে "জপ" বলা যাইতে পারে। "স্মরণ" এবং "যোগোক্ত সাধনা" একই পদার্থ ইহাই মনে হয়। "অর্চ্চন"—অর্থ পূজা, উহা দুই প্রকার, বাহ্য এবং মানস, সুতরাং তন্ত্র শাস্ত্রোক্ত সাধনা "অর্চ্চন" ভক্তির অন্তর্ভূত। "বন্দন"—এবং "স্বাধ্যায়" একই পদার্থ। "সখ্য" "সোহংভাবের কথা, কারণ, "সে আমার আমি তাহার" এই ভাবেই সখ্য হইয়া থাকে, ঐ ভাবটি পক্ব হইলেই, সে আর আমি এক হইয়া "সোহহং" ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। দাস্য নিষ্কামতার কথা। আমার যাহা কিছু সবই তোমার, তুমি ভিন্ন আমার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সিন্ধুতে মিশিবার জন্যই বিন্দুর জন্ম, সেই বিন্দুও সিন্ধুরই অংশ, কারণ বিন্দুসমষ্টিই মহাসিন্ধু। সুতরাং আত্মনিবেদনে—"একমেবা দ্বিতীয়ং" এই ভাবই পরিস্ফুট। এই নবধা ভক্তির মধ্যে কর্ম্ম ভক্তি এবং জ্ঞানের অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেদীপ্যমান তাহা ভক্ত সাধক অবশ্যই বুঝিতেছেন। এই সব সাধনভক্তি দ্বারা পরমপুরুষার্থ যে সাধ্যভক্তি তাহা লাভ করিতে হইবে, সাধন ভক্তি দ্বারা লব্ধ যে সাধ্যভক্তি তাহা জ্ঞানেরই প্রকারভেদ ইহা আচার্য্যপাদ রামানুজের উপদেশ, সুতরাং ভক্তিবাদে কর্ম্ম এবং জ্ঞানেরও সামঞ্জস্য হইল।

পরীক্ষিৎ শুকদেব এবং প্রহ্লাদের সাধনভক্তিকে যেভাবে বুঝিলাম এই ভাবে লক্ষ্মী, পৃথু, অক্রূর, হনুমান, অর্জ্জুন এবং বলির সাধনভক্তি বুঝিতে হইবে। লক্ষ্মী তাঁহারই প্রিয়তমা শক্তি, তিনি তাঁহার বক্ষঃস্থলে সর্ব্বদাই বিরাজমানা, তথাপি তিনি তাঁহার পদসেবায় নিযুক্ত ভক্ত এ রহস্য বুঝিয়া লইবেন। এইভাবে পৃথু প্রভৃতির ভক্তিসাধনা বুঝা প্রয়োজন। ঐ সব মহনীয় ভক্তগণের পূজনীয় চরিত্র আলোচনা করিলে ভক্তি যে তীব্র সাধনলভ্য অতি সৌভাগ্যের ফল ইহা স্বতঃই উপলব্ধি হয়, রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি মূলগ্রন্থে ঐ সব

ভক্তগণের বিস্তৃত কাহিনী রহিয়াছে, সেই সব দেখিলে ভক্তিপথ অতি সহজ নীরস, উহাতে কর্ম্ম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন নাই ইহা কিছুতেই বলা চলিবে না, সারকথা কোন পথের সঙ্গে কোন পথের বিরোধ নাই, সাধনা করিলেই ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। আমি আজ সেই সাধনভ্রষ্ট হইয়াছি জন্য ঐ সব তর্ক আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে, ইহাই বর্ত্তমানে আমাকে বুঝিতে হইবে।

ভাবরসশূন্য মানব করুণাময়ের সৃষ্টিতে নাই। ঐ ভাব এবং রসকে আমি নানাদিকে ছড়াইয়া দিতেছি।

আমি নানা সময়ে নানারসে মাতিতেছি। আদ্য, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, হাস্য অদ্ভুত এবং বাৎসল্য এই রস সমূহের মধ্যে কোন একটীতে আমি সর্ব্বদাই রহিয়াছি, এই সংসারে কোন সময়ে আমি প্রেমে মগ্ন, দুঃখে ম্রিয়মাণ, ঘৃণায় কুঞ্চিত, ক্রোধে আচ্ছন্ন, উৎসাহে পূর্ণ, ভয়ে ভীত, হাস্যে উল্লসিত, বিস্ময়ে অভিভূত, স্নেহে আদ্র হইতেছি, কিন্তু অকিঞ্চন আমি ইহা বুঝিতেছি না যে ঐ সব রস এবং ভাবের মূল সেই ভগবান্, তাই ত তাঁহাকে "রসোবৈসঃ" বলিয়াছেন। কিন্তু আমি উহা না বুঝিলেও ভক্ত উহা বুঝিয়া থাকেন। সেই জন্য গোপীগণ আদ্যরসে, হিরণ্যকশিপু রাবণাদি রৌদ্র এবং বীররসে, মা যশোদা বাৎসল্য রসে ভগবান্‌কে দেখিতেন। কিন্তু হিন্দু আমি আজ ঐ সব কথা ভুলিয়া গিয়াছি! পত্নীপ্রেম আছে কিন্তু সেই প্রেমের উৎস কোথায় জানি না, ভূতদয়া আছে, কিন্তু সেই দয়ার সাগর কোথায় বুঝি না, অপত্য স্নেহ আছে কিন্তু তাহার স্থ কোথায় তাহা একদিনও ভাবিলাম না! কিন্তু প্রসাদ কবি অতি প্রসন্নভাষায় ইহা বুঝাইয়াছেন—

"আমার মা বিরাজে ঘরে ঘরে, এই ত্রিভুবনে মায়ের মূর্ত্তি দেখেও তুমি দেখলে নারে।
ভৈরব ভৈরবী সঙ্গে শিশু সঙ্গে কুমারীরে। অনুজ লক্ষ্মণ সঙ্গে জানকী তার সহকারে।
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে। প্রসাদ বলে বলবো কি আর
বুঝে লও জীব ঠারে ঠোরে"।

একথা আমিই জগতে সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়াছিলাম, আজ আমি তাহা ভুলিয়াছি, পুনরায় উহা আমাকে বুঝিতে হইবে। আমাকে মনে রাখিতে হইবে ভক্তির ভারতে আমার জন্ম, আমি হিন্দু এই ভগবদ্ভক্তিই আমার স্বভাব, কারণ আমার বেদ হইতে শিশুশিক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রন্থই ঐ ভক্তি সঙ্গীতে মুখরিত। বেদে সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের কথা আছে, সগুণ ব্রহ্মের রূপগুণের কতই বর্ণনা আছে, ঐ সব বর্ণনার ভক্তিই মূল, বৈদিক পুরুষসূক্ত দেবী-সূক্ত প্রভৃতিতে ঈশ্বরের সর্ব্বাত্মতা পরিস্ফুট। "তিনিই সর্ব্ব" এই ভাবের নামই ত সর্ব্বাত্মতা, যে ভক্ত নহে তাহার ঐ ভাব আসিতেই পারে না, এই জগৎ সেই জগন্নাথেরই রূপান্তর একথা আমার বেদপুরাণ তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি সকল গ্রন্থেই নানা ভাবে প্রকাশিত।

"যখন যেভাবে থাকি বঁধুমুখ বুকে দেখি
অমিয়সাগরে করি স্নান।"

ইহাই আমার স্বভাব। বর্ত্তমানে আমার সে স্বভাব না থাকিলেও এমন একদিন ছিল

যে দিন আমি সর্ব্বদাই বঁধুমুখ বুকে দেখিতাম; তাই আমি সেদিন দৈত্যতাপিত হৃতসর্ব্বস্ব: হইলেও সেই মুখ বুকে করিয়া হিমালয়ের পবিত্র নির্জ্জন গহ্বরে গিয়া "দেবি! মহাদেবি! শিবে! প্রকৃতি! ভদ্রে! রৌদ্রে! নিত্যে! গৌরি! ধাত্রি! জ্যোৎস্নারূপিণি! ইন্দু-রূপিণি! দুঃখে! কল্যাণি! বৃদ্ধি! সিদ্ধি! নৈঋতি! রাজলক্ষ্মি! শর্ব্বাণি ইত্যাদি কতনামেই তাঁহাকে ডাকিয়া চরণে লুটিয়া পড়িয়াছিলাম! আহা সেদিন কতরূপেই তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম! আমার প্রাণের প্রাণ মনের মন বাক্যের বাক্য সর্ব্বস্ব ধনকে এই বুকে বুদ্ধিরূপে, নিদ্রারূপে, ক্ষুধারূপে, শান্তিরূপে, শ্রদ্ধারূপে, মাতৃরূপে আরও কতরূপেই দেখিয়াছিলাম! লোকে বলে সে দিন নাকি আমার দুর্দ্দিন গিয়াছে। কারণ, সেদিন আমি দৈত্য তাপিত, হৃতসর্ব্বস্ব, ভ্রষ্টরাজ্য, পরাজিত, সত্যই কি সেদিন দুর্দ্দিন গিয়াছে? আমি যদি দৈত্যের অত্যাচারে সেদিন ঐরূপ দশাগ্রস্ত না হইতাম তবে কি আমি

"চিতিরূপে সর্ব্বভূতে সেই প্রাণারাম
তাহাকে প্রণাম ক'রি তাহাকে প্রণাম" *

বলিয়া তন্ময় হইতে পারিতাম? যদি সেদিন দুর্দ্দিনই হয় তবে কি আজ যেরূপ দুর্দ্দিনকে আমি ডাকিয়া আনিয়াছি ইহা অপেক্ষাও সেদিন দুর্দ্দিন ছিল? সেদিন দুইটি দৈত্য অত্যাচার করিয়াছিল, আজ কত দৈত্য আমাকে আক্রমণ করিয়াছে! যাহাদের দংশনে আমি সর্ব্বদা দষ্ট হইয়া নষ্টবিবেক অবস্থায় ভ্রষ্ট হইতেছি। এই অবস্থাই কি আমার চিরদিন থাকিবে? জীবনে ব্যভিচার করিয়াছি বলিয়া কি গৌতম শাপগ্রস্ত অহল্যার মত চিরকালই নির্জ্জন বনে পড়িয়া থাকিব? আমাকে উদ্ধার করিবার জন্য কি দয়াল রাম আসিবেন না তাঁহার চরণ রেণু স্পর্শে কি এ পাষাণে মানবত্ব ফুটিবে না? যদি তাহা না হয় তবে কেন তিনি বলিলেন—

"যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভাবো নোপ জায়তে
তাবদেব মুপাসীত বাঙ্‌মনঃ কায়কর্ম্মভিঃ।"

"ভক্ত! তুমি কায় মন বাক্যদ্বারা আমারই উপাসনা কর, দেখিবে সমস্ত ভূতে আমারই ভাব উপস্থিত হইবে, যে পর্য্যন্ত তাহা না হয় সে পর্য্যন্ত উপাসনা ছাড়িও না"। আমি ত করুণাময়ের ঐ আদেশ পালন করি না। শাস্ত্র বলিতেছেন সর্ব্বদা তাঁহাকে চিন্তা কর। প্রাতঃকালে "ব্রহ্মা মুরারি" বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ কর, স্নানে "শৈলসুতাসপত্নি!" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান কর, সন্ধ্যা করিবার সময়ে "ধীমহি" বলিয়া তাঁহারই ধ্যান কর, তর্পণে "তৃপ্যন্তু" বলিয়া সর্ব্বভূতময় তাঁহাকে জলাঞ্জলি দান কর, পূজায় "সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ" বলিয়া অনন্তরূপে তাঁহাকে দর্শন কর, ভোজনে তাঁহাকেই আহুতি দাও"। এইভাবে সমস্ত কর্ম্মেই শাস্ত্র আমাকে ভগবান্‌কে সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কলি উপহত আমি সেই সব

* চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ চণ্ডী।

কর্ম্ম এবং উপাসনা করি না, সুতরাং ভগবদ্ভক্তি আমার ভাগ্যে আসিবে কেন? একমুষ্টি অন্ন লইয়া কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করে, আমি ত তাহাই করিতেছি, ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া পাড়া পড়শী প্রতিবেশী কত লোকের সঙ্গে কত কি কোলাহল করিতেছি, কিন্তু আমার জীবনের কি উহাই উদ্দেশ্য? কোথায় আসিয়াছি কবে আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। কাকের মাংস কুকুরের উচ্ছিষ্ট, তাহাও অল্প এবং তাহাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এমন যে সাংসারিক সুখ, তাহারই জন্য জীবনের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিতেছি, কিন্তু এ শক্তি ত আমার চিরদিন থাকিবে না এমন একদিন অবশ্যই আসিবে যে দিন—

মহাশ্বাসের টানে টানে, মহাপ্রলয় উঠবে প্রাণে
টানবে সঘনে,
কণ্ঠেতে ঘড়ঘড় হবে, ঘন ঘন বদন বাঁকা।

বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে যখন এরূপ দিন আসিবে তখন সেই দীনবন্ধু অদিনের সখা ভিন্ন কেহই দেখা দিবেন না। সুতরাং আজ হইতে সেই পথের পাথেয় সংগ্রহ প্রয়োজন। মৃত্যু আরব্য উপন্যাস বা অলীক পদার্থ নহে, একদিন উহার অধিকারে সকলকেই যাইতে হইবে, কবি গাহিয়াছেন "কত চতুরানন মরি মরি যাওত," ঠিক কথা ব্রহ্মারও মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার নাই, "বিততো মৃত্যুপাশঃ" বিশ্ব জুড়িয়া মৃত্যুজাল ফেলিয়াছে, আমি কোথায় যাইব? সে স্থান কোথায়? সে স্থান 'অধ্বনঃপারে' বিদ্যমান, তাহাকে "বিষ্ণুপদ" বলে, আমাকে সেখানে যাইতে হইবে, কারণ আমি সেখান হইতেই আসিয়াছি, সেখানে গেলে ঐ মৃত্যু আমাকে ধরিতে পারিবে না, কারণ তাহা "অমৃতপদ"। এই ভক্তি ভিন্ন সেখানে যাইবার উপায় নাই। অমৃত পুরুষ বলিতেছেন—

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোহহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

"অনন্য ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানা যাইবে না, দেখা যাইবে না এবং সেই অমৃত সমুদ্রে প্রবেশ করাও যাইবে না" ইহা তাঁহারই অমোঘবাণী, সুতরাং এ কালের জাল মৃত্যুকে এড়াইতে হইলে আমাকে "অনন্যভক্তি" অর্জ্জন করিতে হইবে। এই অনন্য ভক্তিই ত "পরানুরক্তিরীশ্বরে" রূপ সাধ্যভক্তি, উহা শ্রবণাদি সাধনভক্তি সাধ্য, ঐ সাধনভক্তি আবার জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি সুতীব্র সাধন সাধ্য একথা পরীক্ষিৎ প্রভৃতির সাধনা দ্বারা বুঝিয়াছি, ইহা কি আমি পারিব? আমি যে কামকামী, সর্ব্বদাই যে আমার কামনা—

"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"

সুতরাং সর্ব্বসাধনার মূল বৈরাগ্যের বীজ কোথায় পাইব? হায়! আমি যে সর্ব্বদাই "ভাবের ঘরে চুরি করিতেছি।"

শিরো মুণ্ডিতং তুণ্ডং মুণ্ডিতং সর্ব্বং মুণ্ডিতং,
চিত্তং ন মুণ্ডিতং তর্হি কিং সুমুণ্ডিতম্?

মুণ্ড মুণ্ডন করিয়াছি, তুণ্ড (মুখ) মুণ্ডন করিয়াছি, সর্ব্ব মুণ্ডন করিয়া সাধু সাজিয়াছি, কিন্তু চিত্ত মুণ্ডন করি নাই, তবে এতদিন কি করিয়াছি, মনের কালী যখন মুছিতে পারি নাই তখন সদাই বিষয়বিষে কালী হইব তাহা আর আশ্চর্য্য কি? বিষের কৃমি আমি সদাই বিষে রহিয়াছি, বিষ খাইয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, সর্ব্বদাই বিষের বোঝা বহিতেছি, এমন যে আমি আমার ভাগ্যে কি ভবরোগৌষধ ভক্তি সঞ্জীবনীসুধা লাভ হইবে? দীনবৎসল করুণাময় পতিতপাবন ভগবান্ বলিতেছেন হইবে।

"স্বল্প মপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

বহ্নিকণা যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ তুলারাশিকে পলকে ভস্ম করে, একবিন্দু ধর্ম্মও সেইরূপ পুঞ্জীভূত অধর্ম্মকে নাশ করে, তখন কামনা থাকিতেই পারে না। একথা ত মিথ্যা নহে, ধ্রুব ত প্রথমে কামনা লইয়াই তাঁহাকে খুঁজিয়াছিল, যখন তিনি আসিলেন তখন ভক্ত বলিলেন আমি কাচ খুঁজিতে খুঁজিতে দিব্যরত্ন পাইয়াছি, সুতরাং

"স্বামিন্! কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে"

প্রভো! আমি তোমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না। আমার জীবনে এ অবস্থা আসিবে না কে বলিল? আমি জগৎস্বামীকে অবিশ্বাস করিয়া ব্যভিচার করিয়াছি বলিয়া ভয়? সে ভয়ের প্রয়োজন নাই, তিনি যে পতিতপাবন, পতিতকে ব্যভিচারীকে উদ্ধার ত তিনি করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী সেই অহল্যা, তিনি জগৎস্বামীর প্রতিনিধি পতিদেবতাকে অবিশ্বাস করিয়া জীবনে ব্যভিচার করিয়াছিলেন জন্য তাঁহারই আদেশে কাননে পাষাণী হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমারও ত আজ সেই অবস্থা, আমিও ব্যভিচারের ফলে সংসার-কাননে পাষাণ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়? তিনি পতির আদেশে জগৎপতির আশায় পাষাণদেহ লইয়াও অন্ধকার বনে সাধনায় মগ্ন ছিলেন, সেইজন্য সে পাষাণে রস সঞ্চার হইয়াছিল, আর আমি নীরস পাষাণ! এতটুকু অশ্রু আমার নয়নে নাই, নয়নে অশ্রু আনিতে চাই কিন্তু হায় বহ্নি আসে, কেন আসিবে না, হৃদয় যে তপ্ত মরুভূমি হইয়াছে, কিন্তু এ নয়নে অশ্রু আনিতেই হইবে। আমার রাম আসিবেন চরণরেণু স্পর্শে এ পাষাণকে উদ্ধার করিবেন" এই আশায় বুক বাঁধিয়া এই "সংসার দুঃখ গহনে" পাষাণের মত পড়িয়া থাকিব, সংসারের ঝড়ে উড়িব না, দুঃখ-বৃষ্টিতে গলিব না, ত্রিতাপ-তাপে শুকাইব না কারণ আমি যে পাষাণ, ঝড় জল বৃষ্টি তাপে পাষাণের কোনই ক্ষতি হয় না। অতএব হে পাষাণ! যদি তোমার উদ্ধারের বাসনা থাকে, তবে "ভক্তি-যোগ" আশ্রয় করিয়া তচ্চিত্ত পরায়ণ হও, হে পাষাণ হৃদয়! সেই পাষাণীর ভক্তি সমুজ্জ্বল সাধনা-চিত্র দর্শন কর—

"সা হি গৌতমবাক্যেন দুর্নিরীক্ষ্যা বভুব হ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং যাবদ্ রামস্য দর্শনম্॥" রামায়ণ। আদি ৪৯।১৬

গৌতমের বাক্যে রামদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত অহল্যা ত্রৈলোক্যের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া

ছিলেন। যথার্থ ব্যবস্থা, ব্যভিচার যখন করিয়াছি, তখন ত্রৈলোক্যের দৃষ্টিপথে আমার থাকিবার অধিকার নাই। ইহা ত আমার শাস্তি নহে পরম অনুগ্রহ, জগতের কোলাহলে থাকিলে সেই আমার গুহ্যাতিগুহ্য ধনকে দেখিতে পাইব কেন? সেই জন্য পতিবিগ্রহ শ্রীভগবান বলিলেন—

"বায়ুভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী।
অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন্ বসিষ্যসি।"

তুমি এই আশ্রমে বহু সহস্রবৎসর নিরাহারা বায়ুভক্ষ্যা ভস্মশায়িনী এবং সমস্তপ্রাণীর অদৃশ্যা হইয়া অনুতাপ করতঃ বাস করিবে। নাথ। আমি ত তোমার সেই আদেশ পালন করিতেছি, তথাপি কি দয়া হইবে না, সেই যে ব্যভিচার দেখিয়া শাপদিয়া চলিয়া গিয়াছ আর কি আসিবে না, দেখ আমি মনের আবেগে ভক্তিযোগে তোমার নামজপ করিতে করিতে বিগত কল্মষ হইয়াছি, পতিতপাবন। দয়াময়। একবার আসিয়া দেখিয়া যাও তোমার ভক্তিমহিমায় ধূমপরীতা প্রদীপ্তা অনল শিখার ন্যায় মেঘ এবং তুষারাবৃত পূর্ণচন্দ্র কান্তির ন্যায় জলমধ্যে পতিত দুর্দ্দর্শনীয় সূর্য্যপ্রভার ন্যায় আমার অঙ্গজ্যোতিঃ দেদীপ্যমান হইতেছে, হে জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ। এই ক্ষুদ্রজ্যোতিঃ কি ঐ মহাজ্যোতিতে মিশিবে না।

আসিয়াছ ভকত বৎসল।
হ'লো মোর আত্মা সুশীতল।
নিরখি জাহ্নবীধারা বহে কল কল।
এক, নাহি দুই আর
আদরিণী প্রেমে'ছ এবার
প্রাণনাথ লহ নমস্কার।

"বিধিশক্তি স্মৃতিদ্বার মহাবাণ যোগিনামপি।
ব্যক্তি তাথ পদং ধর্ম্মপ্রমাণং বামমাশ্রয়॥"

চারি কন্যা।

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।)

(৪)

বিষ্ণুদত্ত শক্তিদেবকে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার নিবাস কোথায়? কোন বংশ? এখানে কি জন্য আসিয়াছ? কিরূপেই বা আসিলে?

শক্তিদেব সংক্ষেপে সমস্ত কথার উত্তর দিল। বিষ্ণুদত্ত শুনিয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিল আমাদের দুজনেরই এক দেশে জন্ম। তুমি আমার মামাত ভাই। আমি বাল্যকালেই এখানে আসিয়াছি। ভাই! তুমি কিছুদিন এখানে থাক। এ তোমার নিজের বাড়ীই মনে করিবে। কোনও বিষয়ে দ্বিধা বোধ করিও না। নানাদ্বীপ হইতে বণিকেরা সর্ব্বদাই এখানে আসিয়া থাকে, তাহাদের কাহারও হইতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে।

এই বলিয়া বিষ্ণুদত্ত আপন বংশের পরিচয় দিল, শক্তিদেব তাহাকে পাইয়া সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গিয়া পরম আনন্দ লাভ করিল। বিদেশে বন্ধুলাভ মরুভূমির অমৃতপ্রস্রবণ, ভাবিল—মাঝখানে যখন এমন হঠাৎ ঘটিল, তখন আমার অভীষ্ট সিদ্ধির বোধ হয় আর বড় বিলম্ব নাই।

কিন্তু কিরূপে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, এই চিন্তায় সে একটীবারও সুস্থির হইয়া শয়ন করিতে পারিল না। পুনঃ পুনঃ উঠিয়া রাত্রে পায়চারি করিতে লাগিল। বিষ্ণুদত্ত তাহা দেখিয়া তাহার শয্যায় বসিয়া, তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য [illegible] একটি উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(১)

বিষ্ণুদত্ত বলিল—

যমুনাতীরে মহাগ্রহার গ্রামে গোবিন্দস্বামী নামে এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথাকালে যথাক্রমে তাঁহার দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল। জ্যেষ্ঠের নাম অশোক দত্ত, কনিষ্ঠের নাম বিজয় দত্ত। তাহারাও পিতার ন্যায় সচ্চরিত্র হইয়াছিল।

এক সময়ে সে দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইল। গোবিন্দস্বামী পত্নীকে বলিলেন—প্রিয়ে! বন্ধুবান্ধবদিগের দুর্গতি আর দেখিতে পারিতেছি না। আমিই বা কাহাকে কত দিতে পারি।

তাই মনে করিতেছি, আমাদের সঞ্চিত খাদ্যাদি যাহাকিছু আছে, সমস্তই বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিয়া কাশীতে গিয়া বাস করিব।

পত্নীরও তাহাতে সম্মতি জানিয়া, তণ্ডুলাদি সমস্ত দ্রব্য বিতরণ করিয়া সপরিবারে দেশ হইতে বাহির হইলেন। সাধুজন স্বজনের দুঃখ সহিতে পারেন না।

(২)

কাশীতে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দস্বামী নগরের বাহিরে দুর্গাবাড়ীতে প্রথম দিন রহিলেন। দিবসে দেবীর পূজা করিয়া, সায়ংকালে মন্দিরের বাহিরে একটা গাছের তলায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে অন্য অনেক আগন্তুকও ছিল। সকলেই পথশ্রান্ত, সুতরাং কম্বলাদি বিছাইয়া শয়ন করিবামাত্রেই নিদ্রাভিভূত হইল।

মধ্যরাত্রে গোবিন্দস্বামীর কনিষ্ঠপুত্র বিজয়দত্তের অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। একে বালক, তাহাতে উপর্য্যুপরি বহুদিনের পথশ্রম, আহারাদির অনিয়ম, সুতরাং সে প্রবলজ্বরে অভিভূত হইয়াছে, শীতে থরথর কাঁপিতেছে। পিতাকে জাগাইয়া বলিল বাবা। আমার জ্বর হইয়াছে, বড় শীত পাইতেছে, কাঠ আনিয়া আমার কাছে আগুন জ্বালিয়া দিন, তা না হইলে আমার শীত ভাঙ্গিবে না, আমি রাত কাটাইতে পারিব না।

গোবিন্দস্বামী শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন। বলিলেন এখানে এখন আগুন কোথায় পাইব।

বিজয় বলিল ঐ যে বাবা। খুব নিকটেই আগুন জ্বলিতেছে, দেখা যাইতেছে। আপনি আমাকে ধরিয়া ঐখানে লইয়া চলুন।

গোবিন্দস্বামী বলিলেন—ও যে শ্মশান ওখানে কত ভূতপ্রেত আছে *। ওটা চিতা জ্বলিতেছে। তুমি বালক, ঐ ভয়ঙ্কর স্থানে তোমাকে কিরূপে লইয়া যাইব?

স্নেহময় পিতার কথা শুনিয়া, বিজয় হাসিয়া সদর্পে বলিল—বাবা। ভূতপ্রেতে আমার কি করিবে? আমি কি কাপুরুষ। আপনি নির্ভয়ে আমাকে লইয়া চলুন।

কথাটায় বালচাপল্য ভাবিয়া গোবিন্দস্বামীর একটু হাসি আসিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জ্বরের প্রলাপ মনে করিয়া, নিতান্ত বিষাদিত হইলেন। পুত্রের পুনঃপুনঃ অনুরোধে তাহাকে সেখানে লইয়া গেলেন। বাস্তবিকই সেখানে একটা চিতা জ্বলিতেছিল। বালক আগুন পোহাইবার জন্য চিতার নিকটে গিয়া বসিল। গোবিন্দস্বামী তাহার পশ্চাতে বসিলেন। সেখানে আর কোনও জনপ্রাণী ছিল না। চিতার মধ্যে একটা বিকটাকার মস্তক পুড়িতেছিল। বিজয় আগুন পোহাইয়া একটুকু সুস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এটা কি বাবা। পিতা বলিলেন একটা মড়ার মাথা পুড়িতেছে। যাহাদের মড়া, তাহারা আধপোড়া করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।

বিজয় তখন একটা জলন্তকাষ্ঠ লইয়া তাহার আঘাতে সেই খুলিটা ফাটাইয়া দিল। তাহা হইতে চর্ব্বি ছিট্‌কাইয়া চারিদিকে পড়িল। বিজয়ের মুখের মধ্যেও একটু পড়িয়াছিল।

* চণ্ডকৌশিক নাটক প্রভৃতির বর্ণনায় জানা যায়, প্রাচীনকালে দুর্গামন্দির শ্মশানের মধ্যস্থলে ছিল, এবং সে শ্মশানও অতি ভয়ঙ্কর ছিল।

সে তখনই রাক্ষসের মূর্ত্তি ধরিল। মাথার চুলগুলা লম্বা, কটা ও খাড়া হইয়া উঠিল। মাথা ফুড়িয়া একখানা খড়্গ বাহির হইল। দাঁতগুলা মুলারমত হইয়া গেল। জিভ্‌টা বড় হইয়া লক্‌ লক্‌ করিতে লাগিল। সে তখন চিতা হইতে খুলিটা টানিয়া লইয়া, তাহাতে যতটা চর্ব্বি ছিল, সমস্ত খাইয়া ফেলিল; অবশেষে জিভ্‌ দিয়া খুলিটা চাটিতে লাগিল।

তার পর নিজের পিতা গোবিন্দস্বামীকে সেই খড়্গের আঘাতে বধ করিতে উদ্যত হইল। গোবিন্দস্বামী প্রাণভয়ে ছুটিতে লাগিলেন, সেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সেই সময়ে শ্মশানের নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে কে বলিল—ওহে কপালস্ফোট! তোমার পিতাকে মারিও না। এদিকে এস।

এই নূতন নাম পাইয়া বিজয়দত্ত পিতার অনুধাবন ছাড়িয়া দিয়া, সেই শব্দের দিকে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

(৩)

গোবিন্দস্বামী "হা পুত্র! হা গুণধর! হা বিজয়দত্ত!" বলিয়া মুক্তকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে সমস্তরাত্রি শ্মশানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। প্রাতঃকালে উন্মত্তবেশে দুর্গামন্দিরে পত্নীকে ও জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকদত্তকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। নিদারুণ বজ্রপাতের ন্যায় সেই শোকের আঘাতে নিতান্ত কাতর হইয়া তিন জনেই রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

কাশীবাসীর মধ্যে যাহারা দুর্গামন্দিরে দেবী দর্শন করিতে গিয়াছিল, তাহাদের দুঃখে সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কেহ তাঁহাদের অবস্থা দর্শনমাত্র করিয়া, কেহ কেহ বা মৌখিক দুই চারিটা সান্ত্বনা বাক্য বলিয়া, সকলেই স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। এক শ্রেষ্ঠীও দেবীর পূজা দিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সমুদ্রদত্ত। তিনি গোবিন্দস্বামীর অবস্থা দেখিলেন, সমস্ত বৃত্তান্তও শুনিলেন। তাঁহাদের তিনজনকে আশ্বাস দিয়া যত্নপূর্ব্বক নিজের বাটীতে লইয়া গেলেন। স্নান আহার করাইয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিলেন। বিপন্নকে দয়া করা মহৎ লোকের স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

তাঁহার নানা প্রকার সান্ত্বনাবচনে গোবিন্দস্বামী পত্নীপুত্রের সহিত ধৈর্য্য ধরিলেন। তদবধি তিনি শ্রেষ্ঠীর একান্ত অনুরোধে তাঁহার বাটীতে থাকিয়াই কাশীবাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অশোকদত্ত শাস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যৌবনে মল্লযুদ্ধও শিক্ষা করিল। তাহাতে তাহার খুব সুখ্যাতি হইল। সকলেই বলিতে লাগিল—পৃথিবীতে এমন কোনও মল্ল নাই তাঁহাকে হারাইতে পারে।

এক সময়ে কাশীতে কোন উৎসব উপলক্ষে নানাদেশ হইতে অনেক মল্ল আসিয়া জমিল *। দাক্ষিণাত্য হইতে এক বিখ্যাত মল্লও আসিয়াছিল। সে কাশীনরেশ প্রতাপমুকুটের সমক্ষে সমস্ত মল্লদিগকে হারাইয়া দিল। কাশীরাজের মহামল্লেরাও তাহার নিকট পরাজিত হইল। তখন কাশীরাজ সমুদ্রদত্ত শেঠের বাটী হইতে অশোকদত্তকে আনাইয়া

* এখনও প্রতিবৎসর এইরূপ মল্ল সম্মেলন হইয়া থাকে, ইহাকে দঙ্গল বলে।

তাহার সহিত মল্ল যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। সেই বিজয়ী মল্ল তালঠুকিয়া যেমন অশোক দত্তকে আক্রমণ করিতে গেল, অমনি অশোক এক ধাক্কাতেই তাহাকে ভূতলশায়ী করিল। তখন সকলেই এমন হাস্য কোলাহল করিতে লাগিল বোধ হইল যেন রঙ্গভূমিটাও অশোক দত্তকে সাধুবাদ দিতেছে।

রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অশোকদত্তকে বহু ধনরত্ন পারিতোষিক দিলেন, এবং স্বচক্ষে তাঁহার বল বিক্রম দেখিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বচর করিলেন।

একদা শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে রাজা নগরের বাহিরে নিজের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে শিবপূজা করিতে গিয়াছিলেন। পূজা করিয়া শ্মশানের পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় শুনিতে পাইলেন, দূরে শ্মশান হইতে কে বলিতেছে— বিচারকর্ত্তা বিদ্বেষবশতঃ মিথ্যা নরহত্যার অপরাধে আমাকে শূলে দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমি অপরাধী নহি। তিন দিন হইল আমি শূলে আছি, এখনও প্রাণ বাহির হইতেছে না। বড় পিপাসা, মহারাজ! আমায় একটু জল দিবার অনুমতি করুন।

শুনিয়া রাজার দয়া হইল। অশোকদত্তকে বলিলেন কাহাকেও দিয়া উহার কাছে জল পাঠাইয়া দাও। অশোক বলিল এরাত্রে কে ঐ ভয়ঙ্কর স্থানে যাইবে মহারাজ! আমি নিজেই যাইতেছি।

এই বলিয়া অশোকদত্ত জল লইয়া একাকী শ্মশানে গেল। রাজা অনুচরদিগের সহিত নিজে পুরীতে গেলেন।

(৪)

কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর নিশীথ সময়। শ্মশানভূমি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শৃগালগুলা মড়া লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে। বৃক্ষের উপর ঝুপঝাপ্ শব্দ হইতেছে। নিম্নেও দুপ্‌দাপ্ শব্দ শুনা যাইতেছে। অশোকদত্ত সেই শ্মশানের কিয়দ্দূরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল—মহারাজের কাছে কে জল চাহিয়াছিলে? একদিক হইতে উত্তর আসিল—আমি।

অশোকদত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গিয়া দেখিল—একটা ক্ষুদ্র বনের অন্তরালে একটা চিতা ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। তাহার নিকটে একজন পুরুষ শূলে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। শূলের মূলদেশে বসিয়া একটী পরমাসুন্দরী সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা যুবতী রমণী রোদন করিতেছে। তেমন রূপ সে কখনও দেখে নাই। তাহার মনে হইল—কৃষ্ণপক্ষের অন্তভাগে রজনীপতি চন্দ্রমা অতি ক্ষীণ হইয়া উঠিতে না পারায়, তাহার জ্যোৎস্না মাখিয়া রজনীদেবী এখানে চিতা পূজা করিতে আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—মা! কে তুমি? কেন এমন কাঁদিয়া এখানে বসিয়া কাঁদিতেছ?

রমণী বলিল—যিনি শূলের উপর রহিয়াছেন, অভাগিনী উঁহারই পত্নী। সহমৃতা হইবার সঙ্কল্প করিয়া এই চিতা প্রস্তুত করিয়াছি। কতক্ষণে উঁহার প্রাণ বাহির হইবে, তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। তিনদিন কাটিয়া গেল, এখনও উঁহার প্রাণ বাহির হইতেছে না,

উনি বারংবার জল চাহিতেছেন, আমি জল লইয়াও আসিয়াছি; কিন্তু উচ্চশূলের উপর হাত বাড়াইয়া উহার মুখে দিতে পারিতেছি না।

তাহার এই কথা শুনিয়া অশোকদত্ত বলিল—মহারাজও উহার জন্য আমার হাতে এই জল পাঠাইয়াছেন। আমার পিঠের উপর দাঁড়াইয়া তুমিই উহার মুখে জলদাও। বিপদের সময়ে পরপুরুষকে কেবল স্পর্শ করিলে স্ত্রীলোকের কোনও দোষ হয় না।

এই বলিয়া অশোকদত্ত শূলের মূলে হস্ত ও জানু পাতিয়া উপুড় হইয়া রহিল। রমণী জল লইয়া তাহার পিঠে পা দিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই অশোকদত্ত নিজের পীঠে ও মাটিতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেছে দেখিতে পাইল। ঘাড় ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল—কি ভয়ঙ্কর! স্ত্রীলোকটা ছোরা দিয়া সেই পুরুষের মাংস কাটিয়া খাইতেছে।

তাহাকে পিশাচী বা রাক্ষসী মনে করিয়া, ভূমিতে আছাড়িয়া মারিবার অভিপ্রায়ে তাহার নূপুর পরা একটা পা ধরিল। সেও বেগে পা ছিনাইয়া লইয়া তখনই শূন্যে উঠিয়া অদৃশ্য হইল। টানাটানিতে নূপুরটা অশোকদত্তের হাতেই রহিয়া গেল। দুর্জ্জন সঙ্গতির ন্যায় সেই রমণীকে প্রথমে মধুরা, মধ্যে কুৎসিতাচারিণী, ও অন্তে বিকৃতরূপে বিনষ্ট ভাবিয়া, এবং হাতে সেই দিব্য নূপুরটা দেখিয়া অশোকদত্ত বিস্মিত, দুঃখিত ও আনন্দিতও হইল। তারপর সেই নূপুরটা লইয়া, শ্মশান হইতে বাসায় গেল। প্রাতঃকালে স্নান আহ্নিক করিয়া রাজবাটীতে গেলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহাকে জল দিয়াছিলে? অশোকদত্ত সেকথার উত্তর না দিয়া, রাজার হাতে সেই নূপুরটা দিল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোথায় পাইলে? অশোক তখন রাত্রির সেই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত কাহিনী কহিল। রাজা তাহার এই অসাধারণ সাহসের কথা শুনিয়া তাহার উপর অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন। নিজে সেই নূপুরটা লইয়া গিয়া মহিষীকে দিলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্তও শুনাইলেন। মহিষী সকল কথা শুনিয়া সেই দিব্য নূপুর দেখিয়া আহ্লাদে যেন সহস্রমুখী হইয়া অশোকদত্তের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

রাজা মহিষীকে বলিলেন—কি জাততে, কি রূপে, কি গুণে, কি বিদ্যায়, কি বলে, কি সাহসে, কি সত্যবাদিতায় অশোকদত্ত মহৎদিগের মধ্যেও মহত্তম। সে যদি আমাদের কন্যা মদনলেখার বর হয় তাহা হইলে পরমসৌভাগ্য মনে করি। বরের এই সব গুণই দেখা আবশ্যক। ধন ত চিরস্থায়ী নহে। বিশেষতঃ গুণ না থাকিলে কেবল ধন অনিষ্টকরই হইয়া থাকে। অতএব আমি অশোকদত্তকেই কন্যাদান করিব, ইচ্ছা করিতেছি। তোমার কি মত?

রাণী রাজার কথা শুনিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বেশ কথা! অশোকদত্তই মদনলেখার উপযুক্ত বর। মদনলেখা তাহাকে একদিন বাগানে দেখিয়াছিল। সেই দিন হইতে সেও তাহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছে। সর্বদা অন্যমনস্ক থাকে, ভাল করিয়া কিছুদেখে না, মনদিয়া কাহারও কথা শুনে না, রুচিপূর্ব্বক আহারও করে না। তাহার

সখীদের মুখে এ সব কথা শুনিয়া আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। একদিন শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, একটি দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি আসিয়া আমাকে বলিতেছেন—"বৎসে! মদনলেখাকে অন্যবরে দিও না। সে পূর্ব্বজন্মে অশোকদত্তেরই পত্নী ছিল। তখনই নিজে গিয়া মদনলেখাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য স্বপ্নের কথা শুনাইলাম। এখন আপনিও নিজে যখন সেই কথা বলিতেছেন, তখন শুভকর্ম্ম শীঘ্রই সম্পন্ন করুন।

রাণীর কথা শুনিয়া রাজা পরম পরিতুষ্ট হইয়া শুভদিনে, শুভক্ষণে, মহাসমারোহে অশোকদত্তকে কন্যাসম্প্রদান করিলেন। তাঁহারাও মনোমত পতিপত্নী পাইয়া পরম সুখী হইল।

ক্রমশঃ—

আশীর্ব্বাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কাব্যব্যাকরণসাংখ্যপুরাণতীর্থ।

পুষ্পচয়ন করাটাও ছিল তার নিত্যকাজের মধ্যে এক কাজ। প্রত্যহ পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সে শয্যাত্যাগ করিত, তারপর শৌচাদি সমাপনান্তে হাত মুখ ধুইয়া বাগানে যাইত। হাতে তার ফুলের সাজি, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, আর গায়ের উপর সেই কাপড় খানারই অগ্রভাগ সযত্নে সংরক্ষিত। উষাকালের মৃদুল পবন তাহার নিদ্রা জড়িত ক্লান্ত শরীরে স্বাস্থ্যের আলিপনা লেখিয়া দিয়া যায়, বিহঙ্গমকুলের অব্যক্ত মধুর ধ্বনি তাহার কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করে, বাগানভরা ফুলরাশি তাহার হাসিরাশিতে স্বর্গীয় সুরভি ছড়াইয়া দেয়; মনঃ প্রাণ পুলকে নাচিতে থাকে। আহা কি শান্তি! কি শান্তি!!

ফুলতোলা শেষ হইতে তাহার প্রায় একঘণ্টা কাল চলিয়া যায়। এই এক ঘণ্টা কাল যে বৃথাই বায়িত হয় তাহা নহে। প্রত্যহ ফুল তুলিতে তুলিতে বালকের মনে এক নূতন খেয়াল জাগিল। সে ভাবিল "গুরুদেবের পূজার ফুল আমাকেই রোজ রোজ তুলিতে হয়, আর অপরাপর ছেলেরা এই সময়ে তাদের পাঠ মুখস্থ করে! আচ্ছা দেখাই যাক্ না।" গুরুদেব এককালে কলেজের প্রফেসর ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে নিজের বাটীতেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার আশ্রয়ে সাত আটটী দরিদ্র ছেলে বাস করিয়া বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তিনি নিজে টোলের ছেলেদিগকে কাব্য ও দর্শনশাস্ত্র পড়ান।

বালকের মনে সময়ের মূল্য জাগিয়া উঠিল। পরের দিবস হইতে বালক ভোরের বেলা বাগানে আসে এবং ফুল তুলিতে তুলিতে তাহার পূর্ব্ব দিবসের সমস্ত পড়া নিজে নিজেই

আবৃত্তি করে। উত্তর দিকের শেফালিকা গাছটা তার খুবই প্রিয়, সে মাটির ফুলগুলি কুড়াইতে কুড়াইতে গাছটাকে সাক্ষ্য করিয়া তাহার ইতিহাসের পড়াগুলি মুখস্থ বলে। শিউলী গাছটাই যেন তার শরৎকালের ইতিহাসের শিক্ষক। তারপর পশ্চিম কোণের রাঙ্গা জবাফুলের গাছটী। এর কাছে আসিয়া বালক তাহার ইংরেজী পড়াগুলি অতি মনোযোগের সহিত গাছটাকে শুনায়। পড়া-ই-বা আর কত? প্রত্যেক বিষয়ে ১২।১৪ লাইনের বেশী নয়। ওদিকে পূর্ব্ব ধারে অপরাজিতা লতাবেষ্টিত সুন্দর এক টগর গাছ। সাদা ও নীল অসংখ্য ফুল উহাতে ফুটিয়া রহিয়াছে; মনে হয় যেন প্রয়াগতীর্থে স্বচ্ছ শুভ্র ভাগীরথীর বারিরাশির সঙ্গে যমুনার নীল সলিলরাশি মিশামিশি হইয়া রহিয়াছে, মনে হয় যেন রজত-গিরিনিভ মহাদেবের বিশাল বপুর সঙ্গে নীলোৎপলদলপ্রভ নারায়ণের অনিন্দ্য সুন্দর দেহকান্তি আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছে। ভাবে বিভোর বালক ঐ গাছ দুটিকে প্রণাম করিয়া উহাদের নিকট সংস্কৃত শব্দরূপ ও জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা মুখস্থ বলে। সে যে এখন সপ্তম মানের ছাত্র। এই প্রকারে সে ভিন্ন ভিন্ন পড়া শিক্ষা করে। এখন এক ঘণ্টার স্থানে দেড় ঘণ্টা চলিয়া গেলেও সে তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি মনে করে না। অমরকোষ প্রায় মুখস্থ হইয়া আসিয়াছে।

বাগানের বৃক্ষ-শিক্ষকদের নিকট পড়া ঠেকিলে সে ঘরে যাইয়া পুস্তক-মাষ্টার খোজে এবং তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া ফেলে; কোন্ স্থানটায় সে পড়া বলিতে পারে নাই। পুস্তক মাষ্টার মূল কথাগুলি সমস্তই বলিয়া দেয়। তারপরেও যদি কোন স্থানে অর্থ বুঝিবার প্রয়োজন হয় তবে স্কুলের শিক্ষক মহোদয় সমস্ত সংশয় ভঞ্জন করিয়া দেন। গুরুর প্রতি তার অতুল শ্রদ্ধা। আহা কি শান্তি! কি শান্তি!! ফুলতোলা শেষ হইয়া গেলে সে ধীরে ধীরে অতি শান্তচিত্তে নিজের পাঠস্থানে বসিয়া নূতন পাঠ আগাগোড়া অভ্যাস করে। প্রখর মেধা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তি তাহাকে যেন বলিয়া দিত "বাপু হে এই স্থানটা মুখস্থ করিয়া রাখ, ভবিষ্যতে কাজে আসিবে। আর ঐ স্থানগুলি মনে মনে আয়ত্ত করিয়া রাখ সমগ্র পুস্তক পাঠে সহায়তা করিবে এবং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা পাইবে।

ভাবী উন্নতির চিহ্ন শৈশবেই প্রকাশ পায়। বালক নিজের শ্রেণীতে প্রত্যহ প্রথম প্রথম থাকিয়া বৎসরান্তে পুরস্কার লাভ করে, অপরাপর বালকগণ হা করিয়া চাহিয়া থাকে। তাহাকে যে সমপাঠী ছাত্রদের মধ্যে কেহও হিংসা করিবে তেমন সুযোগ ছিল না। সে যে হিংসা-দ্বেষের অনেক উপরে। সে যখন যে শ্রেণীতে পড়ে, তখনই সেই শ্রেণীর পড়া শেষ করিয়া বাহিরের আরও কত শত জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের আলোচনা করে। উপরের তিন শ্রেণীর ছাত্রও বাহিরের জ্ঞানে তাহার সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারে না। স্কুলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে টোলের পড়াতেও যত্নবান্ ছিল।

বালকের কি সৌভাগ্য। ভোরের বেলায় গুরুদেবের জন্য পুষ্পচয়ন তাহাকে এমন আসক্ত করিয়াছিল যে, সেই আসক্তির বলে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল বহু বহু গুণ নিজের

মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছিল। প্রাতঃকালীন শীতল বাতাস তাহার শরীরকে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মপটু করিয়াছিল; কুস্তি কসরৎ ও খেলায় তাহার সঙ্গে আটিয়া উঠে তেমন বালক কমই ছিল। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জাগরণের ফলে তাহার স্মরণশক্তি এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহাতে মনে হয় স্বয়ং ব্রহ্মা যেন তাহাকে চতুর্ম্মুখে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন। বাগানের অফুরন্ত সৌন্দর্য্য তাহার হর্ষোচ্ছ্বাসপূর্ণ সুকোমল চিত্তে কবিত্বের রেখাপাত করিয়া দিয়াছে। সে আপন খাতায় কত ইংরেজী, কত বাঙ্গলা কবিতারাশি লিখিয়া ভরিয়া রাখিয়াছে। সে উহা এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও দেখায় নাই, সব জমায়েৎ বস্তু হইয়া আছে। ভ্রমরার গুঞ্জন, বিহঙ্গের কুজন তাহার বালকোচিত মধুর কণ্ঠে সুরলহরীর তান লয় মান শিখাইতে লাগিল। সে এখন নিজের রচিত সঙ্গীত নিজেই গাহিয়া বেড়ায়; শ্রোতা থাক্‌বা না থাক, কি আসে যায় তাতে!

এই সময় হইতেই তাহার মন নির্জ্জনপ্রিয় হইয়া উঠে। মুখে কথা কম, অথচ কি প্রকারে বড় হইবে সর্ব্বদা এই চিন্তা। স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ কালে ইংরেজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধ রচনা আবৃত্ত করিতে করিতে চমৎকার বক্তৃতা ভঙ্গী জন্মিয়া গেল। ছোট ছোট মাসিক পত্রিকায় নিজের লিখিত রচনা ছাপাইয়া দ্বিগুণ উৎসাহ সঞ্চিত হইল।

একদিন গুরুদেব ডাকিয়া বলিলেন "বৎস রত্নেশ্বর! কাল অবধি আর তোমাকে আমার জন্য ফুল তুলিতে হইবে না, কালীকিঙ্কর ফুল তুলিবে।" রত্নেশ্বর গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিল "আচ্ছা গুরুদেব, কালীকিঙ্করও তুল্‌বে আমিও তুলব। কিভাবে ফুল তুলিতে হয় তাহা আমি কালীকিঙ্করকে শিখাইয়া লইব।" গুরুদেব অসন্তুষ্ট হইলেন না। রত্নেশ্বরের কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অন্য প্রকার। সে তাহার চিত্রের খাতাখানা নানারকমের চিত্রবিচিত্র চিত্রে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছিল; তিনটি ছবি এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এই ছবি তিনটি সম্পূর্ণ না হইলে সে যে ফুল তোলার মায়া কাটাইতে পারে না। ফুল তোলার সঙ্গে এই ছবি আঁকার বিশেষ একটা সম্বন্ধ ছিল।

(১) বাগানের ঠিক মধ্যস্থলে অতি সুন্দর একটি গোলাপ গাছ। রত্নেশ্বর কখনও সেই গাছের গোলাপ ছিঁড়িত না। আজ সাত দিন হয় ঐ গাছে খুব বড় একটা গোলাপ ধরিয়াছে; এত বড় যে তেমন গোলাপ সে সেই বাগানে আর কখনও দেখে নাই। রত্নেশ্বর অতি মনোযোগের সহিত সেই গোলাপের চিত্রটি নিজের চিত্র পুস্তকে হুবহু অঙ্কিত করিয়াছে। শুধু রং দেওয়া বাকী। রংএর ভাজ দেওয়া সম্পূর্ণ হইলেই উহা শেষ হয়।

(২) বাগানে বসিয়া বোষদের বাগান বাড়ীটা খুব সুন্দর দেখায়। চারিদিকে গাছ পালা, তার মাঝে মাঝে নারিকেল গাছগুলি মাথা খাড়া করিয়া আকাশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, বুঝিবা আকাশের চিত্র বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া উহার সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের প্রবলইচ্ছা জন্মিয়াছে। রত্নেশ্বর এই দৃশ্যটি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আজ পর্য্যন্তও শেষ হয় নাই।

(৩) আর একখানা চিত্র বড়ই ভাবব্যঞ্জক। তখন শ্রাবণমাস, অনবরত বৃষ্টিধারা। আকাশের অবস্থা সর্ব্বদাই বায়স ডিম্ববৎ ঘোলাটে। মাঝে মাঝে গুর্ গুর গুর্ মেঘের ডাক হয়, চপলা চমকে আর সঙ্গে সঙ্গে বাগানের ময়ূরটা পেখম ধরিয়া নাচিতে থাকে। হরিণ শিশু তাহার দর্শক। বর্ষাকাল চলিয়া গেলে এই মধুরদৃশ্যের মনোহর ভাব কিছুই মনে থাকিবে না; অথচ চিত্রটিও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে এই চিত্রগুলি সম্পূর্ণ না হইলে যে, রত্নেশ্বর ফুল তোলার মায়া কাটাইতে পারে না।

(মধ্যাহ্ন)

জীবনের মধ্যগগনে রত্নেশ্বরের প্রতিভারবি উজ্জ্বলতার শেষ সীমায় পৌছিয়া, চারিদিকে এমন উজ্জ্বল যশোরাশ্মি ছড়াইয়া দিয়াগেল যাহার প্রভাবে শুধু তাহার নিজেরজেলা নহে, সমগ্র বঙ্গদেশ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মনীষার মূর্ত্তিমান ছাব, সরলতার কোমল আধার, গুণের অসীম সাগর, বিদ্যারত্নের একচ্ছত্র রত্নেশ্বর চিরস্থায়িনী কীর্ত্তির অধিপতি হইলেন। কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন ত করিলেনই—তদুপরি সমাজনীতি, দেশনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠানে রায়বাহাদুর রত্নেশ্বরের আন্তরিক সহানুভূতি ও ব্যাগ্রতা এবং অর্থসাহায্যও প্রয়োজন হইত। গীত বাদ্য চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যার মজলিসে, দেশীয় বিজ্ঞান ভাণ্ডারে যেখানে যেরূপ সাহায্য প্রয়োজন তিনি সেখানে তাদৃশ সাহায্য করিতেন। এই প্রকারে তাহার অর্জ্জিত সমস্ত অর্থ দানাদি সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইত। কখন কখন আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া যাওয়ায় তাহাকে আত্মকৃত অব্যবস্থার দরুণ নিপীড়িত হইতে হইয়াছে। কূপ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহ সংস্থাপন মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, স্থানে স্থানে টোল এবং বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি বিবিধ সৎকার্য্যে দান তাহার মুক্ত হস্ত ছিল। অর্থ হস্তগত হইলেই তাহার দান-কণ্ডুয়ন জ্বালাময় হইয়া উঠিত, নিমেষ মধ্যে সেই আধগত অর্থ সদ্ব্যবহারে স্থান পাইত। ইহাতে সরস্বতীর মানমর্য্যাদার হ্রাস পাইল না বটে কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মীদেবীর আসন টলটলায়মান হইল। অন্নদাতা অধ্যাপকের প্রভাব রত্নেশ্বরের চরিত্রে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছিল। এম্,এ পরীক্ষার বৎসর সাংখ্যদর্শনের উপাধিপরীক্ষায়ও পাশ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ গুরুদেব স্বর্গীয় হইয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধকালে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন। আরও কতলোক কত রকমে উপকৃত হইয়াছে তাহার অন্ত নাই ॥ • ॥

(সায়াহ্ন)

মহাত্মালোকেরও শত্রুর অভাব নাই। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন, "আমার কোনও অপরাধ নাই, এই মনে করিয়া নিঃশঙ্কে কালযাপন চলে না; নৃশংসব্যক্তিগণ গুণীব্যক্তিকেও আকুল করিয়া তোলে।" রত্নেশ্বর রাবুর শেষজীবনে বৈরিদলের ভীষণ কাপট্যে, প্রবঞ্চকদিগের অমানুষিক জালিয়াতিতে তাঁহার বিরুদ্ধে ঘোরতর ষড়যন্ত্রের সূচনা হয়। জ্ঞাসত্ভির্পের তুলা

শত্রু নাই। এই সর্প দুগ্ধ কদলী প্রভৃতি বিবিধ উপাদেয় খাদ্যে উপপোষিত হইলেও সুযোগ পাইলে জ্ঞাতিপ্রভুর প্রাণসংহার করিতে ভালমন্দ বিবেচনা করে না, পূর্ব্বপ্রাপ্ত উপকার বিস্মৃত হয়। জ্ঞাতি রত্নেশ্বর অশেষ বিপদ সহ্য করিয়াছেন,শতবিপদেও তিনি নির্ব্বিকার সদানন্দ মহাপুরুষ। মহাত্মার যাবতীয় গুণই তাহাতে পরিলক্ষিত। "বিপদকালে ধৈর্য্য, উন্নতির সময়ে নিরভিমানিতা, সভাতে বাগ্মিতা, বিগ্রহকালে বিক্রম প্রকাশ, যশোলাভে আকাঙ্ক্ষা ও বিদ্যার্জ্জনে আসক্তি, এইগুলিই মহাত্মা ব্যক্তির স্বভাবসিদ্ধ গুণ।

একদা সত্যসত্যই দুর্ব্বৃত্তদানবদল দেবতাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তিন হাজার টাকা দাখিল করিতে না পারিলে তাহার স্বোপার্জ্জিত পল্লীবাসভূমি নীলাম হইয়া যাইবে। উঃ কি ভীষণ চক্রান্ত! পাপিষ্ঠদের যে নরকেও স্থান নাই। রত্নেশ্বর বাবুর সদানন্দময় আননে আজি ভাবনার কালিমা-রেখা প্রকটিত। ভগবদুন্মুখ উন্নতমনকে সংসারের বিষয়বাসনা দৃঢ় আকর্ষণ করিতেছে। তিনি করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া চেয়ারে বসিয়া চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক রত্নেশ্বর বাবুর পদতলে তিন হাজার টাকার নোটের তাড়া স্থাপন পূর্ব্বক তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। বিস্মিত রায় বাহাদুর চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —

"কে" এ—শিবপ্রসাদ না ?"

"আজ্ঞে হাঁ আমি, শিবপ্রসাদ।"

"ও কি রাখ লে তুমি ?"

"ও আমার ঋণ পরিশোধ।"

"বুঝতে পারলেম না।"

"তা আপনি বুঝ্‌তে পারবেন না। আপনি যে ও সমস্ত দোষের বাহিরে। প্রতিদানের আশা না রেখে দান করাই যে আপনার মহদ্ ব্রত ছিল। কাজেই আপনি মনে ক'রতে পারছেন না যে এই অধম একদিন আপনারই সাহায্যে বিষম দারিদ্র্য দুঃখ লঙ্ঘন ক'রে বি-এ পাশ করেছিল। আপনার তিনশ টাকা আমার তিনলক্ষ টাকার কাজ করেছে।"

তাইতেই বুঝি তুমি টাকা গুলো ফিরিয়ে দিতে এসেছ? নিয়ে যাও বল্‌ছি। আমি উহা গ্রহণ করব না।"

"শুধু তাই নয়, আপনারই সুপারিশপত্রের জোরে আমি মুন্সেফী পেয়েছিলাম; তা নৈলে আমি পরিবার সহ ধনে প্রাণে মারা যেতাম। আপনি আমার প্রাণদাতা, আমার সমস্ত পরিজনের জীবন রক্ষক। আপনারই প্রসাদে আমি এখন জিলার সবজজ্।

রায়বাহাদুরের স্বর নামিয়া আসিল, তিনি চক্ষুদুটি বুজিয়া উপরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন "অত শত আমি বুঝি না শিবপ্রসাদ! আমার দ্বারা তোমার যদি কিছুমাত্র সাহায্য হ'য়ে থাকে তবে তা আবার ফিরিয়ে পাবার জন্যে হয়নি জেনো। যা করেন ভগবান আমরা নিমিত্ত মাত্র। ভগবানের বিধানে আজ আমি অমিতব্যয়িতার দরুণ রিক্তহস্ত ও অনুতপ্ত।

শিবপ্রসাদ জোড়হাতে অবনতমস্তকে বলিলেন "আপনার ঐ নিষ্কামকর্ম্ম আমি চিরদিনের নিমিত্ত স্বয়ং অনুকরণ করতে চেষ্টা করব। আপনার আদর্শ আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে থাকুক। কিন্তু আমার তখন প্রতিজ্ঞা ছিল জানবেন "যদি সময় পাই তবে একদিন না এক দিন আপনার ঋণ শোধ করবই করব। আজ সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। আমি আর ঋণী থাকতে ইচ্ছুক নই। এই টাকা গ্রহণ না করলে আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় জানবেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ মহাপাপ, ইচ্ছাপূর্ব্বক অপরকে সেই পাপে পাপী করিলে নিজেও পাপের ভাগী হবেন না।"

"একি কথা শিবপ্রসাদ ?"

"এ আর বেশী কিছু কথা নয়। ঐ টাকার মালিক আপনি স্বয়ং, তিন লক্ষের স্থানে মোটে তিন হাজার বড়ই অকিঞ্চিৎকর।

তখন রায়বাহাদুর ক্ষণকাল কি ভাবিয়া তার পর বলিলেন "শুন শিবপ্রসাদ তোমার উন্নত মনকে ওজন করে মেপে আমি সম্প্রীতির জন্য এই অর্থ গ্রহণ করছি সত্য, কিন্তু এই ঋণ আমি চিরকাল রাখব না। এই লও হ্যাণ্ডনোট একমাসের মধ্যে তোমার তিনহাজার তোমায় ফিরিয়ে দেবো" এই বলিয়া রায়বাহাদুর একখণ্ড হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিলেন। শিবপ্রসাদ অশ্রু-চ্ছাসহে কম্পিতহস্তে হ্যাণ্ডনোট খানা গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উহার লাল কালিদ্বারা বড় বড় অক্ষরে লিখিলেন "আ শী র্ব্বা দ।" তার পর ইহা ভক্তিবিচলিত হস্ত যুগলের সাহায্যে মস্তকে ধারণপূর্ব্বক আবেগের সহিত বলিলেন "এক মাসের জন্যে বল্‌ছেন কি ? আপনার এই হ্যাণ্ডনোট আমার সমগ্র জীবনের জন্য আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হ'য়ে থাকবে। এই আশীর্ব্বাদের বলে যেন আমি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে আপনার মহদ্ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে পারি। আপনি আমার পাতা, পালক-পিতা। একবার সস্নেহ বচনে বলুন আমার জীবনটা যেন বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী না হয়; তিনশতের পরিবর্ত্তে যেন তিন লক্ষ টাকা নিরন্নকে অন্নদান করে, বিদ্যার্থীকে সাহায্য ক'রে পরিশোধ করতে পারি। ভগবান সুমতি দাও।

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজ।

তৃতীয় বর্ষিক অধিবেশন।

গত ২৪শে, ২৫শে, ও ২৬শে শ্রাবণ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজের তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশন সম্পর্কে তিনদিনের কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, অদ্য ২৭শে শ্রাবণ সাধারণ সভা ও বক্তৃতাদি হইয়া এই অধিবেশন পরিসমাপ্তি হইবে।

প্রথম দিন।

২৪শে শ্রাবণ পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ বিগ্রহের উপর ব্রহ্মণ্যদেবের পূজা ও সঙ্গীত হইয়াছেল। অপরাহ্ণ ৫॥ সাড়ে পাঁচটাতে সভাধিবেশন হয়; পণ্ডিত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন, পণ্ডিত হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত রাসমোহন বিদ্যারত্ন, পণ্ডিত শশিমোহন স্মৃতিভূষণ, পণ্ডিত রমেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ত-মীমাংসা-তর্কতীর্থ, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, এবং ঢাকার অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ শ্রীযুক্ত ফণিমোহন চট্টোপাধ্যায়, চতুর্থ সবজজ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, ষষ্ঠ সবজজ শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু গুপ্ত, মুন্সেফ শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেন, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ হিন্দু সন্তানগণের সম্মিলনে সভার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ব্রাহ্মণসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাব এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সমর্থন ও অনুমোদন মতে চুঁচুড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সীতানাথ বেদান্ত-শাস্ত্রী মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে প্রথমে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় স্বরচিত "ব্রাহ্মণ" শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করিয়া সমবেত সভাগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন; তাঁহার কবিতার ভাষা ও ভাব সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তৎপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীছাত্র এবং ভাটপাড়ার স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম,এ মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছেন; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম"। বর্ত্তমানসময়ে সমাজের অন্যান্য জাতির মধ্যে যে ব্রাহ্মণবিদ্বেষ দেখাদিয়াছে কি উপায়ে তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, ব্রাহ্মণজাতির পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা হইতে এখন আমরা কত নীচে আসিয়া পড়িয়াছি, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের স্বরূপ কি এবং কি উপায়ে আমরা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার জাতীয় গৌরবে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি, এসকল বিষয় আলোচনা করিয়া ন্যায়তীর্থ মহাশয় প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের বক্তব্য শেষ হইলে, ঢাকার চতুর্থ সবজজ শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় মহোদয় বলেন যে, ব্রাহ্মণজাতির বর্ত্তমান অবস্থায় এখন কেবল পূর্ব্বগৌরবের কথা কীর্ত্তন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলে চলিবে না, বর্ত্তমান সময়ের প্রতিযোগিতায় পরাঙ্মুখ না হইয়া আমরা কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারি, এ কালে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে; সে সকল বিষয়ের বিশেষ আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই এখন একমাত্র আবশ্যক। জানকী বাবু অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহার বক্তব্য যে ভাবে প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহা সকলেরই প্রীতিজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতার প্রতিবাদ করিলেন।

ইহার পর বক্তৃতা করিয়াছেন, বর্ত্তমান বঙ্গের প্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও গোপাল বসুমল্লিক ফেলোশিপের লেকচারার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়। মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় ছিল "অদ্বৈতবাদ" বেদান্তশাস্ত্রে তাঁহার যেরূপ অসাধারণ অধিকার, বক্তৃতাও তেমনি সারগর্ভ হইয়াছিল; অধিকন্তু, ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতায় এবং তুলনামূলক গল্পবাহুল্যে বেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বৈতবাদের মত অতিদুরূহ বিষয়ও শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, এবং সকলেই এক বাক্যে সেই বক্তৃতার প্রশংসা করিয়াছেন। প্রারম্ভে মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, জানকীবাবু পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের উক্তিতে প্রণিধান না করাতেই এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিরর্থক নহে, উহা বিলুপ্ত শক্তির পুনরুদ্ধার উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। উদাহরণ দ্বারা বক্তা কথাটা বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি অদ্বৈতবাদ বলিতে কি বুঝায়, কেমন করিয়া পরিদৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং একমাত্র অদ্বৈত-তত্ত্বই নিত্য সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, দ্বৈতত্ব, বহুত্ব প্রভৃতি সমস্তই অদ্বৈত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অধিকারিভেদে সে সকলেরও যে সার্থকতা আছে, উপনিষদ ও দর্শনশাস্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা মহামহোপাধ্যায় সে সকল তত্ত্ব সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতান্তে রাত্রি প্রায় ৯৷৷টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিন।

২৫শে শ্রাবণ পূর্ব্বাহ্ণ ৭টাতে শ্রীযুক্ত রাইমোহন গোস্বামী মহাশয় নারায়ণের ধ্যানমূলক স্বরচিত সঙ্গীত গাইয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিবিধান করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন মহাশয় কর্তৃক গার্হস্থ্যধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু কোন কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায়, সকলের অনুমোদনমতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় বর্ণাশ্রম ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা সময়োপযোগী ও সারগর্ভ হইয়াছিল।

অপরাহ্ণ ৫৷৷টাতে পুনরায় সভাধিবেশন হয়। এ দিনও সহরের গণ্যমান্য হিন্দুসন্তান এবং শ্রীযুক্ত গুরুনাথ তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রমুখ কতিপয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় ভক্তিযোগ সম্বন্ধে সুললিত বক্তৃতা করিয়া ভাবপ্রবণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। ভক্তি শব্দের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অর্থ কি, কোন্ কোন্ শাস্ত্রে কোন্ কোন্ আচার্য্য কর্ত্তৃক ভক্তি কিভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, একমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ব্যতীত শ্রুতিতে ভক্তি শব্দের ব্যবহার না থাকিলেও পুরাণাদিতে ভক্তি কি ভাবে বিস্তৃতি ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, শ্রীমৎ রামানুজাচার্য্য হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গোস্বামিপাদগণ পর্য্যন্ত কে কিভাবে ভক্তির রসাস্বাদন করিয়াছেন, এ সকল বিষয় বক্তা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

তৎপর রাত্রি ৭॥টাতে বর্ত্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয়ছিল "বেদ"। মহামহোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমেই বলেন, তাঁহার বক্তব্য বিষয়টী এমন মহান যে, তিনি কোথা হইতে ইহা আরম্ভ করিবেন ও কোথায় বক্তব্য পরিসমাপ্ত হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। কত বার যে বেদ কত ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ব্রাহ্মণজাতি প্রথমে অগ্নিহোত্রী ছিলেন, এবং তাঁহাদের নিত্য অনুষ্ঠানের যজ্ঞের জন্যই বেদের প্রয়োজন হইত। যজ্ঞের নিমিত্ত তিন বেদই মুখস্থ না রাখিলে চলিত না; কারণ যজ্ঞের অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক ও উদ্গাতা যথাক্রমে যজুঃ, ঋক ও সামবেদে অভিজ্ঞ না হইলে যজ্ঞ করা যাইতে পারে না। কালক্রমে বৈদিক মন্ত্রাদি সমস্ত স্মরণ রাখা সম্ভবপর হয় নাই, এবং অগ্নিহোত্রীগণও তিনটী অগ্নির পরিবর্ত্তে একটীমাত্র অগ্নি রাখিয়া সাগ্নিক হ'ন। ইহার পর আমরা নিরগ্নি হইয়া পড়িয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক মন্ত্রাদিও বিস্মৃতিতে ডুবিয়া গিয়াছে। অতঃপর বক্তা বেদের বিভাগ, মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণভাগ, আরণ্যক, উপনিষদ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুজ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। সকলেই বিশেষ আগ্রহভরে সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিন।

২৬শে শ্রাবণ শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে কোন কার্য্য হয় নাই। অপরাহ্ণ ৫টাতে সভাধিবেশনের সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং যথাসময়ে বহু সম্ভ্রান্ত ও পদস্থব্যক্তি এবং অন্যান্য হিন্দুসন্তানগণের সমাগমে সভাস্থল পূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু এদিনের বক্তাদ্বয় শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম-এ এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ কলিকাতা হইতে অদ্যই আসায়—সময়মত সভাস্থলে আসিতে পারেন নাই। কাযেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের চিত্তবিনোদন কল্পে কিয়ৎক্ষণ সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়, এবং ময়মনসিংহ জিলাস্থিত বেতগড়ির জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যাভূষণ মহাশয় রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর সম্মিলন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, রাজেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে যদি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এইশ্রেণী বিভাগ রহিত করিতে না পারাযায়, তাহা হইলে এ জাতির অচিরধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

অতঃপর প্রায় সাড়েছয়টার সময় উল্লিখিত বক্তাদ্বয় সভায় আগমন করিলে, সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভার কার্য্যারম্ভের নিমিত্ত শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণজীউকে সভাপতি কল্পনা করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত তর্কতীর্থ মহাশয়কে বক্তৃতাপ্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তখন তর্কতীর্থ মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি, উহার উৎপত্তি হইল কিরূপে এবং আবশ্যকতাই বা কতটুকু, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়াই যে আমাদের অধঃপাতের একমাত্র কারণ, ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে জাতির সর্ব্বনাশ, এমকল

বিষয় আলোচনা করিয়া হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় আর্য্য সমাজের কোনও লোক হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কারের বিরোধী কতকগুলি অযৌক্তিক আপত্তিযুক্ত বিজ্ঞাপনী বিলি করিতেছিল। শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় উহার একখানি দেখিয়া এইরূপ অনুচিত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং বক্তা তর্কতীর্থ মহাশয় শাস্ত্রীয় যুক্তিপ্রমাণাদি দ্বারা ঐ সকল কথার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণজাতির জন্মগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। তর্কতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতায়ই অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তৎপর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, ট্রেণে রাত্রিজাগরণ ও এখানে আসিয়া অসময়ে আহার করার ফলে তিনি সুস্থ বোধ করিতেছেন না; কাযেই, আজ তিনি বিশেষ কিছু বলিয়া সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারিবেন না। এই বলিয়া তিনি গায়ত্রী উপাসনার মহিমা প্রদর্শনার্থ একটী ক্ষুদ্রগল্প বলিয়া ক্ষান্ত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। রামদয়াল বাবুর বক্তৃতা শুনিবার নিমিত্ত সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে শ্রাবণ রবিবার পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজের তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য পরিসমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় এবং ঢাকাবাসী হিন্দুসন্তানগণের সহানুভূতিতে এবারের অধিবেশন সর্ব্বথা সফলতা লাভ করিয়াছে বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

চতুর্থ দিন।

২৭শে শ্রাবণ প্রাতে প্রথমে কীর্ত্তন হইয়াছিল; শ্রীযুক্ত রাইমোহন গোস্বামী মহাশয়ের নেতৃত্বে তাঁহার পরিবারস্থ কতিপয় বালক সুমধুর কণ্ঠে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া সমাগতব্যক্তিবর্গের তৃপ্তিবিধান করিয়াছে। তারপর সাধারণ সভার অধিবেশন হয়, এবং সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজের গতবর্ষের কার্য্যকলাপ মধ্যে এ সহরে মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ নামে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে প্রতিষ্ঠান কিয়ৎকাল যাবত পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহার পরিচালকগণ হিন্দুসমাজবিগর্হিত আচরণাদি প্রচলনে যত্নবান হওয়াতে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজ তৎসম্বন্ধে বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তনির্ণয়ের নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্মাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধারমণ গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন মহোদয়দিগের সহিত মাধ্বগৌড়ীয় মঠের পরিচালকগণের যে প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সে বিচারে মঠ পরিচালকগণ তাহাদের আচরণ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা যথাযথরূপে সমর্থন করিতে সমর্থ হ'ন নাই, তাহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মণসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কার্য্যবিবরণীতে যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তৎপ্রতি ও ব্রাহ্মণসন্তানগণের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক, ব্রাহ্মণসমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের নিবেদন এইরূপ:—

"হিন্দুসমাজের অন্যান্য শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এখন যেরূপ অত্যধিক আগ্রহে স্ব স্ব প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইতেছে, অন্যান্য বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ যেরূপ প্রকট হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এই ভীষণ সংঘর্ষে ব্রাহ্মণবর্ণের অচিরবিলুপ্তি সর্ব্বথা সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই ব্রাহ্মণ জাতির কল্যাণ কামনা যাহারা করেন, তাঁহাদিগকে এখন আর নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এ সময় যদি ব্রাহ্মণসন্তানগণ সত্বর সম্মিলিত হইয়া আত্মরক্ষার উপায়নির্দ্ধারণ না করেন, এবং সেই নির্দ্ধারণ অনুসারে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় তরণী পরিচালন পূর্ব্বক যদি উহাকে নিরাপদ বন্দরে লইয়া যাইতে সমর্থ না হ'ন, তাহা হইলে এই ভয়াবহ বিপ্লবের তরঙ্গ-ভঙ্গে পড়িয়া জীর্ণশীর্ণ ব্রহ্মণ্যতরী নিশ্চয়ই নিমজ্জিত ও নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। বিগত তিন বৎসরের অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত তিনটী কার্য্য এখন ব্রাহ্মণসমাজের অবিলম্বে অবশ্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার মধ্যে আত্মরক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণজাতির ভিতর সঙ্ঘশক্তির সঞ্চারই প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ জাতির ভাবী ভরসাস্থল বালকবর্গকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও উদ্‌ভ্রান্ততার উন্মাদনা হইতে রক্ষাকরার উপায় বিধান; তৃতীয়তঃ সংসারের সার অন্তঃপুরের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত বালিকা বা ভাবী জননীগণের মধ্যে কুশিক্ষা প্রবেশের পথ রোধ এবং সুশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা। এই তিনটী উপায় স্বরায় অবলম্বিত না হইলে, অচিরে এমন অবস্থার আবির্ভাব হইবে যে, তখন কালের প্রতিকূলপ্রবাহের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিবে।"

কার্য্যবিবরণী পাঠের পর বর্ত্তমানবর্ষের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমিদার ধানকোড়া। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদমোহন চট্টোপাধ্যায়, এডিসন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন্‌স্‌জজ ঢাকা; শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়, সবজজ ঢাকা; শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, জমিদার কালীপুর; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল শর্ম্মা, জমিদার লক্ষ্মীনারায়; শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল; শ্রীযুক্ত মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী অধ্যক্ষ শক্তি ঔষধালয়; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত মীমাংসা তর্কতীর্থ, অধ্যাপক শক্তি আশ্রম। অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত নানচাঁদ বিদ্যালঙ্কার, অধ্যাপক জগন্নাথকলেজ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত মুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক ঢাকাপ্রকাশ; শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উকীল। সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, অধ্যাপক সারস্বত টোল; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উকীল; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উকীল; শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এতদ্ব্যতীত কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণসন্তানগণকে লইয়া এক কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিও গঠিত হইয়াছে।

বারলাইব্রেরীতে সভা।

অপরাহ্ন ৪॥টাতে বারলাইব্রেরী হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়; সহরের সম্ভ্রান্ত

ও পদস্থ হিন্দুসন্তানগণ সাগ্রহে ঐ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, এবং জনসমাগমে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীযুক্ত রাইমোহন গোস্বামী সভার বর্ণনাসূচক সঙ্গীত করেন; তৎপর পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজ হইতে উক্ত গোস্বামী মহাশয়কে "সঙ্গীতাচার্য্য" উপাধি প্রদান করা হয়। সভাপতি, অধ্যক্ষ ও সম্পাদকদ্বয়ের স্বাক্ষরযুক্ত উপাধিদান-পত্র সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বামাচরণ বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক পঠিত এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক শ্রীযুক্ত রাইমোহন গোস্বামীর করে অর্পিত হইলে, গোস্বামী মহাশয় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় স্বকীয় অযোগ্যতার উল্লেখ করিয়া উপাধিপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়; শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ঢাকার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এডিসন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

এ দিন প্রথমে বক্তৃতা করিয়াছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়, এবং তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "সাকার উপাসনা ও জ্ঞানযোগ।" রামদয়াল বাবুর সারগর্ভ ও ভাবপ্রবণতায় হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গকে প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ রাখিয়াছিল। সাকার উপাসনাই যে জ্ঞানযোগের একমাত্র সোপান, গীতার জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণবাদ, সগুণের নির্গুণে পরিণতি, বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে সাধনানুষ্ঠান প্রভৃতি বহু বিষয়ে রামদয়াল বাবুর সুললিত আলোচনা সকলেরই প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা এবং বিদেশাগত প্রচারকগণের সাময়িক অবস্থানাদির জন্য ঢাকানগরীতে একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মনিকেতন স্থাপনের নিমিত্ত বক্তা হিন্দু-সন্তানগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

উহার পর বক্তৃতা করিয়াছেন, কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ মহাশয়; তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল "হিন্দুসমাজ"। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃতায় অনেক সময় অতিবাহিত হওয়াতে, তর্কতীর্থ মহোদয় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় হিন্দু-সমাজের অবস্থা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলেন যে, রামদয়াল বাবুর বক্তৃতার পর তাঁহার আর বিশেষ কোন কথাই বলিবার নাই; সকলে যদি রামদয়াল বাবুর উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন, তবেই কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন। অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মণসমাজের পক্ষ হইতে সভাপতি মহাশয় বক্তাদ্বয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে, রাত্রি প্রায় পৌণে নয়টাতে সভা ভঙ্গ হয়।

অনেকেই আর একদিন থাকিয়া বক্তৃতা করার জন্য শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন; প্রয়োজনানুরোধে তিনি কলিকাতা না যাইয়া পারিবেন না বলিয়া সেই অনুরোধ রক্ষায় অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, কিন্তু কোন কারণে পর দিন সোমবার তাঁহার কলিকাতা যাওয়া হয় নাই; কাযেই সেদিন সন্ধ্যা ছয়টাতে লক্ষ্মীবাজারে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর বাটীতে এক আলোচনা-সভা আহ্বান করা হয়, এবং সমবেত হিন্দুসন্তানগণের

সহিত প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে আলাপাদি করেন। ধর্ম্ম সভার নিমিত্ত স্থান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়া ধর্ম্মসভার স্থানসংগ্রহার্থ সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সাংখ্য-বেদান্ত-তর্কতীর্থ মহাশয়ও এবিষয়ে আলোচনা দ্বারা সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। অবশেষে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ স্থানসংগ্রহ বিষয়ে পরামর্শ করেন, এবং বিভিন্ন স্থানের কথা উত্থাপিত হইলে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার সমাজের সভাপতি মহাশয়ের উপর অর্পিত ও সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়।

কালীস্তুতি।*

(লেখক—শ্রীদুর্গাপদ কাব্যতীর্থ।)

কে তোমার অন্ত জানে মা অনন্তরূপিণী তারা।
বেদ বেদান্ত ভ্রান্ত হ'ল অশান্ত শিব আপনহারা॥
　　　　(তারা তোমার অন্ত পে'তে)
শিবে দিয়ে পদ-তরী, নাম ধ'রেছ শুভঙ্করী,
(তোমার) এ রহস্য বুঝ্‌তে নারি (মা) তাইতে ডাকি পরাৎপরা॥
　　　　(তোমার এ রহস্য তুমিই বোঝ')
লীলাময়ী তুমি তারা (মা) লীলায় তোমার জগৎ ঘেরা,
(তুমি) আপনাহ'তে গ'ড়ে আপন,
　　　　লীলার ছলে দেখাও ধরা॥
রবি শশী গ্রহ তারা, তোমারই প্রতিমা তারা,
হরি হর বিধিবর অভেদ তোমার লীলার ধারা॥
পুনশ্চ ভূয়োঽপি শ্যামে
　　　　প্রণমামিঃ হররমে,
চরণছাড়া ক'র'না মা
　　　　শরণোরে সারাৎসারা॥

---

* কীর্ত্তনাঙ্গ।

একখানি পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের জন্মের সেই প্রথমাবস্থা সেই গর্ভাধানের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত জীবনের এই আগাগোড়া সমস্ত কালই এক প্রকার আমাদের শিক্ষার কাল বলিতে পারি। কারণ সারা জীবন ব্যাপিয়াই আমরা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞাতসারে হউক অজ্ঞাতসারে হউক, কোন না কোন বিষয়ে, কিছু না কিছু শিক্ষা করিয়া থাকি। কিন্তু তাই বলিয়া উহা শিক্ষার মুখ্যকাল নহে। হাতে খড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া টোল বা স্কুল কলেজের পাঠ সমাপনের কালই শিক্ষার মুখ্যকাল। এই সময়ে যেরূপ শিক্ষায় দেহ মন যেভাবে গঠিত হয় সেই ভাবই জীবনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব শিক্ষা —যাহাতে সৎ শিক্ষা হয় —তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধও নাই।

সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে শিক্ষা দুই প্রকার। সাধারণ জ্ঞান লাভের জন্য যে শিক্ষা (অর্থাৎ) বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে যে জ্ঞান সহায়কারী স্বরূপ হয়, অথবা সংসারের যাবতীয় সাধারণ কার্য্য সম্পাদনার্থ যে জ্ঞানের আবশ্যক হয়) তাহাই সাধারণ শিক্ষা। এ শিক্ষা এক প্রকার ভাষা জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এবং এ শিক্ষা সকলের পক্ষেই এক প্রকার। বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য যে শিক্ষা তাহাই অসাধারণ শিক্ষা অসাধারণ শিক্ষা সকলের পক্ষে এক প্রকার নহে। সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি ভেদে নানা প্রকার।

সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাই প্রকৃতির অনুযায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। পৃথিবীর সকল স্থানই এক প্রকার গুণ বিশেষ নহে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার গুণে এবং গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান হেতু, প্রত্যেক স্থানই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। এমন কি একস্থান অন্যস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত গুণবিশিষ্ট। যেমন, কোনস্থান অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান; আবার কোনস্থান নাতি শীত নাতি গ্রীষ্মপ্রধান; কোনস্থানে মাত্র এক ঋতু দৃষ্ট হয়, কোনস্থানে ষড়ঋতুই বিদ্যমান; এইরূপ অনেক বিষয়েই সম্পূর্ণ বিপরীতভাব। জগতে কোন দুইটী স্থান সর্ব্বাংশে একরূপ নহে।

অতএব দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ও গুণবিশিষ্ট। সুতরাং প্রত্যেক স্থানের প্রকৃতিও বিভিন্ন। আবার বাহ্য প্রকৃতির সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ অতি নিকট। সুতরাং যিনি যে দেশে জাত তাঁহার প্রকৃতিও সেইদেশের প্রকৃতির অধীন। অতএব তাঁহার শিক্ষা, দীক্ষা, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সেই দেশীয় হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহা তাহার সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক হইবে অন্যথা মঙ্গলের সম্ভাবনা অতি কম।

স্ব প্রকৃতিতে অন্য প্রকৃতি প্রবেশলাভ করিলে উভয় প্রকৃতিতে দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা। দ্বন্দ্বের ফল বিকৃতি, বিকৃতির ফল বিনাশ।

অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপনার স্বদেশীয় ভাবে শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। অন্যথা আপনার জাতিয়তা বজায় থাকাই কঠিন। যেমন, ইংরাজের পক্ষে দেশে থাকিয়া, ইংরাজের মধ্যে ইংরাজের সংসর্গে বাস করিয়া, ইংরাজের ভাবে অনুপ্রাণীত হইয়া, একভাবে, এক আহারে, এক পরিচ্ছদে একরূপ স্কুলে একরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া একভাবে চরিত্র গঠিত হইলে তাহার ইংরাজত্ব বা তাহার স্বতন্ত্র বা তাহার অবস্থা বিশেষত্ব বজায় থাকিবার সম্ভাবনা। অন্যথায় তাহা থাকিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। বিস্তার করিয়া বলিবার ইহা স্থান নহে, কাযে কাযেই শুধু ইঙ্গিত মাত্র করিয়া যাইতে হইবে। আবার, ব্যক্তিগত ভাবে যে নিয়ম প্রযুজ্য, রূপান্তরে জাতিগত ভাবেও ঐ নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রযুজ্য। অতএব স্বদেশীয়ভাবে প্রত্যেকের শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে নিজেরও মঙ্গল দেশেরও মঙ্গল বটে।

যেমন ইংরাজের পক্ষে তেমনি মুসলমান বা অন্যান্য জাতির পক্ষেও ঐ নিয়ম তুল্যরূপে প্রযুজ্য। হিন্দুর পক্ষেও বটে। বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমীদের পক্ষে, তাহার অবশ্য কারণ আছে।

সুতরাং বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের পক্ষে দেশীয় যেরূপ শিক্ষা শাস্ত্রে বিহিত আছে, যেরূপ আচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে তাহার অবলম্বন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রানুরূপ শিক্ষা দীক্ষা, আচার নিয়ম অবলম্বন করিলেই আপনার অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, নইলে একবারে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে হবে তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই।

উহা হইল এক ভাবের কথা। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে কথাটী অন্য ভাবেও আলোচিত হইবার অধিকতর যোগ্য। হিন্দুর সকল বিষয়ই ত্রিগুণ লইয়া। ইহা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ লইয়াই সকল বিষয়ের ভাল মন্দের বিচার হইয়া থাকে। সত্ত্বই হইল ধর্ম্মের মূর্ত্তি, রজঃ আর তমঃ অধর্ম্মের মূর্ত্তি। সুতরাং রজঃ আর তমোকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্ত্বকেই সর্ব্বপ্রকারে আহরণ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণকে যিনি যে পরিমাণ অর্জ্জন করিতে পারিবেন তিনি প্রকৃত মনুষ্যত্বও সেই পরিমাণ লাভ করিবেন, এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যেও তিনি ততদূর উন্নত হইবেন। এইজন্য আহারে বিহারে, পরনপরিচ্ছদে, স্থানে, সংসর্গে, শিক্ষায় দীক্ষায়, আলাপে, কথাবার্ত্তায়, ভাষায়, অধ্যয়নে, ভাবনা-চিন্তায়—ইত্যাদি সকল বিষয়েই যাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে—তাহার উপায় করিতে হইবে। যে আহার্য্য সামগ্রীতে সত্ত্বগুণ নিহিত তাহাই সাত্ত্বিক আহার, তাহাই ভোজন করিতে হইবে; যে পরিচ্ছদে সত্ত্বগুণের ভাব মনের মধ্যে উদয় হয়, সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। যে স্থানে সাত্ত্বিক ভাব নিহিত, সেই স্থানে বাস করিতে হইবে; সাত্ত্বিক লোকের সংসর্গ করিতে হইবে; যে শিক্ষায়, যে অধ্যয়নে, যে আলাপে বা কথাবার্ত্তায় সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে, তাহাই শিক্ষা, তাহাই অধ্যয়ন, তাহাই আলাপ করিতে হইবে; যে ভাষা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট

সেই ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে; সাত্ত্বিক ভাবনা ভাবিতে হইবে; ইত্যাদি সকল বিষয়েই যাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে তদ্রূপ কার্য্য করিতে হইবে।

উহাই হইল মন্ত্র ভাবের কথা। এবং এই কথাই হিন্দুর পক্ষে—বর্ণাশ্রমীর পক্ষে—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির পক্ষে বিশেষ ভাবে প্রযুজ্য। তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পক্ষে এক চুলও এদিক ওদিক হইবার উপায় নাই হইলেই তাঁহার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া কুৎসিত ভাব বা বিজাতীয় ভাব অলক্ষিত ভাবে তাঁহার দেহের ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে; যত প্রবেশ করে, তত তাঁহার পবিত্রতা নষ্ট হয়, ততই তিনি ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইয়া পরিশেষে অধঃপতিত হয়েন।

অতএব ব্রাহ্মণ যদি তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার বিদেশী বিজাতীয় শিক্ষা একবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে, এবং আপনার স্বদেশী শাস্ত্রীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শাস্ত্রীয় শিক্ষাই পবিত্র সাত্ত্বিক শিক্ষা, তাহাই ব্রাহ্মণের পক্ষে অবলম্বনীয়, অন্যান্য শিক্ষা তাহা নহে, সুতরাং তাহা বর্জ্জনীয়। ইংরাজী, ফরাসী, লাটীন, গ্রীক, আর্বী, পার্শী ইত্যাদি ভাষা ত্যাগ করিয়া, পবিত্র সাত্ত্বিক দেব ভাষা সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইবে। তারপর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণপূর্ব্বক আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে; চিরজীবনের তরে সান্ধ্যাহ্নিক জপতপ ও আধ্যাত্মিক আলোচনাই তাঁহার জীবনের ব্রত হইবে; চাকরীর চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইবে না, আজীবন ব্রাহ্মণের যাহা বৃত্তি তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবন কাটাইতে হইবে; এইভাবে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে জীবনকে চালাইতে পারিলেই আপনার অস্তিত্ব বজায় থাকিবে, অন্যথা কিছুতেই তাহা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি যে পরিমাণ বিজাতীয় ভাবে ভাবিত হইবেন, তিনি অধঃপতিতও সেই পরিমাণ বুঝিতে হইবে। ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে বিস্তারিত কথা। বলা বাহুল্য অন্যান্য কথার মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর আছে।

(৩)

এক ধুয়া উঠিয়াছে—জ্ঞান যেখান সেখান হইতে আহরণ করা যাইতে পারে, বিদ্যা যেখান সেখান হইতেও যে সে ভাবে থাকিয়া উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। অবশ্য যাঁহারা ইহা বলেন তাঁহাদের পক্ষে উহা খাটিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের হিন্দুর পক্ষে, বর্ণাশ্রমীর পক্ষে উহা খাটিবে না; তাহার প্রকৃষ্ট হেতু আছে।

ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমীগণ জগতে এক অভিনব জীব। এ জীবের কাহারও সহিত মিল নাই, সাদৃশ্য নাই! আহারে, বিহারে, পরণপরিচ্ছদে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, আচার নিয়মে, ভাবনাচিন্তায় ইত্যাদি যে দিকেই দৃষ্টিপাত করুন না কেন, কোনদিকেই কাহারও সহিত কোন মিল নাই, পরন্তু গরমিল সর্ব্বত্র এবং তাহা একরূপ আকাশ পাতাল। ইহা অনন্তকালই এইরূপ চলিতেছে। অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, এবং ভবিষ্যতেও

থাকিবে। কোনকালেই ইহার পরিবর্ত্তন হইবে না। তবে যুগভেদে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ হইবে মাত্র, নতুবা মূলে কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।

যাক্ সে কথা। ইঁহারা (ভারতের বর্ণাশ্রমীগণ) জগতে এক স্বতন্ত্র জীব পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কাহারও সহিত কোনরূপ মিল বা সামঞ্জস্য নাই তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অপরের পক্ষে যাহা উপাদেয় খাদ্য, ইঁহাদের পক্ষে তাহাই অস্পৃশ্য, অপরের পক্ষে যাহা সুন্দর পরিচ্ছদ, ইঁহাদের পক্ষে তাহাই অতিশয় কুৎসিৎ, অপরের পক্ষে যাহা মনোহর সুগন্ধি, ইঁহাদের পক্ষে তাহাই অতীব ঘৃণিত পদার্থ; অপরের পক্ষে যে গীত বাদ্য অতিশয় চিত্তবিনোদক, ইঁহাদের পক্ষে তাহাই অশান্তিদায়ক, এক কথায় অপরের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া করণীয়, ইঁহাদের পক্ষে তাহাই অকর্ত্তব্যবোধে অকরণীয়; বাহ্য সকল বিষয়েই এইরূপ ব্যবস্থা সুতরাং বিদ্যা ও জ্ঞান সম্বন্ধেই বা অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে কেন? সে বিষয়েও ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়াই সুসঙ্গত। বিশেষতঃ যখন উভয়ের বিদ্যা ও জ্ঞানের লক্ষ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজনার লক্ষ্য বাহ্য জগতে, অন্যজনার লক্ষ্য অন্তর্জগতে। সুতরাং উভয়ের ব্যবস্থা কখনই একরূপ হওয়া সঙ্গত নহে।

অতএব বর্ণাশ্রমীর পক্ষে জ্ঞানলাভ যেখানে সেখানে থাকিয়া যে সে ভাবে হইতে পারে না। অন্য সকল জাতির পক্ষেই খাটিতে পারে, কিন্তু বর্ণাশ্রমীর পক্ষে খাটিবে না। অন্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত নাই, প্রাতঃকৃত্য নাই; প্রাতঃস্নান নাই, সন্ধ্যাবন্দনাদি নাই; তর্পণ শ্রাদ্ধ নাই; ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নাই, হবিষ্যান্ন গ্রহণ নাই; বেদপাঠ নাই; পূজা অর্চ্চনা নাই; বলি হোম নাই, ইত্যাদি কত কিছু নাই, তাহার ইয়ত্তাও নাই। হিন্দুর উহা আছে, এবং উহা তাঁহার নিত্য অনুষ্ঠেয়। অবশ্য উহা দ্বারা ভাল মন্দের বিচার করিতেছি না এবং সে বিচারের ইহা স্থানও নহে, প্রয়োজনও কিছু দেখি না। শুধু স্বরূপ নির্ণয় করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণই একমাত্র আলোচনার বিষয়।

সুতরাং অন্যের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও বর্ণাশ্রমীর পক্ষে যে-সে বিদ্যা বা জ্ঞান যেখানে সেখানে থাকিয়া যে-সে ভাবে উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। সঙ্গীত বিদ্যা, কলাবিদ্যা বিদ্যা হইলেও ব্রহ্মচারীর পক্ষে অনুষ্ঠেয় বিদ্যা নহে; রতিশাস্ত্রজ্ঞান, জ্ঞান হইলেও ব্রহ্মচর্য্যের নাশক; যুদ্ধবিদ্যা বিদ্যা হইলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ; কৃষিবিদ্যা বাণিজ্যনীতি বিদ্যা হইলেও ব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় বিদ্যা নহে; এইরূপ অন্যান্য সকলের পক্ষেই বিধি-নিষেধসূচক কথা আছে।

তাই বলিতেছিলাম ভারতের হিন্দুগণ—বর্ণাশ্রমীগণ জগতের মধ্যে এক অভিনব স্বতন্ত্র জীব। কাহারও সহিত ইহাদের কোন মিল নাই, সামঞ্জস্য নাই। বলা বাহুল্য মিল বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। এখানকার স্থানীয় প্রকৃতি স্বতন্ত্র; লোকের প্রকৃতি স্বতন্ত্র; জ্ঞানের লক্ষ্য স্বতন্ত্র; জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র -সুতরাং মিল বা সামঞ্জস্য থাকিবে কি করিয়া? থাকিতে পারে না। কাবেকাবেই সকলের পক্ষে কোন নিয়ম খাটিলেই, ইঁহাদের সম্বন্ধেও

অবশ্যই তাহা খাটিবে এমন কোন কথা নাই। পরন্তু না খাটিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব ঐরূপ ধুয়ার কোন মূল্য নাই।

(৪)

একস্থানে আক্ষেপোক্তি দেখিলাম—

"মুসলমানগণের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্বে যে ক্ষতি না হইয়াছে। ইংরাজগণের স্বল্পকাল ব্যাপী রাজত্বে তাহার অধিক ক্ষতি হইয়াছে অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মের ঘোর অবনতি হইয়াছে।"

ঠিক কথা। কিন্তু তাই বলিয়া অস্বাভাবিক নহে। যেমনটী হওয়া কর্ত্তব্য; তাহাই হইয়াছে। কেন এরূপ হইয়াছে? তাহার কারণ কি কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন? কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—অবাধ-সংসর্গ বা যথেচ্ছা মিলনই একমাত্র কারণ। পরস্পরের মধ্যে যত মিলামিসা হয়, বিভিন্ন জাতি হইলেও সকল প্রকার বাহ্যান্তর বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়,—ক্রমশঃ ঠিক এক হয়। হইয়াছেও তাহাই।

"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"—কথা আছে। সংসর্গের দ্বারা দোষগুণ প্রাপ্ত হয়। সংসর্গের শক্তি অতি প্রবল। প্রত্যেক পদার্থেই শক্তি নিহিত আছে। একত্র হইলেই পরস্পরের শক্তির বিনিময় হইতে থাকে। সাধুর সৎশক্তি অসাধুতে প্রবেশ করে, এবং অসাধুর অসৎ শক্তি সাধুতে প্রবেশ করে। যে শক্তি প্রবল হয়, তাহারই ক্রিয়া হইয়া প্রকাশিত হয়, অপরটি অভিভূত হইয়া থাকে, কোনই ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। এই জন্য দেখা যায় সাধুর দলে একজন অসাধু প্রবেশ করিলে সেও ক্রমশঃ সাধু হইতে থাকে, আবার, অসাধুর দলে একজন সাধু প্রবেশ করিলেও তিনিও ক্রমে অসাধু হইতে থাকেন।

মুসলমানগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেও তাঁহাদের সহিত হিন্দুগণ মেলামিসা খুব বেশী রকম করেন নাই, একটু স্বতন্ত্র ভাবেই থাকিতেন। তাহার কারণ মুসলমানগণের হিন্দুর প্রতি দারুণ বিদ্বেষ ভাব। মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে অতিশয় ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন। কাযে কাযেই হিন্দুগণ মুসলমানদিগের সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে মিসিবার সুযোগ পান নাই, স্বতন্ত্র ভাবেই ছিলেন, এবং তজ্জন্য অবনতিও অধিক হয় নাই।

কিন্তু মুসলমানগণের মধ্যেও আকবর আবার অতি উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুদিগকে অতি প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, উচ্চ রাজসম্মানে সম্মানিত করিতেন, কাযে কাযেই হিন্দুগণ ও তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার খুব পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মুসলমানগণের সহিত হিন্দুদের মিসিবার খুব সুযোগও ঘটে এবং মিলামিসাও খুব হয়। তাহার ফলে হিন্দুদের এতদূর নৈতিক অবনতি ঘটে যে, মুসলমানের করে কোন কোন হিন্দু কন্যা সম্প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। ইহা অতিশয় অতিরিক্ত বা যথেচ্ছা মিলামিসার ফল সন্দেহ নাই।

আকবরের পর তাঁহার বংশধরগণ ও যদি তাঁহারই (আকবরের) নীতিই অবলম্বন করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে বোধহয় মুসলমান রাজত্ব ও বিলুপ্ত হইত না, এবং হিন্দু ধর্ম্মেরও দারুণ শোচনীয় অবস্থা হইত।

কিন্তু সুখের বিষয় জাহাঙ্গির সাজাহানের পর দুষ্ট বুদ্ধি আওরংজীবের উদয় হয়। তিনি আকবরের সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অবলম্বন করেন। তাহার ফলে মুসলমান রাজত্বেরও ধ্বংশ হয়, এবং হিন্দুগণও মিলামিসার সেরূপ অবাধ সুযোগ অভাবে আপনাদের শোচনীয় আসন্ন অবনতি হইতে রক্ষা পায়।

সুতরাং বিজাতীয়ের সহিত অবাধ মিলনই স্বজাতীয় রীতি, নীতি, আচার নিয়ম প্রভৃতির ধ্বংশের কারণ দেখা যায়। সেই মিলনের প্রধান উপায় ভাষা। বিজাতীয়ের ভাষা শিক্ষা না করিলে তাঁহার সহিত মিসিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং ভাষাই হইল মিলনের প্রধান সোপান। অন্যান্য বহু সোপান ও অবশ্যই আছে। যাহা হউক আমরা সেই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া ইংরাজের সহিত মিসিয়া অহরহঃ তাহাদের সংসর্গ করিয়া তাহাদের হাবভাব রীতি নীতি শিখিয়া তাহাদের ভাবে এতদূর ভাবিত হইয়াছি যে, আপনার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু ভুলিয়া যাওয়া নহে, আর তাহা ভালও লাগে না—এমনই এক অদ্ভুত জীব সাজিয়াছি! আমাদের দুরদৃষ্ট!!

অতএব অবাধ মিলনই অবনতির কারণ। মুসলমান রাজত্বে মিলনের সুযোগ কমছিল বলিয়া দীর্ঘকালেও অধিক অবনতি হয় নাই, কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে মিলনের সুযোগ অত্যন্ত অধিক বলিয়া অল্পকালের মধ্যে ও অধিক অবনতি হইয়াছে। অতএব এই যথেচ্ছা মিলনের পথ রোধ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ভাষাই যখন প্রধান উপায় বা পথ তখন সেই ভাষা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অন্যথা আত্মরক্ষার উপায় দেখাযায় না।

(৫)

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার "সভাপতির অভিভাষণ" শীর্ষকপ্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"হাণ্টার, স্মিথ বা সেক্সপিয়ার পড়া অসঙ্গত, এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু বেদবেদাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া স্মিথ হাণ্টারে মনোনিবেশ করাতেই আপত্তি করিতেছি।"

"আমরা বি, এ, এম্-এ, চাই না এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু নিরেট বি-এ, এম্-এ, চাই না। বি-এ, বিদ্যাসাগর চাই, এম্-এ বিদ্যারত্ন চাই।"

"টোলে শারিরীক শিক্ষা মোটেই হইতেছে না।" ইত্যাদি।

"যদি টোলের ছাত্রকে বিংশ শতাব্দীর মানব করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাকে যেমন বেদবেদাঙ্গের মূলগ্রন্থগুলি পড়ান আবশ্যক, তেমনি বিগত ৫০০ বৎসরের মধ্যে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাও জানান দরকার।"

"শিক্ষার উদ্দেশ্য—পূর্ব্বকালে মনীষিগণ যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন প্রথমে সেই গুলি আয়ত্ত করা, পরে শক্তি থাকিলে নূতনতত্ত্ব আবিষ্কার করা।

"ব্রাহ্মণের বৃত্তি সম্বন্ধে—ব্রাহ্মণের বৃত্তিতে আর চলে না, সুতরাং অন্যবৃত্তি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য একটাকায় লক্ষ টাকা।" ইত্যাদি।

কথাগুলি ঠিক। যুক্তিযুক্ত কথা বটে। অতি সারবান কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি বলিতে বাধ্য যে, উহা পরের কথা, আপনার নিজের ঘরের কথা নহে; উহা পাশ্চাত্য ভাবের কথা, হিন্দুভাবের কথা নহে; বাহ্যোন্নতিশীল পাশ্চাত্যজগতের বাহ্যবিষয় বিমুগ্ধচিত্তের কথা, বাহ্যবিষয় বিমুখ অন্তরদৃষ্টিশীল ভারতবাসী হিন্দুর কথা নহে; ক্রমোন্নতি নীতিপরায়ণ নব্য সভ্যজাতির কথা, পরন্তু অনন্তকাল সভ্যতালোকে আলোকিত ক্রমাবনতি নীতিপরায়ণ প্রাচীন সভ্য আর্য্যজাতির কথা নহে;—এ কথা অবশ্যই বলিব।

বিদেশী পাশ্চাত্যভাব আমাদের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে এমন প্রবলরূপে প্রবেশলাভ করিয়াছে যে, আমাদের আর স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ পবিত্র হিন্দুভাবে, কথা বলিবার উপায় নাই। আমরা কথা বলি পাশ্চাত্যভাবে, চিন্তা করি পাশ্চাত্যভাবে, এমন কি ঘুমাইয়া স্বপ্নও দেখি পাশ্চাত্যভাবে। সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যভাবই আমাদের আদর্শরূপে দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্যভাব ব্যতীত আর কোন ভাব আছে কি না তাহাও আমরা জানি না বা জানিতে ইচ্ছা করি না। কি শোচনীয় অবনতি ঘটিয়াছে।

যাক্ সে কথা। বিদেশী ভাবে আমরা এতদূর অভিভূত হইয়াছি যে, আমাদের কোন বিষয়েই আর স্বাধীনতা নাই। আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়াছি। নইলে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মস্তিষ্কেও অল্পাধিক পরিমাণে বিজাতীয় ভাব ফুটিবে কেন? তাঁহাদের নির্ম্মল বুদ্ধি ও সংক্রামক রোগের ন্যায় বিজাতীয় ভাবের দ্বারা সংক্রামিত হইবে —কেন?—এরূপ দূষিত হইবে—কেন? তাঁহারাও এমন আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত হইবেন কেন?

এ সংসার ভাবের খেলা।—ভাবের তরঙ্গ বিশেষ। যেমন যেমন ভাব, তেমনি তেমনি অভিব্যক্তি। যেখানে যে ভাব অত্যধিক পরিমাণে জাগ্রত, সেখানে তজ্জাতীয় শক্তি উদ্ভূত হয় এবং ফলও তদনুরূপ প্রসব করে। সুতরাং ভাব লইয়াই কথা। ভাবের জন্যই এই সৃষ্টি বৈচিত্র্য! তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতঃ॥

মরণকালে যে যেভাব লইয়া মরে, মরণান্তে সে সেইপ্রকার ভোগায়তনদেহ প্রাপ্ত হয়। ভরতরাজা মৃত্যুকালে মৃগচিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাই মরণান্তে মৃগদেহলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভাবই হইল সৃষ্টির মূল। প্রত্যেক জীবজন্তুরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হাব ভাব আছে। যেমন ব্রাহ্মণের একভাব, ক্ষত্রিয়ের একভাব, বৈশ্যের একভাব, শূদ্রের এক

ভাব, অন্যান্য জাতীয় লোকের অন্যান্য ভাব, তদ্রূপ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণীরও সেই সেইরূপ ভাব আছে। ভাব লইয়াই সকল ব্যাপার, ভাবছাড়া কিছুই নাই। ভাবের দ্বারাই সৃষ্টির যত যাহা কিছু বৈষম্য দৃষ্ট হয়।

সুতরাং ভাবের গুরুত্ব অতিশয় গুরুতর। বিস্তারিত বলিবার ইহা স্থান নহে। অতএব ভাবের বিশুদ্ধি রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভাবের বিশুদ্ধি রক্ষা না পাইলে আপনার অস্তিত্ব বজায় থাকাই কঠিন। ব্রাহ্মণের ভাব ব্রাহ্মণে না থাকিলে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব থাকে না। তদ্রূপ অন্যান্য লোক ও জীবের স্বস্বভাব তাহাদের মধ্যে না থাকিলেও তাহাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে না।

তন্মধ্যে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট হিসাবে একটি কথা আছে। উৎকৃষ্টের পক্ষে নিকৃষ্ট ভাব পোষণ; ক্ষতি বা অবনতির কারণ। পক্ষান্তরে নিকৃষ্টের পক্ষে উৎকৃষ্ট ভাব পোষণ উন্নতিরই কারণ। অতএব ভাবের বিশুদ্ধি রক্ষা—তথা উৎকৃষ্ট ভাব পোষণ সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। তবেই প্রকৃত উন্নতি হইবার কথা, নইলে নহে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত।

ব্রাহ্মণগণ আজ ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের ভাব হারাইয়াই এতদূর অবনত হইয়াছেন ও ক্রমশঃ হইতেছেন, এবং এই স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিলে ক্রমশঃ আরও হইবেন, শেষে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ও হারাইতে হইবে সন্দেহ নাই।

অতএব এখন হইতে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। বিজাতীয় ভাবের প্রবল স্রোতে আমাদের স্বজাতীয় ভাব ভাসিয়া গিয়াছে। শুধু ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই ব্রাহ্মণের ভাব কতকটা ধারণ করিয়া আছেন, কিন্তু তাহাও আর থাকে না। তাঁহাদের পবিত্র বংশেও বিজাতীয় কুৎসিৎ ভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। তাহারা ও ইংরাজী পড়িয়া ইংরাজী ভাবে বিভোর হইতেছেন। তাঁহারাও আর ভাবের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারিতেছেন না! শুধু রক্ষা করিতে পারিতেছেন না তাহা নহে, রক্ষা করা যে কর্ত্তব্য-সে বুদ্ধি পর্য্যন্ত লোপ পাইতেছে। বরং রক্ষা না করাই কর্ত্তব্য এইরূপ ভাবই মনের মধ্যে উদয় হইতেছে। তাই স্মিথ, হাণ্টার, সেক্স্ পিয়ারে আর আপত্তি নাই, যদি বেদ বেদান্ত স্পর্শ করিয়া করা যায়; বি, এ, এম্-এতেও আর দোষ নাই যদি তাহার সহিত "বিদ্যাসাগর" "বিদ্যারত্ন" যোগ থাকে। হায়রে কলি! তুমি কি আজই এতদূরই অগ্রসর হইয়াছ? সবেমাত্র তোমার ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর গত, এখনও কত লক্ষবৎসর অবশিষ্ট রহিয়াছে! হায়রে পাশ্চাত্য শিক্ষারমোহ তুমি কি ইহারই মধ্যে এতদূরই প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছ? হায়রে তোমাদের শক্তি! হায়রে তোমাদের মহিমা! দিন দিন তোমরা আরও কত কি দেখাইবে তাহা ভাবিয়া পাই না!!

যাক্। তাই বলিতেছিলাম ভাবের বিশুদ্ধি, ভাবের পবিত্রতা রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য নইলে নিস্তার নাই। সুতরাং বিদ্যাসাগরের" সহিত আর বি এ, যোগ চাই না, "বিদ্যা-রত্নের" সহিত এম-এ, যোগও চাই না, "নিরেট" "বিদ্যাসাগর", "নিরেট" "বিদ্যারত্ন"ই চাই।

"নিরেট" "নিরেট"ই থাকা ভাল, খাদযুক্ত হওয়া ভাল নহে, তাহাতে মূল্য কমিয়া যায়। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, যে প্রকার হাওয়া উঠিয়াছে—তাহাতে "নিরেট" অবস্থাতেই হাইলে পাণি পাইবে না।" ঠিক—ঝড়ে কদলী বৃক্ষের দশার ন্যায়, 'হোমরা চোমরা' পণ্ডিত মহাশয়-গণও বিজাতীয় স্লেচ্ছভাব রূপ মহাঝড়ের বেগে পড়িয়া ভূতলশায়ী হইবেন সন্দেহ নাই। তাহার মধ্যে আবার যোগ হইলে সাড়ে ষোল আনা বিয়োগেরই সম্ভাবনা।

ক্রমশঃ—

ক্ষমা—Non-violence

(লেখক—শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম-এ)

আমরা পূর্ব্বে সংহিতাকার মহর্ষিগণ প্রদত্ত ক্ষমাগুণের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। এক্ষণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বুদ্ধদেবের ক্ষমা বিষয়ক উপদেশের যথাযথ আলোচনা করিব।

(১) গীতায় ক্ষমা।

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান—কিরূপ গুণবিশিষ্ট ভক্ত তাঁহার প্রিয়—তাহা বলিতেছেন—(১২ অধ্যায় ১৩।১৪ শ্লোক)—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
. ...
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥"

যে ভক্ত সর্ব্ব জীবে বিদ্বেষবুদ্ধি রহিত,—যে সকলের মিত্র,—সর্ব্বভূতে অভয়দাতা,—সংসারে মমতাশূন্য,—অহঙ্কার বর্জ্জিত, সুখ দুঃখে সমজ্ঞান,—ক্ষমাশীল ... ... একমাত্র আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিয়াছে—সেই ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয়।

পুনশ্চ ষোড়শ অধ্যায়ে—ষড়বিংশ দৈবীসম্পদের মধ্যে ক্ষমা একতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।—(১৬ অধ্যায় ১ -৩ শ্লোঃ)—

"অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ ... ...

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।"

হে ভারত! যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বময়ী দৈবী বাসনা-বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহাদের অভয়, চিত্তের প্রসন্নতা .. .. তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, প্রভৃতি গুণ সমূহ স্বতই উদ্ভূত হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার মনীষিগণ 'ক্ষমা' শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—তাহা অবশ্যই প্রণিধান যোগ্য। বিশ্বনাথ বলিতেছেন—'ক্ষমা' শব্দটী 'ক্ষম্ সহনে'—এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে,—ইহার অর্থ সহগুণ। নীলকণ্ঠ ও শঙ্কর বলিতেছেন—"ক্ষমা আক্রুষ্টস্য তাড়িতস্য বান্তর্বিক্রিয়ানুৎপত্তিঃ" অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রুষ্ট বা আক্রোশপূর্ব্বক তাড়িত হইয়াও যে অন্তঃকরণে কোনওরূপ বিকারের উৎপত্তি না হওয়া—তাহাই ক্ষমা।

রামানুজ বলিতেছেন—"ক্ষমা—পরনিমিত্তপীড়ানুভবেঽপি তৎপ্রতি চিত্তবিকাররাহিত্যম্"—অপর কর্ত্তৃক পীড়া বা দুঃখ অনুভব সত্ত্বেও—উহার প্রতি চিত্তের কোনওরূপ বিকৃতির অভাবের নাম হইল ক্ষমা। হনুমান কহিতেছেন—"ক্রোধকারণেষু সৎস্ব চিত্তস্যাবিক্রিয়া"। ক্রোধের কারণ বিদ্যমান থাকিতেও চিত্তের যে অবিকৃতি—তাহাই ক্ষমা। শ্রীধর বলিয়াছেন—"ক্ষমা পরিভবাদিষুৎপদ্যমানেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ"—অপর কৃত পরিভব ও অপমানাদি উৎপন্ন হইলেও যে ক্রোধের দমন—তাহাই ক্ষমা। বলদেব বলিয়াছেন—"সত্যপি সামর্থ্যে পরিভাবকং প্রতি কোপানুদয়ঃ"—প্রতীকারের সামর্থ্য বা শক্তি থাকিতেও পরিভবকারির প্রতি চিত্তে কোপের উদ্রেক না হওয়ার নামই ক্ষমা। এই উদ্ধৃত লক্ষণ সমূহের মূলকথা একই।

এতগুলি দিগ্‌বিজয়ী মনীষী—পুরাণ ও অন্যান্য প্রাচীন শাস্ত্রের মত অবলম্বনপূর্ব্বক এক বাক্যে যে ক্ষমার পূর্ব্বোক্তরূপ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্দ্দেশকরিলেন,—সেই ক্ষমা কি, এবং তাহার স্বরূপই বা কি?—এ সম্বন্ধে আর কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

বুদ্ধদেব ও ক্ষমা।

(২)

অহিংসা ধর্ম্মের প্রচারক ভগবান গৌতম বুদ্ধের বচনামৃতভাণ্ড 'ধর্ম্মপদ' গ্রন্থে ক্ষমার অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে।—ঐ গ্রন্থের 'যমকবগ্‌গো' নামক প্রথম অধ্যায়ের উপদেশ যথা,—

"অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসি মে,
যে চ তং উপনয্হন্তি বেরং তেসং ন সম্মতি।*

অপরে আমার প্রতি আক্রোশ করিল,—আমাকে প্রহার করিল, আমায় পরাভূত করিল। আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিল,—এই চিন্তা যাহারা অহরহ মনে পোষণ করে তাহাদের বৈরভাব কখনই উপশমিত হয় না।

* সংস্কৃত—অক্রোশীৎ মাং অবধীৎ মাং অজৈষীৎ মাং অহার্ষীৎ মে।
যে চ তৎ উপনহ্যন্তি তেষাং বৈরং ন শাম্যতি॥

অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি মং অহাসিমে,

তে তং ন উপনয্হন্তি বেরং তেসূপসম্মতি ॥

আমাকে তিরস্কার করিল, আমাকে প্রহার করিল, আমাকে পরাস্ত করিল, আমার দ্রব্য অপহরণ করিল, এইরূপ চিন্তা যাহারা মনে স্থান দেয় না—তাহাদের বৈরভাব থাকিতে পারে না।

বুদ্ধবগ্গো অধ্যায়ে কহিতেছেন যথা—"খন্তী পরমং তপো তিতিক্খা"—ক্ষান্তি নামক তিতিক্ষাই পরম তপস্যা।

"সুখ বগ্গো" অধ্যায়ে - প্রথম শ্লোকটী এই -

সুসুখং বত জীবাম বেরিণেসু অবেরিণো।

বেরিণেসু মনুস্সেসু বিহরাম অবেরিণো ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে বিদ্বেষকারি বৈরিগণের মধ্যে বিদ্বেষশূন্য অবৈরিভাবে থাকিতে পারিলেই সুখলাভ হয়।

কোধবগ্গো অধ্যায়ে ভগবান বুদ্ধ বলিতেছেন—

"অক্কোধেন জিনে কোধং"

ক্রোধকে অক্রোধ বা ক্ষমা দ্বারা জয় করিবে। নাগ বগ্গো অধ্যায়ে—নাগ বা হস্তীর মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার কথা বলিতেছেন—

অহং নাগো ব সংগামে চাপতো পতিতং সরং। অতিবাক্যং তিতিক্খস্সং।

সংগ্রামে যেমন করিবর—ধনুঃ নিঃসৃত শরনিকর সহ্য করে সেইরূপ আমিও দুর্জ্জনদিগের পরুষবাক্য সহিষ্ণুতা সহকারে সহ্য করি ব।

বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণশব্দের লক্ষণ নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে কহিতেছেন—

অক্কোসং বধবন্ধঞ্চ অদুট্ঠো যো তিতিক্খতি।

খন্তিবলং বলানীকং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।

যে বিশুদ্ধচিত্তব্যক্তি বধ ও বন্ধনের প্রতি অসূয়া ত্যাগ করিয়া উহা সহ্য করেন,—ক্ষমান্বিত ও দশবল বিশিষ্ট সেই ব্যক্তিকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি *। আরও বলিতেছেন—

"অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধেসু অত্তদণ্ডেসু নিব্বুতং

... ... তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।

বৈরিদিগের মধ্যে যিনি বৈরিশূন্য ও দণ্ডবিধান কারীর মধ্যে যিনি নির্বৃত্ত বা শান্ত তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

---

* বৌদ্ধসাহিত্যে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ এই শব্দ দুইটী একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে শ্রমণও ব্রাহ্মণের তুল্য পদবী। অনেকস্থলে অর্হৎ শব্দের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণপদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা-পরিগৃহীত ১৩২৯ সালের সংস্কৃত উপাধি ও পূর্ব্বপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ও অধ্যাপকগণের নাম এবং পুরস্কার।

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	বৃত্তি	কেন্দ্র
কাব্যোপাধি—দ্বিতীয় বিভাগ।				
শ্রীযুক্ত বলদেব ঝা		শ্রীযুক্ত যোগী ঝা	৮৲	ব্রাহ্মণ সভা
শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ শর্ম্মা		" রঘুবীর ত্রিবেদী	৫৲	"
শ্রীযুক্ত বলরাম পাঠক	৬৲	ঐ		"
সারস্বতোপাধি—২য় বিভাগ।				
শ্রীযুক্ত রামকুমার শাস্ত্রী	৬৲	ঐ		"
পাণিনি পূর্ব্ব—১ম বিভাগ।				
শ্রীযুক্ত বাণিশ মিশ্র	৬৲	শ্রীযুক্ত যোগী ঝা		"
শ্রীযুক্ত চতুরানন্দ ঝা		ঐ		"
শ্রীযুক্ত জয়গোবিন্দ ঝা		ঐ		"
শ্রীযুক্ত মহাদেব পাঠক		শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র	৫৲	"
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দ্বিবেদী		ঐ		"
শ্রীযুক্ত জয়নাথ ত্রিপাঠী		ঐ		"
শ্রীযুক্ত বংশীধর মিশ্র	৫৲	শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ মিশ্র	৬৲	"
শ্রীকৃলদ্বীপ মিশ্র		ঐ		"
শ্রীযুক্ত ইন্দ্রমণি পাণ্ডেয়		ঐ		"

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	বৃত্তি	কেন্দ্র
পাণিনি পূর্ব্ব—২য় বিভাগ।				ব্রাহ্মণসভা
শ্রীগণেশ ঝা		শ্রীযুক্ত যোগী ঝা		”
শ্রীমার্কণ্ডেয় ঝা		ঐ		”
শ্রীসিদ্ধিনাথ মিশ্র		শ্রীযুক্ত চন্দ্রিকাদত্ত মিশ্র		”
শ্রীভগবান মিশ্র		ঐ		”
শ্রীভগবান পাণ্ডেয়		শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ মিশ্র		”
কলাপ পূর্ব্ব ১ম বিভাগ।				
শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য	৫৲	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ		ব্রাহ্মণসভা
শ্রীক্ষীরোদবন্ধু চক্রবর্ত্তী	৬৲	শ্রীযুক্ত রামলাল স্মৃতিতীর্থ		সাংদিয়া
ঐ ২য় বিভাগ।				
শ্রীহরেকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী		শ্রীযুক্ত জানকীনাথ শাস্ত্রী	৪৲	রাঙ্গুনীয়া
শ্রীমহেন্দ্রনাথ শীল		ঐ		”
সংক্ষিপ্তসার পূর্ব্ব ২য় বিভাগ।				
শ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য	৪৲	শ্রীযুক্ত কালীকুমার কাব্যাদিতীর্থ	৫৲	অনলিয়া
শ্রীরমাকান্ত পাণি		ঐ		”
শ্রীশ্রীপতিচরণ পাণ্ডা		ঐ		”
শ্রীমণিমোহন ঘোষাল		শ্রীযুক্ত পঞ্চানন কাব্যস্মৃতিতীর্থ		ব্রাহ্মণ সভা
সুপদ্ম পূর্ব্ব ২য় বিভাগ।				
শ্রীআদিনাথ মল্লিক		শ্রীযুক্ত তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ	৬৲	সাংদিয়া

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	বৃত্তি	কেন্দ্র
পুরাণপূর্ব্ব ২য় বিভাগ				
শ্রীশিবনাথ মিশ্র		শ্রীযুক্ত যোগী ঝা		ব্রাহ্মণ সভা
শ্রীকুবের ঝা		ঐ		”
শ্রীপ্রসন্নকুমার মিশ্র		ঐ		”
শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী	৪৲	শ্রীযুক্ত তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ	}	সাংদিয়া
মীমাংসা পূর্ব্ব—১ম বিভাগ।				
শ্রীনরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য	৭৲	ঐ		”
নব্য স্মৃতি পূর্ব্ব—২য় বিভাগ।				
শ্রীঅশ্বিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৪৲	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী		ব্রাহ্মণ সভা
কর্ম্মকাণ্ড পূর্ব্ব—১ম বিভাগ।				
শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ		কাখুরিয়া বাড়ী
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী		শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিশ্র ব্যাকরণতীর্থ		”
শ্রীহরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৬৲	শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ		”
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য		”		”
২য় বিভাগ।				
শ্রীনগেন্দ্রনাথ মিশ্র		শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিশ্র ব্যাকরণতীর্থ		”
কাব্য পূর্ব্ব ২য় বিভাগ।				
শ্রীঅনন্ত প্রসাদ সনবিয়		শ্রীযুক্ত হরিপদ কাব্যতীর্থ		কাখুরীয়া বাড়ী
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মিশ্র	৪৲	ঐ		”

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	বৃত্তি	কেন্দ্র
মুগ্ধবোধ পূর্ব্ব ১ম বিভাগ				
শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৬৲	শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ	৫৲	কাথুরীয়াবাড়ী
শ্রীশরচ্চন্দ্র সনবিশ্ব		শ্রীযুক্ত হরিপদ কাব্যতীর্থ	৬৲	"
ঐ ২য় বিভাগ				
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিশ্র		ঐ		"
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ত্রিপাঠি		শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিশ্র ব্যাকরণতীর্থ	৫৲	"
সারস্বত পূর্ব্ব—১ম বিভাগ				
শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ত্রিপাঠি	৬৲	ঐ		"
ঐ ২য় বিভাগ।				
শ্রীহরিপদ নন্দ		শ্রীযুক্ত কালীকুমার দর্শনাচার্য্য		অনলিয়া
শ্রীভাস্করচন্দ্র পতি		শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র তর্কব্যাকরণতীর্থ শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম বেদান্ততীর্থ		"
শ্রীরামেশ্বর ত্রিপাঠী		শ্রীযুক্ত ভাস্করানন্দ স্মৃতিতীর্থ		"
প্রাচীন ন্যায়—১ম বিভাগ।				
শ্রীকালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়	৭৲	শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যব্যাকরণ ন্যায়তীর্থ	৫৲	ব্রাহ্মণ সভা
সাংখ্য পূর্ব্ব ২য় বিভাগ।				
শ্রীললিতাঙ্গ ভট্টাচার্য্য	৪৲	ঐ		"
পুরাণ পূর্ব্ব—২য় বিভাগ।				
শ্রীযজ্ঞেশ্বর মিশ্র	৪৲	শ্রীযুক্ত হরিপদ কাব্যতীর্থ		কাথুরীয়াবাড়ী

ছাত্র	বৃত্তি	অধ্যাপক	বৃত্তি	কেন্দ্র
কাব্যপূর্ব্ব ২য়-বিভাগ				
শ্রীভগবাংশচন্দ্র মিশ্র		শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মিশ্র ব্যাকরণতীর্থ		কাথুরীয়াবাড়ী
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী		শ্রীযুক্ত তারানাথ ন্যায় তর্কতীর্থ } শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ }		
শ্রীসীতানাথ চক্রবর্ত্তী		শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ভিষগাচার্য্য		রাজুনীয়া
শ্রীরাম একবাল ত্রিবেদী		শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ মিশ্র		ব্রাহ্মণসভা

পরীক্ষক ও বৃত্তি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিশ্র	২৲	শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্য-ব্যাকরণ ন্যায়তীর্থ	২৲
মহামহোপাধ্যায়		„ আশুতোষ শিরোরত্ন	২৲
শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী	২৲	„ আশুতোষ কাব্য ব্যাকরণতীর্থ	২৲
শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ	•	„ যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ	২৲
„ বীরেশনাথ কাব্যতীর্থ	২৲	„ হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	৪৲
„ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	২৲	„ চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ	২৲
„ মন্মথমোহন স্মৃতিতীর্থ	২৲	„ পঞ্চানন তর্কতীর্থ	২৲
„ শশিকুমার বিদ্যাভূষণ	২৲	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ	২৲
„ সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ	২৲	„ চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন	২৲
„ কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ	২৲	মহামহোপাধ্যায়	
„ নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	২৲	শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ	২৲
„ কালীকৃষ্ণ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী	২৲	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী	২৲
„ শশিভূষণ শিরোমণি	২৲	„ কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থ	?
শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী	৩৲	„ কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার	
„ আশুতোষ স্মৃতিরত্ন	২৲	শ্রীযুক্ত শরৎকমল ন্যায়তীর্থ	২৲
শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ	২৲	„ রাধাবল্লভ জ্যোতিষতীর্থ	২৲

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ সমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট্, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No. C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়

(মাসিক পত্র)

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

একাদশ বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা।

ভাদ্র।

সন ১০৩০ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

REGISTERED No. C—875.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ।

একাদশ বর্ষ । { ১৮৪৪ শক, ১৩৩০ সাল, ভাদ্র । } ১২শ সংখ্যা ।

শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গীতম্ ।

(শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি বিরচিতম্

(নৌমি) মানস ! সচ্চিন্ময়ভাসম ।
নূতনজলধর রুচির বিকাসম

নন্দপতিদারক অচলবিধারক
অশুভনিবারক মণিমন্দিরবাসম ।

পীতবসনধর সুন্দর নটবর
অধরবিকস্বর সুমধুরহাসম ।

মৃগমদচর্চ্চিত মুখকমলাশ্রিত
তিলকুসুমোচিত সুতিলকনাসম ॥

বেণুরবাগত ধেনুখুরোদ্ধত
রেণুকণাঞ্চিত কুন্তল পাশম ।

গোপযুবতিজন মানসরঞ্জন
খঞ্জনগঞ্জন নয়ন বিলাসম ॥

মুনিগণবাঞ্ছিত যমাদি লাঞ্ছিত-
পদতলগঞ্জিত শতদলভাসম।
বিনমদমন্মথ মিষ্টজনৈঃ সহ
শ্যামনিবসদ্যদিঃরসময়রাসম॥

বর্ত্তমান সমাজে ব্রাহ্মণের শিক্ষার ব্যবস্থা।*

লেখক—শ্রীযতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

অঘটনঘটনপটীয়সী জগদম্বার ইচ্ছায় অহরহঃ জগতের পরিবর্ত্তন হইতেছে। এক শতাব্দী পূর্ব্বে বিশ্বের যে অবস্থা ছিল, এখন তাহা নাই। যেখানে অদ্য সুরম্যহর্ম্ম্যরাজি বিরাজমান, তথায় হয়ত পূর্ব্বে শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্যানী ছিল। আবার যথায় জনপূর্ণ নগরী অবস্থান করিত সে স্থান এখন গহনবনে পরিণত। শতাব্দীর কথা ছাড়িয়া এক যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দেখিবেন কি ঘোর পরিবর্ত্তন!! জগতের অপরাপর বিষয়ের কথা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র হিন্দুসমাজদেহের মস্তক ত্রিলোকমান্য ভূসুর মণ্ডলীর বিষয় ভাবিয়া দেখুন, ইঁহারা এখন স্বকীয় দুষ্কৃতির ফলে হেমাদ্রির উচ্চ শিখর হইতে নিপতিত হইয়া মহার্ণবে নিমজ্জিত হইতেছেন।

যে ভূদেবগণ সার্ব্বজনীন উদারতা, মহত্ত্ব, ও তপোবলে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই বর্ণত্রয় "ভূদেব" অর্থাৎ পৃথিবীর দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন; যে ব্রাহ্মণের চরণাঘাতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ নিজকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন—যাহারা ইচ্ছা করিলেই বিশালসাম্রাজ্যের সার্ব্বভৌম হইতে পারিতেন—কিন্তু তাহা না হইয়া বনে বাস করিয়া "জগদ্ধিতায়" ত্যাগের ও বিশ্বপ্রেমের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শনে ব্রহ্মপদে লীন হইতেন—সেই ব্রাহ্মণ আজ কোথায়? যে ব্রাহ্মণগণ স্বীয় পিতৃতর্পণ সময়ে "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" বলিয়া উদারনৈতিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাদেরই সন্তান আমরা কপট! ধূর্ত্ত! অসদাচারী, এবং ব্রাহ্মণ্য হইতে স্খলিত!! যে বিপ্রপদবী লাভের জন্য অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া গাধিনন্দন বহুসহস্রবৎসর দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বজন আকাঙ্ক্ষিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

* এই প্রবন্ধ শ্রীহট্ট বৈদিকসমিতির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত ও পুরস্কৃত।

করিয়া জাতীয় আচার ব্যবহারকে হেয় জ্ঞান করিতেছি। ব্রাহ্মণ্য ও সদাচার বিবর্জ্জিত হওয়ায় আমাদের দ্বিজত্বের পরিচয় কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতে পর্য্যবসিত হইতেছে, এবং কখন কখন জাতিবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণের সম্মান স্বরূপ "রসিওয়াল" আখ্যায় অভিহিত হইতেছি। হায়! এতদপেক্ষা আর অধঃপতন কি হইতে পারে? স্মরণ করিলে অনুতাপে নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়।

আর স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন দ্বারা লেখনীকে কলুষিত করিব না। এই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন যুগে প্রাচীন কালের আচারব্যবহার ও রীতিনীতির পূর্ণ প্রবর্ত্তনও সহজসাধ্য নহে। তবে বিবেচনার সহিত তলাইয়া দেখিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন আমাদের এই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির নিদান অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে মানবত্বে পরিণত করে। মানবের মস্তিষ্কে প্রকৃতিপ্রদত্ত যে উপাদান আছে, তাহা সকলেরই প্রতিভাবিকাশের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যে যন্ত্রের যে কার্য্য সেই যন্ত্র সেই কার্য্যে ব্যবহৃত না হইলে, যেমন তন্মধ্যে যন্ত্রের রক্ষণোপযোগী প্রভূত উপকরণ থাকিলেও উহা নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ শিক্ষাহলের দ্বারা মানবমস্তকস্থ বুদ্ধিবৃত্তি পরিস্ফুরণের উপাদান—মৃত্তিকা কৃষ্ট না হইলে মানবের প্রতিভা বিকশিত হয় না। পরন্তু অশিক্ষায় মানুষ পশু থাকে সত্য, কিন্তু কুশিক্ষায় তদপেক্ষা ভয়ানক নরপশুরূপ ধারণ করিয়া বিবিধ অকার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে সংশিক্ষালোপ হওয়াতেই ব্রাহ্মণের এতাদৃশী দুর্গতি হইয়াছে।

হায়! যখন স্মৃতিপথে ঋষিযুগের কথা উদিত হয় এবং তাৎকালিক শিক্ষাপ্রণালীর বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন মনে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দরস উদ্ভূত হইয়া থাকে। সেই অতীতযুগে জ্ঞানের আলোচনা ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এক কথায় বলিতে হইলে বুদ্ধিসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য ইহাদের করে অর্পিত হইয়াছিল। রাজন্যবর্গের মন্ত্রণা কার্য্য এবং অন্যান্য রাজপদে ব্রাহ্মণেরাই অধিষ্ঠিত থাকিতেন। অবশ্য সেই সকল কার্য্যে তপস্বী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনুন্নত দ্বিজগণই নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতি প্রভৃতি রাজনীতি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ছিলেন। নাটকের এক কঞ্চুকীর বিষয় আলোচনা করিলেই ইহা সম্যগ্ উপলব্ধি হয়। নাটকীয় কঞ্চুকীর লক্ষণ এইরূপ

অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে॥

কঞ্চুকীর কাজ কেবল অন্তঃপুরের সংবাদ আদানপ্রদান করা, কিন্তু তাহাকেও সুবিজ্ঞ হইতে হইত। রাজার যে ব্রাহ্মণ বয়স্য থাকিতেন তিনি সুরসিক ও নানা দেশ ভাষাতে পণ্ডিত হইতেন। তৎকালে মূর্খকে লোকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত। এমন কি ইহাদিগকে উপবাস রাখার ও কঠোর দণ্ডবিধানের ব্যবস্থাও শাস্ত্রে দেখা যায়। মূর্খব্রাহ্মণের তদপেক্ষা অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইত। সুতরাং লোকে তৎকালে দুর্দ্দশার ভয়ে প্রায়ই শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ছিল। তখন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক

ব্রাহ্মণজাতি ভিন্ন আর কাহারও নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারিতেন না। তজ্জন্যই বিপ্রগণকে "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" বলা হইত। ব্রাহ্মণের নিকট শিক্ষা আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ ছিল।

হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণের প্রাধান্য জ্ঞানমূলক ছিল। শাস্ত্রে আছে "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠম।" পলিতকেশকে বৃদ্ধ না বলিয়া জ্ঞানীকে স্থবির বলা হইত। যথা—

'ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।

যো বৈ যুবাপ্যধীয়ান স্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥'

মহাকবিও এই কথার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

বৃদ্ধত্বং জরসং বিনা"।

অজ্ঞলোকেরা সমাজে বিবাহ করিতে পারিত না। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"কামমামরণাৎ তিষ্ঠেৎ গৃহে কন্যর্তুমত্যপি।

ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥'

কন্যা ঋতুমতী হইয়া পিতৃগৃহে অনূঢ়া অবস্থায় আমরণ থাকুক, তথাপি তাহাকে নির্গুণ বরে [illegible] বিবাহ দিবে না। কাজেই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ছিল। ব্রাহ্মণ সন্তান গর্ভাষ্টমে উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেন এবং তপোবনে গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া মধু মাংস, গন্ধ, মালা, তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য গীত এবং বাদ্য) দ্যূতক্রীড়া, অনৃতকথন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দোষকর বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেহ ও মনের পোষক শরীরের সর্ব্বপ্রধান সার রক্ষা করিতেন। সকল ব্রাহ্মণই বেদ পড়িতেন। অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে লোকে শূদ্রের মত অবজ্ঞা করিত। দ্বিজনন্দনগণ চল্লিশ বৎসর অথবা ন্যূনপক্ষে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বেদপাঠ সমাপনান্তে দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিতেন।

আহা! সেই ভোগনিস্পৃহ মহাপুরুষেরা কি অনির্ব্বচনীয় সুখই অনুভব করিতেন! যখন শান্তিরসাস্পদ তপোবনের হবির্গন্ধী সুমধুর মারুত সেবন করিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব সুষমা দেখিতেন, যখন হিংস্রভাব ত্যাগ করিয়া কুরঙ্গের সহিত মৃগেন্দ্রকে ক্রীড়া করিতে দেখিতেন, তখন বিশ্বস্রষ্টার অপার মহিমা অনুভব করিয়া তাঁহাদের হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত, মন আনন্দে নৃত্য করিত। জগৎ মধুময় জ্ঞান করিয়া তারস্বরে গাহিতেন:—

মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ,

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ

অর্থাৎ মধুর বায়ু বহিতে থাকুক, নদীসকল মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধি মধুময় হউক। রজনী উষা মধুময়ী হউক, পৃথিবীর ধূলা মধুময় হউক। আকাশ মধুময় হউক, আমাদের পিতা মধুময় হউন। বৃক্ষ মধুময় হউক, সূর্য্য মধুময় হউক,: আমাদের ধেনুসকল মধুময় হউক।

বৈদিক যুগের শিক্ষাচিত্র আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। কেহ মনে করিতে পারেন আমি "ধান ভাণতে শিবের গীত গাহিতেছি" বস্তুতঃ তাহা নহে, প্রাচীন শিক্ষার সহিত আধুনিক শিক্ষার তারতম্য প্রদর্শনের নিমিত্ত ঋষিযুগের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছি।

শিক্ষার উপরই যখন সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গল উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তখন কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ রক্ষাবিষয়ে কার্য্যকরী হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। শিক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইলেই আমাদের মনে জীবিকাসমস্যার কথা আসিয়া পড়ে। পুরাকালে ব্রাহ্মণগণ শিলোঞ্ছ এবং রাজপ্রদত্ত বৃত্তি দ্বারায় জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিতেন। রাজা তাহাদের নিকট হইতে কোনওরূপ কর আদায় করিতেন না। কিন্তু এখন "তে হি নো দিবসা গতাঃ" সে রাজাও নাই সে আদর্শব্রাহ্মণও নাই। অতএব শিক্ষা ও জীবন-সমস্যাকে একসূত্রে গাঁথিতে হইবে; শিক্ষা জীবিকার্জ্জনের অনুকূলে করিতে হইবে। প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণের শিক্ষা আর্য্যভাষা সংস্কৃতের ভিতর দিয়াই হইয়া আসিতেছে এবং এখনও হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে সংস্কৃতভাষার মধ্যদিয়া চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্ম শিক্ষা করিত, সেই দেবভাষা আজ ইংরাজীর সংসর্গে মৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইল, তখন ইংরাজী শিখিয়া এতদ্দেশীয় কতিপয় ব্যক্তি ধন ও যশোলাভ করিয়া বিখ্যাত হইলেন। তদ্দর্শনে জনসাধারণ স্ব স্ব জাতীয় শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী শিখিতে স্কুলকলেজাভিমুখে ধাবিত হইল। গুরুর পুত্র নিজের শিক্ষা ও বৃত্তি ছাড়িয়া বি এ পাশ করিয়া কেরাণিগিরির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কুম্ভকারনন্দন পৈতৃক ঘটনির্ম্মাণ ত্যাগ করিয়া চিরশ্রান্ত কুলাল-চক্রকে বিশ্রাম করাইবার উদ্দেশ্যেই যেন গ্রাজুয়েট হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। এইরূপে সর্ব্বশ্রেণীর লোক একপথে ধাবিত হওয়ায় ফল হইয়াছে যে চাকুরী দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ব্রাহ্মণ সন্তান স্বীয় শিক্ষা ও ব্যবসা ত্যাগ করায়, সমাজের প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য লুপ্ত হইতেছে। সুখের বিষয়, এই সময়ে এক অতীব শুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে যে জনসাধারণ চাকুরীদ্বারা ধনোপার্জ্জনের উন্মত্ত প্রচেষ্টার অসারতা উপলব্ধি করিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদি জাতীয় উন্নতিকর ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছে। সংস্কৃতশিক্ষার উন্নতিকল্পে রাজসাহায্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। মনে হয় আবার সেই ঋষিযুগের মধুর আম্নায ধ্বনি শ্রুত হইবে; আবার ব্রহ্মতেজ উদ্দীপ্ত মহীসুর ভবনে মঙ্গলঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে।

জীবনসমস্যাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই তৎসঙ্গে ব্রাহ্মণজাতির বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হয়। দ্বিজজাতির বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণঅবস্থা অতীব শোচনীয়। আমি অন্যান্য ব্রাহ্মণসমাজের কথা ছাড়িয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বৈদিকব্রাহ্মণ সমাজের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বে এই বৈদিক সমাজের অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরই প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং শিষ্যযজমানাদি ছিল। এতদ্বারাই প্রভূত অর্থাগম হইত। জীবিকার নিমিত্ত কোনও নীচবৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সকলই ষট্‌কর্ম্মান্বিত আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু অধুনা সকলেরই ভূসম্পত্তি ক্ষয়িত হইয়াছে। শিষ্যযজমানেরা কেহ কেহ ধর্ম্মে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পৈতৃক ক্রিয়াকাণ্ড লোপ করিয়াছে; কেহ কেহ বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। কাযেই বিষয়ের আয়ও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহারা শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন তাঁহারা স্বকীয় সদাচার ও ব্রাহ্মণ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শান্তিস্বস্ত্যয়ন, গীতা বিরাট পাঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের দ্বারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত লোকে ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে ধর্ম্মাবতার জ্ঞান করিত। এমন কি পাণ্ডতগণের মুখে মনুসংহিতার দুই একটি শ্লোক শুনিয়া প্রচুর প্রণামী দেওয়ার কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাশ্চাত্যশিক্ষার মোহে সর্ব্বশ্রেণীর মানবের মধ্যে এক বৃথাভিমান উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন আমরা সর্ব্বজ্ঞ; আমাদের আর শিখিবার নাই। আমি সকলের কথা বলিতেছি না, কাহারও কাহারও মনে এমন ধারণাও আছে যে, ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন অন্য শিক্ষায় লোক শিক্ষিতপদবাচ্য হইতে পারে না। কেহ কেহ বা ইহাদিগকে "অবজ্ঞামিশ্র করুণাপুষ্ট ভিক্ষোপজীবি" অদ্ভুতশ্রেণীর জীবের মধ্যে গণ্য করেন। অতএব আমরা বুঝিয়াছি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যজন, যাজন, প্রতিগ্রহ, এই ত্রিবিধ বৃত্তি দ্বারা আদর্শব্রাহ্মণের জীবিকানির্ব্বাহ হইবে না। জ্ঞানকরী সংস্কৃতবিদ্যা দ্বারাও দুই একজন ভিন্ন অন্যের জীবনোপায় হওয়া অসম্ভব। এদিকে বিশুদ্ধবিপ্রের নিমিত্ত আর্য্যশিক্ষা ব্যতীত অন্যশিক্ষাও অব্যবস্থেয়। এই উভয়শঙ্কটে আমাদিগকে অন্য এক আপদ্ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহারা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য আদর্শব্রাহ্মণ থাকিবেন; তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক চতুষ্পাঠীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। যে সকল ব্রাহ্মণের যাজনাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের দ্বারা জীবনোপায় না হয়, তবে কৃষির জমি থাকিলে কৃষি; অন্যথা কোনও বাণিজ্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এবং তদ্ব্যতিরেকে চিকিৎসা ব্যবসা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মণের চাকুরীবৃত্তি গ্রহণ কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ মনু স্পষ্ট বলিয়াছেন।

"সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ"

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, সদাচারী আদর্শব্রাহ্মণ কিরূপে ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিত্যাগ করিয়া কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি নিন্দিত ব্যবসা অবলম্বন করিবেন? তদুত্তরে বলিব শাস্ত্রে প্রকাশিতভাবে ব্যবস্থা আছে:—

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে"

অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যাযুক্ত বাণিজ্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। (মিথ্যা বলার তাৎপর্য্য এই যে বাণিজ্য করিতে হইলেই মিথ্যা ব্যবহার করিতে হয়।)

অবশ্য উপরিলিখিত ব্যবস্থা উপায়ান্তরাভাবেই প্রযোজ্য। যাহাদের ভূসম্পত্তি অথবা শিষ্যযজমানাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হয়, তাঁহাদের এইসকল বৃত্তি গ্রহণ করা উচিত নহে; কিন্তু কৃষি বাণিজ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

এতদ্ভিন্ন চতুষ্পাঠীর শিক্ষাকালে বঙ্গভাষায় ভূগোল, ইতিহাস, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞান সমূহ যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন করিতে হইবে। সদাচারীব্রাহ্মণ ভূগোল-ইতিহাসাদি সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে চলিবে না। সর্ব্বজ্ঞ হইয়া জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে। এ যুগে বাহ্যজ্ঞান বিহীন শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা মনুষ্যসমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করা যায় না। সম্ভব হইলে ইংরাজী শিখা মন্দ নহে। তবে তাহা প্রাইভেট শিক্ষা করা উচিত। স্কুলে গিয়া কদাচ শিক্ষণীয় নহে। ইংরাজীভাষা বর্ত্তমানে জগতের প্রচলিত ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠভাষা হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্ববিধ ব্যবসাতে এই ভাষার অপরিহার্য্য প্রয়োজন। সদাচারীব্রাহ্মণের কেবল ইংরাজী লিখিবার এবং বুঝিবার শক্তি থাকিলেই যথেষ্ট। যেরূপ অধুনা একদল লোক হিন্দুসমাজের ভিতর অসবর্ণ-বিবাহ (civil marraige) প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী অসদাচার প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছেন; তাহাতে এই সকল দুষ্কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য সদাচারীব্রাহ্মণেরও ইংরাজী জানা প্রয়োজন।

ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন সম্বন্ধে আশঙ্কা জন্মিতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রবর্ত্তন এখন হওয়া উচিত কি না? এতৎসম্বন্ধে 'মহানির্ব্বাণতন্ত্রের' একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সেই সংশয় অপনোদন করা হইতেছে। ভগবতীর প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিয়াছেন—

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বাণপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌযুগে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র—অষ্টমোল্লাস, ৮ শ্লোক।

কলিতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম নাই সত্য, এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্যধারণ নিষিদ্ধ ইহাও সত্য, কিন্তু অন্তত বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করা কর্ত্তব্য। বিলাসবাসনা পরিত্যাগ করিয়া "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ" এই শিবসংহিতোক্ত ব্রহ্মচর্য্যের মূলমন্ত্র অনুক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে। সংযমের অভাবেই যে আমরা দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে উন্নতির আশা করা যায়।

বর্ত্তমান কালের অল্পমস্তিষ্ক দুর্ব্বল চিররুগ্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাধ্যয়ন মরুভূমে বৃক্ষরোপণের ন্যায় ফলপ্রদ হইবে না। কারণ অধুনা প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বীজগত শক্তিও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। সুতরাং এতাদৃশ দুর্ব্বলমস্তিষ্ককে বেদের প্রকৃত

অর্থগ্রহণ দুরুহ ব্যাপার। বর্ত্তমানকালে যে বেদাধ্যয়ন হইয়া থাকে তাহা বেদের কঙ্কাল সদৃশ বলিয়া অনুমতি হয়।

শিক্ষাগ্রহণে গুরুনির্ব্বাচন এক কঠিন কার্য্য। উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিক্ষা প্রায়ই কার্য্যকরী হয় না। গুরুর দোষগুণ শিষ্যে অর্শিয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে—

"যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধি গচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি॥"

যেমন লোক খনিত্র (খন্তা) দ্বারা খনন করিতে করিতে জল প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ গুরুগতা বিদ্যা শিষ্যের অধিগত হইয়া থাকে। তজ্জন্য অসদাচারী ব্রাহ্মণকে গুরুনির্ব্বাচন করা অনুচিত।

পূজনীয় ভূদেববৃন্দ! আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অনুযায়ী আদর্শব্রাহ্মণের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুইএকটি কথা বলিলাম। ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ থাকার সম্ভাবনা। আপনারা অজ্ঞজ্ঞানে ভ্রম বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থম্মন্য হইব। উপসংহারে বলিতেছি এখনও আমাদের সময় আছে।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

বচনামৃত।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

লেখক—শ্রীভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ।

অসুরগণ ধর্ম্মত্যাগ করিয়াছিল। সেই অধার্ম্মিক দৈত্যদিগকে প্রথমেই দর্প আশ্রয় করিল,—তৎপ্রযুক্ত অভিমান জন্মিল,—অতঃপর ক্রোধ আবির্ভাব হইল,—ক্রোধ হেতু সংকোচ ভাব বা চক্ষুলজ্জা টুটিল,—এই অসংকোচ হেতু অন্তঃকরণ হইতে লজ্জা বৃত্তি বিদূরিত হইল। তাহাদের চরিত্রও বিনষ্ট হইল। এইরূপ ভাবাপন্ন তাহাদিগকে ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। অলক্ষ্মী তাহাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। কলি ও তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিলেন। তাহারা দর্প ও অভিমানে অভিভূত, অলক্ষ্মী ও কলিকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, ক্রিয়াহীন ও বিপরীত বুদ্ধি হওয়াতেই অচিরকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, এমনকি একেবারে যশোহীন হইয়া সর্ব্বপ্রকারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া গেল। *

* টীকা।—অনেক সময়ে ধর্ম্ম বা পুণ্য কর্ম্মের আপাততঃ সুফল অনুভূত না হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ ফল যে শুভজনক এবং পাপকর্ম্মের ফল যে এক সময়ে না এক সময়ে বিনাশ

(১৭) অসবর্ণবিবাহ-বিরুদ্ধে যযাতির উক্তি ঃ—

শুক্রকন্যা দেবযানী যযাতিকে আপনার সহিত বিবাহ প্রস্তাব করিলে তদুত্তরে যযাতি বলিতেছেন (আদিপঃ ৮১ অধ্যায় ১৮ ২৬ শ্লো)

বিদ্ধ্যৌশনসি! ভদ্রস্তে ন ত্বামর্হোঽস্মি ভাবিনি।
অবিবাহ্যা হি রাজানো দেবযানি! পিতুস্তব॥
একদেহোদ্ভবা বর্ণাশ্চত্বারোঽপি বরাঙ্গনে।।
পৃথগ্‌ধর্ম্মাঃ পৃথক্‌শৌচাস্তেষান্তু ব্রাহ্মণো বরঃ॥
ক্রুদ্ধাদাশীবিষাৎ সর্পাৎ জ্বলনাৎ সর্ব্বতোমুখাৎ।
দুরাধর্ষতরো বিপ্রো জ্ঞেয়ঃ পুংসা বিজানতা॥

— — ——— -

সাধন করে—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—ইহজীবনে অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে—এতদ্ বিষয়ক বচন বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস খরকে বলিতেছেন—(অরণ্যকা ২৯ সর্গ ৫ ৯ শ্লোঃ)—

"লোভাৎ পাপানি কুর্ব্বাণঃ কামাদ্বা যো ন বুধ্যতে।
হৃষ্টঃ পশ্যতি তস্যান্তং—ব্রাহ্মণী করকাদিব॥
ন চিরং পাপকর্ম্মাণঃ ক্রূরা লোকজুগুপ্সিতাঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্য তিষ্ঠন্তি শীর্ণমূলা ইব দ্রুমাঃ॥
অবশ্যং লভতে কর্ত্তা ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ।
ঘোরং পর্য্যাগতে কালে দ্রুমঃ পুষ্পমিবার্ত্তবম্॥
ন চিরাৎ প্রাপ্যতে লোকে পাপানাং কর্ম্মণাং ফলম্।
সবিষাণামিবান্নানাং ভুক্তানাং ক্ষণদাচব॥"

"ব্রাহ্মণী" অর্থাৎ রক্তপুচ্ছিকা নামক কীটবিশেষ যেমন করকা বা মেঘবৃষ্ট শিলা হৃষ্টচিত্তে ভক্ষণ করিয়া থাকে কিন্তু উদ্গিরণ করিবার সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তেমনি মূঢ় ব্যক্তি লোভ ও কাম হেতু পাপকর্ম্ম হৃষ্টচিত্তে করিয়া থাকে—ইহার অন্ত বা পরিণাম দেখিতে পায় না,- বুঝিতেও পারে না॥

ক্রূর, পাপরত,—গর্হিত চরিত্র ব্যক্তিগণ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও—বেশী দিন তাহা ভোগ করিতে হয় না শীর্ণমূল বৃক্ষের মত পতন তাহাদের অবশ্যম্ভাবী॥

পাপকর্ম্মের কর্ত্তা অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, যেরূপ যথাকালে বৃক্ষগণ ঋতুচিত পুষ্প লাভ করিয়া থাকে॥

পাপকর্ম্মের ফল লোকে অচিরেই প্রাপ্ত হয়, যেমন বিষাক্ত অন্নভোজনে ভোজনকারী অচিরেই বিনাশ পাপ্ত হয়॥

একমাশীবিষো হন্তি শস্ত্রেণৈকশ্চ বধ্যতে।
হন্তি বিপ্রঃ সরাষ্ট্রাণি পুরাণ্যপি হি কোপিতঃ॥
দুরাধর্ষতরো বিপ্রস্তস্মাদ্ভীরু! মতো মম।

হে ভাবিনি দেবযানি! তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমার যোগ্যপাত্র নহি। তোমার পিতা যেরূপ, তাহাতে রাজা বা ক্ষত্রিয়গণ তোমার বিবাহ যোগ্য হইতে পারে না। চারিবর্ণই ব্রহ্মার এক দেহ হইতে উৎপন্ন হইলেও—তাহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও শৌচাদি পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রাজ্ঞব্যক্তি অবগত আছেন যে ক্রুদ্ধ বিষধর সর্প এবং প্রখরতর শস্ত্র অপেক্ষাও ব্রাহ্মণ দুর্দ্ধর্ষতর। ভুজঙ্গদংশনে একব্যক্তি মাত্র বিনষ্ট হয়—শস্ত্রদ্বারাও কেবল একজন হত হয় কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে রাজ্যপুর সমুদয়ের সহিত এককালে সংহার করেন। এই কারণেই ব্রাহ্মণকে আমি দুর্দ্ধর্ষতর মনে করি।

অতঃপর দেবযানী পিতা শুক্রাচার্য্যের এই বিবাহসম্বন্ধে সম্মতি চাহিলে, শুক্রাচার্য্য যযাতিকে দেবযানীর পাণিগ্রহণে অনুমোদন করিলেন। তখন যযাতি করযোড়ে শুক্রাচার্য্যের নিকট প্রার্থনা করিলেন "আপনার কন্যার পাণিগ্রহণে আপনার আদেশ অমান্য করিতে পারি না। তবে আমার কাতর প্রার্থনা এই যে—(শ্লোক ৩২)

অধর্ম্মো ন স্পৃশেদেষ মহান্ মামিহ ভার্গব!
বর্ণসঙ্করজো ব্রহ্মন্নিতি ত্বাং প্রবৃণোম্যহম্॥

হে ব্রহ্মণ্! এ বিষয়ে বর্ণসঙ্কর জন্য মহান অধর্ম্ম যেন আমাকে স্পর্শ করে না।

ইহার উত্তরে শুক্রাচার্য্য আশ্বাস দিয়া কহিলেন—

অধর্ম্মাৎ ত্বাম্ বিমুঞ্চামি বৃণু ত্বং বরমীপ্সিতম্।
অস্মিন বিবাহে মা ম্লাসীরহং পাপং নুদামি তে॥

আমি তোমাকে অধর্ম্ম হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিতেছি, এ বিবাহে তুমি ম্লান হইওনা। আমি তোমার সমুদয় পাপ অপনোদন করিতেছি। বর্ণসঙ্কর পাপ তোমায় স্পর্শিবে না।

বর্ণসঙ্কর জনিত ভয়ে কুণ্ঠিত হইলেও যযাতি—মুনি শুক্রাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত আশ্বাস বাণীতে সাহস প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(ক) প্রতিলোম বিবাহ অতীব হেয়:—ছদ্মবেশী পাণ্ডবগণ লক্ষ্যভেদপণে জয়লাভ করতঃ দ্রৌপদীকে লাভ করিতে গমন করিলে,—পাঞ্চালরাজ স্বীয়পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে উহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ সমুদয় অবগত হইয়া পিতৃসকাশে গমন করিলে,—দ্রুপদ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

(আদি পং ১৯২ অং ১৫-১৬ শ্লোঃ)

"কচ্চিন্ন শূদ্রেণ ন হীনজেন বৈশ্যেন বা করদেনোপপন্না।
কচ্চিৎপদং মূর্দ্ধ্নি ন পঙ্কদিগ্ধং কচ্চিন্ন মালা পতিতা শ্মশানে॥

কচিৎ স বর্ণপ্রবরো মনুষ্য উদ্রিক্তবর্ণোঽপ্যুত এব কচ্চিৎ।
কচিন্ন বামো মমমূর্দ্ধ্নি পাদঃ কৃষ্ণাভিমর্ষেণ কৃতোঽদ্য পুত্র!

হে পুত্র! কোন হীনজাতি বা শূদ্র অথবা করদাতা বৈশ্য আমার দুহিতাকে লাভ করিয়া আমার মস্তকে ত পঙ্কদিগ্ধ পদ নিক্ষেপ করে নাই। মনোহর মাল্যত শ্মশানে পতিত হয় নাই। ১৫। কোন সবর্ণ বা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অথবা ব্রাহ্মণ আমার তনয়াকে জয় করিয়া লইয়া গিয়াছেন। কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি ত কৃষ্ণাকে জয় করিয়া লইয়া আমার মস্তকে বাম চরণ প্রদান করে নাই?

পাছে বৈশ্য বা শূদ্র অথবা অন্য কোন হীনজাতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া তাহার সহিত বীরকন্যা দ্রৌপদী উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কুল কলঙ্কিত করেন,—এই হেতুই দ্রুপদ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। প্রতিলোম বিবাহবিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

(১৮) মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ একটী মহাপাতক হইলেও নিম্নোক্ত কতিপয় স্থলে ইহা প্রয়োগ শাস্ত্রে অনুমোদিত আছে।

শর্ম্মিষ্ঠা যযাতিকে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। যযাতি শুক্রাচার্য্যের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া সত্যভ্রষ্ট হইবার ভয়ে তাহাতে সম্মত হইতেছেন না। তখন শর্ম্মিষ্ঠা রাজার সত্যভঙ্গের ভয় ভাঙ্গিবার জন্য বলিতেছেন—(৮২ অং ১৬ শ্লোঃ)

"ন নর্ম্মযুক্তংবচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"

পরিহাসস্থলে, গম্যাস্ত্রীগমন বিষয়ে, বিবাহ ব্যাপারে, প্রাণনাশ সম্ভাবনায় কিম্বা সর্ব্বস্বাপহরণ সম্ভাবনা হইলে—এই পঞ্চস্থলে মিথ্যাবাক্য দোষাবহ হয় না।

শার্ম্মিষ্ঠা আরও কহিলেন—

"পৃষ্টস্তু সাক্ষ্যে প্রবদন্নন্যথা বদন্তি মিথ্যা পতিতং নরেন্দ্র!
একার্থতায়াস্তু সমাহিতায়াং মিথ্যা বদন্তং হ্যনৃতং হিনস্তি॥"

হে নরেন্দ্র! জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যে পতিত হয় ইহা যে লোকে কহিয়া থাকে তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। গো, ব্রাহ্মণ, অবলা স্ত্রী, দীন, অনাথ, প্রভৃতির নিমিত্ত তাহাদের রক্ষার্থ—স্থল বিশেষে মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদানেও পুণ্য জন্মে।

হিংসাত্মক সত্যবাক্য অর্থাৎ যে সত্যবাক্য অপরের অনিষ্ট বা অপকার হয়—তাহা মিথ্যারই তুল্য পাপজনক। আর অহিংসাহেতু মিথ্যা অর্থাৎ যাহাতে লোকের অপকার না হইয়া উপকার হয়—এমন মিথ্যাকথাও পুণ্যজনক। টীকাকার নীলকণ্ঠ স্বকৃত ব্যাখ্যায় এইরূপই অর্থ বিবৃত করিয়াছেন। আরও একার্থ সমাধান বা মিটমাট অর্থাৎ উভয় বিবদমান পক্ষের স্বার্থরক্ষা স্থলেও মিথ্যাবাক্য দোষজনক নহে।

সত্যসম্বন্ধে গৌতম এই বিশেষ কথা বলিয়াছেন—

"নানৃতবচনে দোষো জীবনঞ্চেৎ তদধীনং—ন তু পাপীয়সাং জীবনমিতি"—যে মিথ্যাবাক্যে কাহারও প্রাণরক্ষা পায় সেইরূপ মিথ্যাবাক্যে দোষ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃত পাপীয়ান্—(হত্যাকারী ইত্যাদি) ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য মিথ্যাকথা কহিলে দোষই হইয়া থাকে। কাশীখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্পির্লবণ তৈলাদিক্ষয়ে চাপি পতিব্রতা।
পতিং নাস্তীতি ন ব্রুয়াদায়াদ্যর্থে নিযোজয়েৎ॥"

গৃহস্থালীতে ঘৃত লবণ, তৈলাদি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পতিব্রতা গৃহিণী পতির নিকট কখনই "নাই" বলিবে না, পরন্তু আয় বা বৃদ্ধি অর্থে উহা প্রয়োগ করিবে।" আমাদের দেশে গৃহিণীরা বলেন—ঘৃত "বাড়ন্ত" হইয়াছে, ফুরাইয়া গিয়াছে বা "নাই" একথা মুখেও আনেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে সত্যের অপলাপ হইলেও তাহা দোষ হইবে না। শপথস্থলেও মিথ্যা বাক্য অনেক ক্ষেত্রে দোষাবহ নহে,—এবিষয়ে মনু বলিয়াছেন—"কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষে তথেন্ধনে ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌ চ শপথে নাস্তি পাতকম্।" কামিনীগণের অভিলাষ পূরণ বিষয়ে, বিবাহে, গোরুর ভক্ষণবিষয়ে, হোমার্থ যজ্ঞীয় ইন্ধন অপহরণ স্থলে, ব্রাহ্মণ রক্ষার্থ ধনদান করিবার অঙ্গীকার বিষয়ে—এই কয়টী স্থলে শপথ পূর্ব্বক কোনও প্রতিশ্রুতি করিয়া তাহা পালন না করিতে পারিলে পাতক হয় না।"

উপরে মহাভারত হইতে শর্ম্মিষ্ঠার ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি" এই বাক্য যে উদ্ধৃত হইয়াছে, সংহিতাকার যমেরও ঠিক অবিকল ঐ বচনই পরিদৃষ্ট হয়। কেবল মহাভারতের বচনস্থিত দ্বিতীয় চরণস্থ "ন স্ত্রীষু রাজন ন বিবাহকালে" এই অংশের স্থলে যমের—"ন স্বৈর বাক্যং ন মৈথুনার্থে" এই টুকু পরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হয়।

পরিহাসাদি স্থলে যে মিথ্যাকথা দোষাবহ নহে বলিয়া শাস্ত্রের বচন দেখান গেল—ইহা ঠিক বটে, কিন্তু উহা যে অধম কল্প তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বকালে অব্যর্থবাক্য মুনিগণ—যাঁহাদের বাক্য সদ্যঃ ফলপ্রসূ ছিল,—যাঁহাদের বর ধ্রুব অভিলষিত ফল প্রদান করতঃ অনুগৃহীত ব্যক্তিকে ধন্য করিত এবং যাঁহাদের শাপ কখনই ব্যর্থ হইত না—তাঁহারা পরিহাস স্থলেও মিথ্যাকথা কহিতেন না।—তাঁহারা একেবারেই মিথ্যাকথা কহিতেন না বলিয়াই তাঁহাদের বাক্যের একটা অপূর্ব্ব শক্তি জন্মিত,—অব্যর্থতা উহার প্রধান লক্ষণ ছিল। ব্যাসদেব গান্ধারীকে শতপুত্ররূপ বর প্রদান করিবার পর গান্ধারী গর্ভাবস্থায় কুন্তীর পুত্রজন্ম শ্রবণ করিয়া—নিজের পুত্র প্রসবে বিলম্ব সহ্য করিতে—না পারিয়া উদরে আঘাত পূর্ব্বক মাংস পেশী প্রসব করিলেন এবং ব্যাসদেবকে উহা নিজবুদ্ধির নিন্দা পূর্ব্বক দুঃখের সহিত নিবেদন করিলেন,—তখন ব্যাসদেব তাঁহাকে আশ্বাস দানপূর্ব্বক কহিলেন—

—"সৌবলেয়ি! নৈতজ্জাত্বন্যথা ভবেৎ।
বিতথং নোক্তপূর্ব্বং মে স্বৈরেষ্বপি, কুতোঽন্যথা॥"

"হে সুবলাত্মজে গান্ধারি! আমার কথা অন্যথা হইবার নহে,—পরিহাসাদি স্থলেও

(স্বৈরেষু) আমি কখন মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই,—তবে কি নিমিত্ত সে কথার অন্যথা হইবে।"

শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করিলে শমধর্ম্মমুনি শমীক পুত্রকে ঐ শাপ প্রতিসংহার করিতে আদেশ করিলেন—তখন শৃঙ্গী কহিলেন—(৪২ অঃ ২ শ্লোঃ)

—"ন বাগুক্তা মে মৃষা ভবেৎ।
নাহং মৃষা প্রবীম্যেবং স্বৈরেষপি কুতঃ শপন্॥

আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। আমি পরিহাস স্থলেও (স্বৈরেষপি) কখন মিথ্যা কহি নাই,—আমার শাপ মিথ্যা হইবে কিরূপে? এইরূপ তৎকালের মুনি ঋষিগণের সত্যনিষ্ঠা বা বাক্‌শুদ্ধি ছিল, সেইজন্য তাঁহাদের বাক্যের একটা তেজও ছিল। এই জন্যই তাঁহাদের বাক্য কখনই ব্যর্থ বা মিথ্যা হইত না। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীও সফল হইত। তাই মহাকবি শ্রীরামচন্দ্রের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—"ঋষীণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুবর্ত্ততে" (উত্তরচরিত) সেই হেতু তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিতেন—"আমাদের বাক্য অন্যথা বা বিফল হইবার নহে।" কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পদে পদে মিথ্যা কথা কহিয়া ঐরূপ বলিতে কেহই সাহসী হয় না,—ঐরূপ কহিলেও তাহা বিফল হওয়ায় নিজেই উপহসিত হইতে হয়। যাহাদের কথায় সত্যের সন্ধান মিলে না তাহাদের শাপ, বর বা আশীর্ব্বাদ খাটিবে কেন?

পরিহাস স্থলে মিথ্যা কথা কহিতে গিয়া অনেকের বিষম বিভ্রাটে বা বিপদেও পড়িতে হয়। সহস্রপাদ নামক মুনিবালক খগম নামক সত্য ও তপোনিষ্ঠ নিজ সখা অপর মুনিবালককে পরিহাস পূর্ব্বক তৃণময় সর্প দ্বারা ভয় দেখাইয়া তাঁহার শাপে ডুণ্ডুভ (ধোড়া) সর্পে পরিণত হইয়াছিলেন, ইহা রুরুডুণ্ডুভ উপাখ্যানে বিবৃত হইয়াছে (আদিপ ১১ অধ্যায়)

আমাদের বিদিত একটি লৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিব যে পরিহাস পূর্ব্বক মিথ্যা কথা কহিতে গিয়া কিরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হয়। একটী সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা তাহার প্রতিবেশী সমবয়স্কা সখীর বাটীতে প্রত্যহ গমন করিত,—একদিন ঐ সখীবধূ নিদ্রিতা ছিল এরূপ অবস্থায় ঐ কন্যাটী রহস্য করিবার উদ্দেশ্যে—তাহার নিদ্রিতাবস্থায় হাত হইতে কঙ্কণ আস্তে ২ খুলিয়া কাপড়ে লুকাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া আইসে। নিদ্রাভঙ্গের পর তাহার সখী হাতে কঙ্কণ নাই—দেখিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। প্রথমে নিজের বাক্স তোরঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কোথাও পাইল না। তখন বাড়ীর লোককে জিজ্ঞাসা করিল। উক্ত বধূর শ্বশ্রূমাতাও উক্ত কন্যাটীকে আসিতে এবং কিছুক্ষণ থাকার পর চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, তিনি তাহার নিকট অন্বেষণ করিতে বলিলেন। যাহার দ্রব্য হারাইয়াছিল তাহার মনের অবস্থা সহজে অনুমেয়। সে আকুল হইয়া শুষ্কমুখে তাহাকে ঐ কঙ্কণের কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু ঐ সঙ্গিকা কন্যাটী তখনও তাহা পরিহাসের ঝোঁকে অস্বীকার করিল। ইহাতেই প্রমাদ ঘটিল। প্রতিবেশীনীর শ্বশ্রূমাতার দৃঢ় ধারণা হইল—ঐ কন্যাই ঐ কঙ্কণ অপহরণ করিয়াছে

—তিনি তাহাদের বাটী গিয়া বেশ দুকথা শুনাইয়া দিলেন, ঐ কন্যাটীর মাতাও নিজের কন্যার সচ্চরিত্রতার পক্ষে—নিজেদের উভয়কুলের চতুর্দ্দশপুরুষ পর্য্যন্ত সাধুতা দশমুখে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় ঐ কন্যাটীও মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল,—এক্ষণে তাহার পক্ষে কঙ্কণ লওয়া স্বীকার করাও সুকঠিন হইয়া পড়িল। পরিহাস মাথায় উঠিল। তাহার পর পুলিসে সংবাদ দেওয়া নলচালা,—ইত্যাদি অনেক কাণ্ডের পর ঐ কঙ্কণ বাহির হইয়াছিল। তখন অপ্রস্তুতের সীমা ছিল না। ইহা কম বিভ্রাট নহে। ইহা হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির—কি স্ত্রী কি পুরুষ অথবা বালকবালিকা মাত্রের—শিক্ষা হওয়া উচিত যেন পরিহাসেও মিথ্যা কথা না কহে।

বিবাহস্থলে মিথ্যা কথা দোষাবহ নহে বলিয়া যে শাস্ত্রের প্রমাণ দেখান হইল, তাহাও অধম কল্প। এ বিষয়ে একটি লৌকিক প্রমাণ দিব। কোনও শাস্ত্রাভিজ্ঞ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাঁহার এক আত্মীয়ের কন্যার বিবাহে ঘটকালী করিতে গিয়া কন্যাটি অতিশয় কুরূপা ও নির্গুণা হইলেও তিনি পাত্রের পিতাকে—পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় অনুমোদন স্মরণকরতঃ—কন্যাটীকে সুরূপা ও গুণযুক্তা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন,—পাত্রের পিতা সরলবুদ্ধি ছিলেন এবং ঐ ব্যক্তিকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন,—তাঁহার কথার উপরই নির্ভর করিয়া নিজে পাত্রী না দেখিয়াই—উক্ত কন্যাটীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের দিন যখন বরযাত্রিগণ সকলেই বধূমুখ দর্শন করিয়া কন্যাটীর কুরূপের নিন্দা করিতে লাগিলেন, তখন পাত্রের পিতা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার উপর সেই অটল বিশ্বাস হারাইয়া ছিলেন। আরও দুঃখের বিষয় কন্যাটী বধূরূপে আসিয়া অবধি তাঁহার শান্তির সংসারে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিও—যিনি বিবাহের সম্বন্ধে ছিলেন পরে ইহার জন্য বিশেষ অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। কন্যাদায় হইতে একজনকে উদ্ধার করা—পুণ্য বটে, কিন্তু উক্ত বিবাহের ফলে পাত্র পক্ষে অনিষ্ট ও অশান্তি ঘটিতে পারে, ইহাতে যে পাপ হয়, তাহার তুলনা নাই। ইহাতে প্রবঞ্চনা দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যাহা হউক কোনও অজুহাতে মিথ্যা কথা কহা কখনই উচিত নহে—ইহা ভাবিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি মিথ্যা কথা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে। তবে অগত্যা স্থলে টীকাকার নীলকণ্ঠের কথা স্মরণীয়। যে মিথ্যা কথায় লোকের উপকার হয়,—কাহারও অনিষ্ট হয় না—সেরূপ মিথ্যা কথা তেমন দোষাবহ নহে। আর সর্ব্বস্ব নাশস্থলে বা প্রাণনাশ সম্ভাবনায় মিথ্যা কথা দ্বারা যদি বিপৎ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে ঐরূপ মিথ্যা প্রয়োগও অনুমোদিত হইতে পারে। যুধিষ্ঠির ঐরূপ অবস্থায়ই "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়া দ্রোণাচার্য্যের হাত হইতে পাণ্ডব পক্ষকে ঐদিনটার যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলেন, নতুবা ঐদিনই পাণ্ডবপক্ষ দ্রোণাচার্য্যের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া চিরদিনের জন্য বিস্মৃতির অতল জলে নিমগ্ন হইত। কিন্তু ইহাও যে অধম কল্প সন্দেহ নাই, কেননা ইহার ফলেই যুধিষ্ঠিরের পতন হইয়াছিল, তাহা মহাভারত পাঠক অবশ্যই স্মরণ করিবেন।

জন্মতিথিকৃত্যে মাসনির্ণয়।

(লেখক—শ্রীকালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ।)

ব্রাহ্মণসমাজে কোন একটী বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিলাম, বিগত ১৩২৪ সনের আষাঢ়ের ব্রাহ্মণ সমাজে সন্ধ্যাপ্রবন্ধে পণ্ডিত শ্যামাচরণ বিদ্যাবারিধি মহাশয় মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অস্পষ্টোক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্য লিখিতেছেন "অনেক ব্যবস্থায় স্মার্ত্তের অস্পষ্টোক্তি আছে" তন্মধ্যে একটা উদাহরণ দিতেছি। তিথিতত্ত্বে জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচন্দ্রের উল্লেখ হইবে লিখিয়াছেন। আবার মলমাসতত্ত্বে জন্মতিথিকৃত্যে মুখ্যচান্দ্রমাসের উল্লেখ ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন। এখন যে কোন স্মার্ত্ত অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনিই মলমাসতত্ত্বে গ্রন্থকারের নিজলিখন ও টীকাকারদের লিখন লক্ষ্য না করিয়া কেবল তিথিতত্ত্বের লিখন অনুসারে ব্যবস্থা দিবেন, জন্মতিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্রমাসের উল্লেখ হইবে। ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতি"র আলোচনাকালে ঐ ব্যবস্থা লইয়া বাদানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া আমি সবিশেষ জানি। যাঁহারা তাহা দেখিয়াছেন তাঁহারা এখন কি বলিবেন জানি না। কিন্তু অধিকাংশ অধ্যাপকই যে গৌণচান্দ্রের ব্যবস্থা দিবেন ইহা নিশ্চিত। আপনি ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিতে পারেন। মুখ্যচান্দ্রমাসের সমর্থন জন্য তিথিতত্ত্ব হইতে কাশীরামও গোস্বামীর টীকার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক্রিয়াকাণ্ডপদ্ধতিরও ৮ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন "জন্মতিথি ও মৃততিথির কার্য্য তিথি বিহিত হইলেও সাধারণের পক্ষে একতিথি নহে বলিয়া মুখ্য চান্দ্রমাসের উল্লেখ করিতে হইবে।" ইত্যাদি—

ভারতপূজ্য, স্মৃতিশাস্ত্রে অদ্বিতীয়, স্মৃতিনিবন্ধপ্রণেতা, অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক, মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পদপ্রান্তে ৭।৮ বৎসর অবস্থান করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থাদি বিষয়ে অধ্যাপকদিগের সযুক্তিক নানাপ্রকার মতভেদ শ্রবণ সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু কদাচ জন্মতিথিকৃত্যে মাস নির্ণয়ে তিথি, মলমাসে স্মার্ত্তের মতভেদ বা অস্পষ্টোক্তি শ্রবণ করি নাই। তাহাতে যে অধ্যাপকদের কোন প্রকার মতভেদ আছে তাহাও এপর্য্যন্ত কর্ণগোচর হয় নাই। বিদ্যাবারিধি মহাশয়েরপ্রবন্ধে এবং পুস্তকে তাহা হঠাৎ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম এ কি! ইহা কি বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের একটা নূতন কিছু করা, না কোন দৈব আদেশে উহা প্রচার করা, না আমারই প্রমাদ। পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম তিথিতত্ত্বে লিখা আছে "জন্মতিথেঃ প্রাগুক্ত ব্রহ্মপুরাণীয়াৎ, পৌর্ণমাস্যন্তমাসাদরঃ"। কৃত্যতত্ত্বে লিখা আছে—"তত্র প্রয়োগঃ—ওঁ তৎসদিত্যুচ্চার্য্য পৌর্ণমাস্যন্তমাসেন উদঙ্মুখস্তাম্রপাত্রং কুশত্রয়ফলপুষ্পতিলজলপূর্ণং যথালাভোপপন্নং বা গৃহীত্বা ইত্যাদি। অন্য স্মৃতিনিবন্ধকারদের অভিপ্রায় জানিবার জন্য প্রাচীন গোপালপঞ্চাননকৃত তিথিনির্ণয় খুঁজিয়া দেখিলাম লিখা আছে "মাসস্তু গৌণচান্দ্রেণৈব ব্রহ্মপুরাণীয় তিথিকৃত্য

স্যাৎ"। মলমাসতত্ত্বে জন্মতিথিকৃত্য সম্বন্ধে মাসনিশ্চায়ক কোন ব্যবস্থাই নাই। সুতরাং ইতোধিক স্পষ্টোক্তি কি হইতে পারে বুঝিতে পারিলাম না। অধ্যাপক পাঠকমহাশয়দের কাহারও যদি কিছু অনুভবে আসিয়া থাকে জানাইলে এ অজ্ঞ কৃতার্থ হইবে।

জন্মতিথিকৃত্যে মাস নিশ্চয় করিতে না পারিয়া স্মার্ত্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে অস্পষ্টোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাপক মহাশয়দের মতভেদ উপস্থিত হইয়া এতদিন "কৃত্যলোপ হইতেছিল, বিদ্যাবারিধি মহাশয় দয়া করিয়া টীকাকারদের সাহায্য লইয়া মলমাসতত্ত্বদ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, জন্মতিথিকৃত্যে মুখ্যচান্দ্রমাসেরই উল্লেখ হইবে। কি ভয়ঙ্কর কথা! ৪০০ বৎসরের মধ্যে স্মার্ত্তের স্পষ্ট অভিপ্রায় ছোট বড় কোনও অধ্যাপক বুঝিতে না পারিয়া অব্যবস্থা দ্বারা সমাজের সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন! এখনও অধ্যাপকদের সে সর্ব্বনেশে ব্যবস্থা সর্ব্বথা তিরোহিত হয় নাই! কদাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের স্পষ্টোক্তি পড়িয়া কোনও অধ্যাপক মহাশয়ের জ্ঞানোদয় হইয়া থাকিবে; কিন্তু হায়! অপর সমস্তই পূর্ব্ববৎ। বড়ই দুঃখ রহিল, মহামহোপাধ্যায় ন্যায়পঞ্চানন, তর্কালঙ্কার, কৃতিরত্ন মহাশয়গণ পরলোকে, এতদিনপরে আবিস্কৃত তাঁহাদের অবোধ্য এ স্পষ্টোক্তি তাঁহাদিগকে শুনাইয়া বিদ্যাবারিধি মহাশয় তাঁহাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইতে পারিলেন না।

এখন একবার পাঠক বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের অবলম্বনীয় মলমাসতত্ত্বীয় স্মার্ত্তোক্তি এবং তাহার সহিত তিথিকৃত্যতত্ত্বীয় স্মার্ত্তোক্তির বৈষম্যটুকু শুনুন। স্মার্ত্ত মলমাসে—

চক্রবৎ পরিবর্ত্তেত সূর্য্যঃ কালবশাদ্‌যতঃ।
অতঃ সম্বৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতং।
মাসচিহ্নন্তু কর্ত্তব্যং পৌষমাঘাগ্য মেবহি।
যত্তত্তত্র বিধানেন মাসঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ইত্যাদি লঘুহারীত বচনোল্লেখ করিয়া দেখাইতেছেন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ এবং তদ্বৎ মাসিক শ্রাদ্ধ, জন্মতিথিকৃত্য তত্তন্মাসীয় তত্তত্তিথি বিশেষ বিহিত কর্ম্মাদি সৌরমাসোল্লেখ বিহিত হইলে রবির মন্দগতি এবং শীঘ্রগতি দ্বারা কোন একতিথি মাসে দুইবার লাভ হইলে বা কোন এক তিথি তাদৃশ মাসে লাভেরই অসম্ভব হইয়া পড়িলে তিথিদ্বয় লাভের বেলায় বিহিত কর্ম্মের সংশয় এবং অলাভে কর্ম্মলোপের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। অতএব একতিথিরই দ্বিত্ব এবং লোপ সম্ভাবনা হেতু তন্নিরাস জন্য ঐ সমস্ত কৃত্য চান্দ্রমাসোল্লেখেই কর্ত্তব্য। গৌণ-মুখ্যচান্দ্র সামান্যের কথা বলিয়া সৌরমাসোল্লেখের নিরাসপূর্ব্বক "ইন্দ্রাগ্নীযত্রহূয়েতে" ইত্যাদি লঘুহারীত প্রমাণান্তর দ্বারা ঐ মাসপদের শুক্লাদি চান্দ্রমাসেই শক্তি ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্ববচনোক্ত সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্ম্মটী ইন্দ্রাগ্নীত্যা"দি প্রমাণলভ্য শুক্লাদি মাস বিহিত বলিয়া দেখাইয়াছেন মাত্র, বাস্তবিক গৌণ মুখ্য সামান্য চান্দ্রমাসোল্লেখে সৌরমাসোল্লেখ জন্য আশঙ্কা নিরাশ হয় বলিয়া সামান্যতঃ উভয় চান্দ্রমাস বিহিত কর্ম্মান্তরের উল্লেখ করিয়া তাহাতেও ঐ হেতুবন্ন্যায়ের চিন্তা করিতে উপদেশ করিতেছেন যথা—

"তেন মাসিক শ্রাদ্ধং জন্মতিথিকৃত্যং তত্তন্মাসীয় তত্তত্তিথি বিশেষ বিহিত কর্ম্মাপ্যেবমেবং।"

এই মলমাসতত্ত্বীয় স্মার্ত্তোক্তিই বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের স্পষ্টোক্তির অন্যতম প্রমাণ। তাহা সঙ্গত হয় কি? বচনোক্ত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের দৃষ্টান্তটী মুখ্যচান্দ্রমাসবিহিত বলিয়া অপর দৃষ্টান্তগুলিও মুখ্যচান্দ্রমাস বিহিত বলা যায় কি? তাহা হইলে তত্তন্মাসীয় তত্তত্তিথি বিশেষ বিহিতকৃত্যে যাহা "তিথিকৃত্যে চ কৃষ্ণাদিং ব্রতে শুক্লাদি মেবচ" ইত্যাদি বচনদ্বারা কৃষ্ণাদিমাসে নিশ্চিত হইয়াছে তাহাতে শুক্লাদি মাস বলিলে সর্ব্বসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয় না কি? সুতরাং যে সমস্ত তিথিবিশেষ বিহিত কর্ম্ম সৌরমাসোল্লেখে কর্ত্তব্য হইলে বিষয়লোপের আশঙ্কা হয়, হেতুবন্নিগদন্যায়ের অবিশেষ হেতু তাদৃশ কর্ম্মমাত্রই চান্দ্রমাসে কর্ত্তব্য। যেহেতু চান্দ্রমাস সামান্যেই আশঙ্কার নিরাশ হইতে পারে। এই জন্যই দৃষ্টান্তে গৌণমুখ্যচান্দ্রবিহিতকর্ম্ম সামান্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধটী যেরূপ "অতঃসাংবৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাসচিহ্নিতং" বলিয়া শুক্লাদি মাসে বাচনিক বিহিত হইয়াছে, তদ্রূপ জন্মতিথ্যাদি কৃত্য ও তত্তৎ বিশেষ বচন প্রাপ্ত শুক্ল কৃষ্ণাদি মাসে হইবে। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ শুক্লাদি মাসে বিহিত বলিয়া জন্মতিথিকৃত্যাদিও কেবল শুক্লাদি মাসে বিহিত নয়; বাচনিক বিষয়ের অন্যত্র অন্যপ্রকারে উপস্থিতি হইতে পারে না। এই জন্যই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কৃত্যটী জন্মতিথি কৃত্যবৎ হইলেও বিশেষ বচন বাধিত বলিয়া স্মার্ত্ত বলিতেছেন "এতেন পার্ব্বণবত্তষ্টকা-শ্রাদ্ধে চান্দ্রমিষ্টং তথাব্দিকে ইতি পারস্করীয়ে পার্ব্বণাদিসাহচর্য্যাদাব্দিক শ্রাদ্ধমপিকৃষ্ণাদি-মাসেনেতি নিরস্তং"। সুতরাং বিশেষযুক্তিপ্রমাণলব্ধ কৃষ্ণাদি মাসবিহিত জন্মতিথিকৃত্যাদি শুক্লাদি মাস বিহিত সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের দৃষ্টান্তে শুক্লাদি মাসবিহিত বলিয়া কল্পনা চলে না। বাস্তবিক জন্মতিথিকৃত্য বিচারে যথাস্থানেই স্মার্ত্তস্পষ্টবাক্যে মাস নিশ্চয় করিয়াছেন। এখানে সৌরমাসে অনুপপন্ন কর্ম্ম সামান্যের উল্লেখে জন্মতিথিকৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, মাসবিশেষ নিশ্চয় জন্য নহে।

মলমাসতত্ত্বীয় পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভটী যাহা বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের স্পষ্টোক্তি কল্পনার ব্রহ্মাস্ত্র তৎসম্বন্ধে পূজনীয় অধ্যাপক মহাশয়দের উপদিষ্ট অভিপ্রায় নিবেদন করিয়া এখন তাঁহাদের লিখিত অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছি, পাঠক প্রণিধান করুন। মহামহোপাধ্যায় ৺কৃষ্ণ নাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তৎপ্রণীত মলমাসতত্ত্বের টীকায় লিখিতেছেন—

"হেতুবন্নিগদচিন্তায়াং যদ্যদুক্তেষ্টব্যং কাৎস্ন্যেন তদুপদিশতি তেনেতি। নমু মাসিক শ্রাদ্ধে যৎকিঞ্চিত্রিংশত্তিথ্যাত্মকচান্দ্র ইতি তথাজন্মতিথিকৃত্যে তত্তন্মাসীয় তিথিবিশেষবিহিত কৃত্যেযু চ কৃষ্ণাদিরেব মাস ইতি নির্ণীতং। তদেবাং হারীত প্রদর্শিত হেতুবন্নিগদচিন্তায়া মুপনীতত্বে মুখ্যচান্দ্রীয়ত্বাপত্ত্যাবিরুদ্ধমিতি চেন্নচাত্তে লঘুহারীতেন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধস্য সৌর মাসীয়ত্বে বিষয়লোপপ্রসঙ্গেন হেতুনা চান্দ্রমাসীয়ত্বমাত্রং প্রতিপাদিতং, ন তত্র শুক্লাদিরূপত্বমপি, তৎপর্য্যন্তস্য তাদৃশহেতোর প্রতিপাদ্যত্বাৎ। তত্তু স্বসঙ্কেতিত নিরূপপদমাসপদ প্রয়োগবলাদুপ-লভ্যমেন বাচিকমেব মন্তব্যং। এবঞ্চ প্রাগুক্তমাসিকাদাবপি মাসপদাচ্চৈত্রাদিপদাদ্বা সৌরস্য

প্রতীতেরপি সম্ভবাদাকাঙ্ক্ষায়াং লঘুহারীতোক্তাদিশা চান্দ্রত্বমেবাবধার্য্যং, নতু তস্য মুখ্যত্বমপি, তথাবিধ হেতুনা তস্যাপ্রাপ্তাৎ। সত্যপিসাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে লঘুহারীত প্রযুক্ত নিরূপপদমাসপদ প্রয়োগবলেন মুখ্যত্বস্ত বাচনিকত্বে যথাবচনং হি বাচনিকমিতি ন্যায়েনাত্রত্র তদনুপস্থিতেশ্চ॥ মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ও তৎস্থলীয় গুরূপদেশ আলোচনা পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় পাঠ্যপুস্তকে টীপ্পনী দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যথা :—

"জন্মতিথিকৃত্যাদ্যন্বেষণস্ত হেতুবন্নায়চিন্তায়ামেব তাৎপর্য্যং। অতো জন্মতিথিকৃত্যাদৌ গৌণচান্দ্র গ্রহণমবিরুদ্ধং তথাচ জন্মতিথি কৃত্যাদেরপি সৌরীয়ত্বে কৃত্যলোপাদ্যনুসন্ধেয়মিতি বস্তুর্থঃ"।

স্বর্গীয় পিতৃদেব কালীকিশোর বিদ্যারত্নমহাশয়ও বিক্রমপুরস্থ ৺অদ্বৈত ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়দের নিকট অধ্যয়নকালে আলোচনা পূর্ব্বক সন্দর্ভের নিম্নে টিপনীদ্বারা স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যথা—

"সৌরমাসেঽনুপপন্নত্বমাহন্বেষ্যমিত্যর্থঃ। ন তু মুখ্যচান্দ্রকর্ত্তব্যতয়া, জন্মতিথিকৃত্যস্য গৌণ চান্দ্রেণোক্তত্বাৎ"।

তিথিতত্ত্বের টীকায় যে কাশীরাম বাচস্পতি লিখিয়াছেন "জন্মতিথিকৃত্যস্য তিথিকৃত্যত্বা-ভাবেন মুখ্যচান্দ্রেণৈব বাক্যরচনা, মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্তস্যাপি তথৈব স্বরসঃ"। তিথি ও মলমাস তত্ত্বের ঐ সন্দর্ভের টীকায় লিখিতেছেন "যে তু জন্মতিথিকৃত্যং গৌণচান্দ্র এববদন্তি তন্মতে জন্মতিথিকৃত্যস্য সৌরে বিধিখণ্ডনমাত্রে এতদ্বাক্যস্য তাৎপর্য্যং নতু মুখ্যচান্দ্রমাসোল্লেখেঽপি বোধ্যং"। এখন মলমাসতত্ত্বীয় সন্দর্ভটীর তাৎপর্য্য স্মার্ত্তমহামহোপাধ্যায়াধ্যাপকগণও বিদ্যাবারিধি মহাশয় কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং কোনটী সমীচীন পাঠক বিবেচনা করুন।

মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপকগণ চিরদিনই গোস্বামী ও কাশীরামকৃত তিথিতত্ত্বাদির টীকাকে সমাদরে গ্রহণ করেন নাই। এই জন্যই ইহা পঠন পাঠন বিরহিত। এখনও অধ্যাপক-গণ শ্রদ্ধারসহিত ঐ টীকার আশ্রয়গ্রহণে পরাঙ্মুখ। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের স্পষ্ট সপ্রমাণ সমীচীন উক্তির বিরুদ্ধে অসমীচীন উক্তির অবতারণাও এ অশ্রদ্ধার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। টীকাকারগণ কিরূপ যুক্তিপ্রমাণ অবলম্বনে স্মার্ত্তের সযুক্তিক স্পষ্টোক্তির খণ্ডনপূর্ব্বক বিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া স্মার্ত্তের অনভিমতাবলম্বন করা সমীচীন কি না পাঠক প্রণিধান করিবেন।

তিথিতত্ত্বে স্মার্ত্ত "জন্মতিথেঃ প্রাগুক্ত ব্রহ্মপুরাণীয়াৎ পৌর্ণমাস্যাস্তমাসাদরঃ" বলিয়া পৌর্ণমাস্যন্তমাসোল্লেখের প্রধান কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তদনুকূলে হেতুনির্দ্দেশ জন্ম গৃহ্য পরিশিষ্টের—

উপাকর্ম্ম তথোৎসর্গঃ প্রসবাহোঽষ্টকাদয়ঃ।
মাসবৃদ্ধৌপরাঃ কার্য্যা বর্জ্জয়িত্বা তু পৈতৃকং॥

বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন "তত্রাষ্টকা সাহচর্য্যাৎ, জন্মাষ্টম্যাং তথা দর্শনাচ্চ"॥ ব্রহ্ম-

পুরাণে গৌণচান্দ্রমাস প্রস্তাবে তিথিকৃত্যাদির উল্লেখহেতু তদুক্ত সমস্তকৃত্যই গৌণচান্দ্রমাসে বিহিত, সুতরাং জন্মতিথিকৃত্যও ব্রহ্মপুরাণে তৎপ্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অবশ্যই গৌণচান্দ্রে বলিতে হইবে। অতঃপর প্রমাণান্তরে অষ্টকাশ্রাদ্ধ গৌণচান্দ্রে বিহিত বলিয়া তৎসমভিব্যাহৃত "প্রসবাহ" অর্থাৎ জন্মতিথিকৃত্যটীও সাহচর্য্য ন্যায়ে গৌণচান্দ্রেই বিহিত হওয়া উচিত। শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিকৃত্য জন্মাষ্টমী ব্রত গৌণচান্দ্রে বিহিত, সুতরাং সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে আমাদের জন্মতিথিকৃত্যও গৌণচান্দ্রেই হওয়া সমীচীন। এখানে টীকাকার কাশীরাম লিখিতেছেন—

"অস্য তু জন্মতিথি কৃত্যস্য তিথিকৃত্যত্বাভাবেন মুখ্যচান্দ্রেণৈব বাক্যরচনা। মলমাস তত্ত্বে স্মার্ত্তস্যাপি তথৈব স্বরসঃ। জীমূতবাহনস্তু জন্মতিথিকৃত্যে সৌরমাসাদরই ত্যাহ তদ্দূষয়িতুমুপক্রমতে অষ্টকা সাহচর্য্যাদিত্যাদিনা"

জন্মতিথিকৃত্যটী জন্মতিথি পুরস্কারেই নিয়ত। পঞ্চমী, ষষ্ঠী ইত্যাদি তিথিবিশেষ বিহিত নিয়ত কৃত্য নহে। স্মার্ত্ত ও জন্মাষ্টমী বৎ তিথিকৃত্য বলিয়া গৌণচান্দ্রের বিধান করেন নাই। সুতরাং জন্মতিথিকৃত্য "তিথিকৃত্যেচ কৃষ্ণাদিং" ইত্যাদি প্রমাণের অবিষয়ীভূত হইলেও ব্রহ্মপুরাণে গৌণচান্দ্রমাস প্রস্তাবে উহার উল্লেখ হেতু, "উপাকর্ম্ম" ইত্যাদি প্রমাণলব্ধ অষ্টকা সাহচর্য্যও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিকৃত্যের দৃষ্টান্তে আমাদের জন্মতিথিকৃত্যও গৌণচান্দ্রেই হওয়া সমীচীন। তিথিকৃত্য নহে বলিয়াই ত স্মার্ত্ত "তিথিকৃত্যেচ কৃষ্ণাদিং" না বলিয়া যুক্ত্যাদির অবতারণা করিয়াছেন, ইহাতে বিরুদ্ধবাদী টীকাকারের বাহাদুরী কি আছে? স্মার্ত্ত কি উহা লক্ষ্য করেন নাই? জন্মতিথিকৃত্যবৎ মৃততিথিকৃত্যসম্বন্ধে "তদিতরত্র সাম্বৎসরিকাদৌ শুক্লাদিরেব মাসো নির্দ্দেশ্যঃ তস্য প্রমাণ তিথিকর্ত্তব্যত্বেন ত্রিংশতিথি সাধারণতয়া তিথি নিয়ত ব্রহ্মপুরাণাস্পর্শাৎ" ইত্যাদি দ্বৈতনির্ণয়োক্তিদ্বারা তিথিকৃত্যত্বাভাব স্মার্ত্ত মলমাস তত্ত্বে স্পষ্টইত প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং ইহাও দেখাইয়াছেন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কৃত্যটী তিথিকৃত্য নহে বলিয়াই যে ("শেষং চান্দ্রাশ্রিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি দ্বারা) শুক্লাদি মাস কর্ত্তব্য হইবে তাহা নহে "পার্ব্বণে ত্বষ্টকাশ্রাদ্ধে চান্দ্রমিষ্টং তথাব্দিকে" ইত্যাদি পারস্করীয় বচনলব্ধপার্ব্বণাদি সাহচর্য্য বশতঃ কৃষ্ণাদি মাসেই সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের সম্ভাবনা ছিল কিন্তু "অতঃ সাম্বৎসরং শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং মাস চিহ্নিতং" ইত্যাদি বিশেষ বচন বাধিত বলিয়া সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ শুক্লাদিমাসেই কর্ত্তব্য হইতেছে। স্মার্ত্ত ঐ বচনের ব্যাখ্যায় স্পষ্ট বলিতেছেন "মাসচিহ্নিতং শুক্লাদিমাসচিহ্নিতং কর্ত্তব্যং। শুক্লাদিত্বং কুত ইতি চেন্মধু-হারীতেনৈব ইন্দ্রাগ্নীত্যাদিনা নিরূপপদস্য মাসপদস্য শুক্লাদৌ সঙ্কেতমভিধায় চক্রনাদিত্যাভিধানাৎ"। এই বচনের উপর নির্ভর করিয়াই "পার্ব্বণাদি সাহচর্য্যাদাব্দিক শ্রাদ্ধমপি কৃষ্ণাদি মাসেনেতি পাশ্চাত্যমতং নিরস্তং" বলিয়া বাদীকে নিরাস করিতেছেন, তিথিকৃত্যত্বাভাব দেখাইয়া নহে। সুতরাং জন্মতিথিকৃত্যটী তিথি কৃত্য নয় বলিয়াই মুখ্যচান্দ্র কর্ত্তব্য হইতে পারে না। মুখ্যচান্দ্র কর্ত্তব্যত্বরূপে তাদৃশ বাধকবিশেষ বচন না থাকায় প্রস্তাত ব্রহ্মপুরাণীয়

কৃষ্ণাদি মাসবিহিত তিথিকৃত্যান্তর্গতকৃত্য, সাহচর্য্য সাংদৃষ্টিক ন্যায়লব্ধ হওয়ায় নিঃসন্দেহে কৃষ্ণাদিমাসেই কর্ত্তব্য হইতেছে।

মলমাসতত্ত্বে জন্মতিথিকৃত্যের উল্লেখ সম্বন্ধে স্মার্ত্তাভিপ্রায় পূর্ব্বে প্রকটীকৃত হইয়াছে। কাশীরাম স্মার্ত্তাভিপ্রায় তথায় যে অন্যরূপেও প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, সুতরাং "মলমাস তত্ত্বে স্মার্ত্তস্যাপিতথৈব স্বরসঃ" এবং জন্মতিথিকৃত্যস্যতিথিকৃত্যত্বা-ভাবেন"—ইত্যাদি টীকাকারোক্তির সুসঙ্গতি পাঠক বিবেচনা করিবেন। এতদুক্তি অবলম্বন করিয়া যিনি স্মার্ত্তকে অস্পষ্টবাদী বলিয়া স্পষ্ট করিবার জন্য স্পষ্টব্যবহার সংস্কার বা সংহার পূর্ব্বক একটা নূতন কিছু করিয়াছেন এবং অধ্যাপক মণ্ডলীকে অব্যবস্থাপক সাব্যস্ত করিয়াছেন তাঁহার ধৃষ্টতা কতটুকু তাহাও লক্ষ্য করিবেন।

তিথিতত্ত্বের লিখার উপর গোস্বামী "বস্তুতস্তু"—বলিয়া স্মার্ত্তাভিপ্রায় বিরুদ্ধ যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহারই স্বাধীন মত, স্মার্ত্তাভিপ্রায় নহে। উহা "বস্তুতস্তু" লিখাদ্বারা এবং স্মার্ত্তের স্পষ্টলিখার বিপরীত লিখাদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয়। যথা—

"বস্তুতস্তু জন্মতিথৌমুখ্যচান্দ্রেণ বাক্যবচনা জন্মাষ্টম্যাস্তিথিবিশেষ কৃত্যত্বেন বৈষম্যাৎ, অষ্টকাসাহচর্য্য ন্যায়স্যাপি শেষং চন্দ্রাশ্রিতং কর্ম্ম ইত্যাদি বচনাৎ দুর্ব্বলত্বাচ্চ।'

সুতরাং মুখ্যচান্দ্রে স্মার্ত্তাভিপ্রায় ছিল বলিয়া তদনুকূলে এ উক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। বোধ হইতেছে উনি স্মার্ত্তের মলমাসতত্ত্বীয়লিখার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, অন্যথা হয়ত উনিও কাশীরামের মত স্মার্ত্তের ঐ লিখাকে স্বাভিপ্রায়ে আনিয়া স্বমত সমর্থনে যত্নবান্ হইতেন। হয়তঃ অস্পষ্টবাদী বলিয়া তিরস্কারও করিতেন।

এখন গোস্বামীর স্মার্ত্তবিরুদ্ধ স্বাভিপ্রায়ের সম্যক্ সমালোচনায় সমীচীনতা উপলব্ধি করুন। জন্মতিথি কৃত্যে মুখ্যচান্দ্রে বাক্যরচনার প্রতি গোস্বামী হেতু নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া জন্মতিথিকৃত্যটী জন্মাষ্টমীকৃত্যবৎ তিথিকৃত্য নয়, "শেষং চন্দ্রাশ্রিতং কর্ম্ম" বচনাপেক্ষায় সাহচর্য্য ন্যায় দুর্ব্বল জন্যও ন্যায়ের উপস্থিতি সম্ভবে না ইত্যাদি স্মার্ত্তবাক্যের প্রতিবাদ দ্বারাই স্বমত সমর্থনের হেতুটীকে প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। বলি এ বৈষম্য কথাটী কি জন্মাষ্টমী দৃষ্টান্তটীকে তিথিকৃত্যের দৃষ্টান্ত মনে করিয়া? জন্মতিথিকৃত্যটী তিথিকৃত্য বলিয়া অভিপ্রেত হইলে "তিথিকৃত্যেচ কৃষ্ণাদিঃ" ইত্যাদি বচন দ্বারাই ত কৃষ্ণাদি মাস সমর্থিত হইত, ন্যায়াবলম্বনের প্রয়োজন কি ছিল? জন্মতিথিকৃত্যবৎ মৃততিথি কৃত্যটী যে তিথিবিশেষ বিহিত কৃত্য নয় তাহা দ্বৈতনির্ণয়োক্তি দ্বারা স্মার্ত্ত স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞাত বিষয়ে এতবড় প্রমাদ? গৌণচান্দ্রকৃত্যে জন্মতিথিকৃত্যেরনির্দ্দেশ থাকায় "শেষং চন্দ্রাশ্রিতং কর্ম্ম" ইত্যাদি সাধারণ বচনদ্বারা ঐ কৃত্যকে মুখ্যচান্দ্রকৃত্য বলা যাইতে পারে না, তজ্জন্যই স্মার্ত্ত "ব্রহ্মপুরাণীয়ত্বাৎ" বলিয়া প্রধান হেতু নির্দ্দেশ করিয়া তদনুকূলে ন্যায়াবলম্বন করিয়াছেন। জন্মাষ্টমীকৃত্যটী ও জন্মতিথিকৃত্য, ঐ কৃত্যে যে কোন উপায়ে হউক কৃষ্ণাদিমাস সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং তদ্দৃষ্টান্তে অর্থাৎ জন্মতিথিকৃত্যের দৃষ্টান্তে আমাদের জন্মতিথিকৃত্যটীও

ঐরূপ কৃষ্ণাদিমাসেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। শুধু জন্মতিথিকৃত্যহিসাবে আমাদের জন্ম তিথিকৃত্যে তদ্বৎ কৃষ্ণাদিমাস কল্পিত হইলে বৈষম্যের উদ্ভব হয় কি? বিশেষ বচন বাধিত সাম্বৎসরিককৃত্যের ন্যায় জন্মতিথিকৃত্যে বিশেষ বচন বাধা না থাকায় ব্রহ্মপুরাণীয় বলিয়া সামান্যবচনের আশ্রয় অসম্ভব জন্য ব্রহ্মপুরাণীয়ের অনুকূলে ঈদৃশ সাংদৃষ্টিক ও সাহচর্য্য ন্যায় প্রদর্শন কি অসঙ্গত না অসমীচীন?

আর প্রবন্ধ বাড়াইয়া বিরক্তি জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। ঈদৃশ টীকাকার এবং তৎপক্ষাবলম্বীদিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায় পঞ্চানন মহাশয় মলমাসতত্ত্বে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এবং বিচারভার পাঠক পণ্ডিত মহাশয়দের উপর ন্যস্ত করিয়া নিরস্ত হইলাম।

......"তন্মাসীয় তৎপক্ষীয় তত্তিথিবিশেষবিহিতে জন্মতিথিকৃত্যে ব্রহ্মপুরাণীয়বচনস্যাষ্টকা সাহচর্য্যাচ্চ পৌর্ণমাস্যন্তমাসানুমাপকত্বাৎ। তিথি বিশেষবিহিতকর্ম্মসু তিথিকৃত্যেচ কৃষ্ণাদি মিতিবচনে পৌর্ণমাস্যন্তমাসোল্লেখপ্রতিপাদনমুখেনৈব তথাবিধমাসপ্রতিপাদনাচ্চ এবঞ্চ জন্মতিথিকৃত্যং গৌণচান্দ্রেণেতি কচিল্লিখিতং মুখ্যচান্দ্রেণাপীতি কচিল্লিখিতং স্মার্ত্তৈরিতি মৌর্খলিখনং ভ্রান্ত্যৈবেত্যবধারনীয়ং।"

এবারেও বিদায়কালে বলিয়া রাখি "সহসা প্রাচামাচারস্যদূরাচারোক্তির্নযুক্তা" ইতি।—

৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায় প্রতিবাদের সমালোচনা।

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর কাব্যব্যাকরণ-ন্যায়তীর্থ।)

বিগত ১৮৪৪ শকের মাঘসংখ্যাক 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদলিখিত ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "ব্রাহ্মণসমাজ" এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনিই লিখিয়াছেন যে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের আচরণে সদাচার ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে কিছু কিছু আঘাত পড়িতেছে, তবে তিনি "কিছু কিছু" বলিয়াছেন—আমরা তাহা মনে করি না। প্রকাশ্য শত্রু (ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টিয়ান) বরং ভাল কিন্তু হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া হাঁড়িধর্ম্ম ছুৎমার্গ বলিয়া খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করা—অনধিকারীর ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস গ্রহণ

করা আচার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ বক্তৃতাদি দেওয়া সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণবিদ্বেষ এবং পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণকরা ইত্যাদি হেতু ৺রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় আর্য্যসমাজীদিগের ন্যায় সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছে। এতদিন এই সম্প্রদায় বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সমাজ অনভিজ্ঞ ছিলেন,স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাদির অথবা রামকৃষ্ণকথামৃত লীলাপ্রসঙ্গাদির—ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণ বড় একটা কিছু খোঁজ খবর রাখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না, * নচেৎ এতদিন পণ্ডিত মহাশয়গণতথা স্বধর্ম্মপরায়ণ আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণবর্গ এই সম্প্রদায়ের বিষয়ে এরূপ উদাসীন থাকি-তেন না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ঐ সম্প্রদায়ের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সনাতন সমাজের পক্ষ হইতে যেরূপ দক্ষতাসহকারে "সাহিত্য"পত্রে প্রবন্ধাবলি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক প্রতিবাদ কারীর উত্তর যেরূপ অকাট্য ভাবে দিয়াছিলেন, তাহাতেই আহ্লাদিত হইয়া বোধ করি 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম্-এ, মহাশয় "ব্রাহ্মণসমাজের"জন্য একটিপ্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিয়া ছিলেন এবং তৎফলেই "৺রামকৃষ্ণপরমহংসও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রতিবাদী ভাগবত ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ব্রাহ্মণসমাজের পত্রের প্রতিও মন্তব্য প্রকটন করিতে ছাড়েন নাই। আমাদের বিশ্বাস বর্ণাশ্রম বিরোধী এই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করিয়া বিদ্যাবিনোদমহাশয় সমগ্রব্রাহ্মণসমাজ তথা সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাসী সদাচার পরায়ণ হিন্দু মাত্রেরই ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। বরং আমরা অনুরোধ করিতেছি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তদীয়প্রবন্ধাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাহাতে এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য সমাজে সুপ্রচারিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন।

রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মও সমাজের উপর আঘাত পড়িতেছে—ভাগবত মহাশয় ইহা স্বীকার করিতেছেন—তথাপি এতদিন কৈ এবিষয়ে তিনি কোনও বাঙ নিষ্পত্তি কোথাও করিয়াছেন বলিয়া তো আমরা অবগত নহি।—তিনি বিদ্যাবিনোদকে যেভাবে লিখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি সেভাবেও তো প্রবন্ধ লিখিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রচারিত অভিনব মতের সহিত শাস্ত্রের একবাক্যতা সাধন করিতে পারিতেন—তাহা করিয়াছেন কি? আশাকরি এখন হইতে তাহা করিবেন—এবং ঐ সম্প্রদায়ের মুখপত্র উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার সামঞ্জস্য বিধায়ক প্রবন্ধ যেন আমরা দেখিতে পাই।

তিনি প্রবন্ধে বলিয়াছেন "আমি রামকৃষ্ণ মিশনের চেলা নই।" আমরা ব্রাহ্মণের বাক্য একেবারে মিথ্যা বলিব না, তিনি মিশনের চেলা না হইলেও তাঁহার প্রতিবাদের ধরণে বোঝা যায়, যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরোধী দলের আওতায় পড়িয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের চেলা

* দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া যে "চাপরাশের" কথা এতদিন চলিয়াছিল, তিনি তাহার খবরই রাখিতেন না। গত ৩।৪ বৎসর হইল তাঁহার নিকট এ কথা উত্থাপিত হইলে পর তিনি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

নহেন কিন্তু রামকৃষ্ণ দেবের ভক্ত অথচ বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুরক্ত সদ্‌ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি, ভাগবত মহাশয় কিন্তু সেরূপ নহেন, তিনি একটু বেশী চাপা পড়িয়াছেন, মিশনের চেলার মধ্যেও এমন দু একজন এখনও আছেন যিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অনুরক্ত, ভাগবত মহাশয় সেরূপ চেলা হইলেও ভাল ছিল, কিন্তু তিনি সেরূপও নহেন—বোধহয় যেন তিনি শিখণ্ডী ভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন—পশ্চাতে কোনও বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিরোধী ধনঞ্জয় অবস্থিত হইয়া বিদ্যাবিনোদের প্রতি বাক্যবান বর্ষণ করিতেছেন।

বর্ণাশ্রম বিরোধীদিগের যাহারা এযাবৎ বিদ্যাবিনোদের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাঁহাকে তাঁহার প্রবন্ধে আমরা কতকগুলি লক্ষণ দেখিতেছি, ক্রমশঃ তাহা বলিতেছি—

(১) যাহা প্রকৃত নহে তাহা বলা।

"তাঁর (পরমহংসের) কাছে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ই ছুটিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু পরমহংসদেব তাঁর কাছে কোন দিন যান নাই।" এ কথা প্রকৃত নহে। বিদ্যাবিনোদের যে প্রবন্ধের তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতেই আছে "একজনের বাড়ী গিয়া (তর্কচূড়ামণি মহাশয় তখন ভূধর বাবুর বাড়ীতেই ছিলেন) তাঁহাকে চাপরাশ আছে কি না জিজ্ঞাসা করা অস্বাভাবিক ও অতি অভদ্রতা। পরমহংস তাদৃশ অভদ্র ছিলেন না।" ইত্যাদি ব্রাহ্মণসমাজ ১৮৪৪ মাঘসংখ্যা ১৬৭ পৃঃ "সাহিত্যে যে প্রবন্ধ বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল, * তাহাতে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল; ঐ পত্রে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন যে পরমহংসই তাঁহার নিকটে প্রথম আসিয়াছিলেন—পরে তিনি গিয়াছিলেন। এরূপ মধ্যে মধ্যে পরমহংসও তাঁহার নিকটে আসিতেন, তিনিও পরমহংসের নিকট যাইতেন।

(২) দোষ ঢাকিবার অন্তবিধ চেষ্টা। "মহাপ্রভু যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্তবর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না বলিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন সেটি তাঁহার লীলা আলোচনা না করিবারই ফল, আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে তাহার ভূরিপ্রমাণ দেখান যাইবে।" বিদ্যাবিনোদ সাবধানে বলিয়াছেন "চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহারও বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না।" ইহার উত্তরে ভাগবত মহাশয় প্রতিবাদ সমর্থনার্থ দু একটা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলেই প্রচুর হইত। তাহা তিনি করেন নাই ভবিষ্যতের জন্ত মুলতোবি রাখিয়াছেন। ৺শিশির ঘোষ প্রভৃতির আধুনিক গ্রন্থে তো চৈতন্যগুরু ঈশ্বর পুরীকে শূদ্র বলা হইয়াছে—তাদৃশ কোনও এক মহাপ্রভুও ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত থাকিতে পারে।

এইরূপ চাপরাশের কথাও স্বকর্ণে শুনিয়াছে এরূপ লোক এখনও আছে বলিয়া এক

* সাহিত্য পৌষ ও মাঘ ১৩২৭। (৫৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

প্রতিবাদী খুব জোরে বলিয়াছিলেন—তারপর এখন তো আহ্বান করিলেও সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! *

(৩) চতুরতা। বিদ্যাবিনোদ সর্ব্বদাই পরমহংসের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন—তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে একাধিকবার একথা স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাপি তাঁহার উপর 'বিদ্বেষের অভিযোগ' চাপান রহিয়াছে। বিদ্যাবিনোদের প্রবন্ধের উপসংহারে "দোষোদ্ঘাটন" করিবার জন্য যে প্রবন্ধ লেখেন নাই স্পষ্ট বলিয়াছেন,—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধভাব প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া জনসাধারণকে সাবধান করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখিয়াছেন একথা বলাসত্ত্বেও—চালাকি করিয়া কোন কারণ না দর্শাইয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়া প্রবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে সার (?)' সংকলন পূর্ব্বক, "জগৎপূজ্য ব্যক্তিকে' 'সবলোট' 'স্নায়ুবিকার গ্রস্ত' 'পাপাচারী' 'পথভ্রষ্ট' 'অধঃপতিত' ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত করিয়াছেন" এরূপ অভিযোগ তাঁহার উপর আনিয়াছেন। এক 'সবলোট' ভিন্ন আর সব বিশেষণ তো বিদ্যাবিনোদের প্রবন্ধে খুঁজিয়া আমরা পাইলাম না। বিদ্যাবিনোদ 'নার্ভাস (nervaus) বলিয়াছেন — * ইহার তরজমা হইয়াছে 'স্নায়ু বিকারগ্রস্ত।" বিদ্যাবিনোদ কি সুন্দরভাবে পরমহংসের কথা লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীজগদম্বার অপার করুণার পাত্র তাঁহার এই সাংসারিক অভিজ্ঞতা শূন্য সরলপ্রকৃতির ছেলেটির পা পিছলিয়াছিল কিন্তু তিনি তাঁহাকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইতে দেন নাই - তবে কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক অবনতি ও দৈহিক যন্ত্রণা ভোগাইয়া পরিশেষে তাঁহার ক্রোড়ে স্থানদান করিয়া ছিলেন। (ব্রাহ্মণসমাজ মাঘ ১৮৪৪ —১৬৯-১৭০) বলি, ইহাতে 'বিদ্বেষ ভাব' প্রকাশিত হয় কি? "পাপাচারী পথভ্রষ্ট অধঃপতিত" ইত্যাদি বিশেষণ এইরূপ লেখা হইতে আহরণ করা যায় কি? ফলকথা, এরূপ 'চালাকি' না করিলে তো বিষয়টা ঘোরাল করা যায় না—পরমহংসের প্রতি কটূক্তি করা হইয়াছে এরূপ না দেখাইলেও বিদ্যাবিনোদের প্রতি গবেষণার সুবিধা হয় না।

(৪) কোনও কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখার অসামর্থ্য। "হাজরা মহাশয় কেবল ফড়র ফড়র করে বকে"—এইকথা পরমহংস বলিয়াছিলেন, ভাগবত মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাবিনোদের প্রবন্ধে আছে—ইহা স্বয়ং কথামৃতকার বলিয়াছিলেন!! উত্তরপাড়ার

* ভাগবত মহাশয় প্রকারান্তরে চাপরাশের কথা তুলিয়াছেন কিন্তু "তুমি যে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছ, চাপরাশ আছে?" এরূপ জিজ্ঞাসা, আর কথাপ্রসঙ্গে "তার কাছ পেংকশাক্ না পেলে কিছুই হয় না" এরূপ বলা কি সমান কথা? প্রকৃতপক্ষে যে সব কথা হইয়াছিল তাহা ৺ভূধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সাধু দর্শন" অথবা তৎসম্পাদিত "বেদব্যাস" পত্রে আছে। বিদ্যাবিনোদ লিখিত (সাহিত্য মাঘ ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রবন্ধ বিশেষেও এ সব কথা বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এসব দেখিবেন।

* বিদ্যাবিনোদ নার্ভাস মাত্র বলিয়াছেন -ব্রাহ্ম প্রচারক ৺শিবনাথ শাস্ত্রী স্পষ্টই ইঁহার "পীড়া" বলিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে" "জয়চন্দ্র মুখোপাধ্যায়" লিখিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন "শাস্তরসাস্পদ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি। নানাকারণে এ বিষয় আলোচনা বাড়াইতে চাইনা—কিন্তু ভাগবত মহাশয় ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (তথা তদীয় পুত্র ৺প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়) সম্বন্ধে যে কিছুই জানেন না বা জানিবার চেষ্টাও করেন নাই—ইহাই প্রতীত হইতেছে।

৫। বুঝিবার অসামর্থ্য। বিদ্যাবিনোদ বলিয়াছিলেন "সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার না থাকিলেও তাঁহারা যত্রতত্র ভোজন করিয়া আধ্যাত্মিক পাতিত্যগ্রস্ত হইবেন এটাও সদাচার অনুমোদিত নহে।" ভাগবত মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—সন্ন্যাসীর পক্ষে জাতিবিচার নাই, একথা বলিলেন, আবার যত্রতত্র ভোজন করিলে পাতিত্য জন্মে ইহাও বলিলেন ইহার সামঞ্জস্য কি? এস্থলে পাতিত্যের পূর্বে আধ্যাত্মিক কথাটি ছাড়িয়া দিয়াই গোল বাধাইয়াছেন। সামাজিক "পাতিত্য" সন্ন্যাসীর নাই—কেননা তাঁহারা গৃহস্থ-সমাজের বাহিরে। কিন্তু আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ এই বাক্যের নিয়মীভূত সন্ন্যাসী বটেন, তাই নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতাবস্থা বজায় রাখিবার জন্য সন্ন্যাসীও যত্র তত্র যা তা খান না, তবে নব্য সম্প্রদায়ের 'আনন্দ' বর্ণের কথা স্বতন্ত্র ইহারা প্রকৃতই সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র'।

৬। শাস্ত্রের দু'একটা বোল চাল প্রকটন—কিন্তু শাস্ত্রতত্ত্বে অপ্রবেশ। ঋষিবাক্য বা ভগবদ্বাক্যেও অসঙ্গতি আছে অতএব রামকৃষ্ণাদির আচরণে ও কথায় না থাকিবে কেন? এইরূপ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ভাগবত মহাশয় কতকগুলি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তেও তিনি "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেদিন নৈহাটি সাহিত্যসম্মিলনে পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় দর্শন শাখার সভাপতি ভাবে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন 'যামি মাং পুষ্পিতাং বাচম্' ইত্যাদির কি সুন্দর যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাগবত মহাশয় তাহা দেখিয়াছেন কি? সে যাহা হউক শাস্ত্রের নানা স্থলে আপাত বিরোধ সূচক কথা দৃষ্ট হয় অতএব রামকৃষ্ণ বা তৎসম্প্রদায়ের কথায় ও কাজে অসামঞ্জস্য থাকিবে ইহা কি যুক্তি? শাস্ত্রের তো আপাত বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য বিধান হইয়া থাকে—ইহাদের দু একটা পরস্পর বিরুদ্ধ কথার বা আচরণের সামঞ্জস্য ভাগবত মহাশয় দেখাইলেন কোথায়? সেটা দেখাইয়া পরে শাস্ত্রের নজির আনা উচিত ছিল।

৭। রামকৃষ্ণাদি সম্বন্ধে অত্যুক্তিবাদ—ভাগবত মহাশয় প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিতেছেন যে রামকৃষ্ণকে একজন অবতার বলিয়া সকলে স্বীকার না করিলেও তিনি যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ এসম্বন্ধে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই।" আমরা তো অবতার দূরে থাকুক রামকৃষ্ণ যে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন ইহাও সম্যক্ স্বীকার করিতে পারি না। বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই একথা তাঁহার অত্যুক্তিবাদ। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি, রাজা প্যারীমোহন, প্রভৃতি (বিদ্যাবিনোদের কথা নাই বলিলাম) অনেকেই তো তাঁহাকে তাদৃশ মনে

করেন না—বিবেকবান্ শাস্ত্রদর্শী কেহই ঐরূপ মনে করিবেন না। "স্বাধীন কুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ"—এটা মস্ত কথা। যে ব্যক্তি পীড়ায় ভুগিয়া যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া ডাক্তার প্রভৃতির তথা শিষ্যাদির দীর্ঘকাল চিকিৎসাও সেবা শুশ্রূষার অধীন হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাঁহাকে সিদ্ধমহাপুরুষ বলা ঐ সম্প্রদায়ের গোঁড়াদের পক্ষে সম্ভব, কিন্তু বিচারশক্তি যাঁদের আছে তাঁরা একথা বলিবেন না—'অবতার' বলা তো নিতান্তই হাস্যাস্পদ বিষয়। * শুনিয়াছি পরমহংস নিজেও বলিতেন, অবতারের কি ক্যান্সার হয় গা ?"

তারপর বলা হইয়াছে "রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় যে প্রসার লাভ করিয়াছে শত শত মহামহোপাধ্যায়ের চীৎকারেও তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না কেবল চীৎকার করিয়াই গলাভাঙ্গিবে।

"শত শত" দূরে থাকুক একজন "মহামহোপাধ্যায়ের" লেখার চোটেইতো দেখিতেছি সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ। "যদি বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয় তবে "সাহিত্য" পত্রের পেছনে এই সম্প্রদায় লাগিয়াছিল কেন—এবং এই ভাগবত মহাশয়ও ব্রাহ্মণসমাজ পত্রের বিভীষিকা জন্মাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কেন? যদি বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়, তবে এই "প্রতিবাদ" করণার্থে অধ্যবসায় কেন? চীৎকার করিয়া গলাভাঙ্গা দূরে থাকুক—তাঁহার লেখা পড়িয়া অনেকেরই চোখ ফুটিতেছে—এই সম্প্রদায় যে তাহা না বুঝিয়াছেন এমনও মনে হয় না। সে যাহা হউক, ভাগবত মহাশয় মনে রাখিবেন সত্যের জয় চিরকাল—শত মিথ্যা একদিকে আর একটি সত্য একদিকে সত্যের জয় হইবেই। বিদ্যাবিনোদ সেই সত্যপক্ষ আশ্রয় করিয়া অত্যুক্তি, অসারোক্তি মিথ্যাবাদ ইত্যাদি নির্ভীক ভাবে দেখাইয়াছেন। প্রতিবাদীপক্ষ যে সব লেখা ছাপাইয়াছেন সেগুলি প্রায়ই অসার বলিয়া প্রতীত হইতেছে—প্রতিবাদ দ্বারা তাঁহারা নিজেরই অনিষ্ট করিতেছেন, আমরা ইহাই দেখিতেছি এবং "সত্যমেব জয়তি নানৃতম্" ইহাই বুঝিতেছি।

(৮) পূর্ব্বাপর অসামঞ্জস্য। রামকৃষ্ণ তাঁহার গুরুকে 'শালা' বলিলেন, তখন তিনি "জগদম্বার ক্রোড়ের সরলশিশু।" আর যখন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনাকে পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম এখন যেন একটু নামিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে"—তখন রামকৃষ্ণ নিজের অবনতি ভাব স্বীকার করিলেন, এটা সরলতা' হইল না এটার বেলায় ভাগবত মহাশয় বলিতেছেন 'তর্কচূড়ামণি মহাশয় যদি তাঁহাকে ঐরূপ বুঝিয়া ঐরূপই বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ঐরূপ উত্তরই সুসঙ্গত কিনা তাহা বিজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণ বিচার করুন।" ঐরূপ উত্তর—যাহা তাহা "কায়স্থ পত্রিকার" একজন লেখক খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের কথাগুলি সমস্ত উদ্ধৃত করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন—ধীমান পাঠক, পণ্ডিতজীর এই চিত্র হইতেই

* এ স্থলে ইহা পুনরপি বলা আবশ্যক যে আমরা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে একজন সাধু পুরুষ এবং সাধকব্যক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করি। 'বাড়াবাড়ি করিয়া বরং তাঁহার প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা এ সব গোঁড়ারাই আনিয়াছেন।

কি পরমহংসদেবের নিরাবতরণা লক্ষ্য হয়? . . জ্ঞানাভিমানী প্রেমভক্তিহীন বিষয়-মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়?" (কায়স্থ-পত্রিকা ফাল্গুন ১৩২৯ ৪৭৯ পৃষ্ঠা) জিজ্ঞাসা করি সরল শিশু কি 'ছলনা' জানে? আমরা মনে করি পরমহংস সরলই ছিলেন—প্রকৃতই জগদম্বাকে মাতৃভাবে সাধন করিয়া তিনি নিজকে শিশুভাবেই গঠন করিতে সতত প্রয়াস করিয়াছিলেন—তাই আমরা বিশ্বাস করি তিনি শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট সরলভাবেই নিজের ঈষদবনত অবস্থা স্বীকার করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি গুরুকে শালা বলিয়া শাসাইতে পারিয়াছিলেন—তিনি চূড়ামণি মহাশয়কেও তাদৃশ গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিতে পারিতেন।

(৯) পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের প্রতি অবহেলা।

ভাগবত মহাশয়—অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী চূড়ামণি মহাশয়কেও পরমহংসের "পরীক্ষক"রূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই জানেন যে "গুরুপরীক্ষা" পর্য্যন্ত করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে, সেটা দীক্ষা গ্রহণে শিষ্যই করিবে। এই "পরীক্ষা" ব্যাপারের প্রকৃত কর্ত্তা শাস্ত্র—শাস্ত্রাদিষ্ট লক্ষণ দেখিয়াই বিচার করিতে হয়। রামকৃষ্ণ কি তাহারও অতীত? শাস্ত্রে অপ্রবিষ্ট কয়েকজন গিয়া "পরীক্ষা" করিয়া রামকৃষ্ণ যে "অবতার" তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলেন—সে বিষয়ে ভাগবত মহাশয় নীরব। আর তাঁহারই মতে বহুশাস্ত্রদর্শী পরমপণ্ডিত এবং একজন সাধক" তর্কচূড়ামণি মহাশয়—তিনি শ্রদ্ধাসহকারেই পরমহংসের নিকট যাইতেন—তিনি 'পরীক্ষা' করিবার কিছু বলিবার অনুপযুক্ত!! কলির লক্ষণে আছে "কুলবধূকে কুলটা করাইবে"—তাহাই আমাদের মনে হয়। "শত শত মহামহোপাধ্যায়কে" চীৎকার করাইয়াও তিনি বেশ পণ্ডিতমর্য্যাদা প্রদর্শন করাইয়াছেন।

(১০) নিজের দোষটি না দেখা কিন্তু অপরের দোষ দর্শন।

ভাগবতমহাশয় রামকৃষ্ণেরপক্ষে বলিবার সময় তো বলিলেন "দোষা বাচ্যা গুরোরপি" ইত্যাদি। বেচারা বিদ্যাবিনোদের বেলায় তো খুব কবিত্ব ফলাইয়া বলিতে পারিলেন "ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্।" বেশ কথা। কিন্তু তিনিতো নিজেই বিদ্যাবিনোদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন একজন শিক্ষাপরিমার্জ্জিতরুচি কি" "তেজস্বী ব্রাহ্মণ" "স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সদাচার পরায়ণ ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মের অকপট বান্ধবতায় (?) আবার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত" ইত্যাদি। এইরূপ ব্যক্তিকে কিরূপে তিনি প্রকারান্তরে মহতের প্রতি অপভাষী "পাপভাক্" বলিয়া খ্যাপিত করিলেন? ঐ উপসংহার অংশটা বাদ দিলেও তো তাঁহার বক্তব্যের কোন হানি হইত না।

(১১) অসম্বদ্ধভাষণ।

তিনি বলেন, রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ে গলদ আছে—কেননা সকল সম্প্রদায়েরই তাহা আছে। এ তো বড মজার কথা। দোষ আছে স্বীকার করিবে—কিন্তু কেহ সেই দোষ ঘাঁটিয়া দেখাইতে গেলে তাহার উপর বিদ্বেষের অভিযোগ আনিবে কেন? অপর

সম্প্রদায় (যথা মহাপ্রভুর ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবেরদল) মধ্যে যদি গলদ থাকে এবং তাহাতে সমাজের যদি অনিষ্ট হয়, তাহা সমাজহিতৈষী ঘাটিয়া দেখাইতে বাধা বিশেষতঃ এইরূপ সম্প্রদায় যদি নিতান্ত অর্ব্বাচীন হয়। রামকৃষ্ণের রোগ সম্বন্ধে বলেন—কলিকালে কঠোর সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই রোগাক্রান্ত হইয়াছেন—যথা দেবাদিদেব শঙ্কর। দেবাদিদেব কি "কলিকালে" কঠোর সাধনা করিয়া ছিলেন ? এবং রোগের যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কি তিনি অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কলিকালে ত্রৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষেপা, ভাস্করানন্দ,রামদাস কাঠিয়া প্রভৃতি কতশত সাধক মহাপুরুষ সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত ছিল। যদি কোনও সাধক কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকেন বুঝিতে হইবে তাহার মধ্যে একটা গলদ ছিল। তার পর রামকৃষ্ণের পীড়া কি "সাধনার কঠোরত ফল ? তাহা হইলে তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থায় দেখা দিত। পরিশেষে যখন তিনি (ভক্তদের চক্ষে) সিদ্ধ মহাপুরুষ হইয়া ছিলেন এবং (কত ভক্তের নিকটে) 'অবতার'রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন, তখন সাধনার কোনও কঠোরতা যে তাহার দেখাযায় নাই—তখন এই পীড়া হইল কেন ? তাই সঙ্গদোষ আচারভ্রষ্ট হইয়াই ইহা ঘটিয়াছিল একথা ভিন্ন আর কি বলা যায় ?

পরমহংস রসদদার 'শম্ভুমল্লিকের 'নাকটেপা' অসরলতার কথা বলিয়া কোন দোষ করেন নাই; কেননা তাহা হইলে জ্যোতিষশাস্ত্রের বক্তাগণ অধিকাংশই ঐরূপ নিন্দুক পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন। "জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ" কি অপরের নিকটে কাহারও কুলক্ষণ বর্ণনা করিয়া উহাকে সাধারণ্যে হেয় প্রতিপন্ন করেন ? শম্ভুমল্লিক যদি রামকৃষ্ণের নিকটে নিজের লক্ষণাদি জানিতে যাইতেন এবং রামকৃষ্ণ যদি শম্ভুমল্লিকের মুখের উপর তাহার টেপানাকের দোষ বর্ণনা করিতেন, তবেই তিনি "জ্যোতিঃশাস্ত্রের বক্তৃগণ" সহিত তুলিত হইতে পারিতেন। অলংবাহুল্যেন ! এখন শিখণ্ডীভূত ভাগবত মহাশয়কে আমরা কতকগুলি কথা বলিতে চাই।

(১) নানাবিধ দর্শনের বিভিন্নমতে যে শ্রুতি ব্যাখ্যা ভেদ আছে তাহা কল্পিত নহে, অধিকারী ভেদে সর্ব্বজ্ঞানাকর শ্রুতি বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ইহাই ব্যাখ্যা ভেদের মূল। দল বাঙ্কিবার জন্য কল্পনা নহে. বিবেকানন্দের ব্যাখ্যাকে সেইরূপ অর্থভেদে ব্যবহার করার উপদেশ প্রদান—শ্রুতির অবমাননা করা এবং বাহ্যপ্রতিষ্ঠার হেতু, ব্রাহ্মণের লেখাতে এমন ভাব প্রকাশ একান্ত অনুচিত।

(২) রামকৃষ্ণ পরমহংস দ্বারা যে সমাজের কতক উপকার হইয়াছিল—ইহা—কি পণ্ডিতবর শশধরতর্কচূড়ামণি মহাশয় কি বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কেহই অস্বীকার করেন নাই। বরং ঐ উপকারের কথা চূড়ামণি মহাশয় তাঁহারচিঠিতে এবং বিদ্যাবিনোদ তাঁহার প্রবন্ধে যথেষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট দোষে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহার সঙ্গে জুটিয়া সব মাটী করিয়াছে। তিনিও কষ্ট পাইয়া গেলেন আমরাও ইহাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রাদু-

ভাব দেখিয়া সমাজের কল্যাণ বিষয়ে আতঙ্কিত হইতেছি। বশিষ্ঠধেনু বিশ্বামিত্র সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ঐ ধেনুর পুচ্ছদেশ হইতে যবন সেনার আবির্ভাব হয় ঐ সেনা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদল পরাজিত করিয়া ধেনুর রক্ষা বিধান করে। পরন্তু ধেনু কর্ত্তৃক সৃষ্ট যবন বংশদ্বারাই ধেনুকুলের ঘোরতর অনিষ্টসাধন হইয়াছে। পরমহংস দ্বারা যেটুকু উপকার হইয়াছিল, তৎসম্প্রদায়ের দ্বারা তদপেক্ষা অধিক অনিষ্ট ঘটিতেছে। (৩) পরমহংসদেবের 'দল' হউক, ইহা ইচ্ছা করিতেন না। তিনি নাকি বলিতেন 'এঁধো পুখুরেই দল বাঁধে' ইত্যাদি। তারপর ডিস্পেন্সারি হাস্‌পাতালেরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন তাঁহারই নামে 'দল' বা সম্প্রদায় (মিশনসঙ্ঘ ইত্যাদি) হইতেছে এবং উহারা ডিস্‌পেন্‌সারি হাসপাতাল ইত্যাদি করিতেছে। তবে এরূপটা করার জন্য রামকৃষ্ণই মূলতঃ দায়ী—শেষাবস্থায় তিনি—ভরত যেমন হরিণ শিশুর মোহে পড়িয়া ছিলেন—কতকগুলি লোকের মায়া জালে জড়িত হইয়া গিয়াছিলেন। ফলে কি হইল তাহা এই প্রবন্ধে বলা পুনরুক্তিমাত্র।

পরমহংসকে (বা বিবেকানন্দকে) সমগ্র দেশের লোক জগদ্বরেণ্যই মনে করুক বা নাই করুক, তাহাতে আমরা ভুলিব না—শাস্ত্রের ও সদাচারের দিক দিয়া তাঁহাদের চাল-চরিত্র দেখিয়া তারপর তাঁহাদের সম্বন্ধে ধারণা গঠন করিব। রামমোহন রায় এবং কেশব-চন্দ্র সেন তাঁহারাও সমগ্র দেশের লোকের নিকট ঐরূপ "বরেণ্য" ছিলেন - তাই বলিয়া তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা যদি সমাজের অনিষ্ট হইয়া থাকে—তজ্জন্য সমাজহিতৈষীর নিকট তাহারা শত্রুরূপেই বিবেচিত হইবেন। ব্যক্তিবিশেষ অপেক্ষা 'সমাজ' বড়—ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে—অতএব সর্ব্বাগ্রেই সমাজ স্বধর্ম্ম স্বদেশ ইত্যাদি দেখিতে হইবে—তারপর ব্যক্তিবিশেষকে বিচার করিতে হইবে, সমাজসমষ্টির হিতাহিত কাহারও দ্বারা কিরূপ হইয়াছে তাহাই মাপকাঠি করিব। এই হিতাহিত বোধ কয়জনের আছে—বিশেষতঃ আজকাল শাস্ত্রবিশ্বাসী লোক বড়ই বিরল, আবার শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোক মুষ্টিমেয় বলিলেই হয় শাস্ত্রানুশাসিত সমাজের প্রকৃতপক্ষে কি হিত কি অহিত শাস্ত্রবিশ্বাসী ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই বলিতে পারেন। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট রামকৃষ্ণ বা তদীয় সম্প্রদায় কিরূপ সমাদৃত তাহাই দেখিতে হইবে। শাস্ত্রে অবিশ্বাসী ও জ্ঞানবর্জ্জিত শতসহস্র পুত্তলিকা সদৃশ জনতার প্রশংসাবাদে বিশেষ কিছু আসে যায় না—কোনও স্থায়ী ফলও হয় না। তবে আজকাল এইরূপ জনতা সাহায্যেই অনেকে বেশ পসার করিয়া লইতেছে। ঈদৃশ জনতা হাতে রাখিবার জন্য তদনুকূল মত প্রচার করিতেছে—যথেচ্ছ আহার-বিহার কর—সদাচার বা শাস্ত্র কিছুই নহে এসব ব্রাহ্মণের কারসাজী—কিন্তু "ঠাকুর" যাহা বলিয়াছেন তাহাই বেদ, তাহাই বেদান্ত, ঠাকুর বলিয়াছেন "আমাকে চিন্তা করিলেই সব আপনা আপনি হইয়া যাইবে; সাধন ভজনের কোন দরকার নাই। ইত্যাকার বিবিধ উপদেশ প্রচার হইতেছে। রামকৃষ্ণসম্প্রদায় এখন এইরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। (৫) গন্ধতৈল প্যাটেণ্ট ঔষধ ইত্যাদি যেরূপ বিজ্ঞাপনের জোরে খুব চলে—এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ নানাভাবে

বিজ্ঞাপনকারী করিয়া প্রসারলাভ করিয়াছে,মিশনসেবাশ্রম ইত্যাদি ঐসকল বিজ্ঞাপনের এজেন্সী স্বরূপ। ছবি ছাপাইয়া পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তো যথাসাধ্য প্রচার হইতেছে, এছাড়া মিল হইতে স্কুলের ছেলেদের খাতা পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণের নামের ছাপ পড়িয়াছে। তাহাতে কয় দিন বেশ চলিবে, তৎপরে ক্রমশঃ পসার কমিয়া আসিবে। লোকে এসব চতুরতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে এই সম্প্রদায়ের দোষাদোষ আরো 'অবতার'দের সম্প্রদায়েও দেখা দিতেছে, সেগুলিও এইরূপই। (৬) রামকৃষ্ণের শিক্ষা ছিল সাধন ভজন কর মাকে ডাক্ ইত্যাদি আর তৎসম্প্রদায় এখন সমাজবিরুদ্ধ আচরণ শিখাইতেছে। নীতিবিরুদ্ধ কথাও প্রচারিত হইয়াছে, যেমন বিবেকানন্দ বলিতেন "না হয় একটা বড়দরের চুরি ডাকাতি কর বুদ্ধি খুলুক"। সংসারানভিজ্ঞ ভাবপ্রবণচিত্ত যুবকগণ অনেকে এসব উদ্ভট উপদেশও সাগ্রহে শিখিয়া সমাজে অশান্তি আনয়ন করিতেছে; নিজেরাও শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। ভাগবত মহাশয় যে ব্রাহ্মণ সন্তান, আশাকরি তিনি এসব বুঝিয়া দেখিবেন, শিখণ্ডী হইয়া ক্লৈব্য প্রকটন নাকরিয়া, "স্বধর্ম্ম মপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতু মর্হসি" এই ভগবদ্‌বাক্য দৃঢ় করিয়া যাহারা নির্ভীক ভাবে সমাজ সেবার্থ চেষ্টা প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের অনুকরণে সমাজ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে যত্নপরায়ণ হইবেন।

চারিকন্যা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।)

(৫)

রাণী একদিন রাজাকে বলিলেন—মহারাজ! অশোক যে নূপুরটা আনিয়াছে, সে একটা ত কোনও কাজে লাগিবে না। তারমত আর একটা নূপুর গড়াইতে দিন। রাজা সেকথা শুনিয়া স্বর্ণকারদিগকে ডাকাইয়া, সেই নূপুর দেখাইয়া বলিলেন—এইরূপ আর একটা নূপুর গড়িয়া দিতে হইবে।

স্বর্ণকারেরা দেখিয়া বলিল—মহারাজ! এরূপ নূপুর পৃথিবীতে কেহই গড়িতে পারিবে না। এ মানুষের গড়ন নয়; কোনও দেবশিল্পীতে গড়িয়াছে। যেখানে এ নূপুর পাওয়া গিয়াছে, সেই খানেই এ জোড়ার অন্য নূপুরটী পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করান।

এই কথা শুনিয়া রাজা ও রাণী উভয়েই বিষণ্ণ হইলেন। অশোকদত্ত সেখানে ছিল, সে বলিল—এ জোড়ার নূপুর আমি আনিয়া দিব।

রাজা তাহার অতুল সাহস জানেন ; যেরূপে এই নূপুরটা আনিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছেন। সেখানে অন্য নূপুর খুঁজিতে গিয়া পাছে প্রাণ হারায়, এই আশঙ্কায় স্নেহবশতঃ যাইতে নিষেধ করিলেন ; কিন্তু অশোকদত্ত প্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই বিচলিত হইল না। সে সেই নূপুরটা লইয়া কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর মধ্যরাত্রে আবার সেই শ্মশানে গেল। গিয়াই সেই রমণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিল—কতকগুলা মানুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়া এক-একটা গাছে ঝুলিতেছে। রমণীকে কোথাও দেখিতে পাইল না। তখন একটা উপায় স্থির করিল। গাছ হইতে একটা মৃতদেহ নামাইয়া, পিঠে করিয়া "মহামাংস নেবে গো!"—"মহামাংস নেবে গো! বলিয়া চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দূর হইতে স্ত্রী কণ্ঠের ধ্বনিতে শুনিল—মাংস লইয়া আমার সঙ্গে এস।

অশোক শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে গিয়া এক রমণীকে দেখিতে পাইল। তাহার অনুসরণ করিয়া, নিকটে একটা বটবৃক্ষের তলায় নানালঙ্কারে ভূষিতা এক পরমাসুন্দরীকে দেখিল। আরও কতকগুলি সুন্দরী রমণী তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। সেখানে গিয়া অশোক বলিল—আমি মহামাংস বিক্রয় করিব, কেহ কিনিবে? মধ্যবর্ত্তিনী রমণী জিজ্ঞাসা করিল—কি মূল্য লইবে? অশোক সেই নূপুরটা দেখাইয়া বলিল—এইরূপ আর একটা নূপুর যে দিতে পারিবে, তাহাকেই সমস্ত মাংস দিব।

রমণী বলিল—ও জোড়ার নূপুর আমার কাছে আছে। ওটাও আমারই সেই জোড়ার একটা ; তুমি অপহরণ করিয়াছ। তুমি সেই রাত্রে সেই শূলের নিকটে যে রমণীকে দেখিয়াছিলে, আমিই সেই। আজ আর-একপ্রকার রূপ ধরিয়াছি বলিয়া চিনিতে পারিতেছ না। মাংসে আমার প্রয়োজন নাই ; যাহা বলিব, তাহা যদি কর, তাহা হইলে পুরস্কার স্বরূপ সে নূপুরটা দিব।

অশোক বলিল—যদি নূপুরটা দাও ত তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

রমণী তখন বলিতে লাগিল—হিমালয়ের উপরে ত্রিঘণ্ট নামে এক নগর আছে। সেখানে লম্বজিহ্ব নামে রাক্ষসদিগের এক রাজা ছিলেন আমি তাঁহারই ভার্য্যা। আমার নাম বিদ্যুচ্ছিখা। আমার একটি কন্যা জন্মিবার পরেই গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। সেই কন্যার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। সে এখন যৌবনাবস্থায় উপস্থিত। আমার একান্ত ইচ্ছা আমার স্বামী যেমন মহাবীর ছিলেন, তেমনি কোনও বীরপুরুষকে জামাতা করিব। তুমি একজন মহাবীর বলিয়া শুনিয়াছি। সেই শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে যখন তুমি রাজার সঙ্গে এই পথ দিয়া যাও, তখন তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া তোমাকেই কন্যাদান করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। আই তোমাদের ফিরিবার সময়, সেই শূলবিদ্ধ মৃত পুরুষের স্ত্রীচ্ছলে আমিই রাজার নিকট জল চাহিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সে সময়ে অপর কেহই এ মহাশ্মশানে আসিতে সাহস করিবে না ; সুতরাং তোমাকেই আসিতে হইবে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধও হইল। তখন আমি তোমার কাছে সেই সব মিথ্যাকথা কহিলাম। আবার তোমাকে আনিব বলিয়া,

ইচ্ছা করিয়াই আমি নূপুরটা ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। সেরূপ করিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আবার তোমায় পাইয়াছি। এখন আমার বাড়ীতে চল; আমার কন্যাকে বিবাহ করিলে অন্য নূপুরটাও দিব।

অশোকদত্ত প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য, রাক্ষসীর সঙ্গে, তাহারই প্রভাবে শূন্যপথে তাহার বাড়ীতে গেল। দেখিল সোণার অট্টালিকা, প্রভায় সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছে। রাক্ষসরাজ কন্যা বিদ্যুৎপ্রভা যথার্থ বিদ্যুৎপ্রভাই বটে। তাহাকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন সেখানে রহিল। একদিন শাশুড়ীকে বলিল—মা! সেই নূপুরটা আমাকে দিন। আমি এখন কাশী যাইব। রাজার নিকট নূপুর আনিয়া দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। এখন যাই, আবার আসিব।

রাক্ষসী তাহাকে সেই নূপুরটা দিয়া একটা অত্যাশ্চর্য্য সোণার পদ্মও দিল। তারপর তাহাকে সঙ্গে করিয়া শূন্যপথ দিয়া নিশীথে সেই শ্মশানে, সেই বটগাছের তলায় আনিল। বলিল—প্রতি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর মধ্যরাত্রে আমি এখানে আসিয়া থাকি। তুমি ঐ রাত্রে ঐ সময়ে এখানে আসিলেই আমার দেখা পাইবে।

অশোকদত্ত রাক্ষসীর নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যূষে নিজের বাসায় গেল এবং মাতাপিতাকে সমস্ত ঘটনা বলিল। তাঁহারা এক কনিষ্ঠ পুত্রের শোকে কাতর তাহার উপর জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুদ্দেশে কয়দিন ম্রিয়মাণ ছিলেন। আজ তাঁহাদের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল। ওদিকে রাজারাণীও জামাতার অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। রাজা প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া গোবিন্দস্বামীর নিকট জামাতার সংবাদ জানিতে আসিতেন। সেদিন যে সময়ে গোবিন্দস্বামী ও তাঁহার পত্নী পুত্রকে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজাও সেখানে আসিয়া, জামাতাকে দেখিয়া প্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং তখনই তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন।

অশোক রাজার হাতে নূপুর-জোড়াটি দিল। রাজা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তখন রুনুরুনু ঝুনুঝুনু ধ্বনি করিয়া নূপুরযুগল যেন অশোকেরই বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিল। তারপর অশোক সোণার পদ্মটিও রাজাকে দিল। রাজা ও রাণী সেই সমস্ত দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসা করায় অশোক সকল ঘটনা সবিস্তর বর্ণন করিল। তাঁহারা জামাতার প্রভাবে বিস্মিত হইলেন। বহুদিনের পর জামাতাকে পাইয়া আনন্দে নগরে উৎসবের আদেশ দিলেন।

(৬)

পরদিন রাজা, বিশ্বনাথের মন্দিরের চূড়ায় যে রূপার কলস ছিল, তাহার উপর সেই সোণার পদ্মটা বসাইয়া দেওয়াইলেন। সেই শুভ্রোজ্জ্বল রজতকলস ও তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকমল একত্র মিলিয়া যেন রাজার ও অশোকদত্তের যশ ও প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা সে শোভা দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন—এইরূপ পদ্ম যদি আর একটা পাইতাম তাহা হইলে নাটমন্দিরের চূড়ায় বসাইয়া দিতাম।

রাজার সে কথা শুনিয়া অশোকদত্ত বলিল—মহারাজ! আর একটা এইরূপ পদ্ম আমি আনিয়া দিব। রাজা বলিলেন—না বাবা! আমার পদ্মের প্রয়োজন নাই। আর তোমায় ওরূপ অসমসাহসিকের কাজ করিতে হইবে না।

অশোকদত্ত মুখে কিছু বলিল না; কিন্তু মনে মনে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই রাত্রি উপস্থিত হইলে, আহারাদি করিয়া রাজকন্যার সহিত একত্র শয়ন করিল। রাজকন্যা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, ধীরে ধীরে উঠিয়া সকলের অলক্ষিতে সেই শ্মশানে সেই বটবৃক্ষের তলে গেল। রাক্ষসী তাহাকে দেখিয়া আদর করিয়া শূন্যপথে নিজের বাটীতে লইয়া গেল। দিন কতক সেখানে থাকিয়া অশোক রাক্ষসীকে বলিল—মা! আমাকে আর একটা সেইরূপ সোণার পদ্ম দিতে হইবে।

রাক্ষসী বলিল আর আমি কোথায় পাইব? এখন যিনি আমাদের রাজা, তাঁহার সরোবরে ঐরূপ সোণার পদ্ম ফুটিয়া থাকে। তিনি আমাকে সেই একটিমাত্র পদ্ম উপহার দিয়াছিলেন।

অশোক বলিল—আমাকে সেই সরোবর দেখাইয়া দিন। আমি নিজে গিয়া সেখান হইতে একটি পদ্ম লইয়া আসিব।

রাক্ষসী বলিল—সে কর্ম্ম তোমার সাধ্য নয়। ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা সেই সরোবর রক্ষা করিয়া থাকে।

অশোক নিষেধ মানিল না। নির্ব্বন্ধসহকারে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন রাক্ষসী দূর হইতে সেই সরোবর দেখাইয়া দিল। অশোক সেখানে গিয়া যেমন একটা পদ্ম স্পর্শ করিয়াছে, অমনি ভীষণাকৃতি সশস্ত্র রাক্ষসেরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অশোক তাহাদেরই অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। অবশিষ্ট রাক্ষসেরা ভয়ে পলাইয়া তাহাদের রাজাকে এ সংবাদ দিল।

রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, একজন মনুষ্য পদ্ম অপহরণ করিতেছে। দেখিয়াই বিস্ময়ান্বিত হইয়া, অস্ত্রশস্ত্র দূরে ফেলিয়া, ছুটিয়া গিয়া তাহার পদতলে লুটিয়া পড়িল।

বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিল—দাদা! আমি আপনার কনিষ্ঠ সহোদর বিজয়দত্ত। আমরা দুইজনে দ্বিজবর গোবিন্দস্বামীর পুত্র। আমি এতদিন রাক্ষস হইয়া ছিলাম। এখন আপনাকে দেখিয়া আমার সকল কথা মনে পড়িয়াছে, রাক্ষসভাবও দূর হইয়াছে।

অশোকদত্ত তাহাকে দেখিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অজস্র রোদন করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন অশ্রুপ্রবাহে বিজয়ের রাক্ষসভাব দূষিত দেহটাকে ধুইয়া দিতেছে। ঠিক সেই সময়ে অশোক নামে বিদ্যাধরগুরু সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা সকলেই পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধর ছিলে, শাপে এইরূপ হইয়াছ। এখন তোমাদের সে শাপের অবসান হইয়াছে; অতএব স্বজাতীয় বিদ্যা গ্রহণ কর। এই বলিয়া বিদ্যাধরদিগের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা তাহাদিগকে দান করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

তখন দুই ভাই জাতিস্মর হইয়া, প্রচুর স্বর্ণপদ্ম তুলিয়া লইয়া রাক্ষসীর বাটীতে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, রাক্ষসীর কন্যা ও বিদ্যাধরী হইয়াছে। তার পর তাহাকে সঙ্গে লইয়া শূন্যপথে কাশীতে আসিল। মাতাপিতার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সকল শোক দূর করিল।

এই সংবাদ পাইয়া রাজা নিজে তখনই তাহাদের বাসায় আসিলেন, এবং সকলকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। অশোকদত্ত মদনলেখার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার আনন্দবর্দ্ধন করিল। যত স্বর্ণপদ্ম আনিয়াছিল, সমস্তই রাজাকে দিল। রাজা একটা চাহিয়াছিলেন, এতগুলা পাইয়া পরম আনন্দিত হইলেন।

(৭)

রাজবাটীতেই সকলের সম্মুখে গোবিন্দস্বামী বিজয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই রাত্রে শ্মশানে তুমি রাক্ষস হইয়া ত ছুটিয়া পলাইলে, তার পর কি হইল ?

বিজয়দত্ত বলিতে লাগিল—বাবা ! আমি বালস্বভাবসুলভ চপলতা বশতঃ সেই খুলিটা ফাটাইয়া দিতে খানিকটা চর্ব্বি আমার মুখের ভিতরে পড়িয়াছিল। তাহাতেই আমি রাক্ষস হইয়া গেলাম। রাক্ষসী মায়াতেই সে চিতা জ্বলিতেছিল ও সেই খুলিটা পুড়িতেছিল। কপালটা ফাটাইয়াছিলাম বলিয়া কপালস্ফোট নাম করিয়া রাক্ষসেরা আমায় ডাকিলে আমি তাহাদের দলে গিয়া মিশিলাম। তাহারা আমাকে হিমালয় পর্ব্বতের উপর তাহাদের রাজার নিকটে লইয়া গেল। রাক্ষসরাজ আমাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সেনাপতি করিল। একদিন সে বলদর্পে গন্ধর্ব্বদিগের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিতে গিয়া শত্রুহস্তে নিহত হইল। তখন সমস্ত রাক্ষসেরা একমত হইয়া আমাকেই রাজা করিল এবং আমার শাসনে চলিতে লাগিল আমি স্বতন্ত্র রাজবাটীতে থাকিয়া রাজ্য করিতে লাগিলাম।

সেদিন দাদা আমার সরোবর হইতে সোণার পদ্ম তুলিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্রই আমার রাক্ষসদেহ ঘুচিয়া গেল। তারপর বিদ্যাধরগুরু আসিয়া আমাদিগকে বিদ্যাদান করিলেন। আমরা রাক্ষসরাজের বাটীতে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার কন্যাও বিদ্যাধরী হইয়াছেন। তখন তাঁহাকে লইয়া আমরা গুরুদত্ত বিদ্যার প্রভাবে শূন্যপথে এখানে আসিয়াছি। আমরা পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধরই ছিলাম। শাপগ্রস্ত হইয়া মনুষ্যযোনিতে জন্মিয়াছি। যে জন্য শাপগ্রস্ত হইয়াছিলাম, সেকথা আমি বলিতে পারিব না ; দাদা বলুন।

তখন অশোকদত্ত বলিতে লাগিল—একদিন গালব মুনির আশ্রমের নিকটে মুনিকন্যারা মন্দাকিনীতে স্নান করিতেছিল। আমরা দুই ভাই সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলাম। তাহারা আমাদের প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিল। আমরাও তাহাদিগকে হরণ করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলাম। তাহাদের বান্ধবেরা তাহা জানিতে পারিয়া আমাদের দুই ভাইকে শাপ দিয়াছিলেন—"তোরা দুজনে মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবি"। তাহাতেও তোদের বিচ্ছেদ ঘটিবে।' তারপর আমরা অনুনয় বিনয় করিলে বলিয়াছিলেন—"তোদের মধ্যে একজন কোনও দুর্গম

স্থানে উপস্থিত হইলে অপরে যখন তাহাকে চিনিতে পারিবে, তখন শাপমুক্ত হইবি।" সেই শাপে আমরা দুইজনে আপনার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছি। তারপর যেরূপে আমাদের দুই ভাইএর বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহাত জানেনই। যেরূপে শাপমুক্ত হইয়াছি, তাহাও বিজয়ের মুখে শুনিলেন।

তাহারা দেহান্তর ব্যতিরেকেও বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া সকলেই যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলেন। তারপর অশোকদত্ত পিতা, মাতা ও প্রথমা পত্নী মদনলেখাকে সেই বিদ্যা শিখাইয়া রাজা ও রাণীর নিকট বিদায় লইয়া সপরিবারে বিদ্যাধর নগরে বিদ্যাধর রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট গমন করিল। তিনি তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়া অশোকদত্তের নাম অশোক বেগ, এবং বিজয়দত্তের নাম বিজয়বেগ স্থাপন করিলেন। তাহারা বিদ্যাধররাজের আদেশে সপরিবারে গোবিন্দকূট পর্ব্বতে গিয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিল।

এরূপ দিব্য পুরুষদিগের সহিত সম্বন্ধ ঘটিয়াছে ভাবিয়া রাজা পরম আনন্দিত হইলেন। জামাতা শেষে যে পদ্মগুলি আনিয়া দিয়াছিল, তাহাদের একটা নাটমন্দিরের চূড়ায় বসাইয়া, অবশিষ্টগুলি দ্বারা ভগবান্ বিশ্বনাথের পূজা করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

বিষ্ণুদত্তের মুখে এই উপাখ্যান শুনিয়া শক্তিদেবের মনে আশ্বাস জন্মিল। তখন সে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শয়ন করিল এবং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইল।　　　　　　ক্রমশঃ—

ব্রহ্মচর্য্য।

(লেখক—শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ।)

ভাবিতে গেলে কত কথাই মনে জাগিয়া উঠে। পাগলের মত নিজের কাছে নিজেই কত প্রশ্ন করিয়া বসি। তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, সীমা নাই, সংখ্যা নাই। কিন্তু তাহার উত্তর পাই না।

যে জাতির অনন্ত মহিমা বেদ উপনিষদে গ্রথিত, আধ্যাত্মিকতা সাংখ্য বেদান্তে প্রবুদ্ধ; গীতা যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, মহাভারত যাহাদের ইতিহাস; ব্যাস, বাল্মিকি যাহাদের জ্ঞানগুরু, কালিদাস, ভবভূতি যাহাদের কবি; ভগবান্ কৃষ্ণ যাহাদের আদর্শ, অর্জ্জুন সদৃশ যাহাদের গর্ব্ব।—সে জাতির সে সমাজের একি অসম্ভব অধঃপতন। সময় সময় মনে হয় এই অনন্ত তমঃ সমাধিসুপ্ত নিষ্ক্রিয় জাতির অতীতের উন্নতি কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মত কবির অলৌকিক কল্পনা নহে ত? আর সন্দেহেরই বা প্রসার কোথায়। বর্ত্তমানে আত্মবোধ বিহীন আমরাই না হয় নিজেকে নিজে চিনিতে অক্ষম। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমুলর,

হেমার প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ বহুগবেষণায় যে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাও যে ইহার অনুকূল। তাঁহারাই লিখিয়াছেন।

প্রাচীনকালের আর্য্য ইতিবৃত্তে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তদপেক্ষা পুরাতন অবিতর্কবার্ত্তা জগতে আর কোথাও নাই" ইত্যাদি -

"ইহা সুনিশ্চিত যে আর্য্যভাষাই জগতের যাবতীয় প্রচলিত ভাষার একমাত্র প্রসূতি।"—ইত্যাদি—

ত'ব এ কি! দেখিতেছি? সমগ্রজগতের আদিজ্ঞানগুরুর পবিত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বিশ্বপূজিত আর্য্যসন্তান? তোমাদের একি অবস্থা? জগতে চির উন্নত চির আদৃত উপাস্যতম আর্য্যসন্তান কেন? কি অভাবে আজ তোমরা অনাদৃত উপেক্ষিত হীন হ'তে হীনতর? বৈদিকযুগ সে অনেকদিনের কথা, পৌরাণিক যুগও না হয় ছাড়িয়া দিলাম; ঐতিহাসিক যুগ অনুসন্ধান করিলেও দেখা যায় অপ্রতিহত আর্য্যপ্রতিভা কোথায় না চির প্রদীপ্ত। তোমাদের কি না ছিল? কিন্তু আজ পার্থিব অপার্থিব সমুদয় সম্পদই কালের করালকবলে কবলিত। আর এখন আছে কি? সব গিয়াছে আর গিয়াছে বা বলি কেন? খোয়াইয়াছ। আর্য্যের গৌরব বলিতে যাহা কিছু সকলই হেলায় হারাইয়াছ। অবশিষ্ট এই জড় দেহটা তাহাও খুয়াইতে বসিয়াছ।

তমঃ কালিমাবৃত কঙ্কালাবশেষ আর্য্যগণ! আজ কোথায় তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য, কোথায় তোমাদের বীর্য্য সঞ্চয়। একটীবার ভাব দেখি? তোমরা কি ছিলে আর কি হইয়াছ। বিলাস কুহেলিসমাচ্ছন্ন আর্য্য সমাজ বল দেখি? শক্তির অভাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ হয় কি? বল দেখি আর্য্য সামাজিক, সংযমের সোপান ব্রহ্মচর্য্য হইতেই না তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ অপূর্ব্ব শক্তিসঞ্চয় করতঃ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জগতে আদর্শ ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর ছিলেন?

একমাত্র আরাধ্যতম জীবজগতের সজীব দেবতা জনক জননী, সন্তানের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষি হইলেও, কালের কুটীল পরিবর্ত্তনে এমনই কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, যে ব্রহ্মচর্য্যনামে তাঁহারাও আজ বজ্রাহত প্রায় আড়ষ্ট হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন যে পুত্র যদি সংযম অবলম্বন করিয়া কৌপীন করঙ্গ ধারণ করিল; মৎস্য মাংস বর্জ্জন করিয়া নিরামিষাদি হইল, তবে পৌত্রমুখ দর্শন ভাগ্যে ঘটে কৈ? বংশ রক্ষাই বা হয় কিসে? পিতৃপুরুষের জল পিণ্ডের বা উপায় কি? বিশেষতঃ লক্ষ্মী বৌটী ঘরে না আসিলে যে ঘরের শোভাই বাড়ে না। হায়! কাল কুহেলিকাবিষ্ট জনক জননী! আজ কি বিষম ভ্রমে পড়িয়া বুঝিতেছ না যে নিজেরাই নিজ সন্তান সন্ততির চির মঙ্গলের পরিবর্ত্তে ভাবি চির অমঙ্গলের পথই পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছ। চির উন্নতির পরিবর্ত্তে ভাবি চির অধঃপাতের পথই পরিষ্কার করিয়া দিতেছ। উন্মার্গগামী, অসংযত, সংসর্গ দোষে, অকাল মৈথুনাদি আত্মহত্যা-জনক মহাপাপে লিপ্ত হইয়া অবোধ সন্তানগণ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারের পরিবর্ত্তে অধঃপাতের পথই পরিষ্কার করিতেছে। আবার কোথাও দেখা যায়—আত্মরক্ষায় একান্ত অক্ষম

অপরিণত বয়স্ক পুত্রকে পত্নীর পতি, পুত্রের পিতা সাজাইতে গিয়া ভবিষ্যতের জন্য একটী রোগ শোক সঙ্কীর্ণ দরিদ্র সংসার চিত্র অঙ্কিত করিয়া আত্মকুলকে অকালে কালের কবলে তুলিয়া দিতেছেন।

তাই বলি জ্ঞান বৃদ্ধ আর্য্য সামাজিকগণ! পূজ্যতম জনক জননীবর্গ! এ মহাভ্রম অপনোদনে এ হৃদরোগ উপশমনে আপনারা ভিন্ন আর কে অগ্রসর হইবে। সমাজ শক্তি যে দিন দিন ক্ষয় হইয়া পড়িতেছে। এ দুর্দ্দিনে অবোধ আর্য্য শিশুগণ আর কার আশ্রয়েইবা আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে। ভারতে বিধাতার আদরের দান বিশ্বপাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান আর্য্য গুরু ব্রাহ্মণগণ এ অসময়ে আপনারা নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে কেন? তারস্বরে সমাজের দক্ষিণ কর্ণে দান করুন। "আপদাং কথিত পন্থা ইন্দ্রিয়ানা মসংযমঃ তজ্জয় সম্পদাংমার্গঃ" সাদরে সমাজকে স্মরণ করাইয়া দিন, একদিন আর্য্য মনীষি মহর্ষি পতঞ্জলি গুরুগম্ভিরে গাহিয়া গিয়াছেন "বীর্য্য ধারণং ব্রহ্মচর্য্যং" বীর্য্য ধারণ করাকে ব্রহ্মচর্য্য বলে, ইহাতে বংশ লোপের সম্ভব নাই (আর অসার অন্ধ খঞ্জ জন্মগ্রহণ করিয়াও ধরার ভার বাড়াইবে না। "কানেন চক্ষুষা কিংবা চক্ষু পীড়ৈব কেবলং।" বিশেষ প্রাচ্য পাশ্চাত্য জীবকবর্গও সাদরে ইহা পোষণ করেন।

অতএব কামনা করিতে হয়, এমন একটী পুত্র কামনা করুন যাহাদ্বারা দেশের দশের সমাজের বংশের অশেষ কল্যাণ অক্ষয় গর্ব্ব বর্দ্ধিত হইবে। সমাজ শুভাকাঙ্ক্ষি সামাজিকগণ। সন্তান হীতৈষী জনকজননীবর্গ একবার সচেষ্ট হউন, সন্তানগণকে সাদরে শিখাইয়া দিন।

"শ্রবনং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণংগুহ্যভাষণং
সংকল্পোহধ্য বসায় স্তাৎ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেবচ
এতন্মৈথুন মষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিনঃ
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যং"...........

আসুন বিশ্ববরেণ্য উপাস্যতম ভারতগুরু ব্রাহ্মণগণ, এইবার আপনারা ও আপনাদের উপদেষ্টার আসন অলঙ্কৃত করিয়া সমস্বরে বলুন।—

নতপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্ম চর্য্যং তপোত্তমং"

অনার্য্য পথাশ্রিত অনাত্মজ্ঞ আর্য্য সন্তানগণকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিন।—

"কর্ম্মনা বচসাচৈব সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা।
সর্ব্বত্র মৈথুন ত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে॥"

কলিকাতা—৮৭নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ নবদ্বীপ সমাজ সম্মিলিত—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভা হইতে ব্রাহ্মণ-সমাজ কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১২নং সিমলা ষ্ট্রীট, জ্যোতিষ-প্রকাশ যন্ত্রে শ্রীবসন্তকুমার তর্কনিধি দ্বারা মুদ্রিত।

REGISTERED No C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

ব্রাহ্মণসমাজ

(মাসিক পত্র)

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দ্বাদশ বর্ষ—প্রথম সংখ্যা।

আশ্বিন।

সন ১৩৩০ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম, এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

Registered No. C—676.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"।

দ্বাদশ বর্ষ। { ১৮৪৪ শক, ১৩৩০ সাল, আশ্বিন। } ১ম সংখ্যা।

যজ্ঞোপবীত।

(লেখক শ্রীজ্ঞানদাশঙ্কর সান্যাল তত্ত্ববিশারদ।)

ব্রাহ্মণ! তুমি হয়েছ অন্ধ হারায়েছ জ্ঞানভাতি
বিজাতীয় ভাব প্রভাবে মুগ্ধ নিয়ত বিলাসে মাতি।
ভাগ্যের ফলে লভেছ জনম উন্নত দ্বিজকুলে
এখন যে তুমি পাও সম্মান, পৈতাটি তার মূলে।
কত বৃথা কাজে কাটাও সময়, পৈতায় দিতে হাত
পাওনা কি তুমি অবসর এই দীর্ঘ দিবস রাত?
দীরতার সহ দেখ বিচারিয়া পবিত্র-যজ্ঞসূত্র
করিবারে লাভ উৎসাহীকত ব্রাহ্মণেতর-পুত্র।
সকলেই ঐ পৈতারে দেখ করিতেছে সম্মান
সেই সম্পদ লভিয়াও তুমি কেন কর অপমান
কোমরেতে কেহ রেখেছ জড়ায়ে ছিন্ন ভিন্ন সূত্র তার
চাবি বাঁধিবার সূত্ররূপে কেহ করিতেছ ব্যবহার।

ব্রাহ্মণ তুমি বর্ণের গুরু চির আদর্শ জাতি
তব ধৃতি, ক্ষমা, সত্য, নিষ্ঠা, উজ্জ্বল জ্ঞান ভাতি,
সকল রকমে উন্নত হয়ে, হারায়ে আত্মবল
অনাচার পথে অসারের মত যাইতেছ রসাতল।
এই সনাতন আচার ধর্ম্ম কোটী কোটী বিপ্লবে
চূর্ণ করিতে পারে নাই; কেহ দাঁড়ায়ে আছে গৌরবে।
শুধু শিক্ষাবিধানের দোষে "মানুষ" হয় না আর
আভ্যন্তরী ধরম বিহীন কোথা "মান" "হুঁস" তার?
শিশুকাল হ'তে আহার, অর্থ, বিলাসদ্রব্যে রুচি
আচার ভ্রষ্ট চার্ব্বাক মতি বচনে পরম শুচি।
জনক জননী শিক্ষক সবে সদাচারে উদাসীন
তারি বিষময় ফলে এ ভারতে আজ মহাদুর্দ্দিন॥

অঘমর্ষণ।

(লেখক—শ্রীকৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি।)

বিশ্বেদেবার কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। কবিরত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের ৭ম সংস্করণ যজুঃ সন্ধ্যার ৫৭পৃঃ প্রাণায়াম মন্ত্রের ছন্দোমধ্যে বিবাদাস্পদ বিশ্বেদেবাপদের সমীপে আর একটা ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে, তিনি লিখিয়াছেন সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতির্ঋষি রগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র বিশ্বদেব দেবতাঃ ইত্যাদি

আমরা শ্রীমদগ্নিচিদ্বিদ্যাকর বাজপেয়িকৃত নিত্যাচার পদ্ধতিতে,—সপ্তার্চ্চিরনীলসূর্য্যো বাক্‌পতির্বরুণোবৃষঃ। বিশ্বেদেবা ইতিপ্রোক্তাঃ,—ইত্যাদি। আশ্বলায়ন গৃহ্য পরিশিষ্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮ম সংখ্যায়, মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর যন্ত্রে ১৮২৬ শকাব্দে মুদ্রিত শ্রীদত্ত বাচস্পতি কৃত আচারাদর্শে, ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে, নিত্যাচারপ্রদীপে (৩৯২পৃঃ) ও মদনপারিজাতে (১ম স্তবকে) "অগ্নির্ব্বায়ুস্তথাসূর্য্যো বৃহস্পতি রপাং পতিঃ। ইন্দ্রশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ" ইত্যাদি এবং অন্যান্য বহুতর প্রামাণ্যগ্রন্থে "বৃহস্পতি বরুণেন্দ্র বিশ্বেদেবা দেবতাঃ" এইরূপ পাঠ দেখিতেছি। আমাদের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাসও এইরূপই বটে।

বহু প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তকের উপরে তাহার প্রমাণও লিখিত আছে যথা—অগ্নির্ব্বায়ুস্তথাদিত্যো বৃহস্পতিরপাং পতিঃ। ইন্দ্রশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ॥ কবিরত্নের

মতে চতুর্থ ব্যাহৃতির অধিদেবতা বরুণ ৫ম বৃহস্পতি ৬ষ্ঠ ইন্দ্র। আর অপর সকলের মতে চতুর্থ ব্যাহৃতির দেবতা বৃহস্পতি ৫ম বরুণ ও ৬ষ্ঠ ইন্দ্র। এখন দেখাযায় কবিরত্ন মহাশয় বরুণ ও বৃহস্পতির আধিপত্যে বৈপরীত্য ঘটাইয়াছেন। মহর্লোক ও জনলোকের অধিপতির পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহা সমুচিত হইয়াছে কি না সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

তাঁহার পর অঘমর্ষণের কথা,—

কবিরত্ন মহাশয় শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ পরিষদে বিচার প্রার্থী হইয়াছেন। পরিষৎ, শাস্ত্রানুসন্ধান সমিতির সভ্যপণ্ডিতগণের নিকট কয়টী প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন। সেই প্রশ্নমধ্যে অঘমর্ষণ বিষয়ে যে কয়েকটী প্রশ্ন আছে তাহারই সংক্ষেপে আলোচনার্থ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

১ম প্রশ্ন—নত্বাতু মন্ত্রে জলদ্বারা সংকল্প তর্কনিধির পুস্তকে লিখিত। কবিরত্নের পুস্তকে এই মন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে। কোনটী সমীচীন?

উঃ মদন পারিজাত ধৃত সম্বর্ত্ত বচনে লিখিত আছে—
নত্বাতু ইত্যাদ্যুপক্রম্য ইত্থং কৃত্বাতু সঙ্কল্পং, এবং আহ্নিক প্রদীপকার লিখিতেছেন এতৎ জলাকামিনাতু বিনৈব সঙ্কল্পং সন্ধ্যা কার্য্যা, এই সকল সন্দর্ভ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এইটী সঙ্কল্পমন্ত্রঃ. প্রণামমন্ত্র বা প্রার্থনামন্ত্র নহে।

"গৃহীত্বো ডুম্বরং পাত্রং" ইত্যাদ্যুক্ত নিয়ম অনুসারে সঙ্কল্প সর্ব্বত্র সম্পাদনে অসুবিধা হইলে কেবল উদক গ্রহণমাত্রেও সম্পাদিত হইবার ব্যবস্থা ও ব্যবহার আছে; তদনুসারেই নিত্যানুষ্ঠেয় সন্ধ্যার সঙ্কল্প জলগ্রহণ পূর্ব্বক সম্পাদন করার কথা লিখা হইয়াছে। কেবল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবার অভিপ্রায় হইলে, ঋষিবচনেও "ইত্থং কৃত্বাতু সঙ্কল্পং" না বলিয়া "এবমুক্তা কৃতাঞ্জলি" এইরূপই থাকিত।

২য় প্রশ্ন,—অঘমর্ষণ মন্ত্রের ছন্দোমধ্যে তর্কনিধির পুস্তকে ভাববৃত্তো দেবতা কবিরত্নের মতে ভাববৃত্তির্দ্দেবতা কোন পাঠ শুদ্ধ?

উঃ—প্রাচীন হস্তলিখিত সকল পুস্তকে আচারাদর্শও ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বে "ভাববৃত্তো দেবতা পাঠ আছে, আমাদের আবহমানকাল হইতে পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস ও আচরণ তাহাই। হলায়ুধ লিখিয়াছেন—

অঘমর্ষণ সূক্তস্যঋষিরেবাঘমর্ষণম্।
অনুষ্টুব্‌ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তশ্চ দৈবতং॥

গদাধর পদ্ধতৌ আচারসারঃ (১১৬পৃঃ) দেবতা ভাববৃত্তস্ত হয়মেধনিয়োজনম্।

বাচস্পত্যাভিধানে দৃষ্ট হয়—

ভাববৃত্তঃ (পুং) ভাবে বৃত্তঃ প্রবৃত্তঃ, ভাবোবৃত্তো জাতো যস্মাদ্বা। সৃষ্টিকর্ত্তরি ব্রহ্মণি। অনুষ্টুপ্‌ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তস্ত দৈবতম্" স্মৃতিঃ॥

বিশ্বকোষে—

ভাববৃত্তঃ (পুং) ভাবঃ সত্তাবৃত্তঃ প্রবৃত্তোঽস্মাদিতি, যদ্বা ভাবঃ সৃষ্টিঃ, তত্রবৃত্তঃ প্রবৃত্তঃ। ব্রহ্মা "অনুষ্টুপ্ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তস্তু দৈবতম্" ॥ স্মৃতিঃ।

শব্দকল্পদ্রুমে লিখিত আছে,—

ভাববৃত্তঃ (পুং) ব্রহ্মা, ভাবঃ সৃষ্টিঃ তত্রবৃত্তঃ প্রবৃত্ত ইতি সন্ধ্যা ব্যাখ্যায়াং স্মৃতিঃ।

আশ্বলায়ন গৃহ্যপরিশিষ্টের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"অঘমর্ষণ ভাববৃত্ত মানুষ্টুভম্"

কবিরত্ন মহাশয়ও তাঁহার নিজ আহ্নিককৃত্যের সপ্তম সংস্করণ পর্য্যন্ত "ভাববৃত্ত" পাঠ লিখিয়াছেন (৭ম সং ৬০পৃঃ ২পং) মধ্যে কি হইয়াছে জানি না।

সংস্কার নৈপুণ্য ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হওয়ায় ত্রয়োদশ সংস্করণের পুস্তকে ভাববৃত্ত", ভাববৃত্তি রূপ ধারণ করিয়াছে।

হয়তঃ এইস্থানে কবিরত্ন মহাশয়, বিশেষ্য বিশেষণে সমলিঙ্গ বিভক্তিতা রক্ষা করার মানসে ভাববৃত্তকে স্ত্রীলিঙ্গ করিয়াছেন। তিনি এইরূপ সংস্কার সাধনে ক্রমশঃ আরও অগ্রসর হইলে, আমরা তাঁহার কৃপায় অচিরেই, ইন্দ্রোদেবতা স্থলে, ইন্দ্রানী দেবতা; রুদ্রো দেবতা স্থলে, রুদ্রাণী দেবতা, বরুণো দেবতা স্থলে বরুণানী দেবতা, এবং অগ্নির্দেবতাস্থলে, অগ্নায়ী দেবতা, ইত্যাকার সংশোধন দেখিতে পাইব। আমাদের বোধ হয় ভগবৎকৃপায় স্বপ্নযোগে আর্যজ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই সপ্তম সংস্করন প্রচার হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক এই অভিনব সংস্কার কার্য্যের গুরুতর গবেষণার প্রকৃত প্রকার জানিতে আমরা সমুৎসুক রহিলাম।

৩য় প্রশ্ন,—ঋতঞ্চমন্ত্রে তর্কনিধির পুস্তকে সমুদ্রোঽর্ণবঃ আর কবিরত্নের পুস্তকে সমুদ্রো অর্ণবঃ পাঠ আছে কোনটী শুদ্ধ ?

উঃ—কবিরত্ন মহাশয় "সমুদ্রো অর্ণবঃ" এইরূপপাঠের বিশুদ্ধির প্রমাণস্বরূপ পাণিনি ব্যাকরণের "প্রকৃত্যান্তঃ পাদম্ অব্যপরে" এইসূত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন; তাহার অর্থ ঋক্‌পাদ মধ্যে, একার ও ওকার হইতে যে অকার তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্বর ও পরবর্ত্তী স্বর সভাবে অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ বিকৃত হয় না।

ঋতঞ্চমন্ত্রের

১। "তপসোঽধ্যজায়ত"

২। "সমুদ্রোঽর্ণবঃ"—

৩। "সংবৎসরো অজায়ত"

এই তিনস্থলেই কথিত সূত্রের বিষয় আছে, কিন্তু প্রথমস্থলে উভয়ের মতেই সন্ধি হইয়া গেল। এই সূত্রের শাসন মানা করা হইল না। আর তৃতীয় স্থলে উভয় মতেই বিসন্ধি থাকিল। সূত্রের অনুশাসন স্বীকৃত। কিন্তু দ্বিতীয়স্থলই বিবাদাস্পদ, ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কেবল এইসূত্রের দ্বারা মীমাংসা হইতেছে না।

কবিরত্ন মহাশয় দ্বৈতনির্ণয়ের পাঠ বিকৃত করিয়া বলিতেছেন—"সমুদ্রো অর্ণবঃ" এইরূপ পাঠ দ্বৈতনির্ণয়ের মতেই লিখিয়াছেন। কিন্তু এই কার্য্য ভুল। দ্বৈতনির্ণয়ের প্রকৃতপাঠ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—সন্ধ্যাবন্দনে চাদাবঘমর্ষণ সূক্তং, তচ্চ মাধ্যন্দিনীয়ানাং নাস্ত্যেব ঋগ্বেদে তৈত্তিরীয়কে চাস্তি। তৈত্তিরীয়কস্য যাজ্ঞবল্ক্যোদ্‌গীর্ণতয়া মাধ্যন্দিনীয়ৈ স্তৎসূক্তং ন পরিগৃহ্যতে। কিন্তু ঋগ্বেদোক্তমেবাঘমর্ষণ সূক্তমাদেয়ং, তত্র রাত্রীশব্দঃ, সমুদ্রোঽর্ণবইত্যকারো ঽভিন্নঃ, অকল্পয়দিত্যত্র ছেদঃ। তৈত্তিরীয়কেতু হ্রস্বোরাত্রিশব্দঃ,—সমুদ্রোঽর্ণব ইত্যকারঃ প্রশ্লেষঃ'—অকল্পয়দ্দিবমিত্যত্র সন্ধিঃ।

"সমুদ্রোঽর্ণব" ইত্যকারোঽভিন্নস্থলে কবিরত্ন মহাশয় ভিন্নপাঠ লিখিয়াছেন। বিগত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীহট্টসহরে পরিষদের শাস্ত্রানুসন্ধান সভার অধিবেশনে শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র তর্কতীর্থ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দয়ালকৃষ্ণ তর্কতীর্থ শ্রীযুক্ত রামনন্দন দর্শনরত্ন মহাশয় প্রভৃতি মনীষিগণের সাক্ষাতে আমি অন্যূন ২০০, শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত দ্বৈত নির্ণয়গ্রন্থ উপস্থিত করিয়া দেখাইয়াছি, তাহাতেও ।অভিন্নপাঠ আছে। এইস্থলে "ভিন্ন" পাঠ স্বীকার করিলে সন্দর্ভের আদ্যন্ত সামঞ্জস্যই থাকে না বলিয়া উপস্থিত পণ্ডিতগণ, মৎপ্রদর্শিত "অভিন্নপাঠই সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদোক্ত পাঠে "সমুদ্রোঽর্ণব" রাত্রীশব্দ দীর্ঘ, অকল্পয়ৎ স্থলে ছেদ, তৈত্তিরীয়কের মতে সমুদ্রো অর্ণব স্থলে অকার প্রশ্লেষ ."রাত্রিশব্দ হ্রস্ব অকল্পয়দ্দিবং" স্থলে সন্ধি হইবে। তৈত্তিরীয়কে যখন "সমুদ্রো অর্ণবপাঠ বর্ত্তমান তখন ঋগ্বেদের মতেও "সমুদ্রো অর্ণব" পাঠ হইলে উভয়ই এক হইয়া যাওয়ায় দ্বৈত হইল না এবং দ্বৈতনির্ণয়ের বিষয়ীভূত হয় কিরূপে? বাচস্পতিমিশ্রের এই উক্তির সামঞ্জস্যই থাকে না।

আরও দেখুন শুক্লযজুঃকর্ম্মকাণ্ড প্রদীপে (১৬৩পৃঃ) লিখিত আছে "ঋতঞ্চেতিত্র্যর্চ্চং সূক্তং ঋক্‌সংহিতায়াং তৈত্তিরীয় সংহিতায়াঞ্চ পঠিতং। তত্রভেদস্তু ততো রাত্র্যজায়তেতি ঋক্‌পাঠঃ। ততোরাত্রিরজায়তেতি তৈত্তিরীয়পাঠঃ। তত্র কোবা গ্রাহ্য ইতিসংশয়ে কাত্যীয়েরাশ্বলায়নীয় মঘমর্ষণ সূক্তং গ্রাহ্যং, নতু তৈত্তিরীয়ং, যাজ্ঞবল্ক্যেনোদ্গীর্ণত্বাদিতি দ্বৈতনির্ণয়ে নির্ণিতম্॥ এই সন্দর্ভদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তৈত্তিরীয় শাখার পাঠ গ্রাহ্য নয়। সুধীগণ কথাটা বিচার করিয়া দেখিবেন।

৪র্থ প্রশ্ন—তর্কনিধির পুস্তকে ঋতঞ্চমন্ত্রে আচমন—কবিরত্নের পুস্তকেমার্জ্জন কোনটী শুদ্ধ?

উত্তর -শ্রীমদগ্নিচিদ্বিদ্যাকর বাজপেয়িকৃত নিত্যাচার পদ্ধতিতে লিখিত আছে—

ঐশানদিগভিমুখ আসনে উপবিশ্য……আচম্য প্রণবং ত্রিমাত্রমুচ্চার্য্য নারায়ণং নমস্কৃত্য বিনিয়োগ মন্ত্রাণামৃষ্যাদীন্ স্মৃত্বা অঘমর্ষণ সূক্তেন উদকচুলুকং পিবেৎ॥

বাচস্পতিকৃত আচারাদর্শে,—উক্ত আছে,—আচম্য ঋতমিত্যভিমন্ত্র্য পুনরাচমেৎ। আহ্নিকপ্রদীপে যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ঋতঞ্চমন্ত্রদ্বারা প্রথমেই আচমন করিতে হয়—

প্রমাণ যথা,—

ঐশানাভিমুখো ভূত্বা শুচিঃ প্রযতমানসঃ।
আচান্তঃ পুনরাচামেদৃতমিত্যভিমন্ত্র্য চ ॥
আস্তরং শুধ্যতিহ্যেব মধুপানমনীকৃতম্ ॥

কাযেই ঋতঞ্চমন্ত্রে আচমনই হইবে মার্জ্জন হইবে না। কোনও গ্রন্থে যে প্রথম মার্জ্জনের বিধান আছে তাহাও স্নানানুকল্প মন্ত্রপাঠ বলিতে হইবে।

প্রমাণ যথা,—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় কর্ম্মকাণ্ডপ্রদীপে (স্নানানুকল্পাঃ) যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

কালদোষাদসামর্থ্যাল্লশক্তোতি যদাহ্যসৌ।
তদাসৃত্বা ঋষিভ্যস্তু মন্ত্রৈদৃ'ষ্টা তু মার্জ্জনম্ ॥
শংন আপস্তদ্রুপদা······এতৈশ্চতুর্ভির্ম্মন্ত্রৈস্ত ইত্যাদি

আচার নির্ণয়ে—

স্নানানুকল্পমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—
শন্ন আপস্ত দ্রুপদা আপো হিষ্ঠাঘমর্ষণম্।
এভিশ্চতুর্ভির্ম্মন্ত্রৈস্ত মন্ত্রস্নানমুদাহৃতম্ ॥

আহ্নিকাচার প্রয়োগতত্ত্বে—

শন্ন আপ ইত্যাদি, এভির্ম্মন্ত্রৈঃ শিরসি কুশাগ্রেণ জলবিন্দু প্রক্ষেপাত্মকমার্জ্জনরূপ মন্ত্রস্নানং কুর্য্যাৎ স্নাতস্তু ন কুর্য্যাদিতি।

উক্ত মন্ত্রস্নানও আবার কাম্য—তাহার প্রমাণ যথা,—মহামহোপাধ্যায়াগ্নিচিদ্ বাজপেয়ি নরসিংহ বিরচিত নিত্যাচার প্রদীপে লিখিত,—

অঘমর্ষণ সূক্তেন মার্জ্জনং কারয়েত্ততঃ।
শন্ন আপস্ত দ্রুপদা কামতঃ সংপ্রযোজয়েৎ ॥
কামত ইচ্ছয়া মন্ত্রোক্তফলকামনায়ামিত্যন্যে।
"শন্ন আপ" ইত্যাদি কাম্যবিষয়মিতি লক্ষ্মীধরঃ।

হেমাদ্রিবিরচিত চতুর্ব্বর্গ চিন্তামণিতে (১০ অ শ্রাদ্ধকল্পের পরিভাষা প্রকরণে) লিখিত আছে যথা—

যোগি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

শন্ন আপস্ত দ্রুপদাদাপোহিষ্ঠাঘমর্ষণম্।
এতৈশ্চতুর্ভির্ঋগ্মন্ত্রৈর্ম্মন্ত্রস্নান মুদীরিতম্।
অপ্রায়ত্যে সমুৎপন্নে স্নানমেবস্তকারয়েৎ।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টৈস্তথা মন্ত্রৈরন্যথা মার্জ্জনং ভবেৎ ॥

সময়ান্তরে অন্যান্য প্রশ্নের আলোচনা করিব—

রামপ্রসাদী সঙ্গীত ব্যাখ্যা।

(লেখক—শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী।)

"এই সংসার ধোঁকার টাটি ওভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥
ওরে, ক্ষিতি জল, বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটি ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষকোটী।
যেমন সরার জলে সূর্য্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব যেটি ॥ ১
গর্ভে যখন যোগী তখন, ভূমে প'ড়ে খেলাম মাটি।
ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি ॥ ২
রমণী বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটী।
আগে ইচ্ছা সুখে পান করে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ ফটি ॥ ৩
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি।
তোমার যাহা ইচ্ছা তা কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী ॥ ৪ "

সংসার বলিতে আমি, আমার, তুমি তোমার ইত্যাকার ভেদজ্ঞান এবং ইহাই ধোঁকার টাটি অর্থাৎ ভ্রান্তিময় আবরণ। প্রমাণ যথাঃ—"নামরূপাত্মকং বিশ্বমিন্দ্রজালং বিদুর্ব্বুধাঃ। অনামত্বাদযুক্তত্বাদিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ। শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ ৩৬।

অনুবাদ—বস্তুতঃ নাম ও রূপের অভাবহেতু তদ্রূপে ব্যবহার অযুক্ত হইলেও নামরূপাত্মকরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় বলিয়া জ্ঞানিগণ এই জগৎকে ইন্দ্রজাল বলিয়া থাকেন। "আনন্দবাজারে"—"সুখমল্পং বহুক্লেশো বিষয়গ্রাহিণাং নৃণাং। অনন্তং ব্রহ্মনিষ্ঠানামিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ঐ ৭৩।

যাঁহারা বিষয়গ্রহণে ব্যস্ত, তাঁহাদের সুখ অতি অল্পই হইয়া থাকে, দুঃখই তাঁহাদিগকে অধিক ভোগ করিতে হয়, কিন্তু যাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠ তাঁহাদের অনন্তসুখ ভোগ হয়। এবঞ্চঃ—"ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১৪অ—১১৩

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়াদ্বারাই কল্পিত হইয়াছে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, ইহা জানিতে পারিলে সুখী হওয়া যায়।

"ওরে ক্ষিতি, জল, বহ্নিবায়ু——স্বভাব যেটি"—প্রমাণ যথা—"ভূমিরাপোঽনলোবায়ু খং মনোবুদ্ধিরেবচ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদংধার্য্যতে জগৎ ॥" গীতা ৭ম অঃ ৪।৫।

অনুবাদ—ক্ষিতি, অপ্‌ তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, আমার প্রকৃতি এই আট রূপে বিভক্তা। হে মহাবাহো, কিন্তু ইহা অপরা (নিকৃষ্টা); ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অন্য

একটী জীবস্বরূপ (চেতনময়ী) আমার প্রকৃতি অবগত হও, যে প্রকৃতি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃত্স্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ॥" গীতা ৯অ-৮।

আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া (আত্মবিস্মরণ হেতু কর্ম্মনিমিত্ত) স্বভাববশে কর্ম্মাদি পরবশ এই সমস্ত ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকি। "শরারজলে—"—যথা শরাব তোয়স্থং রবিং পশ্যত্যনেকধা। তথৈব মায়য়া দেহেবহুধাত্মানমীক্ষতে॥"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ১৪অ ১৩২

যেরূপ বহু শরাবস্থ জলে বহুসূর্য্য লক্ষিত হয়, তাহার ন্যায় আত্মা মায়া প্রভাবে বহু ভাবে লক্ষিত হইয়া থাকেন।

অভাবেতে স্বভাব যেটি"———ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেঽপি তাদৃশং। নষ্টেদেহে তথৈবাত্মা সমরূপোবিরাজতে॥" মহানিঃ ১৪ –১৩৪।

ঘটভগ্ন হইলে তৎস্থিত আকাশ যেরূপ পূর্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে, সেইরূপ দেহ নষ্ট হইলেও আত্মা সমভাবে বিরাজমান থাকেন।

দ্বিতীয়পদ –"যোগী"—কিদৃশো যোগী ? আরুরুক্ষু যোগী। গর্ভবাস সময়ে জীব পূর্ব্ব দেহকৃত কর্ম্মস্মরণ করিয়া বহুদুঃখ সহকারে আপনিই বিচার করিয়া মনে মনে বলিতে থাকে—"যদ্যস্যাম্নিস্কৃতির্ম্মেস্যাদ্‌গর্ভদুঃখাৎ তদা পুনঃ। বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনাদুর্গাং মহেশ্বরীং। নিত্যাং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ॥ ভগবতী গীতা ৩অঃ—৩০

যদি আমার এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে পুনরায় নিষ্কৃতি হয়, তবে মাহেশ্বরী দুর্গার সেবা ছাড়িয়া আর বিষয়সেবাতে রত হইব না। সংযতচিত্তে সেই নিত্যাদেবীকে ভক্তিভাবে পূজা করিব।

এই স্থলে জীবকে গর্ভাবস্থায় আরুরুক্ষু যোগী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে জীব গর্ভ-হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। যথা—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃকারণমুচ্যতে॥" গীতা ৬অ—৩।

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির সম্বন্ধে কর্ম্মই কারণরূপে উক্ত হয়। কারণ, জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন) কিন্তু জ্ঞানযোগে আরূঢ় তাঁহার সম্বন্ধে সমাধি কারণরূপে উক্ত হয়। কেননা সমাধি ব্যতীত অন্য অবস্থায় যোগরূঢ় অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হওয়া যায় না।

ভূমে পড়ে — — —" তৎপর কালপূর্ণ হইলে জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া যায়। যথা –"ততো মন্মায়য়া মুগ্ধস্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ। অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ড ইবস্থিতঃ॥" ভগবতীগীতা ৬ –৩৫

তখন জীব কর্ম্ম করিতে অসমর্থ মাংসপিণ্ডরূপে অবস্থিত হয় এবং আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া সেই সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যায়।

"ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী"—মাতৃদেহের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ ছিল ধাত্রী নাড়ীচ্ছেদ করিয়া সহজেই তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিয়াছে, কিন্তু এখন এই অবিদ্যার বা ভ্রান্তির বন্ধন ছাড়াইবার কি উপায় আছে? গীতা হইতে উত্তর দেওয়া যাইতেছে—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে।" ৭।১৪

এই সত্ত্বাদিগুণবিকারময়ী আমার অলৌকিক মায়া নিশ্চয়ই দুস্তরা, যাহারা (কর্ম্মযোগ দ্বারা) আমারেই পান, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়া অতিক্রম করেন। তৃতীয়পদে সাধক দার-পরিগ্রহ ও তজ্জন্য সাংসারিক আবদ্ধতার পরিতাপটা মায়ের নিকট জানাইতেছেন। ইহাতে যে আধ্যাত্মিক ভাব আছে তাহা গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে। যথা—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান গুণান্।
কারণং গুণ সঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনি জন্মসু॥" ১৩।২১

পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন; কিন্তু এই পুরুষের সৎ, এবং অসদ যোনিতে যে জন্ম তদ্বিষয়ে সত্ত্ব রজস্তমঃ এই তিনগুণের সংসর্গই কারণ। চতুর্থপাদে সাধক বলিতেছেন "আদি পুরুষের আদি মেয়েটী" অর্থাৎ প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" গীতা ১৩।১৯ এবং তুমি পাষাণের বেটী" সুতরাং দয়া থাকার সম্ভাবনাও অতি অল্প, অতএব তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর ভিন্ন আমার উপায়ান্তর নাই, এই জন্যই আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

কপিলগীতা॥ ৪-৫

বিশ্বদেবাঃ।

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি।)

বাদপ্রতিবাদ ব্যাপারে আর লিপ্ত থাকিব না বলি বটে; কিন্তু কি করি, "মুঞ্চন্তং মাং ন মুঞ্চতি।"

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি মহাশয় আমার প্রদর্শিত ব্যাকরণাদি প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া, যথাদৃষ্টং কতকগুলি প্রয়োগমাত্র তুলিয়া, * সমাসেও বিশ্বেদেবাঃ পদের সমর্থন করিয়াছেন। তাহা দেখিয়া অনেকেই বলিতেছেন, তর্কনিধি মহাশয়ের কথাই ঠিক। তাই অগত্যা আবার আসরে নামিতে হইল।

প্রত্যেক পদের পর অবকাশ (স্পেস্) দেওয়া ইংরাজী রীতিতে প্রচলিত হইয়াছে। সংস্কৃত প্রাচীন পুস্তকে—ইদানীন্তন কাশী বম্বে প্রভৃতি প্রদেশের মুদ্রিত ও হস্তলিখিত বহু পুস্তকেও—এক মাত্রাতেই এক পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত ও লিখিত দেখা যায়। যথা—"অগ্নিমীড়েপুরো-হিতং" ইত্যাদি। তাই বলিয়া কি অগ্নি হইতে হিতং পর্য্যন্ত একপদ অর্থাৎ সমস্ত পদ বলিতে হইবে ?

তিনি যে বিশ্বেদেবাস আগত, বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং হবং ইত্যাদি মন্ত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমি প্রমাণ সহকারে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি "বিশ্বে দেবাঃ" অসমস্ত পৃথক্ পদ। তাহাতেও সন্দেহভঞ্জন না হইয়া থাকে ঐ মন্ত্রদ্বয়ের (ঋষিপ্রণীত) "পদপাঠ" দেখুন। তাহাতে "বিশ্বে। দেবাসঃ।……বিশ্বে। দেবাঃ।" এইরূপ পদচ্ছেদ আছে। নিরুক্তে দ্যুস্থান-দেবতার নামে যে "বিশ্বে দেবাঃ" আছে, নিরুক্তের ভাষ্যকার তাহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "সর্ব্বে দেবাঃ" এবং তাহার উদাহরণ দিয়াছেন "বিশ্বে দেবাস আগত। সায়ণাচার্য্যও তদনুসারে ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "হে বিশ্বে দেবাসঃ সর্ব্বে দেবাঃ।" ইহাতে কি বিশ্বেদেবাঃ একপদ স্থিরীকৃত হইল ?

তর্কনিধি মহাশয়ের প্রদর্শিত "আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ" ইত্যাদি বচনেও "বিশ্বে দেবাঃ" ঐরূপ পৃথক্ পদ, এবং "বিশ্বেদেবনিবেধঃ" ইত্যাদি লেখন লিপিকরপ্রমাদকৃত, একথা নিজের গরজে তিনি স্বীকার না করিলেও পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

সমাসে যে "বিশ্বদেব"ই হয়, তাহার প্রয়োগ শ্রাদ্ধতত্ত্বে দেখুন—"এবঞ্চ একোদ্দিষ্টে বিশ্বদেবকরণাকরণয়োঃ শাখিভেদেন ব্যবস্থা। তত্র সামযজুর্ব্বিদোঃ গৃহ্যানুসারাৎ বিশ্বদেব-রহিতত্বং, সাম্নেরর্থেদিনো বিশ্বদেবসহিতত্বম্।" ইত্যাদি। টীকাকার কাশিরাম বাচস্পতিও

---

* ব্রাহ্মণসমাজ ১৩২৯ ফাল্গুন সংখ্যায়।

লিখিয়াছেন—"অত্র চকারানির্দ্দেশাৎ নিরগ্নের্ম্মৈদিনস্ত প্রেতশ্রাদ্ধে বিশ্বদেবরহিতত্বং প্রতীয়তে।" মনু ৩।২০৪ শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্টও লিখিয়াছেন—"তেষাং পিতৄণাং রক্ষাভূতং দৈবং বিশ্বদেবব্রাহ্মণং পূর্ব্বং নিমন্ত্রয়েৎ।" বিশ্বেদেব সমস্তপদ হইলে "বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্ বলিকর্ম্ম তথৈব চ" ইত্যাদি সর্ব্বত্রই বৈশ্বেদেবং থাকিত, এবং দেবীসূক্তে "অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ"স্থলে বিশ্বেদেবৈঃ থাকিত।

তিনি যেমন সমাসে বিশ্বেদেব প্রয়োগ দেখাইয়াছেন, আমিও সেইরূপ বিশ্বদেব প্রয়োগ দেখাইলাম। এক্ষণে কোন্ প্রয়োগ সাধু, এবং কোন্ প্রয়োগ লিপিকরপ্রমাদজনিত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে ব্যাকরণাদি প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। সে প্রমাণ আমি আহ্নিককৃত্যে ও পূর্ব্ব প্রবন্ধে অনেক দেখাইয়াছি,এ প্রবন্ধেও অতিরিক্ত কয়েকটি দেখাইলাম। তর্কনিধি মহাশয় ত একটাও প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই।

কোনও কোনও পুথিতে লেখা থাকিলেই তাহা যদি শুদ্ধ পাঠ হয়, তাহা হইলে স্বস্তি ন ইন্দ্র ইত্যাদি মন্ত্রে চারি বেদেই "স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ" পাঠ আছে, "প্রকৃত্যান্তঃ পাদমব্যপরে।৬।১।১১৫" এই বৈদিক সূত্র দ্বারা এখানে অকার লোপ হইতেও পারে না; কিন্তু লৌকিক ব্যাকরণ অনুসারে অকার লোপ করিয়া সকল পুথিতেই "স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্ট নেমিঃ" লিখিত হইয়াছে। তাই বলিয়া কি উহাকে শুদ্ধ পাঠ বলিতে হইবে?

তর্কনিধি মহাশয়ের একটা বিষয়ে বিশেষকৃতিত্বর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বীয় মতের পোষণ করিবার জন্য প্রাচীন বচনগুলিকে অসঙ্কোচে বিকৃত করিয়া লিখিয়া পাঠকগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণসমাজের ১৩২৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ" মন্ত্রের প্রচলিত অশুদ্ধ পাঠের সমর্থন ও তদুপলক্ষে আমার প্রতি দোষারোপ করিবার জন্য বাচস্পতিমিশ্রের পঙক্তি কিরূপ বিকৃত করিয়া ও নেজামুড়া বাদ দিয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা উহার ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় দেখাইয়াছি। এবারেও মনুর কুল্লূকটীকা হইতে সেইরূপ বিকৃত করিয়া দেবলবচনটি তুলিয়াছেন—

"যে চাত্র বিশ্বেদেবানাং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।
প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহতানি চ॥"

কিন্তু ঐরূপ পাঠ আমরা কোনও দেশের কোনও পুস্তকে দেখি নাই। "বিশ্বেদেবানাং" ও "দ্বিদর্ভোপহতানি" প্রকৃত পাঠ হইলে অর্থসঙ্গতিই হয় না, ইহা তর্কনিধি মহাশয় বুঝিতে না পারিলেও অন্যান্য নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিত মাত্রেই বুঝিয়া থাকেন। উহার প্রকৃত পাঠ—

"যে চাত্র বিশ্বদেবার্থং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।
প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহিতানি চ॥"

কুল্লূকভট্ট এইরূপ পাঠই ধরিয়াছেন। কেবল কুল্লূক কেন, রঘুনন্দনও শ্রাদ্ধতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"আসনে বিশেষমাহ দেবলঃ—

যে চাত্র বিশ্বদেবার্থং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।

প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহিতানি চ॥

এষাং বিশ্বদেব ব্রাহ্মণানাম্। এতচ্চাসনং ব্রাহ্মণোপবেশনার্থং, ন তু বিশ্বদেবার্থম্।"
(এখানেও সমাসে বিশ্বদেব লেখা আছে দেখুন)

গোভিল গৃহ্যের ভাষ্যে আছে—

"দেবলীয়েঽপি প্রয়োগে

যে চাত্র বিশ্বদেবার্থং বিপ্রাঃ পূর্ব্বং নিমন্ত্রিতাঃ।

প্রাঙ্মুখান্যাসনান্যেষাং দ্বিদর্ভোপহিতানি চ॥

ইত্যুক্তন্।"

তর্কনিধি মহাশয় যে হেমাদ্রিধৃত আদিত্য পুরাণের

"বিশ্বেদেবৌ ক্রতুর্দ্দক্ষঃ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু কীর্ত্তিতৌ।

পুরূরবাদ্রবৌ চৈব বিশ্বেদেবৌ চ পার্ব্বণে॥"

বচন তুলিয়া বিশ্বেদেবৌ সমস্ত পদ দেখাইয়াছেন, তাহাতে বহুবচনান্ত 'বিশ্বে' ও দ্বিবচনান্ত 'দেবৌ' পদ অসমাসেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাপন্ন বলিলে পণ্ডিতগণের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, তদুপরি উহাকে সমস্ত পদ বলিলে তাঁহারা উন্মাদগ্রস্ত ভাবিয়া গাত্রে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিবেন, ইহা তিনি লিখিবার সময় ভাবেন নাই। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত কুতিত্বের প্রভাবে এখানেও তিনি উক্ত বচনের মধ্যস্থ তিন পঙ্ক্তি তুলেন নাই। সম্পূর্ণ বচনটি এই—

"বিশ্বে দেবৌ ক্রতুর্দ্দক্ষঃ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু কীর্ত্তিতৌ।

নিত্যে নান্দীমুখে শ্রাদ্ধে বসুসত্যৌ চ পৈতৃকে।

নবান্নলম্ভনে দেবৌ কামকালৌ সদৈব হি।

অপি কন্যাগতে সূর্য্যে কাম্যে চ ধূরিলোচনৌ।

পুরূরবাদ্রবৌ চৈব বিশ্বে দেবৌ চ পার্ব্বণে॥"

অমরকোষে "আদিত্যবিশ্ববসবস্তুষিতাভাস্বরানিলাঃ। মহারাজিকসাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ" থাকায় বিশ্ব শব্দই গণদেবতাবিশেষের নাম বুঝাইতেছে; বিশ্বদেব শব্দ নহে। "বিশ্বা হুতিবিষায়াং স্ত্রী জগতি স্যান্নপুংসকম। ন না শুঠ্যাং পুংসি দেবপ্রভেদেম্বথিলে ত্রিষু" এই মেদিনীবচনে বিশ্বশব্দের নানা অর্থ থাকায় বিশেষ বোধনের জন্য দেব শব্দ উহার বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব উক্ত বচনের অর্থ বিশ্বে বিশ্বসংজ্ঞকা যে দশ দেবাঃ তে সর্ব্বাসু ইষ্টিষু ইচ্ছাশ্রাদ্ধেষু ক্রতুঃ দক্ষ এতৌ দ্বৌ দেবৌ কীর্ত্তিতৌ ইত্যাদি। এখানে ক্রতু ও দক্ষের বিশেষণ বলিয়া 'দেবৌ' দ্বিবচনান্ত হইয়াছে, এবং বিধেয় প্রাধান্য হেতু 'কীর্ত্তিতৌ' ক্রিয়াতেও দ্বিবচন বসিয়াছে। যেমন "গুঞ্জাঃ পঞ্চ পণং ভবেৎ" ইত্যাদি। তৃতীয় পঙ্ক্তিতে দেখুন 'বিশ্বে' নাই, কেবল 'দেবৌ' আছে।

তর্কনিধি মহাশয় কলাপব্যাকরণে অধীতী হইয়াও কলাপচন্দ্রিকা হইতে যে "বিশ্বেদেবা ইতি ছান্দসঃ প্রয়োগঃ" তুলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই, এবং কলাপব্যাকরণাভিজ্ঞ পাঠকগণের তদ্‌গ্রহণে বাধা দিবার জন্য সমগ্র পঙক্তিটিও তুলেন নাই। যাহা তুলিয়াছেন, প্রাগুক্ত কৃতিত্বের বলে তাহাও বিকৃত করিয়াছেন। কলাপ চন্দ্রিকায় আছে—"বিশ্বে দেবা ইতি তু ছান্দসপ্রয়োগঃ। অথবা সঙ্কোচবৃত্ত্যা সর্ব্বত্বপুরস্কারেণৈব বিশ্বশব্দো দশসু শ্রাদ্ধদেবেষু বর্ত্ততে, যথা দশসু ঘটেষু সর্ব্বে ঘটা ইতি প্রয়োগঃ। অতএব বিশ্বেষাং দেবানামিতি প্রয়োগঃ সাধুরিতি।" অর্থাৎ সংজ্ঞা বুঝাইলে সর্ব্বাদিগণের সর্ব্বনাম কার্য্য হয় না; তথাপি যে "বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং" ইত্যাদি মন্ত্রে বিশ্ব শব্দ গণদেবতা-বিশেষের সংজ্ঞা হইয়াও * সর্ব্বনাম কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ছান্দস। "পুরূরবোমাদ্রব-সোর্ব্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময়ব্রাহ্মণয়োরহং করিষ্যে" ইত্যাদি লৌকিক বাক্যেও তবে কিরূপে সর্ব্বনামকার্য্য হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, দশটি ঘট জলপূর্ণ করিতে কাহাকেও আদেশ করিয়া তার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যেমন বলে 'সব ঘট জলপূর্ণ করিয়াছি' অর্থাৎ দশটি ঘটকেই সর্ব্বঘট বলে, সেইরূপ সর্ব্বার্থক বিশ্ব শব্দের অর্থ সঙ্কোচ করিয়া দশজন শ্রাদ্ধদেবকে 'বিশ্বদেব' বলা হয়; সুতরাং সংজ্ঞাবাচক না হওয়ায় "বিশ্বেষাং দেবানাং" প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

সমাসে বিশ্বেদেবাঃ ছান্দস বলা অভিপ্রেত হইলে তিনি উহা সর্ব্বনাম প্রকরণে না লিখিয়া সমাস প্রকরণেই লিখিতেন। হলায়ুধ প্রভৃতিই বা ছান্দস প্রয়োগ লৌকিকে কিরূপে ব্যবহার করিলেন ?

অমরের টীকাতেও ঐরূপ কথা আছে, যথা—"সাধ্যা বিশ্বে সরুদ্রাশ্চ ইত্যাদি পুরাণ প্রয়োগ দর্শনাৎ প্রকারকার্ৎস্ন্যপ্রবৃত্তিত্বেন সর্ব্বনামত্বম্। বিশ্বে দেবা ইতি সংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বাচার্য্য প্রসিদ্ধেঃ পুরাণ প্রয়োগাচ্চ সর্ব্বনামতেতি সাঙ্গাঃ। ভরতস্তু 'ন গৌণ্যাখ্যাচত্রীসাসে' (মুগ্ধবোধসূত্র) ইত্যনেন স্রিসংজ্ঞা (সর্ব্বনামসংজ্ঞা) নিষেধেঽপি নঞা নির্দ্দিষ্টং ব্যভিচরতীতি বিশ্বেষাং দেবানামিত্যাদি ভূরি প্রয়োগদর্শনাৎ স্রিসংজ্ঞত্বমিতি।"

তর্কনিধি মহাশয় আমার অসর্ব্বজ্ঞতা, তাণ্ডব ও কবিকল্পনার পরিচয় দেখাইতে গিয়া নিজের কিরূপ সর্ব্বজ্ঞতা, কিরূপ লাস্য ও কিরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, পাঠকগণ দেখিলেন ত ? তিনি বেদ, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি যাহা উদ্ধৃত করিতেছেন, তাহাতেই আপন অব্যুৎপন্নতাই প্রকাশ করিতেছেন; এ অবস্থায় এখনও বিরত হওয়াই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করি। কিন্তু তিনি এ হিতোপদেশ শুনিবেন বলিয়া মনে হয় না।

ধৃষ্টতাই বলুন, অহঙ্কারই বলুন, আর জিগীষাই বলুন, সত্যানুরোধে আমার শেষ বক্তব্য—আমি আহ্নিককৃত্য প্রভৃতি পুস্তকে মন্ত্রাদির যে পাঠ ধরিয়াছি, তাহার উপর (১৩১৩ সাল

* হলায়ুধ ও গুণবিষ্ণুর ব্যাখ্যানুসারে।

হইতে বর্ত্তমান ১৩৩০ সাল পর্য্যন্ত) যিনি যিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও উক্তিটিকে নাই; প্রত্যুত সুধীসমাজে অসার বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৩১৪ সালের ১৪ই বৈশাখের বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত মধ্যস্থভূত ৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুদীর্ঘ মন্তব্য, মধ্যে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের ত্রিশূলে প্রকাশিত অসার প্রতিবাদ এবং ইদানীং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র তর্কনিধি ও শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় দ্বয়েরও তাদৃশ প্রতিবাদই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ। নিজের কোটটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমার উত্তরের খণ্ডন করিতে যাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রয়াস ব্যর্থই হইয়াছে, এবং তাঁহারা নিজের অপাণ্ডিত্যের ও সত্যানুসন্ধিৎসার অপ্রবৃত্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে আমি আর বৃথা সময় নষ্ট করিব না—আর কাহারও প্রতিবাদের উত্তর দিব না। অজ্ঞকে অনায়াসেই বুঝান যায়; বিজ্ঞজনে বুঝিয়াও না বুঝিলে "ব্রহ্মাপি নরং ন রঞ্জয়তি," অন্যা পরে কা কথা। অলমতিবিস্তরেণেতি।

"বোধন"

(লেখক—শ্রীঅমৃতলাল কাব্যতীর্থ।)

যোগনিদ্রা ত্যজি জাগো মাগো আজি শরত্ এসেছে বঙ্গে।
কাশ কুসুমিত বনালি শোভিত শ্যামলা প্রকৃতি সঙ্গে॥
সরলা বালিকা সিত শেফালিকা এসেছে শরত্ সাথে
এসেছে হাসিনী কুমু কমলিনী মালতীর ধরি হাতে॥
অভ্র শুভ্র রথে নীলাকাশ পথে সাথী করি জোছোনায়।
এসেছে উঠ মা শারদ চন্দ্রমা প্রণমিতে রাঙ্গা পায়॥
কুলু কুলু কুল আশায় আকুল ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী।
স্বচ্ছ সলিলা এসেছে অবলা ধোয়াইতে পা'দুখানি॥
জাগো গো জননী জগত তারিণী কুঞ্জে গাহিছে পাখী।
সে করুণ সুরে গেছে বঙ্গ ভরে মেল মা কমল আঁখি॥
খেতে দেমা বলে কান্দে যায় ছেলে পরণে নাইক চীর।
কুণ্ডলিনী সেজে অঘোরে কি সাজে নিদ্রা সে জননীর॥
দেখ সর্ব্বনাশী চেয়ে এর বেশী দুরবস্থা কিবা হয়।
কলত্র তনয় হতেছে বিক্রয় অভাবেতে বঙ্গময়॥

তবু পূজা আশে	যেন রঙ্গ বাসে	যৌবন পেয়েছে জরা।
কিন্তু নাই আর	ভোর বাংলার	সেই মুখ হাসি ভরা॥
স্বভাব শান্তি	স্বভাব কান্তি	স্বভাব সরল হাসি।
ভোর জাগরণে	ভাবি এ ভবনে	দেখা দিবে পুনঃ আসি॥
পবিত্র লগনে	মাতৃ দরশনে	মেতেছে তনয় হর্ষে।
কর মা ধন্য	ধরণী, পুণ্য	চরণ কমল স্পর্শে॥
প্রবোধ করুণে	অবোধ সন্তানে	প্রদানি পীযূষ স্তন্য।
হাসুক বাঙ্গালী	দিয়ে করতালি	মাতৃনাম হোক ধন্য॥

নাটক ও গীতাভিনয়।

(লেখক—শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর)

বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার সুনিবিড় মিলন সংঘটিত করিয়া প্রতিভাবান কবি কোবিদগণ, কাব্য ও নাট্যাদি রচনা করেন। যাহাতে লোক শিক্ষা, সমাজ সংস্কার এবং কুনীতির দমন হয়, যাহাতে কাব্যরসের সহিত প্রচুর নীতি রস মিশ্রিত থাকে, এবংবিধ গ্রন্থই লোকসমাজে আদৃত ও সম্মাননীয় হইয়া মানব মনে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; অন্যথা সেই সকল গ্রন্থ কণ্ডূয়ন-ব্যাধির ন্যায় ক্ষণিক চাঞ্চল্য উৎপন্ন করিয়া, পরিশেষে জ্বালা উৎপন্ন করিয়া থাকে, যাহাতে দুর্নীতি প্রশ্রয় পায় তাহা সমাজের আবর্জনা মাত্র।

পুরাণ শাস্ত্র অনন্ত জলধি বিশেষ। পুরাণের এক এক বিন্দু উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া সুচতুর কবিগণ বৃহৎ বৃহৎ মনোমদ গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধিগণের আনন্দ উৎপন্ন করেন। এক রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনেই শত শত কাব্য নাটক সৃষ্ট হইয়াছে। এবং এখনও হইতেছে। ভবিষ্যতে ও হইবে।

বেদ পুরাণ ও তন্ত্র একাধারে ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস। বৈদিক যুগের কথাবার্ত্তা, আদব কায়দা, রীতিনীতি, আহার ব্যবহার কিরূপ ছিল তাহার আভাস বেদ পাঠ করিলে অনেকটাই বোধগম্য হয়। পৌরাণিক যুগের রাজা প্রজার ব্যবহার, খাদ্যসামগ্রীর কথা, পুরস্কার তিরস্কার প্রভৃতি ও পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। তন্ত্রও একরূপ ইতিহাস বৈ কি?

ইতিহাস অবলম্বনে নাটক রচনা করা যেমন সঙ্কটের কথা—পুরাণ অবলম্বনে নাটক রচনা করাও তদ্রূপ। ইতিহাস রক্ষা করিতে গেলে কল্পনাকে খর্ব্ব করিতে হয়; অথচ কল্পনার গতি স্বচ্ছন্দ না রাখিলে উৎকৃষ্ট নাট্যাদি রচনা করাও সম্ভবপর হয়না। বিশেষ সুপরিচিত ইতিহাসের বা পুরাণের বিষয়াশ্রয়ে উৎকৃষ্ট নাটক রচনা অনেকটাই অসম্ভব।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ" "পুত্রপরিচয়" "চিত্রাঙ্গদা" "সংসারচক্র" "তাম্রধ্বজ" "সুধন্বাবধ" প্রভৃতি কয়েকখানি গীতাভিনয় রচিত হইয়াছে। নাট্যকারগণের রচনাশক্তির সমালোচনার জন্য বর্ত্তমান প্রযত্ন নহে, তবে তাঁহারা পুরাণ লিখিত সত্যের অপলাপ ; কে কতখানি করিয়াছেন, তাহাই বিচার্য্য।

ধরিয়া লউন "সংসারচক্র" নাটক:খানির কথা। এই নাটকখানি শ্রীযুক্ত অঘোর নাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লেখা। বোধহয় তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ("বোধহয়" লেখার তাৎপর্য্য এই যে, অধুনা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যজাতি ও "বিদ্যারত্ন" বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি উপাধি মাত্র নামান্তে যোগ করিয়া স্বপরিচয় প্রদান করেন। উদাহরণ বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যা-বিনোদ, ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন, বাবু অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ। ইঁহারা ঘোষ বা গুপ্ত লেখেন না)। এবং তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রাদি বিশেষরূপেই পাঠ করিয়া থাকেন। তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রের লিখিত বিষয় গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাদ দিয়া তিনি যে অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, তাহাতে সত্যের অপলাপ হয় কিনা তিনি বলুন।

বহুদিবস পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের একটি যাত্রার:.দলে "চন্দ্রহাস পরিণয়" বলিয়া ঐ বিষয়টিই অভিনীত হয়। তাহার লেখক যে কে ঠিক্ জানি না ; প্রবীনগণ সে সংবাদ জানিতে পারেন। তাহাতে মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বলিখিত বিষয়টি প্রায় যথাযথই রাখা হইয়াছিল। আর ইনি (অঘোর বাবু) যে "সংসারচক্র" লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক অসত্য ঘটনা লিখিত হইয়াছে। পুরাণভক্ত অথবা পুরাণজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সত্যের অযথাপলাপে বিরক্ত হইয়াছেন নিশ্চয়। এক্ষণে কথাগুলি খুলিয়া বলিতেছি।

মহাত্মা ব্যাসশিষ্য জৈমিনি যে মহাভারত সংকলন ও রচনা করেন তাহার নাম "জৈমিনি ভারত"। ঐ মহাভারতে অশ্বমেধ পর্ব্বটুকুই আছে। উহাতে অর্জ্জুন দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিতে করিতে চন্দ্রহাসের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রহাস অশ্ব ধরিয়াছেন।

অর্জ্জুন চন্দ্রহাসের কথা কখনও শুনেন নাই। (এতদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের "ব্রাহ্মণসমাজে" দেখুন)। নারদ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে "চন্দ্রহাস" বড় ভক্ত ও বীর, এরসঙ্গে সাবধানে যুদ্ধ করিতে হইবে। অর্জ্জুন বলিলেন ইহার বিষয় আপনি বলুন। নারদ সকল বৃত্তান্তই বলিলেন। জৈমিনি ভারত হইতে কাশীদাসী ভারত অনেক টুকু পৃথক। আমার বিশ্বাস নাট্যকার অঘোর বাবু কাশীদাসের মহাভারত হইতেই "সংসারচক্র" সংগ্রহ করিয়াছেন। উপাখ্যানটুকু সংক্ষেপে লিখিতেছি। কৌণ্ডিল্যনগরে (কেরল রাজ্যে ?) পাণ্ডবের অশ্ব পৌঁছিলে, তত্রত্য রাজা চন্দ্রহংস অশ্ব ধারণ করিল। অর্জ্জুন অশ্ব না দেখিয়া চিন্তিত হইয়াছেন এমন সময় নারদ আসিয়া চন্দ্রহংসের বিবরণ কহিলেন। বিষ্ণুভক্ত রাজা দধিমুখ অপুত্রক ছিলেন, পুত্র নিমিত্ত যজ্ঞ করায় পুত্র উৎপন্ন হয়। মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে দধিমুখের মৃত্যু হইল ; চন্দ্রহংস তখন তিন দিনের ছেলে। ধাত্রী পরমযত্নে শিশুকে প্রতিপালন করিতে লাগিল ; ইতিমধ্যে রক্তপুল রোগে ধাত্রীর মৃত্যু

হইল। তখন শিশুর মাতামহ চন্দ্রহংসকে লইয়া গেল। তাঁহারা চন্দ্রহংসকে পরমযত্নের সহিত লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শিশু পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল।

এদিকে পাপাত্মা মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি নিজে রাজা হইয়া প্রজাপীড়ন করিতে লাগিল। বলিতে ভুলিয়াছি, রাজা দধিমুখের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁহার পত্নীরও মৃত্যু হয়। মাতা পিতৃহীন বালক মামার ঘরে লালিত হইতে লাগিল। ধৃষ্টবুদ্ধি রাজহত্যা পাপক্ষালনের জন্য) প্রত্যহ পুরাণ শ্রবণ করেন। নাগরিক শিশুগণের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রহংসও একদা পুরাণ শ্রবণার্থ কৌন্তিল্য রাজপুরে গমন করিল। সুদর্শন শিশুকে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ—মন্ত্রী এক্ষণে রাজা) ধৃষ্টবুদ্ধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ শিশুটি কে? মন্ত্রী বলিল, আমি ত জানি না এ কে? ব্রাহ্মণগণ বলিলেন ইহার যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হইতেছে; এই বালক একদিন রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবে। অতএব তুমি এখন হইতে সাবধান হও।

ধৃষ্টবুদ্ধি জানিতে পারিল এই বালক দধিমুখের পুত্র। তখন চণ্ডালগণকে তাহার বধার্থে নিয়োগ করিল। চণ্ডালগণ সুদর্শন [illegible] গিয়া তাহার বামপদের অতিরিক্ত যে কনিষ্ঠাঙ্গুলি, সেটি [illegible] ধৃষ্টবুদ্ধিকে দেখাইল। ধৃষ্টবুদ্ধি হৃষ্টমনে চণ্ডালগণকে অনেক মহিষ পুরস্কার দিলেন। এইখানে দুই মত আছে; জৈমিনিমতে ব্যাধগণ চন্দ্রহংসকে প্রতিপালন করে, ব্যাসদেবের মতে কলিঙ্গ নামে জনৈক রাজমন্ত্রী নিজগৃহে লইয়া যান।

মন্ত্রীকলিঙ্গ অপুত্রক ছিলেন। দৈবযোগে অনাথ চন্দ্রহংসকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে স্বীয়পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ধৃষ্টবুদ্ধি—মন্ত্রীর পুত্র হওয়ার সংবাদে সুখী হইল।

কালক্রমে চন্দ্রহংস ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিল। যেমনি গুণ, তেমনি বীর। তিনি রাজ্যস্থ প্রজাগণকে একাদশীব্রতে ব্রতী করাইয়া প্রেমানন্দে হরিনাম করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রীকলিঙ্গ ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট কর পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, চন্দ্রহংস ভেট পাঠাইতে বলিলেন। (কলিঙ্গ বোধহয় ধৃষ্টবুদ্ধির সামন্ত রাজা হইয়াছিলেন)। ভৃত্যগণ ভেট লইয়া ধৃষ্টবুদ্ধির নিকট পৌছাইয়া প্রত্যাগমন করিতেছে দেখিয়া, ধৃষ্টবুদ্ধি তাহাদিগকে আহার করিতে বলিল। অনুচরগণ বলিল আজ একাদশীব্রত; আমরা স্নান করিয়া নারায়ণ পূজা করিব। তাহা শুনিয়া ধৃষ্টবুদ্ধি ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসিল, কে তোদের একার্য্যে ব্রতী করিয়াছে? তাহারা চন্দ্রহংসের কথা বলিলে, ধৃষ্টবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ কলিঙ্গ নগরে যাত্রা করিল।

ধৃষ্টবুদ্ধি কলিঙ্গর নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া মনের রাগ চাপিয়া মুখে আনন্দের হাসি হাসিল। পরে চন্দ্রহংসকে দেখিয়া সংশয় দূরীভূত হইল। হাঁ! এইত ঠিক দধিমুখের পুত্র! ইহাকে বিনাশ করাই চাই। চন্দ্রহংসকে একখানি পত্র লিখিয়া দিয়া স্বীয় পুত্র মদনের নিকট পাঠাইল। পত্রে লেখা ছিল যে, এই পত্রবাহক আমাদের শত্রু; ইহাকে বিষ দান করিবে। হে মদন! আমার যাবার অপেক্ষা করিবা না। পৌছিবা মাত্র ইহাকে যত্নপূর্ব্বক বিষদান করিবে। ইহাতে অন্যথা না হয়।

দৈববশতঃ ধৃষ্টবুদ্ধির প্রাপ্ত বয়স্কা অতি সুন্দরী কন্যা "বিষয়া" পুষ্পোদ্যানে আসিয়া নিদ্রিত যুবককে দেখিয়া আত্মহারা হইল। দেখিতে দেখিতে "পত্র" দেখিয়া কৌতূহল বশতঃ সেইপত্র পাঠ করিল; (ধৃষ্টতার সীমা নাই)। পাঠান্তে সকল বিষয় অবগত হইয়া উপায় স্থির করিল, কিরূপে ইহাকে বাঁচান যায়। ইহাকে না বাঁচাইতে পারিলে আমি মরিব। বিষয়া নিজ চক্ষের কজ্জল নখে করিয়া লইল এবং "বিষদান করিবা" এই স্থানে "বিষয়া দান করিবা" লিখিল। তারপর পত্রখানি যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া গৃহে গমন করিল। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রহংস মদনকে পত্র দিল; মদন পত্র পাঠ করিয়া বিষয়াকে চন্দ্রহংসের সহিত বিবাহ দিল। বিবাহের বাদ্যে রাজ্য আনন্দে মসগুল, এমন সময় ধৃষ্টবুদ্ধি আসিয়া পুত্রের কাণ্ড শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। স্বীয় দোষ ক্ষালনার্থে মদন যখন সেইপত্র দেখাইল তখন ধৃষ্টবুদ্ধি বুঝিল চতুর চন্দ্রহংসেরই এই কার্য্য, পুত্রের কোনই দোষ নাই। ধৃষ্টবুদ্ধি তখন চন্দ্রহংসকে বলিল

"চন্দ্রহংস! চণ্ডীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া এস, তবে তোমাদের শুভ হইবে।" এদিকে জনৈক ঘাতককে ঠিক করিয়া রাখিল। বলিল যেই অদ্য রাত্রে চণ্ডিকার মন্দিরে প্রণাম করিতে যাইবে তাহাকেই হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না।

দৈবযোগে মদন চণ্ডিকামন্দিরে প্রণাম করিতে গেলে, সেই ঘাতক তাহাকে কাটিল। এদিকে চন্দ্রহংসকে দেখিয়া বিস্মিত ধৃষ্টবুদ্ধি কারণ জিজ্ঞাসা করিল; চন্দ্রহংস বলিল যে, আমাকে মদন যাইতে দিলনা, সেইজন্য ফিরিয়া আসিলাম। এইকথা শ্রবণ করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধি "হাপুত্র হাপুত্র" -করিতে করিতে চণ্ডির মন্দিরে গিয়া দেখিল ছিন্নমুণ্ড মদন ভূমিতলে লোটাইতেছে! পুত্রশোকে ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মহত্যা করিল!

চন্দ্রহংস চণ্ডিকামন্দিরে আসিয়া শ্বশুর ও শ্যালকের মৃতদেহ দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি ভক্তিভরে (তাহাদের জীবন কামনায়) মাতার স্তব করিতে লাগিল। বহুস্তবে ও যখন অভয়ার কৃপা হইল না, তখন আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। হরিভক্ত বিনষ্ট হয় দেখিয়া চণ্ডীমাতা চন্দ্রহংসের হস্ত ধরিলেন এবং চন্দ্রহংসের প্রার্থনানুসারে ধৃষ্টবুদ্ধি ও মদনকে বাঁচাইয়া দিলেন।

ধৃষ্টবুদ্ধি তখন চন্দ্রহংসকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন; মদন মন্ত্রী হইল। ধৃষ্টবুদ্ধি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। বিষয়ার গর্ভে মকরাক্ষ ও পদ্মাক্ষ নামক চন্দ্রহংসের দুইপুত্র হইল। ইহারাই যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিয়াছিলেন। এই ত গেল "চন্দ্রহংসের" সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

অঘোর বাবু মদনের নাম রাখিয়াছেন "সরলকুমার"। ধৃষ্টবুদ্ধি লিখিত পত্রের কোনই উল্লেখ নাই। ধাত্রী ত্রিছয়া, ঐ পুত্র বুদ্ধিমন্ত, ঘাতক বলবন্ত ইত্যাদি কল্পনার সৃষ্টি! লোকরঞ্জনার্থ তাঁহার "সংসারচক্র" রচিত হইলেও মহাভারতের বিষয়টুকু অব্যাহত রাখা উচিত ছিল।

যাঁহারা পুরাণ পড়েন নাই, অথচ নাটক অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময় নাট্যোল্লিখিত কবি কল্পিত নামগুলি লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন। "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের "ছায়া" ও "হেলেনা" কবির সৃষ্টি; অনেকে উহার যাথার্থ নির্ণয়ার্থ ইতিহাস অনুসন্ধান করেন! এইরূপ "সাজাহান" নাটকের "পিয়ারা" ও "দিলদার" কবির কল্পনামাত্র। অথচ জনৈক মুসলমান ভ্রাতা "ভারতবর্ষে" প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "দিলদার বা দানেশনন্দ এসিয়ার বিজ্ঞতম সুধী বলিয়া "সাজাহান" নাটকে লিখিত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক বিবরণ চাই ইত্যাদি।"

সত্যের সঙ্গে দেশ কাল পাত্রোচিত কল্পনার মিশ্রণ আবশ্যক হয় বটে! তাই বলিয়া সত্যকে বাদ দিয়া ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটক লিখিলে অনেকে ভ্রান্ত হয়। অনেক বালক ও যুবক নাট্যোল্লিখিত চরিত্রকে ঐতিহাসিক সত্য মনে করিয়া, পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দেয়। বাল্যাবধি তাহারা নাটকাভিনয় দেখিয়া ভ্রান্তিজালে জড়িত হয়। কেবল "সংসারচক্র" কেন, অনেক সংসার চক্রই ঐরূপ। "সুরথ উদ্ধার" নাটকে, "ত্রিশঙ্কু" নাটকে "তাম্রধ্বজে" "চিত্রাঙ্গদায়" প্রচুর কল্পনা করা হইয়াছে অথচ ঐগুলি পৌরাণিক নাটক। পুরাণের অনেক কথাই উহাতে নাই। ভক্তমালা গ্রন্থের "বিল্বমঙ্গল" ৺গিরিশচন্দ্রের রচিত বিল্বমঙ্গল হইতে পৃথক হইলেও গিরিশ বাবুর "বিল্বমঙ্গল" উৎকৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে নায়ক নিজে ভাল সেখানে তাহাকে আরও ভাল করুন তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু মন্দকে আরও মন্দ করিয়া লোকের সমক্ষে ধরিবেন না। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট্।

(লেখক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম,এ)

সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ যে কোনও অনুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বেই পঞ্জিকায় তিথি নক্ষত্রাদি দেখিয়া কার্য্যের শুভাশুভ ফল পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন নিত্য ব্যবহার্য্য তৈল, ঘৃত, দুগ্ধাদিতে ভেজাল প্রবেশ করিয়া লোকের স্বাস্থ্যহানির পথ পরিষ্কৃত করিয়াছে, তেমনই এই পঞ্জিকা ব্যাপারেও নানারূপ গলদ্ ঢুকিয়াছে—তাহাতে হিন্দুর ক্রিয়া কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান পণ্ড হইবার পথে আসিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে পঞ্জিকা ব্যাপারে কিরূপ বিভ্রাট ঘটিতেছে যথামতি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তবে আমি জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ে "বিশেষজ্ঞ" নহি—আশাকরি এই সামান্য আলোচনা দেখিয়া

জ্যোতির্বিদ্যা-পারদর্শী কোনও সুধী এ বিষয়ে দক্ষতর লেখনী প্রয়োগ করিয়া সমাজের উপকার বিধান করিবেন।

"গুপ্তপ্রেস" প্রভৃতি পঞ্জিকাকারগণ যে ভাবে তিথি নক্ষত্রাদির গণনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা যে অধুনাতন গণিতজ্ঞগণের অনুমোদিত নয়, ইহা এক প্রকার অবিসংবাদিত সত্য। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রবর্ত্তক ৺মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন; কেননা তিনিই বঙ্গদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পঞ্জিকা প্রণয়নপূর্ব্বক চন্দ্রসূর্য্যের দৃক্‌সিদ্ধ গতি অনুসারে তিথি প্রভৃতির মান প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-পঞ্জিকার সমাদর এখন তথ্যানুসন্ধায়ী নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা সুখের বিষয়। পরন্তু একটি বিষয়ে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়ও গলদ রহিয়া গিয়াছে, এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ সেই বিষয়েই যথামতি আলোচনা করিব।

কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী; "এষ্ট্রনমি" বিষয়ে তাঁহার একখানি নিবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, অনার্সের পাঠ্য। আমি জ্যোতিঃশাস্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতের কথায় আমার দৃঢ়বিশ্বাস আছে. বিশেষতঃ তিনি কোনও পঞ্জিকার সঙ্গে সম্পর্কিত নহেন—অতএব তাঁহার সিদ্ধান্ত স্বার্থ-প্রণোদিত নহে। তিনি বলেন যে, "আদি-বিন্দু" অর্থাৎ যে বিন্দুকে সূর্য্য আসিলে পূর্ব্ব সংবৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসর আরম্ভ হয়—তাহা কোনও পঞ্জিকায়ই ঠিক ঠিক গৃহীত হয় নাই—এমন কি বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়ও নহে। তাঁহার মত এই যে ৪২১ শকের বিষুবদ্বিন্দুই প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান হিন্দু রাশি-চক্রের "আদিবিন্দু" (অর্থাৎ মেষ রাশির ও অশ্বিনী নক্ষত্রের আরম্ভ স্থান) এবং তাহাই গ্রহণীয়। ইহ গ্রহণ করার পক্ষে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনাকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহোদয়েরও মত; কিন্তু তাহা হইলে বৎসরারম্ভ (তথা প্রত্যেক মাসারম্ভ) তিন দিন আগে হইয়া যাইবে—ইহাতে লোকেও বিরক্ত হইয়া উঠিবে; এই নিমিত্ত বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হন নাই। বিশেষতঃ বোম্বে নগরীতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের যে সভা হয়, তাহাতে "আদিবিন্দুর" সংস্কার সম্বন্ধে সকলে একমত হন নাই—যদিও বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার প্রতিনিধি ৪২১ শকের "আদিবিন্দু"কেই গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন। * যাঁহারা কেবল গণিত-জ্যোতিষ নিয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের মতে যে কোনও একটা বিন্দু "আদিবিন্দু" ধরিয়া নিলেই হইল। যেমন ধরুন ১লা জানুয়ারী—ঐ দিন সূর্য্যের কোনও বিশেষ রাশি বা নক্ষত্র হইতে অন্য রাশি বা নক্ষত্রে সংক্রমণের কথা নাই—সেদিন একটা কাল্পনিক বিন্দুতে সূর্য্য অবস্থান করেন;

* বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার ভূমিকার ২১ পৃষ্ঠায় ইহার ইঙ্গিত আছে; "যে সংক্রান্তিতে বৎসর বৎসর বর্ষমাণজনিত ভ্রম চলিতে লাগিল, যাহাতে দীর্ঘকাল-পুঞ্জীকৃত প্রায় চারি দিনের ভ্রম রহিয়াছে," ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য (গণিত) জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দেখেন যে কখন সূর্য্য ঠিক সেই (কাল্পনিক) বিন্দুতে আসিল; যখন আসিল, তখনই আবার ১লা জানুয়ারী আরব্ধ হইল।

কিন্তু আমরা—যারা ফলিত জ্যোতিষ বিশ্বাস করি—এইরূপ যাদৃচ্ছিক বা কাল্পনিক একটা "আদিবিন্দু"তে তুষ্ট হইতে পারি না। চন্দ্র সূর্য্যের (তথা অন্যান্য গ্রহের) এক রাশি বা নক্ষত্র হইতে অপর রাশি বা নক্ষত্রে সংক্রমণের সঙ্গে আমাদের জীবন-মরণের সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে ছেলেটি রেবতীর শেষ পাদে জন্মিল বলিয়া প্রচলিত পঞ্জিকা মতে ধার্য্য হইল, প্রকৃত "আদিবিন্দু" গ্রহণ পূর্ব্বক গণনা করিলে দেখা যায় যে উহার জন্ম অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম পাদে। "পালে জীয়ে বারদিন" বলিয়া দৈবজ্ঞ মহাশয় বালকটিকে অল্পায়ুঃ স্থির করিয়া মাতাপিতার আতঙ্ক জন্মাইলেন—ওদিকে সে প্রকৃতপক্ষে ঐ বচনানুসারেই দীর্ঘায়ুঃ হইবে। মীন রাশি, সুতরাং বিপ্রবর্ণ বলিয়া উহার বিবাহ একটি বিপ্রবর্ণা কন্যার সঙ্গে হইল। এদিকে প্রকৃতপক্ষে বর মেষ-রাশি, সুতরাং ক্ষত্রিয় (অথবা মতান্তরে বৈশ্য) বর্ণ হওয়াতে, কন্যা বর্ণশ্রেষ্ঠা হওয়ায় অমঙ্গলের কারণ ঘটিল। মীনরাশি বলিয়া পাত্রের সঙ্গে কন্যার হয় ত রাজযোটক হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে মেষরাশি হওয়াতে হয়তো "অরিষড়ষ্টক" দোষ হইয়া গেল। এইরূপ চন্দ্রশুদ্ধি, তারাশুদ্ধি ঘাতচন্দ্র ইত্যাদি কতশত বিষয়ে গোলযোগ হইতেছে!! এদিকে ৩০শে কার্ত্তিক অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন বলিয়া প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে ঐদিন কার্ত্তিকপূজা হইয়া গেল, অথচ প্রকৃত "আদিবিন্দু" ধরিয়া দেখা যাইবে ঐদিন অগ্রহায়ণের ৩ তারিখ!! যতি এবং বিধবারা যেদিন "অম্বুবাচী" বলিয়া ফলাহার করিলেন—প্রকৃত "আদিবিন্দু"মতে উহার পূর্ব্বেই অম্বুবাচী শেষ হইয়া গিয়াছে—তখন হয়তো তাঁহারা অগ্নিপক্ক দ্রব্যাদি ভোজন করিয়াছিলেন! ফাল্গুনের ২৮শে তারিখে যে বিবাহটি হইল—তাহা প্রকৃত আদিবিন্দু ধরিয়া দেখিলে ২রা চৈত্র—নিষিদ্ধ মাসে সম্পন্ন হইয়াছে!! এইরূপ বৃহস্পতির সঞ্চার ইত্যাদিতে বাত্যয় ঘটিতেছে—অশুদ্ধ কাল শুদ্ধ এবং শুদ্ধকাল অশুদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। যাত্রার লগ্ন মিথুন বলিয়া ফললাভ নিশ্চিত মনে করিলাম—সেই লগ্ন প্রকৃতপক্ষে কর্কট হইয়া প্রাণান্তকর হইয়া গেল!! এইরূপ যে মাস মলমাস বলিয়া পঞ্জিকায় লিখিত তাহার ২।৩ মাস পূর্ব্বে বা পরে মলমাস হইবে। তখন হয়তো ছেলের উপনয়ন দিয়া ফেলিয়াছি!! অতএব আদিবিন্দুর ব্যত্যয়ে কত যে অনর্থ সম্ভাবিত হইতেছে, দিঙ্মাত্র দর্শন দ্বারা তাহার বিশালতা অনুমিত হইবে। প্রকৃত (অর্থাৎ ৪২১ শকের) আদিবিন্দুমতে সূর্য্যাদি গ্রহের সংক্রমণ কিরূপে মোটামুটি ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। উদ্দেশ্য, যাঁহারা প্রকৃত 'আদিবিন্দু' নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা যেন স্বীয় বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।

বর্ত্তমানে যে স্থানটিকে আদিবিন্দু বলিয়া গ্রহণ করা হয়—প্রকৃত আদিবিন্দু (অর্থাৎ ৪২১ শকের বিষুবদ্বিন্দু) হইতে ইহা ২°—৪৯′—৫০″ আগাইয়া পড়িয়াছে। এই নিমিত্ত গ্রহাদির সঞ্চার এক্ষণে কিছু সময় পরে ধরা হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় যে স্ফুট

দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ২°—৪৯'-৫০" বাদ দিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই প্রকৃত স্ফুট। রাশিকে ৩০শ অংশে বিভক্ত করিলে, সূর্য্য ১ মাসে ঐ ৩০° (এবং মোটামুটি দৈনিক ১°) চলিয়া থাকেন—অতএব সূর্য্যের সংক্রমণ মোটামুটি পৌনে তিন দিন পাছে হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকানুসারে সূর্য্যের এ বৎসর মেষ-সংক্রমণ ১৩ই এপ্রিল রাত্রি পূর্ব্বার্দ্ধে (প্রায় পৌনে নয়টায়) হইয়াছে—তাই ১৪ই এপ্রিল (১৯২৩) হইতে বর্ত্তমান বর্ষারম্ভ। কিন্তু ৪২১ শকীয় আদিবিন্দু অনুসারে সূর্য্যের মেষ সংক্রমণ ১০ই এপ্রিল (১৯২৩) রাত্রি প্রায় ১১॥০ সাড়ে এগার ঘটিকায় সময়ে ঘটিয়াছে। ইহা কিরূপে স্থির করা যায়? ৩০° হইতে ২°-৪৯'-৫০" বাদ দিলে ২৭°-১০'-১০" হয়। অতএব বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে কোনও গ্রহ * মীন রাশির ঐ ২৭°-১০'-১০" বিন্দুতে পৌছিলেই বুঝিতে হইবে ইহা প্রকৃত আদিবিন্দুতে পৌছিতেছে। বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায়—১০ই এপ্রিল (২৭শে চৈত্র) সূর্য্যের সান্ধ্যস্ফুট ২৬°-৫৬'-২১"; * ২৭°-১০'-১০" হইতে ইহার বিয়োগ ফল ০°।১৩'।৪৯"; সূর্য্য (মোটামুটি হিসাবে) রোজ ২৪ ঘণ্টায় ১° চলেন, সুতরাং ১৩'।৪৯" চলিতে মোটামুটি ৫॥০ঘণ্টা আন্দাজ লাগিবে—তাই অনুমানিক ১১॥০টা রাত্রিতে সংক্রমণ হইল।

চন্দ্র এক এক রাশি সোয়া দুই দিনে (মোটামুটি হিসাবে) অতিক্রম করেন; ২৷০ দিনে অর্থাৎ ৫৪ ঘণ্টায় ৩০° গতি হইলে, ২°-৪৯'-৫০" অতিক্রম করিতে ঈষদধিক ৫ ঘণ্টা লাগিবে—তাই চন্দ্রের রাশি-সংক্রমণ ৫ ঘণ্টা আন্দাজ পূর্ব্বেই হইয়া যায়। রাশি সংক্রমণের ন্যায় নক্ষত্র সংক্রমণেও সেই পরিমাণ প্রভেদ (অর্থাৎ আনুমানিক ৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে) ঘটে।

মেষের আদিবিন্দু বেঠিক হওয়ায় অন্যান্য রাশির আদিবিন্দুও সেই পরিমাণে বেঠিক হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ প্রতি রাশিরই আদিবিন্দু ২° ৪৯'-৫০" আগাইয়া গিয়াছে। আবার মেষের আদিবিন্দুর অর্থ অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিবিন্দু; তাই অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিবিন্দুও ২°-৪৯'-৫০" আগাইয়া গিয়াছে। এবং অন্যান্য নক্ষত্রের আদিবিন্দুও ঠিক ২°-৪৯'-৫০" সরিয়া গিয়াছে। অতএব চন্দ্রের নক্ষত্র সংক্রমণও ঐ ৫ ঘণ্টা আন্দাজ পরে হইতেছে। অর্থাৎ প্রকৃত নক্ষত্র সংক্রমণও (৪২১ শকের আদিবিন্দুর মতে) আনুমানিক ৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে ধরিতে হইবে। এবং সূর্য্যের নক্ষত্র সংক্রমণও (রাশি সংক্রমণের ন্যায়) প্রায় পৌনে তিন দিন পূর্ব্বেই হইয়া যায়। যেমন অম্বুবাচী; সূর্য্য আর্দ্রার প্রথম পাদে অবস্থান কালটাই অম্বুবাচী; এবার অম্বুবাচীর আরম্ভ ৬ই আষাঢ় রাত্রি ১২টার সময়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহার পৌনে তিন দিন পূর্ব্বে—৪ঠা আষাঢ় প্রাতঃকালেই অম্বুবাচী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মলমাস সূর্য্য সংক্রমণের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস মলমাস হইয়াছে;

* এই প্রবন্ধের সমস্ত অঙ্কই বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা হইতে গৃহীত। অন্যান্য পঞ্জিকাগুলি আগাগোড়া ভ্রান্তিপূর্ণ; কাজেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদের কোন অঙ্ক ব্যবহার করা হয় নাই। * স্ফুটাকে রাশির অঙ্কটি অনাবশ্যক বলিয়া অনেক সময়ে ধরা হয় নাই।

কিন্তু প্রকৃত আদিবিন্দু অনুসারে সূর্য্য সংক্রমণ ধরিলে শ্রাবণ মাস মলমাস হইবে। * জামাই ষষ্ঠী, দশহরা, রথযাত্রা ইত্যাদি এবার বৃথা একমাস পিছাইয়া গিয়াছে।

অপর গ্রহগণের মধ্যে বৃহস্পতি, শনি এবং রাহুকেতু সংক্রমণ (শুভাশুভ ফল সহ) প্রচলিত পঞ্জিকা গুলিতে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে বৃহস্পতির ও শনির সংক্রমণ বহুদিন পূর্ব্বে এবং রাহু কেতুর সংক্রমণ (গতির বৈপরীত্য নিবন্ধন) বহুদিন পরে (প্রকৃত আদিবিন্দু অনুসারে) হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে কোনও গ্রহের ২৭--১০'--১০" রাশ্যবস্থান দেখিলেই ঐ গ্রহের (প্রকৃত: আদিবিন্দু অনুসারে) রাশ্যন্তর প্রবেশারম্ভ সূচিত হইবে। চলিত বর্ষে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতির সঞ্চার প্রদর্শিত হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত আদিবিন্দু মতে বৃহস্পতির বৃশ্চিক রাশিতে সঞ্চার ২২শে আশ্বিন হইবে—কেননা ঐদিন সাঙ্কাস্ফুট ৬।২৭।১২'।২"—সন্ধ্যার ৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে ২৭'-১০-১০" হইবে। ২১শে ও ২২শে আশ্বিনের সান্ধ্য স্ফুট তুলনা ক্রমে দেখা যাইবে যে বৃহস্পতির দৈনিক গতি তখন ১২'—অতএব ২' অতিক্রম করিতে ৪ ঘণ্টা লাগিবার কথা।

শনির সঞ্চার বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্তে ২৮শে আশ্বিন লেখা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শনি ৪ঠা আশ্বিন তুলা রাশিতে প্রবেশ করিবেন—কেননা ঐ দিন শনির সাঙ্কাস্ফুট ২৭।১০।২—সন্ধ্যার অল্প পরেই ২৭'-১০'-১০" হইয়া যাইবে—যেহেতু তৎপর দিনের সাঙ্কাস্ফুট (২৭।১৬'।৫৬' হওয়াতে শনির তৎকালীন দৈনিক গতি ৬'-৪৬',—ঘণ্টায় ১৭"।

রাহু কেতুর এ বৎসর সঞ্চার দেখা যায় না। গতবর্ষে (১৩২৯ বঙ্গাব্দে), ১৮ই মাঘ তাহা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় দেখান হইয়াছে। রাহু কেতুর গতি বিপরীত তাই উহাদের সঞ্চার পরে হইবার কথা ; ফলতঃ প্রকৃত আদিবিন্দুমতে উহাদের সংক্রমণ ১৩ই চৈত্র হইয়াছে—ঐ দিন সাঙ্কাস্ফুট ৪।২৭।৯।৪১ (তৎপূর্ব্বদিনের সান্ধ্য স্ফুট ৪।২৭।১২।৫২ হওয়াতে দৈনিক গতি ৩ ১১'; অতএব ২৭।১০।১০ ১৩ই চৈত্র সন্ধ্যার কিঞ্চিদূন ৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে হইয়াছিল।

যখন গ্রহগণের রাশি বিশেষে অবস্থান কালের উপর কালাশুদ্ধি নির্ভর করে (যেমন

---

* ১৩ই জুলাই (২৮শে আষাঢ়) তারিখে বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় সূর্য্যের সাঙ্কাস্ফুট ২৭।২৩।৫০ ; অতএব রবির কর্কট রাশিতে সংক্রমণ তাহার পূর্ব্বে (অর্থাৎ যখন সূর্য্যের স্ফুট ২৭।১০।১০) হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যা পরদিন (১৪ই জুলাই) প্রাতে আরম্ভ—ঐ দিন প্রকৃত আদিবিন্দু মতে ১লা শ্রাবণ। ১২ই আগষ্ট প্রচলিত পঞ্জিকায় ২৭শে শ্রাবণ সূর্য্যের সান্ধ্য স্ফুট ২৬।৪।৪৪ - তখনও ২৭।১০।১০ হইতে অনেক বাকী। অতএব সূর্য্য সংক্রমণ (প্রকৃত আদিবিন্দু মতেও) হয় নাই। কিন্তু অমাবস্যা ঐ দিন অপরাহ্নেই শেষ হইয়া গিয়াছে। [তিথিমানের সঙ্গে আদিবিন্দুর গোলযোগের কোনও সম্পর্ক নাই—তদ্বিষয়ে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে]।

গুরু-রাহুর এক রাশিতে স্থিতি) তখন কালাশুদ্ধিও প্রকৃত আদিবিন্দু অনুসারে যে অগ্র পশ্চাৎ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। দৃষ্টান্ত অনাবশ্যক।

রাশিচক্রের দৈনিক আবর্তনে যখন যে রাশি ক্ষিতিজ রেখায় সংস্পৃষ্ট (অর্থাৎ সংলগ্ন) থাকে, তখনই ঐ রাশি "লগ্ন" সংজ্ঞিত হয়। আদিবিন্দুর পার্থক্যে লগ্নেরও উদয়াস্তের পার্থক্য হয়। মোটামুটি এই বলিলেই চলিবে যে, যে লগ্নের যত মান তাহার ঈষন্ন্যূন $\frac{১}{১৩}$ * সময় অর্থাৎ কম বেশী $\frac{১}{৩}$ দণ্ড পূর্ব্বেই প্রকৃত আদিবিন্দু অনুসারে ঐ লগ্নের উদয় তথা অস্ত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে ধরুন মেষলগ্ন—ইহার ভুক্তিকাল দ ৪।১০।১৫ অর্থাৎ মোটামুটি ১০০ মিনিট—অতএব ইহার উদয় ও অস্ত ১০ মিনিট্‌ পূর্ব্বে ধরিতে হইবে।

আদিবিন্দুর গোলযোগে তিথিমানের কোনও ন্যূনাধিকতা হয় না, তিথি চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটের বিয়োগ ফলের উপর নির্ভর করে। আদিবিন্দু ঘটিত গোলযোগে যেটুকু ব্যতিক্রম আছে, তাহা চন্দ্র ও সূর্য্যে সমানরূপেই আছে; উহাদের পরস্পর বিয়োগে ঐ গোলযোগটুকু কাটিয়া যায়। করণ তিথির অর্দ্ধভাগ হওয়াতে উহাতেও কোনও ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু "যোগ" (বিষ্কুম্ভাদি) চন্দ্র ও সূর্য্যের স্ফুটের যোগফলের উপর গণিত হওয়াতে ঐ ব্যতিক্রমটুকু দ্বিগুণিত হইয়া যায়। * তাই 'যোগ' প্রকৃত আদিবিন্দু মতে বিচার করিলে, পঞ্জিকায় প্রদর্শিত সময়ের কিঞ্চিদধিক ১০ ঘণ্টা পূর্ব্বেই ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্থলে ধরুন অদ্য বিষ্কুম্ভযোগ সন্ধ্যা ৬টার সময় পর্য্যন্ত পঞ্জিকায় আছে, প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রাতঃকাল ৭॥০ কি ৭৸০ ঘটিকায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

যদিও অধ্যাপক তারকেশ্বর বাবুর সিদ্ধান্তে আমি আস্থাবান্ তথাপি এতৎ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিবার জন্য বিগত বর্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। একজন মাননীয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—অপর বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনগুপ্ত—ঢাকা কলেজের (অবসর প্রাপ্ত) গণিতাধ্যাপক। তাঁহাদের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ক্রমশঃ—

---

* সূক্ষ্ম পরিমাণ $\frac{২^\circ-১৯'-৫০''}{৩০}$ ১$\cdot\frac{১০১৯}{১০৮০০}$ ১$\cdot$০৯৪৩৫ .....

* ব্যতিক্রমটুকুকে যদি "ক" ধরা যায় তবে (চন্দ্র + ক) − (সূর্য্য + ক) = চন্দ্র − সূর্য্য; কিন্তু (চন্দ্র + ক) + (সূর্য্য + ক) = চন্দ্র + সূর্য্য + ২ক

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতির

আভাষণ।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ॥
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ব্রাহ্মণসভার এই সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে,—আনন্দ ময় মধুরগীতি গাহিব, না শোকের করুণউচ্ছ্বাস অশ্রুপূর্ণ তপ্তশ্বাসে প্রকাশ করিব, স্থির করিতে পারিতেছিনা ;—আনন্দেও অশ্রু, শোকেও অশ্রু ; আনন্দেও বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠস্বর, শোকেও বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠস্বর ;—রুদ্ধ বাক্য সহসা নিঃসৃত হয় না, তাই ভাবিতেছি, ইহা আনন্দের লক্ষণ না শোকের লক্ষণ।

মন মূঢ়, 'বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখ মিতি বা'—একপ্রকার বিবেক শক্তি শূন্য ; হে ব্রহ্মণ্যদেব হে সর্ব্বশক্তিময় ভগবন্, হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর—যেন বুঝিতে সক্ষম হই আমি আনন্দিত বা শোকার্ত্ত।

এই যে কলিপীঠ কলিকাতা ইহার মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণসভার ন্যায় বিংশ শতাব্দীয় সভ্যতা বিরুদ্ধ সভা যে সপ্তদশ বৎসর জীবিত আছে—ইহা সভার আত্মীয়গণের পক্ষে যেমন আনন্দ-দায়ক, তেমনই এই সপ্তদশবর্ষব্যাপী জীবনেও কার্য্যাংশে—উদ্দেশ্য বিষয়ে—অশক্তি তেমনই শোকাবহ। সাধারণ দুঃখাবহ নহে—শোকাবহ,—স্বজন বিয়োগে যেমন শোক হয়—এই অশক্তি সেইরূপ শোকাবহ। অশক্তি—শক্তির বিধ্বংস—শক্তির বিয়োগ। ব্রাহ্মণের যে শক্তি পূর্ব্বে ছিল, যে ত্যাগ ও সংযম শক্তি বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মণগণের স্বভাব সিদ্ধ ছিল—তাহার বিয়োগ হইয়াছে, সেই চিরদিনের ঘনিষ্ট আত্মীয় ত্যাগ সংযম শক্তির বিয়োগে কোন্ ব্রাহ্মণ শোকার্ত্ত না হইয়া থাকিতে পারেন ?

ব্রাহ্মণসভায় সাঙ্গ বেদবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণসভায় ব্রাহ্মণসমাজ পত্রিকা ব্রাহ্মণসভায় নূতন ভবন সমাবেশ, ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্য প্রচারের ব্যবস্থা—এই সব কার্য্য দেখিয়া যেমন আনন্দ অনুভব হয়, তেমনই সকল কার্য্যেই সজীবতার অভাব শনৈঃ শনৈঃ জীবনী শক্তির অপচয় শোকের ছায়া আনিয়া দেয় না কি ?—

অথচ আনন্দ ও শোক পরস্পর-বিরোধী, আনন্দের অনুভবে শোক থাকিতে পারে না, শোকের আবির্ভাবে আনন্দ আসিতে পারে না।

এ সঙ্কট—এই ভাব সঙ্কটে ব্রহ্মণ্যদেবই একমাত্র উপায়। তাঁহার কৃপাই একমাত্র সম্বল। ঐ যে সে কৃপা কটাক্ষ, ঐ যে সেই সদয় উপদেশ,—তবে ভাবনা কি ভয় কি?—শুনুন, সদস্যগণ প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করুন,—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

কিসের আনন্দ, কিসের শোক?

"সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপ মবাপ্স্যসি॥"

ব্রহ্মণ্যদেব বলিতেছেন—আনন্দ শোকের—সুখ দুঃখের কথা ভাবিও না—লাভ অলাভের হিসাব করিও না, ইহা বাণিজ্যক্ষেত্র নহে—ধর্ম্মক্ষেত্র,—যাহা কর্ত্তব্য তাহাতে সুখই হউক আর দুঃখই হউক, লাভই হউক আর ক্ষতিই হউক,—এই যুদ্ধে—এই ত্যাগ ও ভোগের সংগ্রামে, এই জ্ঞান এ ধনের সঙ্ঘর্ষে, এই সংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধে আত্মসমর্পণ কর। ত্যাগ ব্রাহ্মণ্য, ভোগ ম্লেচ্ছত্ব; জ্ঞান ব্রাহ্মণ্য, ধন ম্লেচ্ছত্ব; সংযম ব্রাহ্মণ্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ম্লেচ্ছত্ব; হে ব্রাহ্মণসন্তান, এ যুদ্ধে তোমার কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয় তাহা কি বলিয়া দিতে হইবে? তুমি দেশ-কাল পাত্র ভাবিতেছ, তুমি ফলাফল বিচার করিতেছ তুমি লাভ ক্ষতি গণনা করিতেছ,—কিন্তু তাহা করিতে নাই—ঐ শুন "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" যাহা তোমার কর্ত্তব্য, জন্মগত অধিকার তোমার যে কার্য্য আছে- তাহা করিবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে করিবে ফলাফলের বিচার করিও না। ফলদাতা ব্রহ্মণ্যদেব, তোমার কর্ম্ম যদি যথাবিধি হয় ত তিনি তাহা অবশ্যই সফল করিবেন, এ আশার বাণী শুনাইবার প্রয়োজন নাই, তোমার ও শুনিবার আবশ্যক নাই, তুমি কর্ম্ম কর—কর্ত্তব্য সম্পাদন কর, ইহাতেই তোমার অধিকার। এই যে মধ্যম পুরুষ প্রয়োগে এত কথা বলিলাম, ব্রাহ্মণসভার উত্তমপুরুষ (ফলতঃ অন্যপুরুষ) তাহা করেন কিনা একবার ভাবিয়া দেখা ভাল; কারণ এ সময়ে ব্রাহ্মণসভার প্রতি অনেকেই বিরক্ত, অনেকেই ব্রাহ্মণসভায় বিদ্বেষ্টা, অনেক ব্রাহ্মণও বলিয়া থাকেন—ব্রাহ্মণসভা দলাদলির আড্ডা,—বিলাত ফের্ত্তার অব্যবহার্য্যতা, কায়স্থের উপবীতধারণ ও বিধবাবিবাহ লইয়া দলাদলিই ব্রাহ্মণসভা করেন। সুতরাং উত্তমপুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এ বিষয়ে কিছু বলা ভাল।

ব্রাহ্মণ সভায় অনেক সদস্য আছেন, ব্যক্তিগত ভাবে কাহার উদ্দেশ্য কিরূপ তাহা বলা যায় না, আমি উত্তম পুরুষের উদ্দেশ্য বলিতে পারি এবং সভার সমবেত উদ্দেশ্য বলিতে পারি, তাহাই বলিতেছি, উত্তম পুরুষ নিষ্কাম সাধনা করিতে এখনও সমর্থ হন নাই; তবে সেই উচ্চ লক্ষ্য তিনি বিস্মৃত হন নাই, ইহা বলিতে পারি এবং তিনি আশা করেন—ব্রাহ্মণ সভার সদস্য মধ্যে এমন ২ ৪ জন এখনও আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন যাঁহারা প্রকৃতই নিষ্কাম সাধক। এই সাধকবর্গের তপঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণসভার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হইবে। আজ যে অসহযোগের কথা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সেই অসহযোগ—ধর্ম্মের মূলে আছে, ব্রাহ্মণসভার ভিত্তি তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু সে অসহযোগ রাজনীতিভ্রমিশ্রার অন্ধকারে আচ্ছন্ন

নহে, ধর্ম্ম-পৌর্ণমাসীর শরদিন্দুকিরণে সমুজ্জ্বল। প্রবৃত্তিমার্গ যত বর্দ্ধিত করিবে, ততই সহযোগ আসিবে—ততই উচ্ছৃঙ্খলতার আধিপত্য বিস্তৃত হইবে ; নিবৃত্তিমার্গ যত সঞ্চারিত করিবে অসহযোগের অভ্যুদয় ততই হইবে। আমাদের অভ্যুদয়ের—উন্নতির চরম—মোক্ষ। যোগ সেই মোক্ষের পন্থা “যোগী যুঞ্জীত সতত মাত্মানং রহসি স্থিতঃ। একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীর পরিগ্রহঃ।”

রহসি স্থিত, একাকী, এবং অপরিগ্রহ হইয়া যোগ করিতে হয়, এ যোগ যে কত বড় অসহযোগ—তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। রহসি অর্থাৎ নির্জ্জনে থাকাতেই সঙ্গ জনিত সহযোগ বর্জ্জন, একাকী হওয়াতে সহায় সহযোগ বর্জ্জন, এবং অপরিগ্রহ হওয়াতে পরস্পরাসহযোগ বর্জ্জন, সেই যোগের আরম্ভেই আবশ্যক। কিন্তু এ অসহযোগে দ্বেষ নাই, ঈর্ষ্যা নাই, অসূয়া নাই ; এ অসহযোগে ক্রোধ নাই, অবজ্ঞা নাই, ঘৃণা নাই ; কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি ইহার মূলে নিহিত, শাস্ত্র বিশ্বাস সেই কর্ত্তব্য বুদ্ধির প্রবর্ত্তক। অসহযোগ-সম্ভূত যোগ সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাপুরুষগণ জগতের কল্যাণ সম্পাদনে জগতের শ্রেয়ঃ বিতরণে সমর্থ। এত বড় যে অসহযোগ তাহা কিন্তু সহসা হয় না হইতে পারে না ; অসহযোগের অভ্যাস আবশ্যক। এই যে সাধারণ বর্ণাশ্রমীর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার এই যে নব্য মহলের ‘ছুঁৎমার্গ’ নামে উপহসিত সদাচার তাহাতেই অসহযোগ সাধনার আরম্ভ ; সে সাধনা সুদৃঢ়—এবং সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিশ্বাস প্রসূত, অথচ তাহার অভ্যাস—অনায়াসে ও সাত্ত্বিকতার সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য—এ অসহযোগেও দ্বেষ ঈর্ষ্যা অসূয়া নাই, ক্রোধ অবজ্ঞা ঘৃণা নাই। কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও শাস্ত্রবিশ্বাস হইতেই এই অসহযোগ-সাধনার সৃষ্টি পুষ্টি ও পরিণতি।

রাজা সগর পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়গণকে পরাজিত করিয়া সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিলেন—ইহাদিগকে বধ করিয়া কাজ নাই, উহাদিগকে সহযোগবর্জ্জিত করুন—সগর রাজা তাহাই করিলেন, বধ করিতে হইল না, অথচ এই অহিংসঅসহযোগে তাহারা একেবারেই মৃতবৎ হইল। অবশ্য এ অসহযোগ রাজনীতিসম্পর্কযুক্ত ; সুতরাং ইহাতে রোষ ও দ্বেষ, অবজ্ঞা ও ঘৃণা, বিজড়িত থাকিলেও ধর্ম্মের বন্ধনী ছিল,—কেননা রক্তপাত ছিল না। তথাপি এ অসহযোগ উচ্চশ্রেণীর নহে, দ্বিতীয় শ্রেণীর ; এ অসহযোগ দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলে প্রয়োগ করিতে পারে, প্রবলের প্রতি দুর্ব্বলে করিতে পারে না। দুর্ব্বলকে প্রবল হইতে হইলে বিনা রক্তপাতে আত্মবল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে শাস্ত্রবিশ্বাসী হইতে হয় সেই বিশ্বাস মত কার্য্য করিতে হয়, পরমুখাপেক্ষী, পরোপদেশ বিমূঢ় হইলে চলিবে না।

যাহারা শাস্ত্রদ্বেষী, ধর্ম্মদ্বেষী, শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতিকূল আচরণ যাহাদের স্বাভাবিক ; তাহাদের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও ম্লেচ্ছগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এখন যাহারা অসহযোগ সাধন করিতে উদ্যত,—তাহারা সর্ব্বাংশেই ভ্রান্ত ; রোষ, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, শাস্ত্রে অবিশ্বাস, মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস, আলস্য ও সংশয়ে তাহারা সমাচ্ছন্ন ; পবিত্র অসহযোগ তাহাদের সাধনায় আসিতে পারে না। যে শাস্ত্র, সরল পবিত্র পথে প্রেম ও করুণার পথে

মানুষকে লইয়া যান,—সে শাস্ত্রে যাহারা মনে বা কার্য্যে অবিশ্বাসী—তাহারা প্রকৃতই দুর্ভাগা; তাহারা কখনই স্বীয় দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া প্রবল হইতে পারে না। শাস্ত্র, বিধি ও নিষেধ দ্বারা দুর্ব্বলকে প্রবল করেন, কাপুরুষকে পৌরুষ সম্পন্ন করেন, অস্থিরকে স্থির করেন।

পরাধীন কখনই প্রবল হইতে পারে না, কিন্তু যে প্রকৃত শাস্ত্র বিশ্বাসী সে বিজাতীয় বিধর্ম্মী রাজার শাসনে থাকিলেও প্রকৃত পরাধীন হয় না—পরাধীনতা জনিত যে দোষ তাহা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সে কপটপ্রিয় মিথ্যাবাদী ভীরু কাপুরুষ হয় না; সে নিজের ঐহিক ভোগ বা পদমর্য্যাদার আশায় উৎফুল্ল হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করে না, করিতে পারে না; কেন না তাহাতে শাস্ত্রের আদেশ লঙ্ঘিত হয়। অথচ তাহারা বাহ্য সংগ্রামে নরহত্যায় লিপ্ত হয় না, বা গুপ্ত হত্যায় কলঙ্কিত হয় না; তাহারা ধর্ম্মে—সত্যে অহিংসায় ব্রহ্মচর্য্যে ও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাহারা নির্ধন হইতে পারে, কিন্তু দরিদ্র হয় না, দৈন্য তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। শাস্ত্র বিশ্বাসী শাস্ত্রের আদেশে অপবিত্র বস্তু ব্যবহারে পরাঙ্মুখ, সুতরাং বিদেশাগত বহু পণ্যই তাহারা বর্জ্জন করিতে বাধ্য; ইহাতে দ্বেষ নাই, রোষ নাই ঘৃণা নাই অবজ্ঞা নাই ইহা কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রণোদিত ব্যবহার মাত্র, ইহা শাস্ত্র বিশ্বাসের নিদর্শন মাত্র;—ব্রাহ্মণসভা দেশে এই শাস্ত্রবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। ব্রাহ্মণসভা সাম্প্রদায়িক নহে, সমগ্র মানবের সভা, কেন না সমগ্র জগতের কল্যাণ এই সভার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত। শিক্ষার দোষে কালের প্রভাবে এখন ব্রাহ্মণ্য নিষ্প্রভ, ম্লেচ্ছভাব দীপ্যমান। ব্রাহ্মণসভার শীর্ণ-কণ্ঠস্বর অনেকের কর্ণেই প্রবেশ করে না, যদি বা কাহারও কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে—তাহারা প্রায়ই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ভরে অথবা বিদ্বেষ ও ক্রোধভরে তাহার মন্ত্র গ্রহণে একান্ত বিমুখ।

আজ রাজনীতি আশ্রয়ে অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষায় কত সভা সমিতি হইতেছে, কত শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ সেই অভ্যুদয়ে যত্নবান—কত যুবক ও শিশু কত বৃদ্ধ ও বনিতা এই তরঙ্গে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু হায়— তাহার ফল কি? ফলাফল বিচার না করিয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিবলে যে কর্ম্মে অবতীর্ণ হওয়া শাস্ত্রের আদেশ—একি সেই কর্ম্ম? ইহা কি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম? রোষ, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, সত্য গোপন, মিথ্যা খ্যাপন, যে আধুনিক রাজনীতির নিত্য সহচর,—সেই রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পন্থা অবলম্বনে গীতার উপদেশ প্রমাণ স্বরূপে মৌখিক ভাবে প্রদর্শন—আত্ম বঞ্চনা মাত্র; অতএব ইহাতে যদি যাইতেই হয়—ফলাফলবিচার কর্ত্তব্য। অতীত বিচারে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতেছে, রাজনীতি দুর্ব্বলের অনুকূল নহে, ৩৯।৪০ বৎসর এ দেশে রাজনীতির চর্চ্চা বর্দ্ধিতাকারে হইতেছে—এ সময়ের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির রাজকীয় পদমর্য্যাদাবৃদ্ধি ভিন্ন কোন উপকারই হয় নাই, বরং অধিকতর অপকার হইয়াছে। দুর্ম্মূল্যতাবৃদ্ধি, করবৃদ্ধি ও রাজকীয় পীড়ন নীতি-প্রসারে দেশবাসী সাধারণ ভাবে অপকৃত; যাঁহারা রাজকীয় উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ঐহিক উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শে দেশের বহু ব্যক্তি শাস্ত্র বিশ্বাস বিচ্যুত, সুতরাং সমাজ-দ্রোহী,—মতান্তর মনান্তর ও অনৈক্যের মূল তাঁহারাই।

এই দোষ সমাজে সংক্রামক রোগের ন্যায় ক্রমেই ছড়াইয়া পড়িতেছে, সুতরাং রাজকীয় উচ্চ পদমর্য্যাদায় ব্যক্তিগত যে ঐহিক উপকার তাহার তুলনায় সমাজগত ও জাতিগত ঐহিক পারত্রিক অপকার অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। কেহ শ্রবণ করুক বা না করুক, ব্রাহ্মণসভা অভ্যুদিত হউক বা না হউক কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মণসভা এ সকল তথ্য মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিবেনই। ইহার জন্যই ব্রাহ্মণসভার স্থিতি।

ব্রাহ্মণসভার বল দিনে দিনে কমিতেছে, ব্রাহ্মণসভার শক্তি হ্রাস হইতেছে, এমন আলোচনায় অনেকে আনন্দিত ও অনেকে দুঃখিত আমি বলি তাহা হউক, যাঁহারা আনন্দিত হইতে চাহেন, তাঁহারা আনন্দভোগ করুন, যাঁহারা দুঃখিত হইতেছেন তাঁহারা দুঃখ ভোগ করুন, তাহা ব্রাহ্মণসভার ভাব্য নহে; ব্রাহ্মণসভা কর্ত্তব্যকর্ম্ম করুন, শাস্ত্র বিশ্বাস যাহাতে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্য যত্ন করুন, এই কর্ম্মই বৈধ, ধর্ম্মের মূলই শাস্ত্র বিশ্বাস, এ শাস্ত্রবিশ্বাস রক্ষায় শাস্ত্র বিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় যে প্রযত্ন তাহাই ব্রাহ্মণসভার একমাত্র কর্ত্তব্য। অসহযোগ বল, স্বারাজ্য বল সমস্তই এই শাস্ত্র-বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু এ অসহযোগ রাজনীতি কলঙ্কিত নহে, এ স্বারাজ্য অহঙ্কার মলদিগ্ধ নহে; ইহা ধার্ম্মিকের নিজস্ব। ব্রাহ্মণসভা শাস্ত্র-বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা দ্বারা সেই ধর্ম্ম রক্ষায় ব্রতী। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুজাতি সমধর্ম্মীকে অস্পৃশ্য বলেন, অথচ বিজাতি বিধর্ম্মীর স্পর্শে বাধ্য হইয়াছেন এই বৈষম্য হিন্দুজাতির অনৈক্যের মূল; ব্রাহ্মণসভা সেই বৈষম্যেরই পোষক, এ সব কথায় প্রকৃতই হাস্যোদ্রেক হয়। কেন না 'হিন্দু'র সজাতি বিজাতি নাই, উপাসনা বা দেব আরাধনার বৈলক্ষণ্যে সজাতি বিজাতি ভাব হিন্দুর হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না, সাধারণ গাছ-পাথর হইতে চিন্মাত্র আত্মা পর্য্যন্ত যিনি যাঁহার উপাসক হউন না তিনি হিন্দু সমাজের অন্তর্গত ইহা সকলেই জানেন, হিন্দুনাম আধুনিকই হউক আর পুরাতনই হউক—সে বিচার এখন করিব না কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে হিন্দুনাম নাই, ধর্ম্ম বলিলেই 'হিন্দু' ধর্ম্ম বুঝা যাইত। বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত যত ধর্ম্ম আছে—তন্মধ্যে 'হিন্দু' ধর্ম্ম ব্যতীত অপর সকল ধর্ম্মাপেক্ষা প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম—তাঁহাদের পরিভাষায় 'সদ্ধর্ম্ম' নামে প্রসিদ্ধ; ধর্ম্মের বিশেষণ 'সত্' বিশেষণ শূন্য কেবল 'ধর্ম্ম' নাম হিন্দু ধর্ম্মেরই বোধক, সুতরাং ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—পৃথিবীর যত ধর্ম্ম সভ্য মানব-সমাজে আছে সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত; পৌত্তলিক, অপৌত্তলিক, একেশ্বরবাদী, নিরীশ্বর বাদী, নানেশ্বর বাদী যে যেখানে আছেন সকলের ধর্ম্মই 'হিন্দু' ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত, আমাদের ধর্ম্ম যে 'হিন্দু' শব্দ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে—তাহার মূল নিতান্ত আধুনিক; এক ধর্ম্ম শব্দেই আমাদের ধর্ম্মের বোধক ইহাতে কোন বিশেষণ যোগ করিতে হয় না। অতএব ধর্ম্মভেদে সজাতি বিজাতি ভেদ 'হিন্দু' নামধারীর মধ্যে হইতে পারে না। হিন্দু ধার্ম্মিক, কোন ধার্ম্মিকের ধর্ম্মেই হিন্দুর দ্বেষ থাকিতে পারে না, সকলের প্রতি প্রেম স্থাপনই হিন্দুর ধর্ম্ম। মানব মাত্রেই—মানবের সজাতি, জীবমাত্রই জীবের সজাতি হিন্দুর এই ধারণা, তাই হিন্দুর তর্পণে "আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" হিন্দুর এই মহালয়া শ্রাদ্ধে, "মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষাঃ" বৃক্ষ পশু প্রভৃতি

উদ্দেশেও পিণ্ডদান বিহিত। এ উদারতা এই সর্ব্বভূতপ্রেম হিন্দুরই থাকিতে পারে। "সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ" হইবার উপদেশ হিন্দুরই শাস্ত্রসমূহে উদ্ঘোষিত, ইহাই হিন্দুর পরমধর্ম্ম। অধিকার ভেদে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ভেদ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বথা ধর্ম্ম ভেদ হয় না। তাই বর্ত্তমানে বিধর্ম্মী শব্দ ভাষায় ব্যবহৃত হইলেও সে বিধর্ম্মী হিন্দুর দৃষ্টিতে খ্রীষ্টান বা মুসলমান বা অন্য কোন মানব ধর্ম্মাবলম্বী কেহই নহেন। তবে তাঁহারা মানবত্বে সজাতি হইলেও অন্য-ভাবে সজাতি না হইতে পারেন,—কিন্তু এ সজাতিত্ব অন্য প্রকার - হিন্দু মাত্রেই হিন্দুর সজাতি নহে—ব্রাহ্মণের সজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সজাতি ক্ষত্রিয় ইত্যাদি রূপেই এই সজাতিত্ব ব্যবস্থা। এই কারণে এমন অনেক হিন্দু আছেন—তাঁহারা হিন্দু হইলেও খ্রীষ্টান মুসলমানের সমান। অতএব, ব্রাহ্মণের আচরণ খ্রীষ্টান মুসলমান ও অনেক হিন্দুর সঙ্গে সমান রূপেই বিধি নিষেধের সীমাবদ্ধ। যে ব্রাহ্মণ মুসলমান ও খ্রীষ্টানের সহিত আচরণে সেই বিধি-নিষিধের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্রে অবিশ্বাসী—অথবা শাস্ত্রশাসন লঙ্ঘনকারী। তাদৃশ ব্যক্তির যাদৃচ্ছিক আচরণে—শাস্ত্র বা সমাজ ধর্ম্মতঃ দায়ী নহেন—তবে তিনিও যদি কোন কোন স্থলে বিধিনিষেধের সীমা বন্ধনে বদ্ধ হইতে চাহেন—তাঁহাকে বলপূর্ব্বক বাধা প্রদানও সমাজের কর্ত্তব্য নহে। এক ব্যক্তি হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় লাম্পট্য হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই, কিন্তু সে পরকীয় ধনরত্ন অপহরণ করে না, চৌর্য্য কার্য্যে সে প্রবৃত্ত নহে, ইহা তাহার অপরাধ বা অসমদর্শিতা নহে—অথবা একস্থানে লাম্পট্য করিয়াছে কিন্তু অন্যত্র সে তাহা করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া তাহাকে অপরাধী করা যায় না—একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে বলিয়া সকল দুষ্কর্ম্মই যে তাহাকে করিতে হইবে এমন ব্যবস্থা সভা বা সঙ্ঘ অথবা সম্প্রদায় কোন ক্রমেই করিতে পারেন না। তবে যে বৈষম্যদোষ হয় তাহা দূর করিবার জন্য সকলেরই শাস্ত্রে বিশ্বাসী হওয়া উচিত। রোষ, দ্বেষ, ঘৃণা অবজ্ঞা ত্যাগ করিয়া সকলেরই শাস্ত্রের স্নিগ্ধ আশ্রয়ে অবস্থান করা কর্ত্তব্য। এইরূপ হইলে বৈষম্যের আশঙ্কাই হইতে পারে না। জন্ম পূর্ব্ব কর্ম্মফলে হইয়া থাকে, তাহাতে বর্ত্তমানে অহঙ্কারের কিছুই নাই, বরং অহঙ্কার করিলে এ জন্মের ব্রাহ্মণকে পরজন্মে হীন জন্মগ্রহণ করিতে হয়, যদি স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বিধানে উচ্চ জাতির অহঙ্কারের উত্তাপ না থাকে যদি অবজ্ঞার তীক্ষ্ণ ছুরিকা উদ্যত না হয়, যদি ঘৃণার হলাহল বিকীর্ণ না হয় পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণাদির প্রতি যদি অন্যজাতির রোষদ্বেষ না হয়, তাহা হইলে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে বৈষম্যের দোষ সৃষ্টি হইতেই পারে না; শাস্ত্রের আদেশে সমস্ত মানবজাতিই যে পরস্পর স্নেহ ভক্তিবন্ধনে আবদ্ধ—সমস্ত সমাজ যদি সেইরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারেন তাহা হইলে পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পুত্রের যেমন আগ্রহ হইয়া থাকে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা প্রতিপালনে সকলেরই সেইরূপ আগ্রহ না হইবে কেন? পূর্ব্বে তাহাই হইত; শাস্ত্রবিশ্বাস আপাত দর্শনে বৈষম্যের প্রদর্শক হইলেও সে অকপট বৈষম্য সাধকদিগের মনকে রাগদ্বেষ পরিহারে অভ্যস্ত করিয়া সাম্যের পথেই লইয়া যায়, কপট সাম্যের আবরণে বৈষম্যের আবর্ত্তে মানব সমাজকে নিপাতিত করে না। শাস্ত্রবিশ্বাসের অভাবে ঘোর বৈষম্য পূর্ণ মিথ্যা সাম্যদর্শনের

প্রভাবে এখন বিদ্বেষের সৃষ্টি। এদিকে এখন সেরূপ ত্যাগশীল মৈত্র ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ নাই, দম্ভ অভিমানে ব্রাহ্মণের চিত্ত কলুষিত, অস্পৃশ্য জাতিও শাস্ত্রবিশ্বাসের অভাবে বিদ্বেষ বিষে জর্জ্জরিত, কাজেই বিরোধের সৃষ্টি। এপথে এ বিরোধ পরিহার কেবল স্পর্শ দোষ পরিহারে হইতে পারে না। আহার ব্যবহার আদান প্রদান সকল বিষয়েই সমতা করিতে হয়। যে তরঙ্গ উঠিয়াছে তাহার নিবৃত্তি এরূপে হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও ভবিষ্যতে ইউরোপের ন্যায় বিপ্লবাশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ, সে চেষ্টা—প্রকৃতি বিরুদ্ধ সেই সমগ্র সমতার জন্য বৃথা চেষ্টা—করিতে হইলেও শাস্ত্রকে সমূলে বিসর্জ্জন দিতে হয়। যে জাতি শাস্ত্র শাসন বর্জ্জিত, তাহাদের কোনরূপেই অভ্যুদয় হয় না, বরং অচিরে একেবারেই তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মণসভা এই ধ্বংস নিবারণের জন্য বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহাতে যিনি ব্রাহ্মণসভাকে সদোষ মনে করেন করুন, তাহাতে আমরা হাস্যই করিব। বৎসরে ১বার করিয়া যদি এইরূপ আলোচনা ও ব্রাহ্মণসভার অধিবেশনে হয় যদি ২।৪ জন ব্রাহ্মণ বা কোন হিন্দুসন্তান এই আলোচনার ফলে শাস্ত্র বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহাতে লাভও ত আছে; লাভের কথা অভ্যাস দোষেই আসিয়া পড়ে। ফলতঃ লাভ অলাভ যাহা হউক, শ্রদ্ধা যখন ধর্ম্মসাধন, শাস্ত্রবিশ্বাস যখন সেই শ্রদ্ধারই নামান্তর, তখন কর্ত্তব্য বোধে সমাজের শ্রদ্ধা সম্পাদনে যত্ন ব্রাহ্মণ সভার অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণসভার যতই বলক্ষয় হউক যতই শক্তি হ্রাস হউক, সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া যতদিন একজন ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ সভায় থাকিবেন ততদিন এই যত্ন তিনি সর্ব্বথা করিবেন, ইহাতেই পবিত্র অসহযোগ সাধনা,—ইহাতেই সাত্ত্বিকস্বারাজ্য ইহাই ব্রাহ্মণের লক্ষ্য—ব্রাহ্মণসভা সেই স্থির লক্ষ্যে দৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন ফলাফল ব্রহ্মণ্যদেবের শ্রীচরণে সমর্পিত। অসহযোগ ও স্বরাজ কথাটা দেশে বড় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার অর্থ ও সাধন প্রায়ই অজ্ঞাত, তাই ঐ দুই কথা লইয়া একটু আলোচনা করিলাম। আবশ্যক হয় ত পরে ব্যাখ্যা করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ-সভা সাম্প্রদায়িক সভা নহে, ব্রহ্মণ্যদেবের যাঁহারা শরণাপন্ন তাঁহাদের মিলন গোষ্ঠী সেই মিলন স্থানে ব্রহ্মণ্যদেবের আবির্ভাব ধ্যান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি—

"ব্রহ্মবক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরুদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতাঃ শূদ্রা তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ॥"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

পশুপতি প্রেস, ৩০ নং হরীতকী বাগান, কলিকাতা।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা—

১৩২৯ সালের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যের তালিকা

কর্ম্মকর্ত্তৃবর্গ।

সভাপতি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ

" ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

স্যার " নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

" ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী

সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী

" বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

" অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার

" শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

" শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য

হিসাব পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী

সহকারী হিসাব পরীক্ষক

শ্রীযুক্ত মাধব দাস সাংখ্যতীর্থ

শাস্ত্র ব্যবসায়ী সভা

১। মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ

বিষয়ী সভ্যগণ

১। শ্রীযুক্ত রাজা রমণী কান্ত রায়
২। " চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
৩। " সতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। " বিজয় কুমার চট্টোপাধ্যায়
৫। " গিরিজা প্রসন্ন সান্যাল
৬। " রামরঞ্জন রায়
৭। " শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৮। " নীলরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। " রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়
১০। " ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ
১১। " শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
১২। " তারক নাথ মুখোপাধ্যায়
১৩। " রায় পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর
১৪। " আশুতোষ শাস্ত্রী

২। মহামহোপাধ্যায
শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
৩। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী
৪। „ কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ
৫। „ আশুতোষ শিরোরত্ন
৬। „ কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার
৭। „ বিষ্ণুচরণ তর্করত্ন
৮। „ বসন্তকুমার তর্কনিধি
৯। „ যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ
১০। „ চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ,

পারিষদ সভ্যের নাম।

১। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন
২। মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ
৩। „ „ বৈকুণ্ঠ নাথ তর্কভূষণ
৪। „ „ গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ
৫। „ „ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী
৬। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর স্মৃতিতীর্থ
৭। „ কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার
৮। „ কালীকিশোর স্মৃতিরত্ন
৯। „ বিজযকিশোর স্মৃতিতীর্থ
১০। „ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ
১১। মহামহোপাধ্যায শ্রীযুক্ত রামচরণ ন্যাযাচার্য্য
১২। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ স্মৃতিতীর্থ
১৩। „ চণ্ডীদাস ন্যাযতর্কতীর্থ
১৪। „ গুরুনাথ তর্কবাগীশ
১৫। „ শশিভূষণ শিরোমণি
১৬। „ সত্যনারাযণ স্মৃতিসাংখ্যবেদান্ততীর্থ
১৭। „ কালাকান্ত স্মৃতিরত্ন
১৮। „ অন্নদানাথ বেদান্তশাস্ত্রী
১৯। „ অবিনাশচন্দ্র ন্যাযরত্ন
২০। „ সুরেন্দ্র নাথ তর্করত্ন
২১। „ জগদীশচন্দ্র স্মৃতিকণ্ঠ
২২। „ রমণীমোহন বিদ্যারত্ন

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সপ্তদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী।

শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। কার্য্যকরী সমিতি সভার অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবকে সর্ব্বাগ্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সমবেত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর সাদর অভ্যর্থনা করিতেছেন।

অতীব আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে, সভার মাননীয় সভাপতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অনেকটা সুস্থ হইয়া ৺কাশীধাম হইতে পুনরায় দেশে ফিরিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় তিনি সুস্থ থাকিয়া সভার কার্য্য পরিচালন করিতে থাকুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। আশাকরি, তাঁহার সুবিজ্ঞ পরিচালনায় সভা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

বর্ত্তমান সময়ের রাজনৈতিক আন্দোলনে পরম্পরায় সভার পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইতেছে। সভার কতিপয় সদস্যের উদ্যোগে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণেতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মীগণের কার্য্যক্ষেত্ররূপে "ভারত হিন্দুসভা" নামে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। আশা আছে, শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় এবং ব্রাহ্মণসভা ও হিন্দুসভার চেষ্টায় আমরা সমস্ত ব্যাঘাত দূর করিয়া অভীস্টপথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব।

আলোচ্য বর্ষে কতিপয় স্বার্থান্ধ এবং সমাজ বিপ্লবকারীগণের চেষ্টায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। ডাক্তার গৌরের অসবর্ণ বিবাহ বিল এবং শ্রীযুক্ত শেষাগিরি আয়ারের হিন্দুউত্তরাধিকারী আইনের পরিবর্ত্তন কল্পে উপস্থাপিত বিল এবং ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত ব্যক্তিগণকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে তুল্যাধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিল আইনে পরিণত হইয়াছে। সভার পক্ষ হইতে উক্ত বিল সকলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হওয়া সত্ত্বেও কৌশলে এবং বে-আইনিরূপে উক্ত আইনগুলি পাশ হইয়াছে। ভবিষ্যতে সমাজে যাহাতে আর এরূপ বিপ্লবের সূচনা না হইতে পারে তজ্জন্য সভা বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের কৃপায় সভার চেষ্টা ফলবতী হইবে আশা করা যায়।

সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং শাস্ত্রাধ্যাপকদিগের নামে বৃত্তিস্থাপনের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা নানাকারণে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আশাকরা যায়, দেশের আর্থিক অবস্থা একটু উন্নত হইলেই অভিলষিত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইবে।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরক্ষা ও তৎপ্রতি অনুরাগ বৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত বালকদিগকে

প্রাচীন রীতিতে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বর্তমান বর্ষে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং উহা পরিচালনের জন্য মাননীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত শরৎকমল ন্যায়তীর্থ, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম এ, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার এম, এ বি, এল, শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ এবং শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার তর্কনিধি মহাশয় দিগকে লইয়া একটী শিক্ষাসমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত শিক্ষাসমিতি বর্ণাশ্রম পাঠশালার নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শিক্ষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার তর্কনিধি মহাশয় বর্ণাশ্রম পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্যে যশোহর জিলায় বর্ত্তমানে কার্য্য করিতেছেন এবং কয়েকটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। আশা করা যায় তাঁহার চেষ্টায় আরও নূতন পাঠশালা শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। যশোহর নলডাঙ্গা পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সভা হইতে বার্ষিক ৬০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

বড়ই দুঃখের বিষয় নানাবিধ গোলযোগে বিগত ও আলোচ্য বর্ষে কোথায়ও ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইতে পারে নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে উহার অধিবেশন হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

আলোচ্য বর্ষে সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির ১২টি অধিবেশন হইয়াছে; তন্মধ্যে ৭ জন সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় একটী অধিবেশন স্থগিত হয়।

সভার সদস্যসংখ্যা বর্ত্তমান বর্ষে ৬২৫ জন; তন্মধ্যে ২২ জন পারিষদ সদস্য এবং অবশিষ্ট সাধারণ সদস্য।

সামবেদ বিদ্যালয়

বর্ত্তমান বর্ষে ব্রাহ্মণ সভার প্রতিষ্ঠিত সামবেদ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা—৬০টি।

পূর্ব্ববৎ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহোদয় এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় সামবেদের ও শ্রীযুক্ত বালমুকুন্দ শাস্ত্রী মহাশয় যজুর্ব্বেদের অধ্যাপনা করিতেছেন। এই বিদ্যালয়ের মাসিক বৃত্তি ১১০৲ টাকা।

চতুষ্পাঠী—

ইহারই অন্তর্গত ধর্ম্মশাস্ত্র বিভাগে আলোচ্য বর্ষে অনেকগুলি ব্যবস্থার প্রার্থনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদুত্তরে লিখিত ব্যবস্থাই প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৌখিক ব্যবস্থাও দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বিনা দক্ষিণায় এই ব্যবস্থা

প্রদত্ত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত আশুতোষ স্মৃতিরত্ন এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ পঞ্চতীর্থ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিবিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত।
শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চতুষ্পাঠীর দর্শন বিভাগে পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ তর্কতীর্থ মহাশয় ন্যায়ের অধ্যাপনা করিতেছেন ও তাঁহার অধীনে ১৫জন ছাত্র আছে এবং এই বিভাগে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ সিদ্ধান্তশাস্ত্রী মহাশয় সাংখ্য ও বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেছেন। তাঁহার অধীনে ১৭ জন ছাত্র আছে। চতুষ্পাঠীতে কাব্য ও ব্যাকরণের অধ্যাপনাও হইয়া থাকে।

জ্যোতিষ বিভাগ পূর্ব্ববৎ শ্রীযুক্ত রামাচরণ জ্যোতিঃশাস্ত্রী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে।

পরীক্ষা বিভাগ

গঙ্গাটিকুরির জমিদার শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ববৎ এই বিভাগের ব্যয়ভার গ্রহন করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গদেশের যে সমস্ত জেলায় সংস্কৃতের অনুশীলন আছে, তাহার প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। আলোচ্য বর্ষে নানা বিষয়ে ১৭৯ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছে। তন্মধ্যে ৪ জন উপাধি পরীক্ষায় এবং ৫১ জন পূর্ব্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ১৭ জন বৃত্তি পাইয়াছে। ৩০ জন পরীক্ষক এবং ১২ জন অধ্যাপক বৃত্তি পাইয়াছেন।

প্রচার বিভাগ

আলোচ্য বর্ষে প্রচার বিভাগের কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত শরৎ কমল ন্যায়তীর্থ মহাশয় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম এবং সমাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আগামী বর্ষে যাহাতে এই বিভাগের কার্য্য আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং শ্রীযুক্ত শরৎ কমল ন্যায়তীর্থ, মহাশয়গণ এই বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শাখা সভা।

বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা কর্ত্তৃক স্থাপিত শাখা সভার সংখ্যা ৮৭ টি।

পত্রিকা বিভাগ—

আলোচ্য বর্ষে নানাবিধ গোলযোগে "ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকা রীতিমত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে সেরূপ কোন গোলযোগ না ঘটে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, সভার অধিকাংশ সভ্যগণের মতানুসারে আগামী বর্ষ হইতে সভার উদ্দেশ্য প্রচারের সহায়তা কল্পে এক খানা সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কার্য্য পরিচালনার জন্য শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম, এ, বি, এল. শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত চিরসুহৃদ্ লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়গণকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটি কার্য্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, শীঘ্রই প্রস্তাবিত সপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির কোন কার্য্য হয় নাই।

বিবিধ—

আলোচ্য বর্ষে—"বৃহস্পতি অরিগৃহস্থ হইলে অকাল হয় কি না" এ বিষয়ে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকে ব্রাহ্মণসভার অভিমত জানিতে চাহেন। এইজন্য ব্রাহ্মণসভা পারিষদ সভা আহ্বান করেন এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ও শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয়গণের মধ্যস্থতায় এই বিষয়ের আলোচনা হয়। অনেকে এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, তন্নিবন্ধন কেবল মাত্র উপনয়নেই অকাল হইবে এবং তাৎকালিক মিত্রতা হইলে উপনয়নও হইতে পারিবে। ভট্টপল্লীর পণ্ডিতবর্গের মতে বৃহস্পতি অরিগৃহস্থ হইলে অকাল দোষ হয় না। যিনি যে সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তন করেন তিনি তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

আলোচ্য বর্ষে—ভুঁইমালী ও পাটনীগণ নাপিত পাইতে পারে কি না এই বিষয়ে ব্রাহ্মণসভার অভিমত প্রার্থনার আবেদন করে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা এই বিষয়ের বিচারার্থ পারিষদ্ পণ্ডিত মহাশয়গণকে আহ্বান করেন। বঙ্গের বিভিন্ন জেলার নৈয়ায়িক ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় সমবেত হইয়া আলোচনান্তে অভিমত প্রকাশ করেন যে, নাপিতগণ ভুঁইমালী ও পাটনীগণকে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে পারে।

আয়ব্যয়

আলোচ্য বর্ষের আয়ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা—

জমা খরচের বিবরণ

১লা বৈশাখ হইতে ৩০এ চৈত্র, ১৩২৯ সন।

জমা

সাধারণ বিভাগ

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কিশোর ——— —২৪৩০৲
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রদত্ত
১০০০০৲ টাকার সুদ শতকরা
বার্ষিক—৫৲ হারে একবৎসরের
প্রাপ্য—৫০০৲ টাকা মধ্যে—
২৪৩০৲

বৃত্তি খাতে (সদস্য)— ৭৯৬৸৶০
পত্রিকা বিভাগ খাতে—— ২০৮।০
পত্রিকার মূল্য— ২০০।০
বিজ্ঞাপন— ৮৲
২০৮।০
বার্ষিক সভা খাতে— ৫০৲
ব্যাঙ্ক হইতে উত্তোলন— ৩০০৲

দেনা খাতে ১০৩৬৸৶১০
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক হইতে
Overdraw — ১৫০৲
আমানত জমা সাংখ্যতীর্থ
মহাশয়—— ৮৮৬৶১০
১০৩৬৸৶১০
ঋণ আদায় ৩০০৲
বর্ণাশ্রম ট্রাষ্টের
(হাওলাত উদয়)
সুদ আদায় খাতে—— ৪৩৸০
(হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কে আমানতী—
টাকার সুদ)
বিবিধ—(সাহায্য) খাতে— ৯৯৲
৫২৬৪।/১০
গত বর্ষের তহবিল— ২১৯৫৸/০
নগদ—— ১৪৯৫৸/
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কে স্থির আমানত
৫০০৲
বর্ণাশ্রম ট্রাষ্ট ২০০৲

৭৪৬০৶১০

খরচ

সাধারণ বিভাগ——১ ৯২৸০
দেবার্চ্চনা খাতে—— ২৩৸ ৫
বার্ষিক সভা খাতে—১১১৸১০
বিবিধ খাতে——— ৪০৶ ৫
ডাক (সাধারণ) খাতে ১৭।৶০
কর্ম্মচারীগণের বৃত্তি
খাতে——৩০৬৸৶১০
পাথেয় খাতে— ২৮।/১০
বেদ বিদ্যালয়ের সাহায্য
খাতে— ১২১৲
বাড়ীভাড়া খাতে— ৬৩০।১০
মহাসম্মিলনী খাতে—
১৩৸/১০
১০৯২৸০

পত্রিকা বিভাগ খাতে— ১৪৭৫।৶০
কর্ম্মচারীগণের
বৃত্তি— ৪৯২৶১০
মুদ্রাযন্ত্রের ব্যয়—
৪৪৭৲
ডাক খরচ—
১২৩৫
অন্যান্য খরচ—
৪১১৸৶৫

১৪৭৫৶০

পরীক্ষা বিভাগ খাতে— ২৯০৶১০
পরীক্ষার আনুষ্ঠানিক
ব্যয়———১৩৩।/১০
ঐ বৃত্তি—১৫৬৸৶০
২৯০৶১০
৩০৫৮/১০

জমা		খরচ		
ইঃ		ইঃ		৩০৫৮৶১০
	৭৪৬০৶১০	ধর্মচতুষ্পাঠী বিভাগ খাতে—		১০১১৸০
		অধ্যাপক বৃত্তি—৭৮৭৲		
		ছাত্রবৃত্তি— ২২৪৸০		
		১০১১৸০		
		প্রচার বিভাগ খাতে		২৫৫।৶১৫
		মুদ্রিত খরচ— ২১১।৶১৫		
		অন্যান্য খরচ—৪৪৲		
		আমানত খাতে		৮০০৲
		হিন্দুস্থান ব্যাঙ্কে—		
		স্থির আমানত ৩০০৲		
		এই ব্যাঙ্কেই আমানত ৫০০৲		
		হাঃ বর্ণাশ্রম ট্রাষ্ট		২০০৲
		ঋণ পরিশোধ খাতে—		৯৩৭৷৶১০
		আমানত শোধ—		
		শরচ্চন্দ্র সাংখ্যতীর্থ ৮৮৬৷৶১০		
		হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক হইতে		
		১৩২৮ সালের Overdraft পরিশোধ——৫১৲		
		দাতব্য খাতে		১০।০
		অন্যান্য খাতে		৬৮৶৫
		গৌরের বিয়ের		
		প্রতিবাদ খরচ—৬৮৶৫		
				৬৩৪১॥৶০
		নগদ তহবিল		১১১৮॥১০
		মঃ সাত হাজার চারি শত ষাট টাকা দুই আনা দশ গণ্ডা মাত্র		৭৪৬০৶১০

শ্রীচিরসুহৃদ্ লাহিড়ী
হিসাব পরীক্ষক

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক
শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সহঃ সম্পাদক

শ্রীদুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশচন্দ্র লাহিড়ী হিসাব রক্ষক।

সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়।

১৩২৯ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত।

জমা		খরচ	
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—	১২০০৲	অধ্যাপক ৪ জনের বৃত্তি—	১২৬০৲
বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা—	১২১৲	বাজে খরচ—	২৲
গত বর্ষের তহবিল—	৩৪৶০		১২৬২৲
	১৩৫৫৶০	তহবিল—	৯৩৶০
			১৩৫৫৶০

নববর্ষ।

(লেখক—শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ।)

শ্রীশ্রী৺ব্রহ্মপাদেবের অহৈতুকী করুণায় "ব্রাহ্মণসমাজ" দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। গ্রাহক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী সজ্জনগণকে যথাযোগ্য সম্মান ও শুভাশীঃ জ্ঞাপন করিয়া এবং ব্রহ্মপাদেবের চরণে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ পুনরায় কর্মপথে অগ্রসর হইলেন। ব্রহ্মপাদেবের করুণাই একমাত্র ভরসার স্থল—ব্রাহ্মণ-সমাজের আর কিছু নাই।

সত্যই আর কিছু নাই। ব্রাহ্মণসমাজের বাহ্য অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভগবৎ করুণাকণা না পাইলে এতদিন ইঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। আকারের অসৌষ্ঠব অভ্যন্তরের মুদ্রাকর প্রমাদ এবং প্রকাশের অনিয়ম সত্যই বৈধকর্ম্মহীন অনিয়মী কোন কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ সন্তানের মত অনেকের অপ্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছেন।

যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন—কেন পত্রিকায় সর্ব্বাঙ্গীন সৌষ্ঠব সাধন করা হয় না—এ নিরুত্তর পূর্ব্বপক্ষ। সত্যই আমাদের বলিবার কিছু নাই। লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে—এই বর্ষে যথাসাধ্য যত্ন করা যাইবে; যাহাতে ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়। কার্য্যতঃ কতদূর হইবে, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত।

তবে দুঃখ এই, যে উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজের আবির্ভাব, সে উদ্দেশ্যসাধন এখনও বিশেষ কিছু হয় নাই। শিক্ষাবিভ্রাটে আজ দেশের যে দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, সেই শিক্ষা বিভ্রাটের প্রতীকার করাও ব্রাহ্মণ-সমাজের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষার দোষে আপাতরমণীয় বিলাস বাসনায় আজ হিন্দুসন্তান বিভ্রান্ত হইতেছেন, আপনার সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিতেছেন, দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, সমাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি, মমত্ববোধ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন। শুধু তাহাই নহে,—এই শিক্ষার প্রণালী দ্বারা যে বিষাক্ত ভাব-প্রবাহ বাঙ্গালায় প্রবেশ করিতেছে তাহাতে হয়ত কালে বাঙ্গলার প্রাচীন সংস্কার ক্ষেত্র গুলি ধুইয়া মুছিয়া যাইবে। বর্ত্তমান একটী প্রবাহ বেশ তরঙ্গ তুলিয়াছে। সেটী হইতেছে আর্য্যসমাজের প্রবাহ।

পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে 'আর্য্যসমাজী' প্রচারকগণ হিন্দুসমাজের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানাস্থানে বক্তৃতা ও রাজনৈতিক কৌশলে আপনাদের প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টা করিতেছে। সরলমতি পল্লীবাসী হিন্দুগণ সেই সকল প্রচারকের কুহকে ভুলিয়া কতই না পাপানুষ্ঠানে রত হইতেছে। শুদ্ধি-আন্দোলন ব্যাপারে আর্য্যসমাজ হিন্দুসমাজের কল্যাণকামী ইহা অনেকের ধারণা হইয়াছে। কিন্তু যে প্রকৃত পক্ষে হিন্দুসমাজের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করে সে আবার হিন্দুসমাজের ধ্বংসের জন্য কেন অগ্রসর হইবে—ইহাও একবার বিচার করা উচিত। হিন্দুসমাজ ত' হিন্দুসমাজই আছে—তাহাকে আর্য্যসমাজী করিলে ত' হিন্দুর সংখ্যা বাড়িবে না, সুতরাং প্রকৃত কল্যাণকাঙ্ক্ষা ইহারা করেন না। ইহাদের উদ্দেশ্য—নবীন

ভাব স্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর মানবমণ্ডলীকে একাকার করিয়া ফেলে, এবং সেই একাকার হইলেই জগতের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে, ইহাও তাহাদের বিশ্বাস। তাহাদের ধারণা আনুষ্ঠানিক-হিন্দু, সমাজের শত্রু এবং যথেচ্ছাচারী সুবিধাপন্থী সমাজ-দ্রোহিগণ জগতের কল্যাণকর্ত্তা। কেন না আনুষ্ঠানিক-হিন্দু, জাতিভেদ মানেন, মূর্ত্তিপূজা করেন, বিধবা বিবাহের প্রতিবাদী এবং অন্যান্য অনাচারের প্রতিকূল, এই সমস্ত গুণ থাকিলে মানব 'মিলন' বা ঐক্যের পথে যাইতে পারে না। আর আহারে অনিয়ম, বিবাহে অসংযম, সদাচারে ঘৃণা থাকিলে মানব যে অবস্থায় পড়ুক না কেন—তাহার সকলের সহিতই মিলন ঘটিয়া থাকে। আর মিলন হইলেই জগতের কল্যাণসাধিত হইবে—ইহা একরূপ সিদ্ধান্তিত সত্য। সুতরাং এই মিলনের পথই যে একমাত্র উদ্ধারের পথ, ইহাই আর্য্যসমাজিগণের অন্তর্গত ভাব।

প্রবৃত্তির পথে মানুষ চিরদিন ছুটিয়াছে। প্রবৃত্তির শত শত দ্বার আছে। সমস্ত দ্বার দিয়াই মানব ছুটিতে চায়। হিন্দুর পক্ষে সেই শত দ্বারের অধিকাংশ দ্বারই রুদ্ধ। 'আর্য্যসমাজী' সেই দ্বার খুলিয়া দিতেছেন—সাধারণ মানবও ত' তাহাই চায়, কাজেই কোথায়ও কোথায়ও আর্য্যসমাজীগণ হয় ত' সহানুভূতি লাভ করিতেও পারে। কিন্তু যদি আমাদের বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে—যদি আমাদের জাতীয়তা রক্ষা করিবার কামনা থাকে, যদি ভারতের প্রকৃত কল্যাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে - হিন্দুসন্তান, সাবধান, নূতন পথে পা দিও না। সর্ব্বনাশের করালগ্রাসে তোমাদিগকে পড়িতে হইবে। একে পাশ্চাত্য শিক্ষ-রাক্ষসী মায়াময় রূপধারণ করিয়া আমাদের তিলে তিলে ক্ষয় করিতেছে, তাহার উপর এই দেশীয় বিভীষণগণকে দূরতঃ পরিহার না করিলে আর রক্ষা নাই। হিন্দুসন্তান, আজ একটা কথা শুধু স্মরণ করাইয়া দিব—তোমরা কোন্ জাতি একবার স্মরণ করিয়া দেখিও। পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে তোমাদের স্থান কোথায় তাহাও বিচার করিও। জুলু বা নিগ্রোজাতির মত অসভ্যতার অন্ধকার ভেদ করিয়া নবীন আলোকে নবীন প্রাণ লইয়া নবীন জাতিরূপে পরিণত হইতে তোমরা বাসনা রাখ কি? তোমরা কি তাহাদের মত অতীতগৌরববিহীন আধুনিক জাতি? আজ যে বিপ্লব দেখাইয়া আর্য্যসমাজ তোমাদের নবীন পথে লইয়া যাইতে চায় সেই আর্য্যসমাজের জীবনকাল কত দিনের? একটা শিশু অর্ব্বাচীনের কথায় তোমার মত প্রবীন সমাজের যেন কোনরূপ বুদ্ধি বিকার না হয়। আজ যে বিপ্লব দেখাইয়া আর্য্যসমাজ তোমাদের তাহার বিজয়—ধ্বজ দণ্ডের নিম্নে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেছে—সেই ধ্বজ-দণ্ড কোথায় ছিল—যখন ভারতে শকবিপ্লব, বৌদ্ধবিপ্লব, মুসলমান বিপ্লবের উদয় হইয়াছিল? একবার ভাবিয়া দেখ, সেই বৌদ্ধবিপ্লবের কথা—তখন কে আমাদের রক্ষা করিয়াছিল? যিনি তখনও রক্ষা করিয়াছিলেন—আধুনিক এই বিপ্লবেও তিনি রক্ষা করিবেন। সে বিপ্লবের কাছে এ বিপ্লব অতি তুচ্ছ—ইহা ত' বলাই বাহুল্য। আর একটা কথা—যে দেশের অনুকরণে আজ

আর্য্যসমাজ একাকারের গুণগান করিতেছেন—সে দেশে কি সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্য ঘটিয়াছে? যাহাদের আহারে বিহারে মিলন আছে তাহাদের মধ্যে কি দ্বন্দ্ব নাই? যদি দ্বন্দ্ব নাই তবে ইংরাজ জার্ম্মাণের মহাসমর ঘটিল কেন? আয়রল´ও ইংলণ্ডে মনোমালিন্য কেন? রুষে বলসেভিক বাদ উঠে কেন?

এই নব বর্ষের প্রারম্ভে পাঠকবর্গকে জানাইয়া দিতেছি—আর্য্যসমাজ সম্বন্ধে অনেক গূঢ় তত্ত্ব, তাহাদের বিচার প্রণালী এবং তাহার খণ্ডন সমস্তই ক্রমশঃ ক্রমশঃ 'ব্রাহ্মণ সমাজে' প্রকাশিত হইবে। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কেমন করিয়া আমাদের জীবনের রক্ষক, আমাদের দেশের রক্ষক, আমাদের স্বাধীনতার–রক্ষক, তাহাও নানা প্রবন্ধে আমরা প্রকাশ করিব। শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেব করুণা করুন, যেন আমাদের আশা সফল হয়।

একাদশ বর্ষের বর্ণানুক্রমে বিষয়-সূচী।

(সন ১৩২৯ আশ্বিন হইতে ১৩৩০ ভাদ্র পর্য্যন্ত)

REGISTERED NO C—675

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়।

(মাসিক পত্র)

(প্রবন্ধ লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

দ্বাদশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা।

পৌষ।

সন ১৩৩০ সাল।

সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার তর্কনিধি

কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বাহাদুর

শ্রীযুক্ত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ এম,এ,

কুমার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর।

বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা। প্রতিখণ্ড ।০ চারি আনা।

সূচীপত্র।

REGISTERED NO. C—675.

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়"।

দ্বাদশ বর্ষ। { ১৮৪৫ শক, ১৩৩০ সাল, পৌষ। } ৪র্থ সংখ্যা।

মহারাণা প্রতাপসিংহ।

(লেখক—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।)

গত মাসে মহারাণা উদয়সিংহের সংক্ষিপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া মহারাণা প্রতাপসিংহের কথা আরম্ভ করিয়াছি; দু'টি সংস্কৃত কবিতা মহারাণা উদয়সিংহের কথায় সমাপ্তি শান্তি, তাহাই যে মহারাণা-প্রতাপসিংহ কথার মঙ্গলাচরণ।

সমাপ্তি শান্তি পূর্ব্ব প্রবন্ধে পঠিত হইয়াছে, মঙ্গলাচরণ বলিয়া এ প্রবন্ধেও তাহা পুনঃ পঠিত হইতেছে।

স চোদয়োদ্ভবো ভাস্বান্ প্রতাপো বারুণীং জগৌ।
ভবত্যকবর ধ্বান্তে ন সন্ধ্যাক্তো নচাস্তগঃ। (১)

কৃত্বা করে খড়্গলতাং স্ববল্লভাং প্রতাপসিংহে সমুপাগতে প্রগে।
সা খণ্ডিতা মানবতী দ্বিষচ্চমূঃ সঙ্কোচয়ন্তী চ রণং পরাঙ্মুখী॥ (২)

অনুবাদ—যখন আকবর ধ্বান্ত (বাদশাহ আকবর দৃষ্টিশক্তি অপহারী—বাদশাহ আকবর পক্ষান্তরে অতীব দুঃখপ্রদ অন্ধকার) বর্ত্তমান—সেই সময়ে—সেই উদয়সম্ভূত মহারাণা

(১) এই শ্লোকটী পূর্ব্ববারে তৃতীয় চরণের প্রথম পদটি লিপিকর প্রমাদে অন্যরূপ হইয়াছে। ব্রাঃ সঃ।

উদয়সিংহের পুত্র, (পক্ষান্তরে উদয়াচল হইতে উদিত) ভাস্বান্ তেজস্বী, (পক্ষান্তরে সূর্য্য) প্রতাপ (প্রতাপসিংহ ও পক্ষান্তরে প্রবলপ্রতাপ সম্পন্ন) বারুণী (মদ্যসেবা পক্ষান্তরে পশ্চিমদিক্) ত্যাগ করিলেন। তিনি সন্ধ্যাক্ত (সন্ধিরাবা কলঙ্কিত, পক্ষান্তরে সন্ধ্যা আগমনে ম্লান) এবং অস্তগত (স্বাধীনতা বিচ্যুত পক্ষান্তরে অস্তাচলগত) হন নাই।

ভাবার্থঃ—বাদশাহ আকবর অন্ধকারের ন্যায় হিন্দুস্থানের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করিতে ছিলেন, সেই সময়ে উদয়-উদ্ভূত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী প্রতাপসিংহ মদ্যাদিসেবা বিলাস বর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মধ্য গগনস্থ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন সন্ধ্যায় ম্লানি বা অস্তের ছায়া তাহাতে স্পর্শ করে নাই—কেননা সন্ধির কলঙ্ক বা স্বাধীনতার অস্ত তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। (১)

অনুবাদ—প্রতাপসিংহ প্রভাত কালে স্ববল্লভা (নিজের প্রিয়বস্তু, পক্ষান্তরে নিজের প্রেয়সী) খড়্গলতাকে (তরবারি পক্ষান্তরে খড়্গলতা নাম্নী কামিনীকে) করে ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে, সেই মানবতী (মানসিংহ পরিচালিত পক্ষান্তরে, মানিনী) শত্রুবাহিনী খণ্ডিতা (ছিন্না, পক্ষান্তরে ঈর্ষ্যা কলুষিতা) শত্রুবাহিনীচরণং (চ—রণং পক্ষান্তরে চরণম্) রণ যুদ্ধকার্য্য পক্ষান্তরে চরণ সঙ্কুচিত করিয়া পরাঙ্মুখী হইল।

ভাবার্থঃ—সেই প্রতাপসিংহ নিজ প্রিয়া খড়্গলতাকে করে ধারণ করিয়া যখন প্রাতঃকালে উপস্থিত হইলেন, তখন মানসিংহ পরিচালিত শত্রুবাহিনী খণ্ডিতা ছিন্নবিচ্ছিন্না হইয়া রণকর্ম্ম সংক্ষিপ্ত করিল ও পরাঙ্মুখী হইল। (২)

এই দুটি শ্লোকেও ধ্বনিযুক্ত অতএব উত্তম কাব্য। প্রথমটীতে প্রতাপসিংহ যে হিন্দুসূর্য্য নামে অভিহিত হইতেন তাহার ব্যঞ্জনা আছে। বাদশাহ আকবর স্বীয় রাজনীতি চাতুরীতে যে হিন্দুস্থানের বিবেচনা শক্তি অপহরণ করিয়াছিলেন তাহার ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল প্রতাপসিংহ তাঁহার সেই দৃষ্টিবিলোপিনী মোহিনী-শক্তিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই সকল ভাব এই শ্লোকে নিহিত থাকাতে এই শ্লোকটী ধ্বনিযুক্ত। দ্বিতীয়টীতে প্রতাপ-সিংহ বীরপুরুষ, মানসিংহ পরিচালিত দিল্লীশ্বরের বাহিনী তাঁহার নিকটে অবলা রমণী। এই ব্যঞ্জনা আছে। 'খণ্ডিতা'র লক্ষণ অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—'জ্ঞাতেঽন্যাসঙ্গবিকৃতে খণ্ডিতের্ষ্যা কষায়িতা।' নায়ককে অন্যাসক্ত দেখিয়া ঈর্ষ্যা কলুষিতা নায়িকার নাম খণ্ডিতা। এই খণ্ডিতা শব্দ মানবতী শব্দ এবং চরণং শব্দ দ্বিবিধ অর্থেপ্রযুক্ত। চরণং এস্থলে শব্দ শ্লেষও আছে—চ রণং এবং চরণম্। এইরূপ অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে দ্বিতীয় শ্লোকবিভূষিত। এই শ্লোকে মহারাণা প্রতাপসিংহের তরবারিবলে মানসিংহ পরিচালিত দিল্লীশ্বর বাহিনীর পরাজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত। মহারাণা প্রতাপসিংহ পরিণামে বিজয়ী হইলেও প্রথমে যে দিল্লীশ্বরের নিকটে পরাজিত ও অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন তাহা ঐতিহাসিক সত্য। সে সময়ে মহারাণা প্রতাপও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দুর্গম দুর্গ তদধিক দুর্গম গিরিগুহা বা পার্ব্বত্যারণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। সাময়িক রাজধানী সেই সকল স্থানেই

তাঁহার হইয়াছিল। উদয়পুর প্রভৃতি জনাকীর্ণ স্থান অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই জন্যই পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, মহারাণা প্রতাপসিংহও পিতার নীতি অনুসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে প্রভেদ এই যে উদয়সিংহ উদয়পুর স্থাপন করিয়া চিতোর আক্রমণে নিরস্ত ছিলেন, ইনি উদয়পুর ত্যাগ করিয়া আক্রমণে নিরস্ত হ'ন নাই। পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে প্রতাপসিংহ যাহা করিয়াছিলেন উদয়সিংহের পক্ষে তাহা অনুষ্ঠিত হইলে, অধিকতর অনিষ্টের উৎপত্তি হইত। উদয়সিংহকে নূতন দুর্গম স্থানে আসিয়া রাজধানী নির্ম্মাণ প্রজাস্থাপন, দুর্গ নির্ম্মাণ সমস্তই করিতে হইয়াছিল। সে সমস্ত না করিয়া সুসজ্জিত প্রবল শত্রু দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আত্মনাশ ব্যতীত আর কিছু নহে। উদয়পুরস্থ উদয়সিংহকে আকবর আক্রমণ করেন নাই। উদয়পুর ত্যাগী অরণ্যস্থ প্রতাপকে কিন্তু আকবরবাহিনী আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং উদয়সিংহ দুর্গম ভূমির আশ্রয়ে যে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভবিষ্যৎ কুলের স্বাধীনতা রক্ষার্থ যে আয়োজন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু চিতোর উদ্ধারে সে যত্ন করিতে পারেন নাই, প্রতাপসিংহ সে শান্তিও প্রাপ্ত হ'ন নাই। উদয়সিংহ প্রতাপের অবস্থায় নিপতিত হইলে সন্ধি না করিয়া থাকিতে পারিতেন কিনা বিষম সন্দেহ হইলেও -তাঁহার সময়ে তিনি যে স্বাধীনতা পিপাসার বীজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রামসিংহের পুত্র ও প্রতাপসিংহের জনকের উপযুক্ত ইহা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ হয়। শাস্ত্রে আছে -পুত্রে যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্। প্রতাপসিংহে এবং পেশলা ও উদয়সমুদ্র মহারাণা উদয়সিংহের পুণ্যপরিচয়। বলোপাসক রাজপুতের নিকট তাঁহার বীরত্ব যশ উদ্ঘোষিত না হইলেও—উদয়পুর রাজ্য যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহার বিচক্ষণতা ও স্বাধীনতা প্রীতির যশ নিরপেক্ষ ভাবুকের রসনায় কীর্ত্তিত হইবেই।

আর তাঁহার পুণ্যলক্ষণ মহারাণা প্রতাপসিংহের যশের ত তুলনা নাই, কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় একবাক্যে সকলেই সেই বীরশ্রেষ্ঠের, সেই বীরসাধকের, সেই ত্যাগী মহাপুরুষের অনন্ত পবিত্র কীর্ত্তিগাথা গান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মহারাণা প্রতাপসিংহের দুইখানি তরবারি একটি বর্শা —লৌহনির্ম্মিত শিরস্ত্রাণ ও লৌহবর্ম্ম অদ্যাপি উদয়পুর রাজকীয় অস্ত্রাগারে সযত্নে রক্ষিত। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া ও ভার গ্রহণ করিয়া বুঝিয়াছি যে মহারাণা প্রতাপসিংহ কিরূপ বীরপুরুষ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। লৌহময় শিরস্ত্রাণটি অনুমান দশসের ভারযুক্ত। লৌহবর্ম্ম বোধহয় ১ মণের অধিক। এক একখানি তরবারির ওজন মনে হইতেছে ৫ সেরের ন্যূন হইবে না। মহারাণা প্রতাপ সব্যসাচী ছিলেন, তিনি দুই হস্তেই সমভাবে তরবারি চালনা করিতে পারিতেন। বাহুর মধ্যভাগে বল্লম স্থাপিত দুই হস্তে তরবারি লৌহময় শিরস্ত্রাণে মস্তক ও লৌহবর্ম্মে দেহ আবৃত করিয়া তিনি যুদ্ধ করিতেন।

মহারাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যু উদয়পুরে হয় নাই, চামুণ্ডা (?) গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। গ্রামের নাম ঠিক স্মরণ নাই। সেই গ্রাম উদয়পুর হইতে ১৮ ক্রোশ। ঐ গ্রামের নিকটবর্ত্তী

পার্ব্বত্য স্থানে মহারাণা ব্যাঘ্র শীকারে গিয়াছিলেন। একটি ব্যাঘ্র পর্ব্বতের এমন একটা নিভৃত স্থানে ছিল যে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র চালনা অসম্ভব। পর্ব্বতের গাত্রে তুরারোহ একপদী, সেই একপদীর উচ্চসীমায় ব্যাঘ্র রাজ উপবিষ্ট, তাঁহার পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন। ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠভাগের কিছু ঊর্দ্ধদেশে একটা বৃক্ষ বৃক্ষে রজ্জুর দোলা প্রস্তুত ও নিবদ্ধ হইল। মহারাণা প্রতাপসিংহ সেই দোলায় বিলম্বিত হইলেন তাঁহার বীর অনুচরগণ সুদৃঢ় দোলা-রজ্জু মহারাণার অনুমতিক্রমে তাঁহার বক্ষ ও উদরে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া আকর্ষণ করিয়া রহিল, তিনি অধোমুখ হইয়া ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে বর্শা প্রহার করিয়া নিহত করিলেন। তজ্জন্য উদরে যে রজ্জুবন্ধনের ব্যথা বোধ হইল, তাহাই ক্রমে ভীষণতর হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল। এইজন্য রাজকীয় শ্মশানে মহারাণা প্রতাপসিংহের ভস্ম সমাধি নাই। দ্বিতীয় প্রতাপসিংহের যে ভস্ম সমাধি আছে সাধারণ দর্শকগণ তাহাই মহারাণা প্রতাপসিংহের ভস্মসমাধি বলিয়া ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া থাকেন। মহারাণা প্রতাপসিংহের বিষয়ে ইহাই বিশেষ বিবরণ।

সম্পাদকীয়।

[১৮৪৪ শকাব্দের মাঘসংখ্যক 'ব্রাহ্মণসমাজ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ..বিদ্যাবিনোদ লিখিত "৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। কেহ তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ কিছু লিখিলে, তাঁহার উচিত যে সর্ব্বাদৌ "ব্রাহ্মণসমাজ" পত্রিকায় তাহা প্রেরণ করেন। * কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা এই ছদ্মনামা জনৈক কায়স্থ (?) তাহা করেন নাই—ইনি "ব্রাহ্মণসমাজ ও পদ্মনাথ" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত উপরি উক্ত প্রবন্ধের এক প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহাতে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন ইত্যাদি আছেই — এ ছাড়া তিনি কায়স্থ বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়াই তদীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, একথাও লেখা হইয়াছে। "কায়স্থ পত্রিকায়" লিখিত প্রবন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপরে সাধারণ ভাবে "কায়স্থ বিদ্বেষ" অযথাভাবে আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কামরূপ কায়স্থ সমাজের অগ্রণী স্বরূপ। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করেন—"এই প্রবন্ধটির তিনি নাম দিয়াছেন"

---

* প্রতিবাদ ব্রাহ্মণসমাজে পাঠাইলে যে উহা প্রকাশিত হইত—তাহার প্রমাণ গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যক পত্রিকায়ই আছে—তাহাতে শ্রীযুক্ত ভাগবত ভট্টাচার্য্য লিখিত প্রতিবাদ তেমন সারগর্ভ না হইলেও প্রকাশিত হইয়াছে।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর) "

প্রথমতঃ তিনি প্রবন্ধে স্বীয় নাম স্বাক্ষর না করিয়া "জনৈক কামরূপ বাসী কায়স্থ" এইরূপ পরিচয় মাত্র দিয়া ঐ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রবন্ধ পাঠান—কিন্তু সম্পাদক নিকট লিখিত পত্রে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দেন। সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রবন্ধটি ফেরত দিয়া লিখেন যে নাম না দিলে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইবে না। (অথচ যে প্রবন্ধের ইহা উত্তর সেই প্রবন্ধে প্রকৃত নাম নাই একটা ছদ্মনাম ছিল।) তৎপর শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় ইহা প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে প্রসন্ন নারায়ণ বাবুর বিশেষ পরিচিত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের শিরোমণি স্বরূপ প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এই প্রবন্ধের কথা শুনিয়া এবং ইহা ফেরত গিয়াছে জানিয়া এরূপ মত প্রকাশ করেন যে, ইহা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইলে তিনি ইহার প্রকাশার্থ অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে দ্বিতীয়বার নাম স্বাক্ষর-পূর্ব্বক প্রবন্ধ পাঠাইলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর নিকটই উহা প্রেরিত হয়। সম্প্রতি নগেন্দ্র বাবু জানাইয়া দিয়াছেন 'প্রতিবাদ প্রবন্ধটী (অর্থাৎ প্রসন্ননারায়ণ বাবুর প্রবন্ধ) আমার অনুরোধে পত্রিকা পরিচালনসমিতিতে দেওয়া হয়, কিন্তু নানাকারণে প্রবন্ধটি পত্রিকায় বাহির হইবে না একারণ ফেরত পাঠাইতেছি।*

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধ ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকায় প্রকাশার্থ আমাদের নিকট আসিয়াছে।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ লেখকের প্রবন্ধই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধটির সঙ্গে 'ব্রাহ্মণ সমাজ" পত্রিকার যথেষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণ সমাজে' প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষের প্রতিবাদের উত্তর—এবং ইহা প্রকাশ না করিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রবন্ধ লেখক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর কায়স্থ পত্রিকা সম্পাদক তথা পরিচালন সমিতি যে অবিচার করিয়াছেন আমরা ইহা প্রকাশ না করিলে সেই অবিচারের অংশভাজন হইব বলিয়াই মনে করি। তাই ইহা প্রকাশিত করা হইল।

কায়স্থ-সমাজপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ (অর্থাৎ বর্ত্তমান প্রবন্ধটি যাহার উত্তর এই সঙ্গে পুনর্মুদ্রিত করা অনাবশ্যক মনে করিলাম কেননা উত্তরের মধ্যেই, ঐ প্রবন্ধের কথাগুলি প্রায়শঃ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তথাপি যাহারা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে চান তাঁহারা কায়স্থ পত্রিকার একবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন ১৩২৯) দেখিতে পাবেন।

---

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু আমাকে জানাইয়াছেন যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সম্বন্ধে "যেরূপ উক্তি পত্রিকাসম্পাদক বা পত্রিকা পরিচালনসমিতির অজ্ঞাতসারে পত্রিকায় বাহির হইয়াছে তজ্জন্য সমিতি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন।" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষে যে উক্তি করা হইল, তাহা পত্রিকাসম্পাদকের অজ্ঞাতসারে কিরূপে হইল, আমরা বুঝিলাম না।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

বিগত মাঘ মাসের "ব্রাহ্মণ-সমাজ" পত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ; ফাল্গুন মাসের "কায়স্থপত্রিকায়" শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। *বর্ত্তমান প্রবন্ধ বর্ম্মামহাশয়ের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর।

কেবল "ব্রাহ্মণ সমাজে"র পত্র নহে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের লিখিত ৺রামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রবন্ধেরই খবর আমি রাখি ; বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বারংবার বলিয়াছেন, তিনি ৺পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ; এবং তাহার সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা সহকারেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ 'আসামে বিবেকানন্দ' 'সাহিত্যে' পাঠাইবার পূর্ব্বে তিনি ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে স্পষ্টই জানাইয়া ছিলেন তিনি স্বামীজির ভক্ত নহেন, তথাপি ৺সমাজপতি মহাশয় প্রবন্ধ পাঠাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়া ছিলেন "আমি বিবেকানন্দের পরম ভক্ত বটে, কিন্তু আর কাহারও অভক্ত হইবার অধিকার নাই, তাহা মনে করি না। ইহাও বোধ করি বিবেকানন্দেরই শিক্ষা। (সাহিত্য ফাল্গুন চৈত্র ১৩২৭ ৮৬০ পৃষ্ঠা ফুটনোট দেখুন)। তথাপি স্বামী বিবেকানন্দ যে একজন "অতি বড়লোক" তাহা এবং স্বামীজির গুণাবলীর কথাও আমরা তদীয় প্রবন্ধাবলীতে দেখিয়াছি।* অতএব কেবল অনাহুতভাবে এবং বিদ্বেষভাবে প্রণোদিত হইয়াই যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন একথা কিরূপে বলা যায় ? ৺পরমহংসদেবের সম্বন্ধে তিনি কুত্রাপি কোনও তীব্র মন্তব্যও করেন নাই। —তবে তৎসম্বন্ধীয় তথ্য নির্ণয়ার্থ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের চিঠি পত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন—বরং চূড়ামণি মহাশয়ের সঙ্গে বিতর্কও করিয়াছেন (সাহিত্য ১৩২৮। মাঘ সংখ্যা দেখুন)। তারপর স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই মধ্যে মধ্যে তীব্র মন্তব্য আছে—সে বিষয়ে উপসংহারে তিনিই বলিয়াছেন "বিবেকানন্দ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বহুশঃ গালি দিয়াছেন -আমরা যদি আবেগবশতঃ তাঁহার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ কটু বলিয়া থাকি, আশা করি তাহা ক্ষমার যোগ্য হইবে।" (সাহিত্য শ্রাবণ ১৩২৮, ২১৬ পৃষ্ঠা।)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয় ব্যাপারটা বেশ 'ঘোরালো' করিবার নিমিত্তই বোধহয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর কায়স্থ-বিদ্বেষের অভিযোগ করিয়াছেন এই অন্যায় অভিযোগই প্রধা-

*প্রবন্ধ যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রতিবাদও সেই পত্রিকায়ই প্রেরিত হওয়া উচিত ছিল ; বর্ম্মামহাশয় কিজন্য তাহা করেন নাই বুঝিতে পারিলাম না।

* "আসামে বিবেকানন্দ" প্রবন্ধ (সাহিত্য ১৩২৭ ফাল্গুন চৈত্র। এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম প্রবন্ধ সাহিত্য ১৩২৮ বৈশাখ সংখ্যা) দেখুন।

নতঃ এই দীন কায়স্থকে বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রবন্ধে তিনি কায়স্থের উপনয়ন সংস্কার ক্ষত্রিয়ত্ব খ্যাপন অথবা সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার নাই, একথা বলাতেই যদি 'কায়স্থ' জাতির উপর তাঁহার বিদ্বেষ সূচিত হইয়া থাকে তবে এই অধমকেও স্বজাতি বিদ্বেষে অভিযুক্ত করিতে পারেন। আমাদের এই অঞ্চলে অন্ততঃ সদাচার কায়স্থ কেহ বেদবিহিত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় সাজেন নাই। শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছি যে যাহারা খাদ্যাখাদ্য স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার করেন না, সমাজে একাকারের পক্ষপাতী, আচার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ ;ব্রাহ্মণের প্রতি বিরাগ বান বঙ্গদেশের এইরূপ কায়স্থও নাকি পৈতানিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের বড়াই করিয়া থাকেন। বৈদ্যের উপর টিক্কা মারিবার জন্যই বোধহয় এই আন্দোলনের সৃষ্টি। অশৌচকালের সংক্ষেপ ভিন্ন ইহা দ্বারা কোনও লাভ * হইয়াছে কিনা জানিনা। কায়স্থের জাতির নিকট এক দিন মতে কায়স্থের সম্মান অনুমাত্রও বাড়িয়াছে বলিয়াও তো বোধ হয় না। এই অঞ্চলের কোন কলিতাগণও এভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছে—কিন্তু সামাজিক সম্মান পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

সে যাহা হউক বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে কায়স্থ বিদ্বেষ অনুমাত্রও নাই তাহা কয়েকটি উদাহরণ-দ্বারা সমর্থন করিতেছি—

(১) ক্ষত্রিয়োচিত উপবীত গ্রহণকারী কায়স্থ কুল প্রধান শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একাধিকবার গৌহাটিতে আসিয়া বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া গিয়াছেন তাঁহার সম্মানার্থ সভা, বঙ্গীয় ও আসামীয়া কায়স্থ সমাজ কর্ত্তৃক ভোজের ব্যবস্থা ইত্যাদি তিনিই করাইয়াছিলেন।

(২) বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাশ পুস্তকের ভূমিকায়, ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে কায়স্থ ৺চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দের নাম সমাজের কল্যাণসাধক মহাত্মাগণের তালিকায় সাদরে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) "কায়স্থাবতার শঙ্করদেব" নামক যে পুস্তকখানি বঙ্গীয় কায়স্থসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া বিক্রীত হইতেছে উহার "বিজ্ঞাপিকা" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং পুস্তক প্রকাশে তাঁহার কতটুকু যে যত্নচেষ্টা ছিল তাহা ঐ বিজ্ঞাপিকা পাঠেও প্রতীত হইবে?

(৪) অত্রত্য কায়স্থপ্রধান অনেকেই যথা—রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, রায় সাহেব রজনীকান্ত চৌধুরী প্রভৃতি বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সুহৃদ্, এবং পরিচিত

---

* ইহাও কি নাই † এবং আমি মনে করি অনেককাল বাধ্য হইয়া সাত্ত্বিক (নিরামিষ) আহার ব্যবস্থা কল্যাণ জনক, অথচ আমাদের কর্ত্তব্য তান্ত্রিক সন্ধ্যাদির নিষেধও নাই। বলা আবশ্যক যে কামরূপের কায়স্থেরা তাঁহাদের কায়স্থ সূচক মালাকারে সূত্রধারণ করেন কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বসূচক ১২ দিন অশৌচ লয়েন না ৩০ দিনই মানেন।

কায়স্থ মাত্রেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। ফলতঃ কোনও জাতি বিদ্বেষ নিয়া যে তিনি ঐ সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি কিজন্য এ ব্যাপারে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা "সাহিত্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ বিশেষের উপসংহারেই বলিয়াছেন—"দুর্ভাগ্যবশতঃ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ও সমাজের পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রতিকারের আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করিবার লোক দিন দিনই বিরল হইয়া পড়িতেছেন—অযোগ্য হইলেও এসময় স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম ও সমাজের অনুকূলে বিশেষত বিপক্ষের প্রতিকূলে দুচারি কথা না বলিয়া উদাসীন থাকা কাপুরুষতা মনে করি। ইহাতে যদি প্রতিপক্ষের কটুক্তির আঘাত সহ্য করিতে হয় করিতে প্রস্তুত আছি; কেবল বলিব ভাই strike but hear, মারো কিন্তু শুন।" (সাহিত্য ১৩২৮। পৌষসংখ্যা—৬৫১ পৃষ্ঠা) স্বয়ং রামকৃষ্ণ দেবও বলিয়াছেন "অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করিয়া থাকতে নাই।" [কথামৃত তৃতীয় ভাগ ৯৩ পৃষ্ঠা]

তাই কেবল এই সকল প্রবন্ধ-শ্রীযুক্ত চন্দ্রদত্ত বর্ম্মা মহাশয়ের অবগতির জন্য লিখিতে হইল, যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে স্যার পি, সি, রায় মহাশয়ের বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার প্রবন্ধের না প্রতিবাদ করিয়াছিলেন? পূর্ব্বে গেইট সাহেবকৃত আসাম ইতিহাসের" ও তীব্র সমালোচনা করিয়া সমাজ ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কথার প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। ইহাতে জাতি-বিচার করেন নাই—ব্রাহ্ম ৺রামমোহন রায়, ৺শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়—ইহাদেরও যে শাস্ত্র সমাজ প্রভৃতি বিধায়ক মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—স্যার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিবাহসংস্কারের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্বন্ধে চাটু ও অত্যুক্তি বাদের প্রতিবাদ তিনি যেরূপ সাহসের সহিত করিয়াছেন তেমন বোধহয় আর কেহ করেন নাই।

আশা করি ইহাতেই চন্দ্রদত্ত মহাশয়ের ভ্রান্তিনিরাশ হইবে *

কায়স্থ-বিদ্বেষ বশতঃ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দেরবিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন ইহা যদি একটা যুক্তি হয় তবে চন্দ্রদত্ত বাবুর প্রতিপক্ষও বলিবেন স্বজাতিপ্রেম প্রণোদিত হইয়াই চন্দ্রদত্ত মহাশয় কেবল যে কায়স্থ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গলদ দেখেন নাই এমন নহে তাঁহাকে বাড়াইবার জন্য নিম্নোক্ত দর্প অতিশয়োক্তি তদীয় প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে—"বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্বমানব শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ' স্বামী শিরোমণি বিবেকানন্দের মেঘমন্দ্র বাণী জগৎ আলোড়িত করিয়াছে। চক্ষুষ্মান চাহিয়া দেখ মহাত্মা গান্ধী প্রতি। চাহিয়া দেখ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিন্দু ধর্ম্মের বিজয়

* ব্রাহ্মেরা রাজা রামমোহনের সম্বন্ধে এবং নববিধানের ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্বন্ধেও এইরূপ অত্যুক্তি করিয়া থাকেন। ফলতঃ নূতন সম্প্রদায়ের গোড়ারা প্রবর্ত্তকদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ এতাদৃশ অন্ধভক্তি প্রকটিত করিয়াই থাকেন।

বৈজয়ন্তী কিভাবে উড়াইতেছেন।" "সমবেতভাবে নাম দিয়া বা নাম না দিয়া যেখানেই সেবাকার্য্য আরম্ভ হউক সেইখানেই বিশ্বপ্রেমিক ভারত প্রেমিক বাঙ্গালীকুলশিরোমণি বিবেকানন্দের শ্রীকরচিহ্ন বর্ত্তমান।"* অথচ এ সকল উক্তির প্রমাণ প্রয়োগের কোনও বালাই নাই।

পরমহংসদেব অবশ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন তবে তাঁহাকে অবতার সাজাইবার ও এরূপ মতলব হইতে পারে যে তাঁহার মুখ দিয়া স্বামী বিবেকানন্দের প্রশংসাবাদ (যথা ও যদি অখাদ্য খায় তবে দোষ হইবে না ইত্যাদি প্রচার করিয়াছেন। অনাচারী স্বামীজির প্রতি হিন্দুসাধারণের ভ্রম জন্মিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ কায়স্থ জাতির—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের জিনিষ, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার চিঠিপত্রে বক্তৃতাদিতে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর বিষম আঘাত পড়িয়াছে, ইহাতেও সংশয় নাই। তিনি খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতেন না—তজ্জন্য বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মকে বলিতেন "হাঁড়িধর্ম্ম"; স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারকে বলিতেন 'ছুৎমার্গ'; ব্রাহ্মণদিগকে শাস্ত্রকার দিগকে বলিতেন "দুষ্টপুরুষ"। এ সকল হলাহল স্বামীজির সম্প্রদায়স্থ লোকেরা পুস্তকাদিতে সমাজনধ্যে প্রচার করিতেছেন—স্বধর্ম্ম অনভিজ্ঞ সরল প্রকৃতির নবযুবক অনেকে এ সব অবিচারিতভাবে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে সদাচার বিদ্বেষী ব্রাহ্মণদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছে। জনসেবার বাপদেশে অনেক যুবক পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া মঠে বা আশ্রমে যোগ দিতেছে, ইহাতেও সমাজের নানাদিক দিয়া ক্ষতি দেখা যাইতেছে। তার পর স্বামীজির অনুকরণে আজকাল অনেক অমুকানন্দ তমুকানন্দ দেখা দিতেছেন, তাঁহাদের ত্যাগের মধ্যে এক বিবাহ না করাটাই দেখিতে পাই—সেটা করিলে নানা ঝঞ্ঝাটেও যে পড়িতে হয়। কিন্তু তাঁহাদের খাওয়া দাওয়া চলা বলা পোষাক পত্র (একটা গেরুয়ার আবরণ ছাড়া) বিলাসীতারই পরিচায়ক; ইহাতে সন্ন্যাসের আদর্শ খর্ব্ব হইয়াছে। এই সকল কারণে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধাবলীর সহিত আমাদের ঐকমত্য খ্যাপন করিতেছি এবং আশা করি যে এগুলি দ্বারা সমাজের অনেকের চোখ ফুটিবে—এই সম্প্রদায়ের প্রকৃত তথ্য* জানিয়া অনেকেই সাবধান হইবেন। আমরা জানি এই সকল প্রবন্ধের জন্য তিনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ধর্ম্মবিশ্বাসী বিবয়ী ব্যক্তিগণ হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন—এমনকি এসকল প্রবন্ধ পুস্তকাকারে ছাপাইবার জন্যও অনুরোধ আসিতেছে। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ

* চন্দ্রদত্ত বসু লিখিয়াছেন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "জাতিকলহ" "জাতি-বিদ্বেষ" দ্বারা প্রণোদিত হইয়া "মহাপুরুষ নিন্দায়" প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ—কায়স্থ বিবেকানন্দ তাঁহার "জাতি" হইলেন কিরূপে? চন্দ্রদত্ত বসু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অগ্নিহোত্রী বলিয়াছেন—এই উদ্ভট সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন?

* একটি অভিনব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যোদ্‌ঘাটন করিতে হইলেই ঐ সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকগণের ব্যক্তিগত কথা—তাঁহাদের কার্য্য বাক্য ইত্যাদি আলোচনার বিষয় হইয়া

সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাবলী হিন্দী ভাষায় (জনৈক হিন্দুস্থানী লেখক কর্তৃক) অনুবাদিত হইয়া প্রসিদ্ধ হিন্দীমাসিক "মর্য্যাদা" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অতএব চন্দ্রদত্ত বসু বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি যেরূপ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। * এবং তাঁহার "পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা আবশ্যক" এই উপদেশ প্রদানকরাটা নিতান্তই হাস্যকর। পুরাণে কলির লক্ষণ আছে—কুলটা কুলবধূকে সাশাইবে; তাই এরূপ উপদেশ সম্ভাবিত হইল † !!

বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে উপদেশ দেওয়া হইল কিন্তু চন্দ্রদত্ত বসু জানেন কি নূতন সম্প্রদায় যাঁহারা প্রবর্ত্তনকরেন তাঁহাদের সম্বন্ধে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় কি একটা গল্প কহিতেন? গল্পটা সংক্ষেপে এই। নববর্ম্ম প্রবর্ত্তক মৃত্যুর পরে যমপুরী গেলে ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বিচার সভায় দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিলেন। তারপর ঐ সম্প্রদায়ের কেহ যমালয়ে আসিলে প্রশ্ন হইল "আমি তোমাকে যাদের ঘরে জন্ম দিয়াছিলাম তুমি তাদের কুলক্রমাগত সাধনপথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে কেন গিয়াছিলে?" ঐ ব্যক্তি সেই স্থলে দণ্ডায়মান নবধর্ম্মগুরুকে দেখাইয়া উত্তর করিল "হুজুর উঁহার উপদেশে আমি ঐরূপ করিয়াছিলাম।" তখন হুকুম হইল—একে লাগাও ৫০ বেত—তবে অর্দ্ধাংশ (২৫ ঘা) প্রবর্ত্তকের প্রাপ্য।" অবশ্য এটা গল্প মাত্র; তবে ইহার ভিতর যে নীতিকথা আছে' আশাকরি বর্ম্মা মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তো পিতৃপিতামহের পথেই যথাশক্তি চলিতেছেন—সুতরাং তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য তেমন ব্যগ্র না হইলেও ক্ষতি হইবে না।

নিতান্ত অবান্তর ভাবে চন্দ্রদত্ত বসু পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে তদীয় প্রবন্ধে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন, ৺পরমহংসদেব শেষাবস্থায় কিন্তু নামিয়া পড়িয়াছিলেন; ঐ চিঠি যে কেবল 'সারথি' পত্রে ছাপা হইয়াছিল, এমন নহে ইহা ১৩২১ সালের সাহিত্যপত্রের পৌষ-মাঘ যুগ্ম সংখ্যায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। পরমহংসদেব স্বয়ংই নাকি তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে একথা বলিয়াছিলেন। এই চিঠির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া চন্দ্রদত্ত বসু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ধীমান্ পাঠক পণ্ডিতজীর এই চিত্র হইতে পরম হংসদেবের নিম্নাবতরণ লক্ষ্য হয়? জ্ঞানাভিমানী, প্রেমভক্তিহীন বিষয় মোহিত মানবকে ইহা কি ছলনা নয়? অবশ্য

পড়া অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে যদি গলদ প্রকটিত হইয়া পড়ে সে জন্য আলোচক দায়ী নহেন—তবে তিনি সর্ব্বদাই প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় মন্তব্য সমর্থন করিবেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

* বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের যে এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে তাহার অন্যতম কারণ এই যে তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটির অধিবেশন বিশেষে সভাপতিকে যে সভাপতিত্ব করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ তো ব্রাহ্ম বিদ্বেষী ছিলেন, তবে সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ধরা হয় কেন? নিষেধ না করা বরং তাঁহার পক্ষে বাহ্মবোচিত কার্য্য হইত না।

এই অধম নিজকে "ধীমান মনে করে না; তথাপি চূড়ামণি মহাশয়ের বর্ণনার আদ্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়িয়া তো বুঝা যায় ইহাতে ছলনার নামগন্ধও নাই—বেশ সরলভাবেই পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় ভাবিয়া তৎসম্বন্ধে নিজের আধ্যাত্মিক অবতরণের অবস্থা স্বীকার করিয়াছেন। পরমহংসদেব তো বালকের ন্যায় সরল ছিলেন—তিনি কাহাকেও কস্মিনকালে ছলনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। তিনি তো তাঁহার পীড়ার সম্বন্ধে বলিতেন "অবতারের কি ক্যান্সার হয় গা?" অথচ গোঁড়া ভক্তেরা বলিতেন—'তিনি ডাক্তারের অভিমান বাড়াইবার জন্য পীড়া করিয়া বসিয়া আছেন।" এরূপ সরল ভাবকে জটিল করা কি উচিত? সে যাহা হউক ছলনার কোনও কারণ এস্থলে দেখা যায় না। চূড়ামণি মহাশয় অতি বিনীত ভাবে কথাটি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন—তাঁহার জিজ্ঞাসায় কোনও দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় নাই। চন্দ্রদত্ত বসুই তো বলিতেছেন চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের "শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই কি "প্রেমভক্তিহীনের" লক্ষণ? তিনি কদাপি পরমহংসদেবের নিকটে "জ্ঞানাভিমানও দেখান নাই; চন্দ্রদত্ত বসুই তো বলিতেছেন, চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের আলাপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন "যাহা কিছু শুনিতেছি বেদবাক্য তুল্য—এমন কথা জীবনে কখনও শুনি নাই।" * এরূপ উক্তি কি "জ্ঞানাভিমান" দ্যোতক? পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে 'বিষয় মোহিত' বলিয়াও মনে করিতেন না, কেননা পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়ের মধ্যে জ্ঞানের চিহ্ন দেখিতেন (কথামৃত ৪র্থ ভাগ ১১৯পৃঃ দেখুন)—জ্ঞানী কখনও বিষয়মোহিত হইতেই পারে না। অতএব ছলনার কারণ গুলির কোনওটি টিকিতেছে না। বিশেষতঃ পরমহংস দেব চূড়ামণি মহাশয়কে বড়ই আপনার মনে করিতেন। কথামৃতে (তৃতীয়ভাগ ৯৭ পৃঃ) আছে। তিনি চূড়ামণি মহাশয়কে বলিতেছেন "আবার আসবেন। গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্লাদ করে—গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে ইত্যাদি।" এ অবস্থায় ছলনার ভাব আসিতে পারে কি?

চন্দ্রদত্ত বসু জিজ্ঞাসা করিতেছেন "ইনি কি সেই পণ্ডিত শশধর যিনি বাগবাজারস্থ বসু বলরামের মন্দিরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতময় উপদেশ কথা শুনিতে শুনিতে বিহ্বল হইয়া বলিয়া ছিলেন "যাহা কিছু শুনিতেছি, ইহা বেদবাক্য তুল্য। এ নকথা এজীবনে শুনি নাই?" ইনি কে সেই পণ্ডিত শশধর যিনি মহাভাগ সমাধিস্থ পরমহংসদেবের শ্রীচরণদ্বয় নিজ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন?" ইহার পর প্রমাণার্থ বলিতেছেন "এই দৃশ্য দ্রষ্টাও

---

* চূড়ামণি মহাশয় পরমহংসদেবের শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা এবং এই উক্তি (এমন কথা জীবনে শুনি নাই) যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না এ বিষয় পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে। তবে চূড়ামণি মহাশয় যে "অভিমান শূন্য" ও গানাদি শুনিয়া "প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন" করিতেন—একথা "কথামৃতেই আছে (৪র্থ ভাগ ১১৯ পৃঃ ১২১পৃঃ দেখ)

শ্রোতা এখনও বর্ত্তমান।" তাঁহার জিজ্ঞাস্য—তিনি চূড়ামণি মহাশয়ের কাছে পৌছাইয়াছেন কিনা জানি না—এবং তিনিইবা কি উত্তর দিবেন, বলিতে পারি না। তবে বসু বলরামের মন্দিরে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা আর এক প্রত্যক্ষ "দ্রষ্টা ও শ্রোতা" (সেই দিনই নোট করিয়া রাখিয়া) পুস্তকমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কথামৃত ৪র্থ ভাগ পঞ্চদশ খণ্ডে ঐদিনের ঘটনা লিখিত রহিয়াছে—তাহাতে ঐরূপ কথার নামগন্ধও নাই। অন্যত্র কোনও স্থলেও এরূপ কথা (অন্ততঃ কথামৃতে আছে বলিয়া বোধ হয় না। *

কিন্তু হঠাৎ এই 'জিজ্ঞাসা'টা কেন করা হইল তাহার কারণ ভাল বোঝা গেল না। চূড়ামণি মহাশয় তো পরমহংসদেবের প্রতি শ্রদ্ধাবানই ছিলেন। তবে অত্যুক্তি বাদ বা পড়াইয়া পড়া না শুনিলে বা না দেখিলে কি চন্দ্রদত্ত বাবুর আশা মিটেনা।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধীয় (পূর্ব্বে উল্লিখিত) অত্যুক্তি গুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। চন্দ্রদত্ত বসুর লেখায় এরূপ প্রতীতি হয় যে মহাত্মা গান্ধী বা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যাহা করিতেছেন তাহা স্বামী বিবেকানন্দের 'মেঘমন্দ্র বাণীর' জগদালোড়নের ফল। অবশ্য মহাত্মার অথবা শ্রদ্ধানন্দের সাধন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র স্বামীজির মেঘমন্দ্রবাণী দ্বারা কি ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল আমরা অবগত নহি—এবং চন্দ্রদত্ত বাবু বলেন নাই। তবে মহাত্মা যে ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন তিনি যে সব নীতির প্রচার করিতেছেন, স্বামীজি বা তৎসম্প্রদায় তাহা করিয়াছেন কি? মহাত্মার উপদেশাবলীর এক আধটা বিবেকানন্দের বাণীর সদৃশ হইতে পারে, * তেমন সাদৃশ্য চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশ গুলির সঙ্গেও মহাত্মার কথাগুলির সঙ্গেও আছে—বরং অধিকতরই আছে। মহাত্মা কোনও 'আনন্দ' সাজিয়া গেরুয়া পরেন নাই—অথচ আহারে পোষাকে চলায় ফিরায় সংযম সাধনায়, স্বামীজির বা তদনুবর্ত্তী 'আনন্দ' গণের সহিত তাঁহার কত প্রভেদ। তারপর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে ভাবে শুদ্ধি চালাইতেছেন—স্বামী বিবেকানন্দ বা তৎসম্প্রদায় সেরূপ কি করিয়াছেন? এক দুই জন বিলাতী বা মার্কিনী সাহেব মেমকে গেরুয়া পিন্ধাইয়াছেন বটে—কিন্তু স্বামীজির বহুপূর্ব্বে থিয়সফি দলে ঢুকিয়া অনেক সাহেব মেম হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি সংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন; এমন কি মুক্তি ফৌজের দলেও গৈরিকবস্ত্র এবং হিন্দু নাম গ্রহণ পর্য্যন্ত হইয়াছে শুনিয়াছি। বিবেকানন্দের সম্প্রদায়' এদেশের কয়জন মোসলমানকে হিন্দু করিয়াছেন—এমনকি বৈষ্ণব গোস্বামীরা কত পার্ব্বত্য জাতিকে হিন্দু বানাইয়াছেন—

* 'চাপরাশ' সম্বন্ধীয় কথা (অর্থাৎ পরমহংসদেব চূড়ামণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি যে ধর্ম্ম প্রচার কর চাপরাশ আছে?) প্রমাণিত করিবার উদ্দেশে কোনও ব্যক্তি ঈদৃশ সাক্ষীর কথা বলিয়া ছিলেন—কিন্তু যখন সাক্ষীর পরিচয় চাওয়া হইল তখন তিনি নীরব রহিলেন। (সাহিত্য মাঘ ১৩২৮ ৭২৭ পৃঃ দেখুন)

* মহাত্মার "অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন" ও স্বামীজির 'ছুৎমার্গ' ঠিক একার্থ বাচক কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

সে দিকেও তো এই সম্প্রদায় কিছু করিয়াছেন বলিয়া অবগত নাই। তারপর সমবেত ভাবে নাম দিয়া বা নাম না দিয়া যেখানেই সেবকার্য্য আরব্ধ হউক, সেই খানেই বিবেকানন্দের শ্রীকর-চিহ্ন বর্ত্তমান।' ইহার অর্থ কি এই নয় যে স্বামীজি কর্ত্তৃক রামকৃষ্ণ মিশন সংস্থাপনের পূর্ব্বে এদেশে কুত্রাপি সমবেত ভাবে কোনও সেবা কার্য্য ছিল না। যাঁদের কাছ হইতে মিশন শব্দটি ধার করা—আমি এস্থলে তাঁদের (অর্থাৎ খ্রীষ্টিয়ান্ মিশনারিগণের কথা বলিব না—তাঁহরা দুর্ভিক্ষাদিতেও পীড়ার সময়ে এদেশীয় নর নারীর সেবা করিয়া তদুপদেশে লোকেদের খ্রীষ্টান্ করিতে চেষ্টা করিতেন। ব্রাহ্মগণের কথাও বলিব না—তাঁহারাও খ্রীষ্টিয়ানদের অনুকরণে 'মিশন' (স্বামীজির বহু পূর্ব্বেই) করিয়াছেন। আমি আমাদের সমাজের কথাই বলিব। হিন্দুদের সমাজ বন্ধন যেরূপ তাহাতে পরস্পর সহায়তার ভাব ফুটিয়া উঠে—জ্ঞাতি মরিলে সকলে মিলিয়া বহন দহন করে, অশৌচ মানে শ্রাদ্ধে সকলে সাহায্য করিয়া ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। ব্যষ্টিভাবে দরিদ্র সেবার জন্য মুষ্টিভিক্ষা, শ্রাদ্ধাদিতে কাঙ্গালী ভোজন, ইত্যাদিতো রহিয়াছে। সমষ্টিভাবেও গ্রাম দেশে যুবকদের একএকটা দল থাকে *—উহারা বিপদ আপদে লোকের সাহায্য করে—ডাকাত পড়িলে বা আগুন লাগিলে ইহারাই অগ্রসর হয়—আবার ইহারাই বার-ইয়ারি পূজা করে, বরযাত্রীর দল পুষ্ট করে। ইদানীং স্কুল ডিস্পেনসারীর জন্য সামাজিক ক্রিয়া কলাপের সময়ে চাঁদাও উঠায়। আর পাশ্চাত্য অনুকরণেও "শোভাবাজার বেনা ভোলেন্ট সোসাইটি" প্রভৃতি দু'একটা অনুষ্ঠান † স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বেও হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা। কংগ্রেসে ভলেন্টিয়ার গঠিত হইত—এবং আমার বোধহয় ১৮৯১ সালে যে "অর্দ্ধোদয়যোগ" হয় তাহাতে কলিকাতায় তাদৃশ ভলেন্টিয়ার গঠিত হইয়া সমাজ সেবায় ও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব রামকৃষ্ণ মিশন খৃষ্টানও ব্রাহ্মদের অনুকরণে গঠিত হইলেও হিন্দুসমাজের পক্ষেও একেবারে অভিনব জিনিষ নহে। সন্ন্যাসীর দল ত চিরকালই পরার্থ পরায়ণ *—এমনকি বিশে ডাকাতের দলও নাকি দারিদ্রের সেবা করিত যদিও ধনীর ঘাড় ভাঙ্গিত। বরং স্বামীজির প্রবর্ত্তিত সেবাসমিতি প্রভৃতিতে (খ্রীষ্টানদের ন্যায়) নিজেদের সম্প্রদায় প্রচারার্থ পুথি ছবি ইত্যাদির বিক্রয়, স্বামীজি আসলে অভিনন্দনার্থ সভাকরা, ৺রামকৃষ্ণ -বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা করা,

---

* পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত "যুগান্তর" উপন্যাসে বঙ্গদেশের একটি পাড়াগেঁয়ে চিত্র আছে—তাহাতে হাঁসের দল' নামক এক যুবকসঙ্ঘের বর্ণনা আছে। কল্পিত হইলেও বাস্তবের উপর ইহার ভিত্তি বলিয়া মনে হয়।

† সেদিন সংবাদ পত্রে "কলিকাতা অনাথ আশ্রমের ৩১ বার্ষিক অধিবেশনের বিবরে পড়িলেন। তাহা হইলে, ১৮৯২ অব্দে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে—ইহা সংস্থাপিত।

* ইহারা অনেকেই সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবক, বিবাহ করিয়া সমাজে থাকিতে সদ্গৃহস্থের সংখ্যা বাড়িত, ইহাতে ক্রমশঃ ক্ষীণভূত হিন্দুসমাজেরও লাভ হইত।

৺রামকৃষ্ণের পূজার্থ মন্দির করা ইত্যাদি প্রচেষ্টা দেখা যায়—তাহাতে জনসেবা "নিঃস্বার্থ" ভাবে হইতেছে বলা যায় না।

রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা উপকার অবশ্যই হয়—কোন মিশন দ্বারাই বা কিছুটা না হয়? তবে যখন দেখিতে পাই, যে নবযুবকগণ আপ্ত পিতামাতার সেবা ছাড়িয়া মিশনে যোগ দিতেছে উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ না হইয়া ভিক্ষুকের দল বাড়াইতেছে, * আর (বঙ্গদেশের আখড়ায় মোহন্ত বাবাজীদের ন্যায়) 'স্বামীজি'রাও সেই ভিক্ষুকের দলের অর্জ্জনের (ভিক্ষা এবং ছবি ও সমাজ বিরুদ্ধ মত খ্যাপন পুস্তকাদি ফেরি করিয়া যাহা হয় তাহার) দ্বারা বেশ বড় লোক মাফিক চলাফিরা করিতেছেন, তখন মনে হয়—এই ব্যবসা চলিতেছে মন্দ নয়। নচেৎ কোথায় কবে দুর্ভিক্ষ প্লাবন বা মহামারী হইবে—তারজন্য এইরূপ করিয়া দল বাঁধিয়া রাখার প্রয়োজন নাই বা কি ছিল? চন্দ্রদত্তবসু: ইহাও লিখিয়াছেন, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় জন্মগ্রামে একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইলে দেখিয়া তিনি সুখী হইবেন। তাঁহার উপদেশ অবশ্যই মূল্যবান্। তবে স্বভাব জানিতে পারিয়াই বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের এ সময় সামাজিক অবস্থা এখনও এমন পরস্পর সহানুভূতিশূন্য হয় নাই যে, 'সেবাশ্রম' একটা করা নিতান্তই আবশ্যক। বরং এরূপ 'সেবাশ্রম' যে স্থানে আবিষ্কার হইবে সেখানে লোক ক্রমশঃ পরার্থপর ভুলিয়া যাইবে। বিলাতের লোক যেমন ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া 'পুয়র হাউস' দেখাইয়া দেয়—এখানেও হয় ত লোকে আত্মীয় বা প্রতিবেশীকে সেরূপ দেখাইয়া দিবে।

চন্দ্রদত্তবসু বলিয়াছেন—"নদীয়ার প্রেমাবতার একবার ছেঁড়া পুথির উপর ঘা দিয়াছিলেন। তাহাতে আযবন চণ্ডাল উন্নত হইয়াছে।" এই ছেঁড়া পুঁথি"র অর্থ অবশ্যই শাস্ত্র গ্রন্থ—এবং এইরূপ উক্তি স্বামীজির সাধু অনুকরণ সন্দেহ নাই—সাধে কি পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিবেকানন্দের প্রতি বিরাগবান?

শ্রীগৌরমহাপ্রভু শাস্ত্রের উপর আঘাত দেওয়া দূরে থাকুক তিনি স্বয়ং অগাধ শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন; তাঁহার শিক্ষানুসারে রূপসনাতন প্রভৃতি গোস্বামীগণ বহু সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া গিয়াছেন। এমন কি চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি বাঙ্গলা গ্রন্থেও পদে পদে শাস্ত্রের বচন উদ্ধার পূর্ব্বক তত্ত্ব বিচার আছে। বর্ত্তমানে যাঁহারা বৈষ্ণব সমাজের অগ্রণী সেইসব প্রভুগণও এক একজন প্রভূত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন। ইদানীং গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত পরীক্ষায় বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রেরও মর্য্যাদা লাভ হইয়াছে।

ফলতঃ যাঁহারা এযুগেও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া প্রখ্যাত (যেমন রাজারামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি) তাঁহারাও শাস্ত্রের মর্য্যাদা করিয়াছেন—শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তবে কেশবচন্দ্র সেন (যিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন না।] হইতেই

* বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠ পড়িয়া নানাকারণে যেন আকস্মিক আনন্দমঠের কথাই স্মরণ হয়; বঙ্কিমবাবুও বাস্তবের উপরই কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রমর্য্যাদার লোপ হইয়াছে —ফলও তেমনি হইয়াছে—ব্রাহ্মসমাজ কিছুদিন বেশ প্রবল হইয়াছিল —এখন নিষ্প্রভ প্রায়। স্বামীজি ব্রাহ্মসমাজেরই মেম্বর ছিলেন —তিনি ঐ ধারাই ধরিয়াছিলেন। ভূত দেখিয়া যদি ভবিষ্যৎ বিচার করিতে হয়, তবে পরিণাম কি হইবে তদীয় সম্প্রদায় বুঝিয়া লউন। *

মুখে বড় বড় কথা আমরা বহু শুনিয়াছি ও শুনিতেছি; কিন্তু কথায় কোনও দিন চিঁড়া ভিজে না। কথা যিনি বলিবেন, তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধিমান ব্যক্তি দেখিবেন তাঁহার চরিত্র ও অনুষ্ঠানাদি কথার অনুরূপ কিনা। এই জন্যই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক স্বামীজির কার্য্যে ও কথায়, অনুষ্ঠানে ও উপদেশে সামঞ্জস্য কতদূর তাহা পরীক্ষার বিষয় — বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাই করিয়াছেন — এবং বেশ বিচক্ষণ ভাবেই করিয়াছেন। যদি গলদ থাকে তাহা খাটী হইবেই — এখন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের উচিত ঐ সব যথাসম্ভব দূর করা, সমালোচককে গালি মাত্র দিয়া কোনও লাভ নাই। "চালাকি দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না" —প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই উপদেশ দেওয়া বা খ্যাপন করা খুবই সহজ —কিন্তু কাজের বেলায় কি দেখিতে পাই? — দেখি আগাগোড়া 'চালাকি' (যথা চূড়ামণি মহাশয়ের নিকটে পরমহংসদেবের নিজের অবস্থা সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি ("ছলনা" মাত্র) দেখি "প্রেমের" পরিবর্ত্তে গালি, (যেমন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের উপর বর্ষিত হইয়াছে) দেখি "সত্যানুরাগের" পরিবর্ত্তে অত্যুক্তিবাদ, অপ্রমাণিত কথা (যথা স্বামীজির বিশেষণাদি —এবং চূড়ামণি মহাশয় কর্ত্তৃক পরমহংসদেবের শ্রীচরণ বক্ষস্থলে ধারণ) এবং "মহাবীর্য্যের" পরিবর্ত্তে অবিনয় অভদ্রত (যেমন প্রতিবাদ প্রবন্ধের 'টোন্' ও বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব)!!

উপসংহারে বর্ম্মা মহাশয়ের প্রতি এই দীনের বিনীত বিবেদন এই যে, তদীয় প্রবন্ধে যে 'মহাত্মা'র এবং 'প্রেমাবতারের' উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হউন; তাঁহাদের সারল্য, সহিষ্ণুতা, অদাম্ভিক পবিত্রতা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করুন এবং কৃপা করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখকের ধৃষ্টতা যেন মার্জ্জনা করেন।

---

* পরমহংসদেব সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না —তিনি গুরুমুখে ও সাধুসঙ্গে শাস্ত্রমর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন; তাঁহার একটা "সম্প্রদায়" হউক এমনটা যেন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না — ইহা সব বিবেকানন্দেরই (প্রধানতঃ) প্রবর্ত্তিত। তথাপি পরমহংসদেব গুরু (এবং অবতার) বলিয়া —ইহা তদীয় সম্প্রদায় রূপেই কথিত হইতেছে।

পরলোক।

(লেখক—শ্রীযুক্ত রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী।)

ইহলোক জাগরণ। পরলোক স্বপ্নবৎ। স্বপ্নে কেবল মনের খেলা। পরলোকেও মনেরই খেলা—স্বপ্নে মন একাই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পন্ন করে, দর্শন শ্রবণাদি সমাধা করে, এই দেহেরই ছায়া লইয়া বিচরণ করে। পরলোকে মনই স্থূলদেহের ছায়া লইয়া স্থূলদেহাভ্যস্ত সংস্কারের বলে দর্শনশ্রবণাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করে। জাগ্রদবস্থার অনুভূতি ও চিন্তাই স্বপ্নে মূর্ত্তিমতী। পরলোকে ইহলোকের প্রতিচ্ছবিও ইহলোকের বাসনা সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠে। ইহলোকে যাহা বিদ্যমান্ পরলোকে তাহাই বিদ্যমান, ইহলোকের আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতী হইয়া সম্মুখে দেখা দেয় এইমাত্র। অনুভূতি হইয়া স্বপ্নাবস্থিতি যেমন সত্য, পরলোকে দর্শনাদি তেমনই সত্যবৎ প্রতীত।

স্থূলদেহ ত্যাগের পর মনঃসমন্বিত জীব বা মনোপাধিক জীব স্থূলদেহের যাবতীয় সংস্কার লইয়া দেহত্যাগ করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ লিঙ্গদেহ। ছায়াদেহ ও লিঙ্গদেহ। সূক্ষ্মদেহের বিচরণ স্থানই সূক্ষ্মলোক বা পরলোক। পরলোক ইহলোকেরই প্রতিচ্ছবি। ইহলোকের বাসনা বা সংস্কার পরলোকে বিদ্যমান। ইহলোকের পাপপুণ্যাত্মিকা বাসনা পরলোকে অনুবর্ত্তমান। স্থূলদেহে মর্ত্ত্যে অনুষ্ঠিত শুভাশুভকর্ম্মের তথায় ফলভোগ। পরলোক কেবল মনেরই খেলা। ক্ষুধা তৃষ্ণা তৃপ্তি অতৃপ্তি সুখদুঃখ সমস্তই সেখানে মানসিক। সে লোকই মনঃসৃষ্ট সংস্কারমূলক, সে লিঙ্গদেহই মনোময়।

এই পরলোক যাঁহারা মানেন তাঁহারাই আস্তিক। দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই পরলোক নাই যাঁহারা বলেন তাঁহারা নাস্তিক। পুষ্পগন্ধের মত মৃত্যুতে সবই যদি শেষ হয়, তবে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রয়োজন নাই। পুণ্যের পুরস্কার পাপের দণ্ড নাই। মৃত্যুর পর ভালমন্দ কার্য্যের কোন ফলাফল নাই। সাধনা ভগবানে আত্মসমর্পণ ব্যর্থ। অমৃতের সন্তান দেহাত্মবাদী পরলোকে অবিশ্বাসী হইয়া অসুররূপে দাঁড়াইবে। জন্ম মৃত্যুর মাল রচনা করা ব্যতীত তাহাদের আর কোন কার্য্যই নাই।

মৃত্যুর পর স্থূলদেহের ছায়া লইয়া জীব প্রস্থান করে বলিয়া ছায়াদেহ লিঙ্গদেহই ভোগদেহ (স্বর্গ নরকভোগের উপযোগী দেহ) স্থাবর সংশ্লেষপ্রাপ্ত জীবাণু দেহ ও লিঙ্গদেহ। স্থূলদেহের উপর অতিরিক্ত আকর্ষণ বা ঝোঁক ছায়াদেহ গ্রহণে জীবকে বাধ্য করে। ঐ আকর্ষণ বা ঝোঁকের অবসানের সহিত ছায়াদেহের তিরোধান। ঐ উপাধি সূক্ষ্মসংস্কারমূলক ছায়াদেহ বিলীন হইলে পর মনোপাধিক জীব জীবাণু আকারে স্থলে জলে পৃথিবী সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। শস্যাদি পদার্থে সংশ্লিষ্ট থাকে। এই স্থাবর সংশ্লেষ প্রত্যেক জীবের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি। স্থাবর সংশ্লেষই জন্মিবার উপায়। সংশ্লেষ অর্থে

লাগিয়া থাকে। স্থাবরে শস্যাদিতে সংশ্লিষ্ট সূক্ষ্মজীবাণুদের সে সময়ে সংমূর্চ্ছিতাবস্থা "সংমূর্চ্ছিত বৎ অবতিষ্ঠতে" (শাঙ্কর ভাষ্য, ছান্দোগ) সে সময়ে কোনরূপ উপলব্ধি নাই। অনুভূতি সম্পূর্ণ সুপ্তভাবেই থাকে। জলের মধ্যে দিয়া খাদ্যের ভিতর দিয়া এইরূপ কতই জীবাণু প্রতি-নিয়তই আমাদের দেহে প্রবেশ করিতেছে, আবার জন্মিবার কাল বা স্বানুরূপ দেহগ্রহণের সময় না উপস্থিত হইলে নির্গত হইয়া যাইতেছে। খাদ্যের গুঞ্জন পেষণে খাদ্য সংশ্লিষ্ট জীবের কোনপ্রকার দুঃখের উপলব্ধি হয় না। "জীব অঙ্গুষ্ঠাকার" এইরূপ দুই একটি প্রমাণ পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। আমাদের হৃদয়দেশ পুণ্ডরীকাকার বলিয়া তৎস্থিত জীবও পুণ্ডরীকাকাররূপে উদাহৃত হইয়াছে।

ছায়া দেহ কোথাও প্রেতদেহ বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। প্রেতদেহ বলিতে ভৌতিকযোনি কেহ বুঝিবেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যত দিন স্থূলদেহের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক বা আকর্ষণ প্রবল, ততদিন ঐ ছায়াদেহের বা প্রেতদেহের অস্তিত্ব। স্থূলদেহ আর দেখাও যায় না, পাইবার আর আশাও নাই, কাজেই তখন ক্রমে ক্রমে স্থূলদেহের উপর ঝোঁক বা আকর্ষণ কমিতে আরম্ভ করে। সাধারণ জীবের মানবাদি জীবের ঐ ঝোঁক বা আকর্ষণ বড় জোর এক বৎসর পর্য্যন্ত বা কিছু অধিক দিনও থাকিতে পারে, এক বৎসর প্রেতদেহে অবস্থিতির অর্থ, বড় জোর একবৎসর ঐ ছায়া বা প্রেতদেহের অস্তিত্ব। এই ঝোঁক বা আকর্ষণ যতদিন স্থায়ী ছায়া বা প্রেতদেহ ততদিন স্থায়ী।

পাপপুণ্যকারী ব্যক্তির দুই এক বৎসর পরেই হউক বা মধ্যে, না হইলে বৎসরান্তেও অন্য স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আতিবাহিক দেহ কেবল মনুষ্যদের জন্যই।* আতিবাহিকদেহ ছায়া দেহেরই অসংস্কৃত অবস্থা।

প্রেতদেহ এই স্থূলদেহেরই ছায়ামাত্র। এইজন্য প্রেতদেহের নামই আমরা ছায়াদেহ বলিয়াছি। মৃত্যুর পর ঐ ছায়া বা প্রেতদেহ গৃহীত হইয়া থাকে। যোগীর যোগ শক্তি দ্বারা যে যোগ দেহ, মহাত্মার অলৌকিক ক্ষমতা সাহায্যে যে চিন্ময় দেহ তাহা ছায়াদেহ বা প্রেতদেহ নহে। গাঢ় চিন্তা কখন কখন মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়। সে ছায়াময়ী চিন্তাময়ী মূর্ত্তি—প্রিয় জনেরই দৃষ্ট হয়। আপনারও কদাচিৎ চকিতে দৃষ্ট হইতেও পারে। প্রগাঢ় চিন্তা দ্বারা ভাবনা যে মূর্ত্তিমতী হয়—তাহা আচার্য্য রামানুজ স্বকৃত ভাষ্যে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ধ্যান বা নিদিধ্যাসনই যে আত্মসাক্ষাৎকাররূপে পরিণত হয় ইহা আচার্য্য শঙ্কর শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণেও স্বাধীন যুক্তিতে দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন।

ছায়াদেহ গ্রহণ সাধারণতঃ সাধারণ জীবের (মানবাদির) যখন প্রকৃতি, তখন ক্রমে ক্রমে সেই ছায়ার বিলয়ও তাহাদের প্রকৃতি। যাহা প্রকৃতি তাহা স্বভাব। "স্বোভাবঃ" নিজস্বভাবই স্বভাব। প্রকৃতি বা স্বভাবের কার্য্য শৃঙ্খলা ও নিয়মের সহিত হইয়া যায়। যদি কোন বাধা থাকে তবে তাহার প্রতিকারেও মন দিতে হয়। যে প্রক্রিয়া প্রকৃতি বা স্বভাবকে সাহায্য

* কেবলং তন্মনুষ্যানাং নন্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ।

করে, আগন্তুক বাধা নষ্ট করে—তাহার সাহায্য লওয়াও আমাদের আবশ্যক। আমাদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষিগণ প্রকৃতির সাহায্যে ও বাধা দূরীকরণের ব্যবস্থা জন্য কি সাধনাই না করিয়া গিয়াছেন। সাগরফলে বাহ্যজগতের চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ, অন্তর্জ্জগতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসা শাস্ত্র সংহিতাদি প্রণীত হইল। পারলৌকিক জীবের মঙ্গল জনক প্রক্রিয়াই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। শ্রাদ্ধ তর্পণ সপিণ্ডীকরণাদি সবই আধ্যাত্মিক চিকিৎসা মাত্র।

মৃত আত্মার সদ্গতি ও মঙ্গল উদ্দেশ্যে প্রার্থনাও একপ্রকার আধ্যাত্মিক চিকিৎসা। আমাদের শ্রাদ্ধাদি উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা। স্বাভাবিক নিয়মে রোগ আরোগ্য হইলেও যেমন চিকিৎসার উপযোগিতা। চিকিৎসা না করিলে যেমন প্রত্যবায়। তদ্রূপ শ্রাদ্ধতর্পণাদির উপকারিতা না করিলেও পাপ। জীবন দিতে না পারিলেও রোগযন্ত্রণার কথঞ্চিৎ উপশমও একটি লাভ। পরলোকগত আত্মার কিঞ্চিৎ উপকারও প্রার্থনীয়।

মুক্তব্যক্তি ও শিশুরা এই ছায়াদেহ প্রাপ্ত হয় না। (মুক্তব্যক্তির কথা পরে বলিব। একবৎসর কি দুই বৎসরের শিশুর আমার দেহ এইপ্রাকর "ইত্যাকার কোন সংস্কার থাকা সম্ভব নহে। কাজেই স্থূলদেহের উপর তাহার কোনরূপই আকর্ষণ জন্মে না। এক দুই বৎসরের শিশুরা স্থূলদেহের ছায়া লইয়া যাইতে পরে না বলিয়া মৃত্যু ক্ষণেই তাহারা জীবাণু আকারে স্থাবর সংশ্লেষ লাভ করে। আর বর্ত্তমান কালে, কোনরূপ পাপপুণ্য অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া স্বকর্ম্মার্জ্জিত কোন শুভাশুভ লোকে তাহাদের যাইতে হয় না। তৎক্ষণাৎ দেহপ্রাপ্তির অবস্থায় উপনীত হয় বলিয়া মৃত্যুর পর তাহাদের একেবারেই সংমূর্চ্ছিত ভাব। শস্যাদিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া সংমূর্চ্ছিতভাবে জীবাণু আকারে অবস্থিতিই তাহাদের পক্ষে অবশ্য ব্যবস্থিত বলিয়া শাস্ত্রীয় দাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদি তাহাদের জন্য নহে। স্মৃতি উপস্থাপিত ছায়াদেহ গ্রহণের যোগ্যতা বা শক্তি শিশুদের নাই; কাজেই জলৌকার মত দেহ ত্যাগ করিবামাত্র অপর দেহ গ্রহণের অবস্থায় উপনীত হয়। স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ গতি হয় না, ঝোঁক সহজে কাটে না। স্থূলদেহের ফটো মৃত আত্মার আকর্ষণের একটি উপায়। ফটো থাকিলে পাছে দেহীর গতির ব্যাঘাত জন্মে তজ্জন্য সাধারণ ব্যক্তিদের ফটো চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি না রাখাই ভাল। মুক্তমহাপুরুষদের চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি রাখায় ক্ষতি নাই।

শিশুদের কথা হইতে ছিল। যে শিশুরা বাল্যকালে দেহত্যাগ করে—তাহারা দ্বিবিধ এক পুণ্যাত্মা দেবশিশু। দ্বিতীয় ক্ষুদ্রকর্ম্মা জন্তু। মুক্ত মহাত্মারা কখন কখন শেষ একবার জন্মমৃত্যু ভোগ করিবার জন্য সংসারে আসিয়া থাকেন।

কেবল যেবার শিশুর মৃত্যু হইবে না—বুঝিতে হইবে, তাহাদের ফলোন্মুখ পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল আর নাই। অফলোন্মুখ কর্ম্মফল (সঞ্চিত) সামান্য থাকিতে পারে, পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতি মাত্র লইয়াই সেই শিশু সেবার জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলোন্মুখ কর্ম্মফল (প্রারব্ধ) না থাকায় কেবল নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম্মই সেই শিশু করিতে আরম্ভ করে। এই শ্রেণীর জীব সাধারণতঃ প্রথম হইতে ভবের খেলা খেলে। পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতি ও

মোটামুটি অফলোন্মুখ সঞ্চিত কর্ম্মফল থাকে বলিয়া সাধারণত ব্যবহার করা হইল। অফলোন্মুখ কর্ম্মফল না থাকিলেও পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতি সঙ্গে না আনিয়াও মানব নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারে। নূতন ক্রিয়মাণ কর্ম্মে যে মানবের স্বাধীনতা বিদ্যমান তাহা আচার্য্য শঙ্কর সুস্পষ্টভাবেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাহাই সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

ক্রিয়মাণ কর্ম্মে মানবের ষোল আনা না হউক কতকটা স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয়। সেই অধিকার অংশতঃ জন্মান্তরীণ প্রকৃতি সাপেক্ষ হইলেও প্রধানতঃ উহা স্বাধীন, বর্ত্তমান জন্মে যাহার প্রারব্ধ নাশ তাহা পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের ক্রিয়মাণ কর্ম্মেরই ফল। পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মই বর্ত্তমান জন্মের দৈব বা অদৃষ্ট। একজন্মে অনুষ্ঠিত না হইলে প্রারব্ধ তৈয়ারীই হইতে পারে না। পূর্ব্বজন্মের প্রকৃতি অনুযায়ীই মানব শুভাশুভ কর্ম্ম করে—ইহা সর্ব্বথা স্বীকার করিলে অভ্যুদয় ও অবনতিতে মানবের কোন হাত থাকে না, স্বর্গ, মোক্ষে কাহারও অধিকার জন্মে না। প্রথমাবস্থায় যে মানব যে ভাবে যে জাতীয় পাপপরায়ণ ও পুণ্যকারী থাকে; অনন্তকাল পর্য্যন্ত সেই মানব তাহা হইলে সেইভাবের সেই জাতীয় পাপী বা পুণ্যবান থাকিয়া যাইবে, কোনওকালে তাহার আর পরিবর্ত্তন হইবে না। সাধন ধর্ম্মানুষ্ঠান, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতিতে কোন উপকার নাই। শিক্ষা, সংসর্গ, সংযমে মানবের কোনও ফলাফল নাই। ঐহিক পারত্রিক ব্যাপারে মানবের কান কর্ত্তব্যই থাকে না ভবের খেলার বৈচিত্র্য ভগবংলীলার মাধুর্য্যই থাকে না। একজন্মের প্রকৃতিই জন্মজন্মান্তর ধরিয়া কার্য্য করিবে, তাহাতে মানবের কোন হাতই নাই—ইহা যুক্তি ও অনুভব বিরুদ্ধ।

অবশ্যম্ভাবী বা প্রারব্ধ বর্ত্তমান জন্মের আরম্ভক, তাহার ফল ফলিবেই। নিক্ষিপ্তবাণ আর ফিরিবে না। অফলোন্মুখ সঞ্চিত কর্ম্মফলে স্বাধীনতা ও পরাধীনতা দুইই আছে। বর্ত্তমান জন্মে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম, ক্রিয়মাণ কর্ম্মেই মানবের স্বাধীনতা কিঞ্চিৎমাত্র পরাধীনতা। জন্মান্তরীণ প্রকৃতির বশে মানব কোন কোন কার্য্য যন্ত্রচালিতবৎ হইয়া করিয়া থাকে তাহাতেই পরাধীনতা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে সাধনা বা কঠোর পুরুষাকার ব্যর্থ নহে। জন্মান্তরীণ প্রকৃতি সংযত বা পরিবর্ত্তিত করা মানবেরই সাধ্য। আর অনেক কার্য্যই মানব ইচ্ছার বশে করে মনে করিলেই না করিতে পারে, (ক্রিয়মাণ) কর্ম্মমাত্রেই পুরুষব্যাপারের অধীন (শঙ্কর মত) ক্রিয়মাণ কর্ম্ম আছে, তাই মানব ইচ্ছা করিলে দেবতা ও পিশাচ দুইই হইতে পারে। আমরা ইচ্ছা করিলে সৎকার্য্য করিতে পারি, অসৎকার্য্য হইতে বিরত থাকিতে পারি কিন্তু সৎকার্য্য করি না, অসৎকার্য্য হইতে বিরত থাকি না। সেটা আমাদেরই দোষ, তবে যে কঠোর সাধনা পুরুষকারও যদি ব্যর্থ হইতে দেখি; তখন না হয় ধরিয়া লইব জন্মান্তরীণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল।

শিশুদের প্রস্তাবই চলিতেছিল। শিশুজন্মে জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়া কর্ম্মফল যাহার শেষ হইয়া গেল—সেই ব্যক্তি শেষবার প্রথম পয়েন্ট হইতে নূতন করিয়া ভবের খেলা আরম্ভ করিবে। কোনরূপ জমাখরচ (পাপপুণ্যের) থাকিবে না। মোটামুটি মৈত্রী বাসনা জন্মান্তরীণ সাধনা সংস্কার অনুবর্ত্তন করিবে মাত্র। গোড়া থেকে নূতন করিয়া ভবের খেলা আরম্ভ করিতে হইলে এই একবার শিশুবয়সেই মৃত্যুভোগ করিয়া কর্ম্মফল নিঃশেষে ভোগ করিয়া লইতে হয়।

শিশুরা মৃত্যুক্ষণে জন্মিবার অবস্থায় আসিয়া পড়ে। সে জন্মের পাপপুণ্য নাই, কাজেই স্বানুরূপ দেহলাভার্থ অপেক্ষাও নাই। শিশুরা যে গৃহে মরে, সেই গৃহে প্রায়শই জন্মিতে পারে। সে জন্মের কর্ম্মই নাই কাজেই তদনুযায়ী গতি লাভের জন্য ইচ্ছা ব্যাহত হয় না। মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতি প্রিয়জনের আন্তরিক টান যদি সেই শিশুকে আবার আকাঙ্ক্ষা করে তবে শিশুরা আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। কারণ তাহাদের বিশেষ কোন বাধা নাই। বয়স্ক লোকদের বেলা ইহা ঘটে না। কারণ ইহাদের পাপপুণ্য কি অবস্থায় উপনীত করাইবে তাহার ঠিক নাই। মানুষ হইবে কি পশু হইবে, শীঘ্র জন্মিবে কি বহুকাল পরে জন্মিবে তাহার কোন নিশ্চয়তাই নাই। ঐ পাপপুণ্যই মৃত বয়স্কদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দেয়না, প্রিয়জনের ইচ্ছার ব্যাঘাত জন্মায়। যে শিশুরা মরে, তাহার পরজন্মে যদি জন্মে, তবে মানব হইয়া জন্মিবে।

একগৃহে জন্মিলেও শিশুদের জন্মান্তরীণ স্মৃতি কখন ফুটে না; অস্ফুটভাবেও কখন ফুটে না। শিশুকাল হইতেই সেই ঘর বাড়ী দেখে বলিয়া, প্রিয়জনের নিকটে থাকে বলিয়া "এই জন্মের কি পূর্ব্বজন্মের এইরূপ কোন সংশয়ই তাহাদের জাগে না। শৈশবে জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে এই জন্মের পার্থক্য বোধই থাকে না। যদি কোন বয়স্ক ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মের দৃষ্ট স্থানে যাইয়া অধিক পরিচিত কিছু দেখে অত্যন্ত ভালবাসার জনকে প্রাপ্ত হয়—তবেই তাহার জন্মান্তরীণ স্মৃতি ফুটে। এই জন্মে এই স্থানে আসি নাই, এই জন্মে ইহাকে কখন দেখি নাই—অথচ দৃষ্ট স্থান বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহাকে অত্যন্ত পরিচিত মনে লাগিতেছে—এইরূপ ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ স্ফুট হউক অস্ফুট হউক জন্মান্তর স্মৃতি ফুটিয়া উঠে। উদ্বোধের কারণ সামগ্রী উপস্থিত হইলে জন্মান্তর স্মৃতি অন্ততঃ ক্ষীণভাবেও ফুটে—ইহাই আমাদের আর্য্য মনীষীগণের সিদ্ধান্ত।

সাধারণ পাপপুণ্যকারী ব্যক্তিগণই মৃত্যুর পর সংবৎসর মধ্যে বা পরে মর্ত্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। প্রাণত্যাগের সময় দেহ হইতে বাহির হইতে পারিলেই জীবের শান্তি। সে মৃত্যু সময়ে এক কণার জন্যও স্বতঃ মূর্চ্ছা যাইবে, আর সেই মূর্চ্ছার অন্তরালে জীবের মৃত্যু হইবে—ইহাই বিধাতার নিয়ম। আমি (জীব) এই বাহির হইতেছি, কি আমার আত্মা এই বাহির হইল—ইহা কোন জীবই জানিতে পারে না। মৃত্যুর পর জীব বড়ই স্বস্তি বোধ করতঃ উধাও হইয়া ছুটিয়া যায়। কোন কোন জীব আপনার লঘু শরীর দেখিয়া সে

তারীপরার কোথায় গেল—ভাবিয়া মৃত্যুস্থানে ফিরিয়া আইসে। সে ফিরিয়া আসায় ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াই তখন লাভ। এইরূপ ফিরিয়া আসার উন্মুক্ত স্থানে মৃত্যু হইলেই সুবিধা। শবদেহ দাহ হইল। দেহী দেখিল "ভস্ম হইল, আর পাইব না" তখন দেহের প্রতি তাহার ঝোঁক কমিতে লাগিল। দুই চারিদিন আসা যাওয়ার পর সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াই সে আসা ছাড়িয়া দিল। প্রিয়জনকে দেখা দেওয়া বা তাহাদের সহিত দেখা করার তখন কোন লাভালাভ নাই বলিয়া তাহাও ত্যাগ করিল। কেহ কেহ আসিয়া কোন তৃপ্তি পাইল না তাহাদের কিছু বুঝাইতে পারিল না—ক্রমশঃ সে মোহ সে আকর্ষণ তাহার ছুটিয়া গেল। কাহারও বা ইচ্ছাসত্ত্বেও আসার শক্তি রহিল না; নিজ পাপপুণ্যাত্মক প্রকৃতিবশেই তাহাকে চলিতে হইল। কিন্তু সাধারণতঃ "পুরাতন স্থূলদেহ আর পাইবার নহে"—এই বোধ জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন স্থূলদেহ লাভের আকাঙ্ক্ষাও বলবতী হইতে আরম্ভ করে। তখন সেই নূতন দেহের ঝোঁকে মৃত জীব ঘুরিয়া বেড়ায় বলিয়া প্রিয়জনের কথা তাহার মনে পড়ে না, পড়িলেও তজ্জন্য কোন ব্যাকুলতা জন্মে না। সেই ঝোঁক, সেই উন্মত্ততা এমন ভাবে তাহাকে পাইয়া বসে—যে কোথাও তাহার তৃপ্তি নাই। স্থূলদেহ লাভের উপায় করিতে পারে না, অথচ অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে উন্মত্তের মত ছুটিয়া বেড়ায়। নূতন স্থূলদেহের আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দেহের ছায়াও ক্রমে সূক্ষ্ম আকার ধারণ করে। যতদিন যায় পূর্ব্ব-দেহের ছায়া সূক্ষ্ম ক্ষীণ হইয়া আইসে, নূতন দেহের ঝোঁক প্রবল হইতে থাকে। এইরূপ ভাবে স্মৃতি উপস্থাপিত সংস্কার মূলক ছায়া শেষে একেবারে মিলাইয়া যায়। অমনই জীব জীবাণু আকার ধারণ করিয়া স্থাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হয়।

ছায়াদেহে যতদিন অবস্থিতি ততদিন পাপপুণ্যের ফলভোগ হয় না। কেবল পাপপুণ্যাত্মিকা প্রকৃতির বশে মোটামুটী সুখদুঃখের উপলব্ধি জন্মে। সে উপলব্ধিতে পাপপুণ্য ক্ষয় পায় না। হাজতবাসের মত। জীবদ্দশার অভ্যস্ত সংস্কার বশতঃ একটি ক্ষুধাতৃষ্ণার ভাব জাগে। এ ক্ষুধা তৃষ্ণা মন কল্পিত সংস্কার মাত্র। কিন্তু সেই সংস্কার বশত না পাইলে কষ্ট বোধ, পাইলে সুখবোধ হইবে। আপনা হইতে তাহার পাওয়া না পাওয়া ঘটে। তথাপি যদি আপনা হইতে তাহা না পাওয়া যায় বা কোন বাধা উপস্থিত হয়, তবে তাহা পাওয়ার ও বাধা দূর করার ব্যবস্থা করা সন্তানাদির মহা কর্ত্তব্য। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী মৃতআত্মার সদ্গতি ও মঙ্গলের জন্য কেবল প্রার্থনা করেন—আমরাও তাহাই করি, উপরন্তু সম্মুখ অন্নজলাদি রাখিয়া মন্ত্র ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া একটি অপূর্ব্ব উন্নত প্রণালীর আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করিয়া মৃত আত্মা শ্রাদ্ধান্ন দৃষ্ট দ্বারা ভোজন করত তৃপ্ত প্রাপ্ত হয়। শ্রাদ্ধান্ন রাখিয়া মৃতের মনে এইরূপ একটি মানসিক সংস্কার উৎপাদন করাই শ্রাদ্ধের অন্যতম উপকার। মাতার ঐকান্তিক প্রার্থনায় সন্তানের রোগ যদি আরাম হইতে পারে, তবে আমাদের ইচ্ছা ও মন্ত্রশক্তি সহকৃত প্রার্থনায় বা মৃত আত্মার উপকার না হইবে কেন? সংবৎসর মধ্যে জন্ম না হইলে সপিণ্ডীকরণ দ্বারা সেই জন্মলাভের বাধা দূর করিয়া দিই। সপিণ্ডীকরণের ইহাও একটি উদ্দেশ্য।

"সংবৎসরে দেহ মতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে"

অত্যুৎকট পাপকারী ব্যক্তি আর পারলৌকিকার্থ পুণ্যকারী ব্যক্তি সংবৎসর মধ্যে বা পরে জন্মগ্রহণ না করিয়া পাপপুণ্য ভোগের জন্য ভোগদেহ ধারণ করে। স্বর্গ নরক ভোগোপযোগী দেহের নাম ভোগদেহ। ছায়াদেহে সূক্ষ্ম জীবাণু আকার শরীরে স্বর্গনরক ভোগ হয় না। সংবৎসরে জন্ম না হইলে তাহারা "ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা" নিজ কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ লোকে গমন করে। স্বর্গে সুখভোগের দ্বারা পুণ্যের, নরকে যাতনা ভোগের দ্বারা পাপের ক্ষয় হইলে জীব আবার মর্ত্ত্যে স্থূলদেহ গ্রহণ করে।

স্বর্গ কি? মানসিক সুখভোগের স্থানেই স্বর্গ। নরক কি? মানসিক দুঃখভোগের ক্ষেত্রই নরক। স্বপ্নের মত মানসিক ভোগ কেবল সংস্কারমূলক। উহা কেবল মনের ভোগ। স্বপ্নের মত যখন ভোগ হয় তখন সত্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। স্বপ্নজ সুখদুঃখ আর ব্যক্তির সুখদুঃখ অনুভূতি হিসাবে একই। দৈহিক আর কেবল মানসিক সুখদুঃখ অনুভব সময়ে একই। স্বপ্নের অবগতি স্বপ্নকালে সত্য, পারলৌকিক সুখদুঃখ পরলোকে সত্যই, সে সময়ের সুখদুঃখের বিচার এখন স্থূলদেহে করা চলে না। যেমন স্থূলদেহের সুখদুঃখের বিচার মুক্তি অবস্থায় করা যায় না।

ঐহিকার্থপুণ্য অধিক জোর থাকিলে বর্ত্তমানজন্মেই ভোগ হয়, বর্ত্তমানজন্মেনা হইয়া উঠিলেই বা জোর কম হইলেই জন্মান্তরে ভোগ হয়। পরলোকে পারলৌকিকার্থ পুণ্যেরই ফলভোগ হইয়া থাকে। পরলোক ভোগ্য শুভকর্ম্মই পারলৌকিকার্থ পুণ্য। পরলোক কেহ মানুক বা নাই মানুক, পরলোক উদ্দেশ্যে কেহ কর্ম্ম করুক বা নাই করুক, পরলোকে সে কর্ম্মের ফলভোগ করিতেই হয়। কেহ যদি দুঃখশূন্য সুখ, অপূর্ব্ব, পৃথিবীতলে অসম্ভব সুখ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তদনুরূপ উপযুক্ত পুণ্য করিয়া যায়—তবে সে সুখের ভোগ কোথায় হইবে, স্থূলদেহে সম্ভব নহে, মর্ত্ত্যে মেলে না—তবে মানসিক ভোগ ব্যতীত সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ কোথায় হইবে? কেহ চাহিল—আমি আকাশে উড়িব, জলের মধ্যে প্রবেশ করিব। চিরকাল বাঁচিয়া চিরযৌবন থাকিয়া চিরযৌবনা রমনীভোগ করিব। অবসাদ হীন ভোগ, ক্লান্তি শূন্য উপভোগ করিয়া জরারোগ বিবর্জ্জিত হইয়া সুখভোগ করিব। ইচ্ছামত সংকল্প পূর্ণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যথাইচ্ছা বিচরণ করিব। এরূপে পৃথিবীতলে স্থূলদেহে অসম্ভব ভোগ সম্ভব নহে। কাজেই মনোময়ভোগ ব্যতীত উপায় নাই। সে আদর্শ কল্পনানুগামী সুখাস্বাদন মৃত্যুর পর মানসিকভাবে মনোময় দেহে হইতে পারে সেই স্থানই স্বর্গ। সেই সুখভোগের নামই স্বর্গসুখ। জীবদ্দশার কল্পনা স্বর্গে মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দেয়, মর্ত্ত্যের কামনাই স্বর্গে ফলবতী "স্বর্গলোকে মনোময়ানি শরীরাণি" "সংকল্পমূলা স্তত্র ভোগাঃ"। প্রাপ্য পুণ্যকৃতান্ লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ভোগের স্বর্গবর্ণনায় দেখ—চিরযৌবনা অপ্সরা, অবসাদ হীনভোগ, সংকল্পমাত্র ইচ্ছাপূরণ, জরারোগরাহিত্য, চিরবসন্ত, নিত্যজ্যোৎস্না, মণিময় শিলাময়তল প্রভৃতি বিদ্যমান।

যতদিন পুণ্যফল, ততদিন স্বর্গে অবস্থিতি, পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে পতন। স্বর্গ হইতে পতনের সময় উপস্থিত হইলে স্বর্গোপরি জীবের মোহ ছুটিয়া যায়, পৃথিবীতে আসিবার জন্য নূতন ইচ্ছা জাগে। পুণ্য ক্ষয় পাইল, অথচ মোহ ছুটিল না, ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে স্বর্গ হইতে পতন কত কষ্টের। এতকাল মানসিক সুখভোগ করার পর আবার পৃথিবীর সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে, ভাবিলেও কত কষ্ট। সে কষ্টভোগ; স্বর্গভোগের পর দুঃখভূয়িষ্ঠ সংসারে আসাই ত নরকযন্ত্রণা অপেক্ষাও ভয়ানক বলিয়া বোধ হইবে। তবে স্বর্গ ত কাহারও প্রার্থনীয় নহে। পাপী, তাপী, সাধারণ জীব (সংসারযন্ত্রা ঘাত ক্লান্ত) কেহই ত স্বর্গ চাহিবে না। স্বর্গভোগের পর আবার পৃথিবীতে আসিতে হইবে এই ভয়েই কেহ স্বর্গ চাহিবে না। স্বর্গভোগান্তে জীবগণের দশা কিছুদিনের জন্য রাজভোগ খাওয়ার পর মুটের পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসার মত; ইহা ভাবিতেও ভয় হয়। তাই বিধাতার দান স্বর্গভোগোপযোগী পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গভোগের উপর একটী অতৃপ্তি ও বিতৃষ্ণার ভাব দেখা দিবে। ক্রমশঃ স্বর্গের বাহ্যভোগ বহুদিনের পর আর সুখকর বলিয়া বোধ হইবে না। বহুকাল দুঃখ না থাকায় দুঃখস্মৃতি পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাওয়ায় সে বাহ্যসুখ আর তৃপ্তিপ্রদ লাগিবে না। স্বর্গ তখন স্বর্ণপিঞ্জর, ভোগ তখন পুণ্যক্রীত, অপ্সরা বেশ্যার মত, তাহাদের প্রেম স্বর্গবাসাবধি—এইপ্রকার মনোভাব জন্মিবে। তখন মনে হইবে, পৃথিবী আমার ভাল; সেখানে স্বাধীনতা আছে সেই স্থানই ভাল। পুণ্যের বিনিময়ে প্রেমহীন অপ্সরাদের মত দাসীর সেবা অপেক্ষা প্রেমময় সুখদুঃখের সমভাগিনী পৃথিবীর পত্নীর প্রেম মধুর। পুণ্যক্ষয় হইল স্বর্গমোহ ছুটিয়া গেল, মর্ত্ত্যে আসার আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এমন সময়ে সেই ভোগদেহ ভোগোপযোগী পুণ্যক্ষয়ের সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর (মাধ্যাকর্ষণী) শক্তি তাহাকে পৃথিবীতে পতিত করে। বলাই বাহুল্য, স্বর্গচ্যুতির সহিত ভোগদেহের চ্যুতি। ভোগদেহের চ্যুতির সহিত সূক্ষ্ম জীবাণু আকারে পৃথিবীতে পতন।

স্বর্গচ্যুতির পর বায়ুমণ্ডলে ভাসিতে ভাসিতে মেঘের ভিতর দিয়া বৃষ্টিধারার সহিত স্বর্গচ্যুত পুণ্যবান্ জীব জীবাণু আকারে পৃথিবীতে নামিয়া থাকে। স্থাবর সংশ্লেষ প্রাপ্ত হইয়া সংমূর্চ্ছিতবৎ থাকিয়া অবশিষ্ট পুণ্য বা কর্ম্ম অনুযায়ী নূতন জন্ম গ্রহণ করে। পারলৌকিকার্থ পুণ্য যাহারা করেন তাঁহারা পুণ্যবান্। পুণ্যবান্ যাঁহারা, কি পারলৌকিকার্থ কি ঐহিকার্থ দুইপ্রকার পুণ্যই তাঁহারা করিয়া থাকেন। পুণ্য করাই যে তাঁহাদের প্রকৃতি ইহলোকে ভোগপ্রাপক পুণ্য ত স্বর্গে ভোগ হয় না; কাজেই সেই অবশিষ্ট ঐহিকার্থ পুণ্যের ফলে স্বর্গভ্রষ্ট উৎকৃষ্ট জন্মই প্রাপ্ত হয়। স্বর্গ হইতে পতন সময় অনুভূতি থাকে না। পর্ব্বত হইতে কেহ ফেলিয়া দিলে পতনোন্মুখ জীবের যেমন পথিমধ্যেই শূন্যেই জ্ঞান লোপ হয়, সেইরূপ পতন সময়ে স্বর্গভ্রষ্টের জ্ঞান থাকে না। ইহাই বিধাতার করুণা।

পারের পথে।

(লেখক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ।)

পর পারের পথিক আমি পারের ঘাটে বসে,
পারের মাঝি কেন আমায় পার কর না এসে?
এ পারে যা কর্ম্ম ছিল সব করেছি শেষ,
পাওনা দেনা চুকিয়ে দিয়ে—ধরছি পারের বেশ।
ছেঁড়া কাঁথা, নামের ঝুলি সব গুছানো আছে,
ধীরে ধীরে পারের তরী ভিড়াও আমার কাছে।
পারের কড়ির বিনিময়ে শুন্‌তে যদি চাও,
বৈরাগির সেই ডুগডুগির গান;—ভিড়াও আগে নাও।
নাচার আমি তোমার কাছে গাইতে তেমন গান,
সে-দিন আমার নাইরে মাঝি মাতিয়ে তুলি প্রাণ।
জরাজীর্ণ দেহ খানি শীর্ণ, দীর্ণ, ক্ষীণ,
(এ) ভাঙ্গা গলায় বাজ্‌বে না আর সাধা বেণু বীণ।
হেসে গেয়ে আমোদ ক'রে কাটায়ে এ কাল—
ভাবছি শুধু আপন মনে ভীষণ পরকাল।
এ বার মাঝি দে পার করে, তুই ত রে কাণ্ডারী,
দিস্‌নে রে আর আমায় নিয়ে ওপার হ'তে পাড়ী॥

চারি কন্যা।

(লেখক—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি)

(৫)

এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে শক্তিদেব পিতার বাটীতে গেল। যদিও দুশ্চরিত্র বলিয়া পিতা দূর করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি বহুকাল নিরুদ্দেশ থাকায়, তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পিতৃস্নেহের স্বভাবই এইরূপ। তখনও ঘোষণা চলিতেছিল। পরদিন শক্তিদেব শুনিল, ঘোষণা কারীরা ঢেঁড়া দিয়া বলিতেছে—

"ক্ষত্রিয় হউক কিম্বা হউক ব্রাহ্মণ,
যে জন কনকপুরী করেছে দর্শন।
তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্য রাজকন্যা আর
করেছেন মহারাজ দিতে অঙ্গীকার।"

তাহা শুনিয়া শক্তিদেব ঘোষণাকারীদিগের নিকটে গিয়া বলিল—আমি কনকপুরী দেখিয়াছি। তাহারা তাহাকে রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন—আবার পূর্ব্বের মত মিথ্যা কথা বলিতে আসিয়াছ? শক্তিদেব বলিল—না মহারাজ! এবার আমি সত্য সত্যই কনকপুরী দেখিয়াছি। যদি মিথ্যা বলি, আমার শির লইবেন। রাজ-কন্যা আমাকে পরীক্ষা করুন।

রাজা তখন সেই খানেই কন্যাকে আনাইলেন। রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া বলিল—বাবা! আবার সেই প্রতারককে আনিয়াছেন? এ আবার কত মিথ্যাকথা কহিবে।

শক্তিদেব কহিল—রাজকন্যে! আমি সত্যই বলি আর মিথ্যাই বলি, পরে শুনিবে। আগে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। আমি কনকপুরীতে পালঙ্কের উপর তোমায় মৃত দেখি-য়াছি, এখানে জীবিত দেখিতেছি কেন?

এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা পিতাকে বলিল—বাবা! এবারে ইনি সত্য সত্যই কনকপুরী দেখিয়াছেন। আমি সেখানে গেলে ইনি আমাকে বিবাহ করিবেন। আমি আজিই সেই পুরীতে যাইব, ও সেই দেহে প্রবেশ করিব। এক মুনির সাপে আমি আপনার গৃহে জন্মিয়াছি। তিনি আমার এইরূপ শাপান্ত করিয়াছিলেন যে, তুমি মানবীদেহ ধারণ করিলে যখন কোনও মানুষ কনকপুরীতে গিয়া তোমার মৃতদেহ দেখিয়া রহস্য জিজ্ঞাসা করিবে, তখনই তুমি শাপ-মুক্ত হইবে, এবং সেই মানুষই তোমার স্বামী হইবে। মুনির প্রসাদেই আমি জাতিস্মরাও হইয়াছি।

এই বলিয়া রাজকন্যা তখনই দেহত্যাগ করিল। রাজবাটীতে রোদনের রোল উঠিল। শক্তি-

দেব ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ” হইল। “এত কষ্ট করিয়া, দুজনের একজনকে পাইয়াও পাইলাম না!” এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রাজবাটী হইতে বাহির হইল। আবার ভাবিল কনকরেখা ত বলিয়া গেল, সেখানে গেলে বিবাহ হইবে। তবে কেন বিষাদিত হই? সিদ্ধি সাহসের অধীন। সেই পথে আবার সেই কনকপুরীতে যাইব। বিধাতা অবশ্যই যাবার কোনও উপায় আবার করিয়া দিবেন।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া শক্তিদেব নগর হইতে নির্গত হইল। ধৈর্য্যশালী পুরুষেরা কোনও কার্য্যে বারংবার হতাশ হইলেও নিবৃত্ত হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(১)

বহুদিন হাঁটিয়া হাঁটিয়া সমুদ্রের তীরে সেই বিটঙ্কপুরে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্রেই একবণিক্‌কে দেখিতে পাইল। যাহার সঙ্গে সেবার যাইতে যাইতে জাহাজ ডুবি হইয়াছিল, সে সেই সমুদ্রদত্ত। দেখিয়া ভাবিল—এ সেই সমূদ্রে পড়িয়া কিরূপে উঠিল? আবার ভাবিল—তা' আর আশ্চর্য্য কি! আমি নিজেই ত তার জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় বণিক্ তাহাকে চিনিতে পারিয়া, আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া, সাদরে নিজের বাটীতে লইয়া গেল। যথোচিত আতিথ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জাহাজ ডুবি হইলে তুমি সমুদ্রে পড়িয়াছিলে; কিরূপে উঠিলে?

শক্তিদেব—যেরূপে তাহাকে মৎস্যে গ্রাস করিয়াছিল, যেরূপে উৎস্থলদ্বীপে উঠিয়াছিল, যেরূপে মৎস্যের উদর হইতে বাহির হইয়াছিল—সেই পর্য্যন্ত সমস্তই বলিল। অবশিষ্ট কথা আর বলিল না। তারপর বণিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি ভাই! কিরূপে উঠিলে বল?

বণিক্ বলিতে লাগিল—আমি ত সেই তোমার সঙ্গেই সমূদ্রে পড়িলাম। এক খানা তক্তা ধরিয়া তিন দিন ভাসিতে লাগিলাম। তারপর সেই পথে এক খানা পোত আসিতেছিল। আরোহীরা আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাতে তুলিয়া লইল। পোতে উঠিয়া আমার পিতাকে দেখিলাম। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে কোনও দ্বীপে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে করিতে ঘটনাটা জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি বলিলাম—বাবা! আপনি বহুদিনেও ফিরিলেন না দেখিয়া আমি স্বধর্ম্মবোধে নিজেই বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলাম। উৎস্থল দ্বীপে যাইতে যাইতে ঝড়ে জাহাজ ডুবি হওয়ায় তিন দিন সমুদ্রে ভাসিতেছিলাম। আজ আপনারা আমাকে তুলিলেন।

এই কথা শুনিয়া পিতা আমায় সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন—তুই এমন প্রাণসংশয় কার্য্যে কেন গেলি? তুই আমার এক সন্তান; আমার প্রচুর ধন আছে, তার উপর আরও

বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি। এই দেখ্ তোর জন্য পোত পূরিয়া ধনরত্ন আনিয়াছি।

এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি এই বিটঙ্কপুরে নিজ বাটিতে আমাকে লইয়া আসিলেন।

শক্তিদেব বণিকের কথা শুনিয়া সে রাত্রি তাহার বাটীতেই বিশ্রাম করিল। পরদিন তাহাকে বলিল—ভাই! আমাকে আবার সেথ উৎস্থল দ্বীপে যাইতে হইবে; কিরূপে যাইব বল দেখি?

বণিক্ বলিল—আমাদের লোকজন আজই সেখানে যাইবে। তাহাদের সঙ্গে যাইতে পার।

শক্তিদেব এ যাত্রায় সকলই সুলক্ষণ দেখিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইল। স্নানাহার করিয়া বণিকদিগের সহিত পোতে উঠিল। উৎস্থল দ্বীপে নামিয়া আশ্রয় লইবার জন্য বিষ্ণুদত্তের বাটিতে যাইতেছিল, পথে ধীবররাজ সত্যব্রতের পুত্রদিগের সহিত দেখা হইল। তাহারা শক্তিদেবকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল ওগো ঠাকুর! তুমি বাবার সঙ্গে কনকপুরীর সন্ধানে গিয়াছিলে, এতদিনের পর একা ফিরিয়া আসিলে, বাবা কোথায়?

শক্তিদেব বলিল—তোমাদের পিতা দৈবদুর্ব্বিপাকে স্রোতের টানে পড়িয়া নৌকা সমেত বড়বামুখে ডুবিয়া গিয়াছেন।

সে কথা শুনিয়া ধীবর পুত্রেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃত্যদিগকে বলিল—দুরাত্মাকে বাঁধ। এ আমাদের পিতাকে হত্যা করিয়াছে। তা না হইলে দুজনে এক নৌকায় গেল, একজন নৌকা সমেত পাকনায় ডুবিল, আর একজন নিরাপদে ফিরিয়া এল! আমাদের পিতৃহন্তা এই পাপিষ্ঠকে কাল প্রাতঃকালে চণ্ডীর কাছে বলি দিব। আজ ইহাকে সেইখানে বাঁধিয়া রাখিয়া আইস।

ভৃত্যেরা তখনই শক্তিদেবকে বাঁধিয়া চণ্ডীর মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিল। সে মন্দির বড় ভয়ঙ্কর স্থান। জনশূন্য প্রদেশে নিবিড় বৃক্ষরাজির মধ্যে অবস্থিত। সেখানে প্রত্যহ শত শত জীববলি হয়, মধ্যে মধ্যে নরবলিও হইয়া থাকে। শক্তিদেব যে সকল সুনিমিত্ত ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিল, সে সমস্ত এখন তাহার ভাগ্যদোষে দুর্নিমিত্তে পরিণত হইল। রাত্রি প্রভাত হইলেই তাহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইবে, সকল আশা তারাও চিরদিনের জন্য অস্তে যাইবে। তাহার চিন্তার অবধি নাই। বদ্ধ অবস্থায় ভূপতিত থাকিয়া রাত্রিকালে কাতর প্রাণে সে দেবীর স্তব করিতে লাগিল—

বালার্ক সদৃশ দেবি! তোমার মূরতি,
সদা রক্তপানে যেন রক্তবর্ণ অতি।
এহেন মুরতি তুমি ধরিয়া, যতনে
রক্ষা করিতেছ মা গো! জগতের জনে।
প্রিয়জন সমাগম লাভের আশায়
বহুদূর দেশ হ'তে এসেছি হেথায়।
অকারণে দুর্জ্জনের হস্তগত জনে
রক্ষা কর মা বরদে! প্রণমি চরণে।

এইরূপ স্তুতি করিয়া, নিরন্তর প্রবল দুশ্চিন্তায় দেহ মন অবসন্ন হওয়ায়, সে নিদ্রাভিভূত হইল। স্বপ্নে দেখিল—সেই মন্দিরের গর্ভগৃহ হইতে এক দিব্য স্ত্রীমূর্ত্তি বাহির হইয়া তাহাকে বলিতেছেন—"বৎস! ভয় নাই। যে ধীবর—পুত্রেরা তোমাকে বন্দী করিয়াছে, তাহাদের এক ভগিনী আছে। তাহার নাম বিন্দুমতী। সে প্রাতঃকালে এখানে আসিবে। তোমাকে দেখিয়া বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে। তুমি স্বীকার করিও। তাহা হইলে সে তোমায় মুক্ত করিবে। স্বপ্ন দেখিয়া শক্তিদেবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে আবার কত কি চিন্তা করিতে লাগিল।

ধীবর কন্যা স্বপ্ন দেখিয়াছিল, দেবী তাহাকে বলিতেছেন—"তোমার ভ্রাতারা আমার মন্দিরে যাহাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে, সে তোমার বর। প্রাতঃকালে গিয়া তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিও। সে স্বীকার করিলে, তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দিও।"

তাহার ভ্রাতাদিগকেও দেবী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিয়া স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন—"বিনা দোষে আমার নিকট বলি দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিস, সেই অপরাধে আমি তোদের সকলকে বধ করিব। ভাল চাহিস ত প্রাতঃকালে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবি, এবং তোদের ভগিনীকে তাহায় সম্প্রদান করিবি।"

(২)

ধীবরকন্যা প্রভাতে দেবীমন্দিরে আসিল। দ্বার খুলিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া, শক্তিদেবকে দেখিয়া বলিল—ভাই এদের মুখে তোমার বিবরণ শুনিয়াছি। তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি তোমায় মুক্ত করিব। দেবীর সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে প্রতারণা করিও না।

স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া অনিচ্ছা সত্বেও জীবন রক্ষার জন্য শক্তিদেব স্বীকার করিল। বিন্দুমতী তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। ইত্যবসরে ধীবরপুত্রেরা আসিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, পরম সমাদরে তাহাকে গৃহে লইয়াগেল। শক্তিদেব বিন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া কিছুদিন সেখানে রহিল। *

একদিন বিন্দুমতীর সহিত অট্টালিকার উপর বসিয়া আছে, এমন সময় দেখিল, একটা ইতর লোক গোমাংসের ভার লইয়া পথদিয়া যাইতেছে। বিন্দুমতীকে দেখাইয়া বলিল যে গোজাতি ত্রিভুবনের পূজনীয়, পরম হিতকারিণী, তাহাদিগকে যাহারা বধ করে, তাহাদের মাংস যাহারা খায়, তাহারা কি পাষণ্ড! কি পাপিষ্ঠ!

বিন্দুমতী বলিল—সে কথা আর বলিতে? আমি তুচ্ছ অপরাধে, গোজাতির প্রভাবে, এই ধীবরকুলে জন্মিয়াছি। গোবধে ও গোমাংস ভক্ষণে যে কি অধোগতি হয়, তাহা বলা যায় না।

* বলা বাহুল্য এঘটনা কলিযুগের পূর্ব্বে,—কলিতে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আরও প্রাণের দায়ে ব্রাহ্মণকে ঐরূপ নিকৃষ্টকার্য্যে সম্মত হইতে হইয়াছিল, ব্রাঃ সঃ সম্পাদক।

শক্তিদেব বলিল—প্রিয়ে! কে তুমি? কেন ধীবরকুলে জন্মিয়াছ? কি অপরাধ করিয়াছিলে, সে কাহিনী আমায় বলিতে হইবে।

নির্ব্বন্ধ সহকারে এইরূপ জিজ্ঞাসা করায় বিন্দুমতী বলিল—সে গোপনীয় কথা। তবে, আমি যাহা বলিব, তাহা করিতে যদি প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে বলিতে পারি।

শক্তিদেব কৌতুহল পরবশ হইয়া শপথ করিয়া বলিল—হাঁ প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

বিন্দুমতী বলিল—যাহা করিতে হইবে, আগে সেই কাজটাই বলিতেছি। এখানে তুমি আর একটি পত্নী পাইবে। সে অচিরে গর্ভবতী হইবে। আট মাসের গর্ভ হইতে তাহার পেট চিরিয়া তোমাকে সেই ভ্রূণ বাহির করিতে হইবে।

"সে কি কথা" বলিয়া শক্তিদেব বিস্মিত হইয়া ঘৃণা প্রকাশ করিল। বিন্দুমতী বলিল—কোনও বিশেষ কারণে এ কাজ তোমায় করিতেই হইবে। এখন আমার কথা শুন! আমি পূর্ব্বজন্মে বিদ্যাধর কন্যা ছিলাম। গরুর স্নায়ুতে নির্ম্মিত বীণার তাঁত দাঁতে কাটিয়াছিলাম বলিয়া সেই পাপে এই নীচবংশে জন্মিয়াছি।

এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় বিন্দুমতীর এক ভ্রাতা দ্রুতপদে আসিয়া শক্তিদেবকে বলিল—একটা প্রকাণ্ড বরাহ এই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে, যাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই মারিয়া ফেলিতেছে।

(৩

শক্তিদেব তখনই ধনুর্ব্বাণ লইয়া উপর হইতে নামিল। বরাহের অনুধাবন করিয়া তাহাকে বাণবিদ্ধ করিল। বরাহ পলায়ন করিয়া একটা বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিল দেখিয়া, শক্তিদেবও তাহাতে প্রবেশ করিল। দেখিল তাহার ভিতর এক উদ্যান, তন্মধ্যে অট্টালিকা একটি আশ্চর্য্যরূপা কন্যা ভয়ে দৌড়িয়া আসিতেছে।

শক্তিদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কল্যাণি! কে তুমি? কন্যা বলিল—দাক্ষিণাত্যে এক মহাপ্রতাপশালী রাজা আছেন, আমি তাঁহারই কন্যা। আমার নাম বিন্দুরেখা। আমার এখনও বিবাহ হয় নাই। একটা পাপিষ্ঠ দৈত্য হরণ করিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে। এ পর্য্যন্ত আমার উপর কোনও অত্যাচার করে নাই। সে আজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বরাহরূপ ধরিয়া বাহির হইয়াছিল। কোনও বীরপুরুষ তাহাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছে। সে এই বিবরে প্রবেশ করিয়াই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাই পলায়ন করিতেছি।

শক্তিদেব বলিল—আমিই তাহাকে মারিয়াছি। বিন্দুরেখা বলিল—আপনি কে? শক্তিদেব বলিল—আমি ব্রাহ্মণ, আমার নাম শক্তিদেব। কন্যা বলিল—তবে আপনিই আমার স্বামী। শক্তিদেব বলিল—তাই।

তার পর তাহাকে লইয়া বিবর হইতে বাহির হইল। গৃহে আসিয়া বিন্দুমতীকে সকল কথা শুনাইয়া, তাহার সম্মতিক্রমে বিন্দুরেখাকে বিবাহ করিল। অল্প দিনের মধ্যেই বিন্দুরেখার

গর্ভ সঞ্চার হইল। আট মাসের গর্ভ হইলে বিন্দুমতী শক্তিদেবকে বলিল—বীরবর! আমার নিকট শপথ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। বিন্দুরেখার গর্ভ আট মাসের হইয়াছে। এখন তাহার পেট চিরিয়া ভ্রূণটা বাহির কর। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিও না।

শক্তিদেব অধোবদনে কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিল। তারপর প্রতিজ্ঞালঙ্ঘনে মহাপাপ ভাবিয়া বিষণ্ণমনে বিন্দুরেখার নিকটে গেল। বিন্দুরেখা তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল—নাথ! আপনার এরূপ বিষাদের কারণ আমি বুঝিয়াছি। বিন্দুমতীর কথায় আমার গর্ভ বাহির করিতে আসিয়াছেন।

শক্তিদেব শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। সে কাতর হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিন্দুরেখা বলিল—কাতর হইবেন না। ইহা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে নৃশংসতার লেশমাত্র নাই, পাপেরও আশঙ্কা নাই। এ বিষয়ে দেবদত্তের কথা কহিতেছি শুনুন।

(৪)

কম্বুক নগরে হরিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবদত্ত বাল্যকালেই কৃতবিদ্য হইয়া যৌবনে দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিল। নিজের বস্ত্রাদি সমস্ত দ্রব্য হারাইয়া ভয়ে ও লজ্জায় পিতার গৃহে যাইতে পারিল না। হেথা সেথা ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন শ্মশান পার্শ্বস্থ বনমধ্যে জনশূন্য এক দেব মন্দিরে প্রবেশ করিল। দেখিল মন্দিরের এক কোনে এক কাপালিক বসিয়া জপ করিতেছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে যাইলে তিনি জপ সমাপন করিলেন। দেবদত্ত তাঁহাকে প্রণাম করিল, তিনিও তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কাপালিক তাহাকে মলিন ও বিষণ্ণ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবদত্ত নিজের অবস্থা তাঁহাকে জানাইল। কাপালিক বলিলেন—যাহারা কুকর্ম্মে রত হয়, যত ধনই পাউক, কিছুতেই তাহাদের কুলায় না। যদি উন্নতি লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহাহইলে আমার কথা শুন। আমি বিদ্যাধরত্ব লাভ করিবার জন্য সাধনা করিতেছি। তুমি আমার সহায় হও তাহা হইলে তুমিও সেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। যাহা বলিব, তাহাই করিবে, প্রতিজ্ঞা কর।

দেবদত্ত "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার নিকটেই রহিল। রাত্রিকালে কাপালিক তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানে গিয়া এক বৃহৎ বটবৃক্ষের মূলে পূজা করিয়া পরমান্ন ভোগ দিলেন। তার পর দেবদত্তকে বলিলেন—তুমি প্রতি রাত্রে একাকী এইখানে আসিয়া এইরূপে পূজা করিও। মন্ত্র আর কিছুই নহে, কেবল—"বিদ্যুৎ প্রভে! ইমাং পূজাং গৃহাণ।"

কাপালিকের আদেশে দেবদত্ত প্রতিরাত্রে সেইখানে গিয়া সেইরূপে পূজা করিতে লাগিল। একদিন পূজার পর বটগাছটা দ্বিধা হইল। তাহার ভিতর হইতে এক রমণী বাহির হইয়া, দেবদত্তকে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিল। দেবদত্ত প্রবেশ করিয়া দেখিল এক মনিময় মন্দির, তন্মধ্যে এক সুন্দরী রত্নপালঙ্কে বসিয়া আছে। সুন্দরী উঠিয়া দেবদত্তের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পাশে বসাইল। বলিল—আমি যক্ষপতি রত্নবর্ষের কন্যা। আমার নাম বিদ্যুৎ প্রভা ঐ কাপালিক জালপাদ আমার আরাধনা করিতেছে। আমি তাহাকে সিদ্ধি দিব। কিন্তু তুমি আমার প্রাণেশ্বর। আমায় বিবাহ কর।

দেবদত্ত গন্ধর্ব্ববিধানে তাহাকে বিবাহ করিয়া একমাস তাহার নিকটেই রহিল। তারপর তাহার গর্ভসঞ্চার হইলে কাপালিকের নিকটে আসিয়া ভয়ে ভয়ে সমস্তই বলিল। কাপালিক নিজের সিদ্ধিলাভের সুযোগ হইয়াছে বুঝিয়া প্রসন্নচিত্তে তাহাকে বলিলেন—বৎস! ভালই করিয়াছ। আর পূজা করিতে হইবে না। আমার কাছেই থাক।

আটমাস পূর্ণ হইলে কাপালিক পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাস্মরণ করাইয়া দেবদত্তকে কহিলেন—এখন যাও, সেই যক্ষকন্যার উদর বিদীর্ণ করিয়া ভ্রূণটা লইয়া আইস। দেবদত্ত যক্ষকন্যার

নিকটে গিয়া বিষণ্ণবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্যুৎপ্রভা বলিল—প্রিয়তম! তোমার বিষাদের কারণ আমি জানি। আমার উদর বিদীর্ণ করিয়া গর্ভটা লইয়া যাইবার জন্য কাপালিক তোমায় পাঠাইয়াছে। তাই কর। তুমি না করিলে আমি নিজেই করিব।

রমণী এইরূপ বলিলেও দেবদত্ত যখন তাহা করিতে পারিল না, তখন সে নিজেই উদর বিদীর্ণ করিয়া, দেবদত্তের হাতে ভ্রূণটা দিয়া বলিল—বিদ্যাধরত্ব লাভ করিবার এ একটা উপায়। আমি বিদ্যাধরী ছিলাম, শাপে যক্ষী হইয়াছি। আমার এইরূপই শাপান্ত ছিল। আমি এখন স্বস্থানে চলিলাম। সেই খানেই আমাদের আবার মিলন হইবে।

এই বলিয়া বিদ্যুৎপ্রভা কোথায় চলিয়া গেল। দেবদত্ত দুঃখিত মনে সেই ভ্রূণটা আনিয়া কাপালিককে দিল। সাধুলোক দুর্লভ বস্তুর জন্যও স্বার্থপর হয় না।

কাপালিক সেই ভ্রূণমাংস পাককরিয়া দেবদত্তের হাতে একটু দিয়া বলিল—শ্মশানে গিয়া ভৈরবকে বলিদিয়া আইস। তারপর ইহা দুইজনে খাইব।

দেবদত্ত কাপালিকের আদেশ পালন করিয়া, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কাপালিক সমস্তই খাইয়াছে। বলিল—কৈ! আমার জন্য একটুও রাখেন নাই?

জালপাদ তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধরমূর্ত্তি ধরিয়া দিব্য খড়্গ হস্তে করিয়া শূন্যে উঠিয়া গেল। দেবদত্ত ভাবিতে লাগিল—কি কষ্ট! পাপিষ্ঠ আমায় প্রবঞ্চনা করিল! ভাল মানুষের ভালই নাই। কিরূপে ইহার প্রতিশোধ লইব? কিরূপে উহাকে পাইব? বেতাল সিদ্ধি ভিন্ন আর আমার উপায় নাই।

এইরূপ স্থির করিয়া সে সেই রাত্রেই শ্মশানে গেল। অনুসন্ধান করিয়া একটা মৃতদেহ আনিয়া সেই বটগাছের তলায় তাহার উপর বসিয়া বেতালের আবাহন ও পূজা করিল। মৃতদেহে ভর করিয়া বেতাল কহিল—আমাকে নরমাংস বলি দাও। দেবদত্ত তখন নিজের মাংস কাটিয়া বলি দিল। বেতাল বলিল—তোমার এইরূপ সাহসে ও সহিষ্ণুতায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার কি ইচ্ছা বল, আমি তাহা সম্পাদন করিব।

দেবদত্ত বলিল—প্রতারক জালপাদ যেখানে আছে, আমাকে সেইখানে লইয়া চল। তার পর তাহাকে নিগ্রহ করিবে।

বেতাল তখনই তাহাকে কাঁধে চাপাইয়া শূন্যপথে বিদ্যাধরপুরীতে লইয়া গেল। দেবদত্ত সেখানে গিয়া দেখিল, জালপাদ রমণীয় মণিমন্দিরের মধ্যে গর্ব্বভরে রত্নসিংহাসনে বসিয়া আছে। তাহার হস্তে খড়্গখানাও রহিয়াছে। বিদ্যুৎ প্রভার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে আয়ত্ত করিবার জন্য মৈত্রী ও ভয় প্রদর্শন করিতেছে। দেবদত্তকে দেখিয়া আনন্দে বিদ্যুতপ্রভার বদন প্রফুল্ল হইল; ভয়ে ও বিস্ময়ে জালপাদের হস্ত হইতে খড়্গ খানা পড়িয়া গেল।

দেবদত্ত তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইল, কিন্তু তাহাকে বধ করিল না। বীরপুরুষেরা ভীত শত্রুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন।

বেতাল তাহার নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইলে, দেবদত্ত তাহাকে নিষেধ করিল। বলিল—ভীরু পাষণ্ডকে মারিয়া কোনও ফল নাই। ইহাকে পৃথিবীতে ইহার নিজের আশ্রম লইয়া যাও। পাপিষ্ঠ সেইখানে যাবজ্জীবন কাপালিক হইয়াই কাল কাটাউক।

সেই সময়ে দেবী সর্ব্বাণী কৈলাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেবদত্তকে বলিলেন—বৎস! তোমার অসাধারণ সাহসে ও মহানুভবতায় প্রসন্ন হইয়াছি। আমি তোমাকে এই বিদ্যাধর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম।

এই বলিয়া দেবী প্রণত দেবদত্তকে বিদ্যাদান করিয়া ও বিদ্যাধররাজ্য দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বেতাল সিদ্ধিভ্রষ্ট জালপাদ কে, ঘাড়ে ধরিয়া তাহার আশ্রমে লইয়া গেল। অধার্ম্মিকের সম্পদ্

অধিক দিন থাকেনা। দেবদত্ত বিদ্যাধর রাজ্য পাইয়া বিদ্যুৎ প্রভার সহিত পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

(৫)

আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া বিন্দুরেখা মৃদুমধুর বচনে পুনর্ব্বার পতিকে বলিল—আপনি শোক পরিত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচে আমার উদর বিদীর্ণ করুন। গুরুতর কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

বিন্দুরেখার বচন শুনিয়াও দুঃখে ও ঘৃণায় শক্তিদেব যখন সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল না, তখন আকাশবাণী হইল - শক্তিদেব! বিন্দুরেখার উদর বিদীর্ণ করিয়া ভ্রূণ নির্গত কর। মুষ্টি দ্বারা তাহার কণ্ঠ ধারণ করিলেই সে খড়্গে পরিণত হইবে।

শক্তিদেব সেই দৈববাণী শুনিয়া বিন্দুরেখার উদর বিদীর্ণ করিয়া ভ্রূণটার কণ্ঠ ধরিল। গ্রহণ মাত্রেই সে খড়্গ হইয়া গেল। বিন্দুরেখাও তখনই সে দেহ পরিত্যাগ করিল।

শক্তিদেব প্রথমা পত্নী বিন্দুমতীর নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বিন্দুমতী বলিতে লাগিল—নাথ! আমরা তিন ভগিনী অগ্র্যতপা মুনির শাপে কনকপুরী হইতে মর্ত্তালোকে আসিয়া মানব যোনিতে জন্মিয়া ছিলাম। আমাদের মধ্যমা ভগিনী কনকরেখার শাপান্ত বর্দ্ধমানে তুমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। কনিষ্ঠা ভগিনীর শাপান্ত ঐ রূপেই হইল। আমি তৃতীয়া আমিও এখন শাপমুক্ত হইলাম। তুমি এখনই খড়্গসিদ্ধি প্রভাবে শূন্য পথে কনকপুরীতে যাও

এই বলিয়াই বিন্দুমতী দেহত্যাগ করিল। শক্তিদেবও তৎক্ষণাৎ কনকপুরীতে গেল। পূর্ব্বে তিন কক্ষে যে তিনটী মৃত দেহ দেখিয়াছিল, তাহাদের আত্মা সেই সেই দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছে; চন্দ্রপ্রভা তাহাদের মঙ্গলাচরণ ও প্রসাধন করিতেছে, দেখিতে পাইল। সানুরাগ হৃদয়ে সস্মিত বদনে চন্দ্রপ্রভা শক্তিদেবের মুখের দিগে অনিমেষনয়নে চাহিয়া বলিল—বর্দ্ধমানে যে রাজকন্যা কনকরেখাকে দেখিয়াছিলে, সে এই আমার মধ্যমা ভগিনী চন্দ্ররেখা। উৎস্থল দ্বীপে যে ধীবররাজের কন্যা বিন্দুমতীকে প্রথম বিবাহ করিয়াছিলে, সে এই আমার তৃতীয়া ভগিনী শশিরেখা। তারপর সেইখানেই দৈত্যের আনীত যে রাজকন্যা বিন্দুরেখাকে বিবাহ করিয়াছিলে, সে এই আমার কনিষ্ঠা ভগিনী শশিপ্রভা। আর যে তোমায় সর্ব্ব প্রথমে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া পতিত্বে বরণ করিবার জন্য পিতার অনুমতি আনিতে গিয়াছিল, যাহার নিষেধ বচনে অবহেলা করিয়া এই উপর তলায় উঠিয়াছিলে, আমিই সেই চন্দ্রপ্রভা; বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ?

শক্তিদেব একটু অপ্রতিভ হইল। চন্দ্রপ্রভা আবার বলিল—এখন আমাদের সঙ্গে আমাদের পিতার নিকটে চল। তিনি আমাদের মধ্যে কাহাকে তোমায় সম্প্রদান করেন অথবা কাহাকেও না করেন, দেখা যাউক।

চন্দ্রপ্রভার এ কথা শুনিয়া শক্তিদেব বিষণ্ণ হইল।

তারপর তাহারা চারি ভগিনী মিলিয়া শক্তিদেবকে লইয়া মাতাপিতার নিকটে গেল। তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখনই দৈববাণী হইল—"বৎস শশিখণ্ড! তুমি এই বরকেই চারি কন্যা ও কনকপুরী রাজ্য সম্প্রদান কর।"

দৈববাণী শুনিয়া শশিখণ্ড, শক্তিদেবকে বিদ্যাধর বিদ্যা দান করিয়া, তাহার নাম শক্তিবেগ রাখিলেন। তার পর মহা সমারোহে তাহাকে

চারি কন্যা।

ও কনকপুরী রাজ্য সম্প্রদান করিলেন। শক্তিদেব শ্বশুর শ্বশুড়ীর চরণে প্রণাম করিয়া, পত্নীদিগের সহিত কনকপুরীতে আসিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।

(সম্পূর্ণ)।

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়।

পূর্ব্ববঙ্গ প্রাদেশিক ব্রাহ্মণ সভার সভাপতির অভিভাষণ।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

বরেণ্য ভূদেবগণ!

অশেষ মনীষা সম্পন্ন সদাচার পরায়ণ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বহু আদর্শ ব্রাহ্মণের সমুপস্থিতি সত্ত্বে আপনারা আমাকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়াছেন। ইহা আমার গৌরব কি লাঞ্ছনা—সম্মান কি বিড়ম্বনা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারণ আপনারা ভৃগু, কশ্যপ ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি প্রাতঃ স্মরণীয় মহর্ষিগণের সন্তান; আমি যেন তাঁহাদের গৌরব-মণ্ডিত-চ্ছবি আপনাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তাই ত্রুটি—বিচ্যুতির ভয়ে হৃদয় সন্ত্রস্ত ও ভক্তিভরে মস্তক অবনত হইতেছে। পক্ষান্তরে আপনারাই ব্রহ্মণ্য-দেবের প্রত্যক্ষ শ্রীবিগ্রহ। আমি সুদীর্ঘকাল যাবত এই বিগ্রহেরই সেবা ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারি নাই। বিগত বর্ষ হইতে আমাকে সভাপতি নামে চিহ্নিত সেবক করিয়া লইয়াছেন। তাই বুঝি আজ ও নামে সভাপতি ফলতঃ শ্রীশ্রীব্রহ্মণ্যদেবের পুরাতন সেবক জ্ঞানে আমাকেই আহ্বান করিয়াছেন। স্বীয় যোগ্যতা বা অযোগ্যতার বিচার না করিয়া প্রভুর কার্য্য সম্পাদান করাই সেবকের ধর্ম্ম, আমি সেই ধর্ম্মেরই অনুসরণে প্রবৃত্ত। হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে সর্ব্বশক্তিময় ভগবন্! আমার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার কর—আমি যেন সেবক ভাবে তোমাতে আত্ম-সমর্পণের ফলে আত্মলাভ করিতে সমর্থ হই। আমার ব্রাহ্মণ জন্ম সার্থক হইয়া যাক্।

বরেণ্য ভূদেববৃন্দ! বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী সুবর্ণগ্রামে আসিয়া যেরূপ অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মরণ হইতেছে—সেইরূপ এই পুণ্য ভূমিতে আপনাদিগকে সম্মিলিত দেখিয়া অতীত যুগের মহর্ষিগণের পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদেরই বংশধর আমরা, এই গৌরবে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে; সেই অলোক-সামান্য মহিমার অমৃত-সরস সংস্পর্শে মনের সমস্ত আবিলতা মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন মুছিয়া গিয়াছে। আর ভাবিতেছি ঋষির সন্তান আমি, জগদ্ যন্ত্রের কালচক্র নেমির বিঘূর্ণনে কোথায় সরিয়া গিয়া কোন্ আসনে সমাসীন হইয়াছি। হায়! কোন স্মরণাতীত কালে ব্রাহ্মণগণ অমঙ্গলসঙ্কুল ভূমণ্ডলে অজ্ঞানের সূচীভেদ্য অন্ধকারে সর্ব্বপ্রথম মধুর মঙ্গলময় জ্ঞানের স্নিগ্ধ দীপাবলি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন; সেই

দীপালোকে শুধু তাঁহারা নহেন, কেবল ভারতবাসী নহে, বিশ্বমানবজাতি তাহাদের মানবত্ব বিকাশের সুযোগ পাইয়াছিল। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। তাই ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ্ পৃথিব্যাঃ সর্ব্বমানবাঃ।

এই ভারতবর্ষে সমুৎপন্ন ব্রাহ্মণ জাতিই পৃথিবীর মানবসমাজের সচ্চরিত্রতার শিক্ষক। সুতরাং তাঁহাদিগের অলোক সমান্ত অভ্যুদয় কেবলমাত্র স্বীয় কল্যাণেই পর্য্যবসিত হয় নাই, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ ইহাতে অনুস্যূত ছিল—ছিল কেন যতদিন মহর্ষিগণের বংশধর একজনমাত্র ও জীবিত থাকিবেন, ততদিন এই উদ্দেশ্যে তাঁহার দৃষ্টি উপনিবদ্ধ থাকিবে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের অবস্থা যতই কেন হীন হউক না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত এই মহৎ উদ্দেশ্য আমরা কখনও বিস্মৃত হইবনা। সাময়িক অবস্থা হীনতার জন্য যাহাতে মানসিক দৈন্য উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে জাগরূক থাকিতে হইবে। দীনতায়ই মানবের পতন, আর আত্ম-সামর্থ্যে বিশ্বাসেই অভ্যুদয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

নাত্মানমবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাম্।

কিছুদিন আমাদের হীনাবস্থা হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই; আত্ম-সামর্থ্যে বিশ্বাস হারাইবার কারণ নাই, অনাদরের ভস্মস্তূপে আত্ম-নিক্ষেপের আবশ্যকতা নাই। যতদিন একজন ব্রাহ্মণ ও জীবিত থাকিবেন ততদিন এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিবে। ব্রাহ্মণের দেহ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য নহে।

শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—
ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ক্ষুদ্র কামায় নেষ্যতে।
কৃচ্ছ্রায় তপসে চেহ, প্রত্যানন্ত সুখায় চ॥

ব্রাহ্মণের ইহলোকে কঠোর তপস্যাচরণে চিত্তশুদ্ধি ও তাহার ফলে জ্ঞানোদয়ে মুক্তিই চরম লক্ষ্য। ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ব্রাহ্মণের দেহ নহে। ব্রাহ্মণের প্রাথমিক স্বার্থ স্বীয় অনুষ্ঠিত সদাচারের অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করিয়া সমগ্র মানব জাতির কল্যান—সাধন; চরম স্বার্থ মুক্তি। অন্যসম্প্রদায়কে নিপীড়িত করিয়া নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধন অথবা অন্যজাতির সর্ব্বস্বান্ত করিয়া নিজ জাতিকে ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত করা ব্রাহ্মণ উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে করেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—স্বয়ম্ভু সমস্ত জগতের রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ জাতির উপরে জগতের রক্ষার ভার বিন্যস্ত। এই ভার স্বয়ং ভগবান্ অর্পণ করিয়াছেন। ইহা মানব কল্পিত মোহ বিজৃম্ভন নহে। ব্রাহ্মণ চিরকাল এই গুরুভার বহনে অভ্যস্ত, পবিত্র ঋষি শোনিত সংস্রাব পূত স্বভাব ব্রাহ্মণ সেই ভার উপেক্ষায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এই জগদ্রক্ষার ভার ভোগের তমিস্রার অন্ধকারে আচ্ছন্ন নহে। ইহা শম দম তিতিক্ষা ত্যাগ ও জ্ঞান পৌর্ণমাসীর শরদিন্দু কিরণে সমুজ্জ্বল।

এই রক্ষার ভিত্তি আপাত মনোহর অসার চাক্‌চিক্যময় কাচ চূর্ণ স্তূপ নহে, ইহার ভিত্তি চির-স্থির—নিত্য একরূপ বিশুদ্ধ মর্ম্মর প্রস্তর—ধর্ম্ম। যাহাতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সামান্য লক্ষণ, বিশেষ লক্ষণ এই যে—বেদে এবং ভগবদ্‌বাক্য ও ঋষিবাক্যে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট তাহাই ধর্ম্ম। বেদ অপৌরুষেয়, তন্ত্র ভগবদ্বাক্য, স্মৃতি এবং পুরাণ ঋষিবাক্য। দর্শন শাস্ত্রও স্মৃতি শাস্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা ধর্ম্মশাস্ত্র। এই ধর্ম্মশাস্ত্রই মানবের মোহ তিমির বিনাশ পূর্ব্বক জ্ঞানচক্ষুরুন্মীলনের অঞ্জনশলাকা। যখন পৃথিবীতে অন্যকোন ধর্ম্মের উদয় হয় নাই, তখন আমাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া নিজ অপূর্ব্ব মনীষার আলোকে বিশ্ব উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। তখন ইতিহাস প্রসিদ্ধ অন্যকোন ধর্ম্মই ছিলনা সুতরাং ধর্ম্ম বলিলে অন্য কোন ধর্ম্ম না বুঝাইয়া এই ধর্ম্মকেই বুঝাইত। বস্তুতঃ আমাদের আর্য্যধর্ম্মই একমাত্র 'ধর্ম্ম' পদ বাচ্য। অন্য সকল ধর্ম্মেই বিশেষণ যোগ করিতে হয়। এই ধর্ম্ম অপৌরুষেয় বেদ মূলক, ইহার ধ্বংস বা বিলয় নাই বলিয়া 'সনাতন'। এই সনাতন ধর্ম্মের নিমেষ পাতে কত ধর্ম্মের উত্থান পতন, কত জাতির উদয় বিলয় হইয়া গিয়াছে; কতযুগ যুগান্তর ক্ষণ মুহূর্ত্তের ন্যায় এই সনাতন ধর্ম্ম হেলায় অতিবাহিত করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? এই সনাতন ধর্ম্মই যে বিশ্ববিজ্ঞান প্রসূতি, বিশ্ব মানবের অক্ষয় কবচ, ইহার উপদেশ বা শাসনই যে উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের পথ প্রদর্শক দিগ্‌দর্শন, কে ইহা কোন অকুতস্থ অস্বীকার করিতে পারেন? কিন্তু দুঃখের বিষয় কালপ্রভাবে এবং বৈদেশিক শিক্ষার মোহে বিকৃতবুদ্ধি স্বজনগণ এতাদৃশ উপাদেয় শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন হইয়া লালসার উৎকট বেগে বিপরীত পথে চলিয়াছেন। শাস্ত্রবিশ্বাস হারাইয়া পরকালে আস্থাহীন হইয়া ইহকালের ক্ষণভঙ্গুর ভোগ তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছেন। এই ব্যাকুলতা যে সমগ্র জীবনেও মন্দীভূত হইবার নহে, ইহার মূলে যে শাস্ত্রচর্চ্চার অভাবে অসংযম কীট প্রবিষ্ট এবং তাহার উন্মূলক একমাত্র শাস্ত্রবিশ্বাস ও তদনুকূল আচরণ, ইহা তাঁহারা অনুমাত্রও অনুভব করিতে পারেন না। ধর্ম্মশাস্ত্র সংসারাতপক্লিষ্ট জনগণের সুশীতল বটচ্ছায়া, তৃষিতের সুপেয় জল, আর্ত্তের শরণ, বিপন্নের আশ্রয় স্থল। যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এই শাস্ত্র কল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন তিনিই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন। মূলে বিশ্বাস প্রয়োজন, এ বিশ্বাস কথার বিশ্বাস নহে—প্রাণের বিশ্বাস। বিশ্বাস-বিহীন মিথ্যাচার অসূয়ককে শাস্ত্র দূর হইতে বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে আছে—

"বিদ্যা হবৈ ব্রাহ্মণমাজগাম তবাহমস্মি ত্বং মাং পালয়, অনর্হতে মানিনে নৈব মাদা, গোপায় মাং শ্রেয়সী তেহহমস্মি।"

বিদ্যা দেবী জ্ঞান গুরু ব্রাহ্মণের নিকটে আসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমারই নিধি। আমাকে শ্রদ্ধাবিহীন প্রভূত অভিমানীর হস্তে সমর্পণ করিওনা। তুমি আমাকে রক্ষা করিলে আমি তোমার মঙ্গল বিধান করিব। ভগবান্ মনু ও এই শ্রুতিরই অনুধ্বনি করিয়াছেন।

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাং।
অসূয়কায় মাংমাদাস্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমাঃ॥

মঙ্গলময় শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অমার্জ্জিত বুদ্ধি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি যে বিপরীত ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাহারা শাস্ত্রের অনুগামী হইতে বাধ্য নহেন, প্রত্যুত শাস্ত্রকেই তাঁহাদের অনুগামী করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা

কেবলং শাস্ত্র মাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

এই বৃহস্পতি বচনকে প্রমাণ স্বরূপে উপন্যস্ত করিয়া যুক্তি অর্থে লৌকিক যুক্তি বলিতে চাহেন। অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের অপরিসীম জ্ঞানরাশিকে কূপ মণ্ডূকের ন্যায় সীমাবদ্ধ করিয়া ভ্রম প্রমাদ সঙ্কুল লৌকিক যুক্তিতে পর্য্যবসান করা অদূর দর্শিতার পরিচায়ক। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানু সন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।

ঋষি সেবিত বলিয়া আর্ষ শব্দের অর্থ বেদ। ধর্ম্মোপদেশ-বেদমূলক স্মৃতি, ইহা বেদশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ তর্ক অর্থাৎ মীমাংসাদি শাস্ত্রদ্বারা যিনি বিচার করেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মরহস্য বুঝিতে সমর্থ। মীমাংসায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নহেন। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে বেদের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মীমাংসাদি দর্শন সমুদ্র কিরূপ আলোড়ন করিতে হয়। কেবল তাহা নহে—মাল্য সূত্রের ন্যায় বেদসূত্র সকল শাস্ত্রেই অনুস্যূত। একমাত্র বেদজ্ঞান অবলম্বন করিয়া নিখিল শাস্ত্র আর্ষ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। তাই ইতিহাস এবং পুরাণ বেদ রহস্য অবগতির জন্য অবশ্য অনুশীলনীয়। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্প শ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।

বেদের তাৎপর্য্য ইতিহাস ও পুরাণ হইতেও অবগত হইবে। যে মীমাংসাদি দর্শন ও ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ সে অল্পজ্ঞ। বেদ ভয় করেন তিনি সেই অল্পজ্ঞের হাতে পড়িলে প্রহৃত বা লাঞ্ছিত হইবেন। অর্থাৎ তাঁহার অপব্যাখ্যা হইবে।

ঋষি সন্তানগণ! আপনাদের শাশ্বত সত্যার্থদর্শী বেদের কি সে লাঞ্ছনা ঘটে নাই? পবিত্র প্রণব মুখরিত সাম ঝঙ্কার কি চাষার গান বলিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই? যাক্, সে হইয়াছে বিধর্ম্মীর মুখে, অতত্ত্বজ্ঞের মুখে; তাহাতে আমাদের তেমন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যাঁহারা নব্য শিক্ষার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত, তাঁহারা এই শ্রুতি জননীর প্রকৃত স্নেহ পীযূষ ধারার আস্বাদ না বুঝিয়া, তাদৃশ পূতনার মায়ায় মুগ্ধ। এমন কি নিজ নিজ সর্ব্বজ্ঞ পূর্ব্ব পুরুষ মহর্ষিগণের বচনে আদর সম্পন্ন ত নহেনই প্রত্যুত অবজ্ঞা সম্পন্ন। বৈদেশিক শিক্ষায় এ অবজ্ঞা অঙ্কুরিত, স্বেচ্ছাচারে পুষ্পিত এবং দাম্ভে ফলিত। এই বিষময়ফলের ভোগে অত্যাধিক পরিমাণে প্রায়

প্রত্যেক আর্য্য সন্তানই প্রপীড়িত। এই পীড়া দুঃসাধ্য হইলেও এখনও অসাধ্য হয় নাই। এখনও প্রতীকারের সময় আছে। ইহার প্রতীকার একমাত্র "শাস্ত্রে বিশ্বাস"। এই শাস্ত্র বিশ্বাসের অভাবেই হৃদয়ে হৃদয়ে আধি ও দেহে দেহে ব্যাধি—সমাজ শরীর কঙ্কালাবশিষ্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই বিশ্বাস শুধু কথার বিশ্বাস নহে—প্রাণের বিশ্বাস। যিনি মনে প্রাণে শাস্ত্রে বিশ্বাসী তিনি বৈষম্যের মধ্যে ও সাম্যের সৌম্য মূর্ত্তি অবলোকন করেন। সৃষ্টি বৈষম্য ময়—জগতে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়, সমস্তই পরস্পর বিভিন্ন। এমন কি এক জাতীয় মানবের মধ্যে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমতার মধ্যেও এমন একটী বৈষম্য বিদ্যমান, যাহার ফলে তাহাকে অপরব্যক্তি বলিয়া অনায়াসে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই বৈষম্য যেমন বিধাতৃকৃত—মানবকৃত নহে, সমাজে বর্ণ বৈষম্যও সেইরূপ বিধাতৃ কৃত—মানব কৃত নহে।

তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।
(ঋগ্‌বেদ)

প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় ঊরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। উল্লিখিত সূক্তে উপক্রমে 'মুখমাসীৎ' এইরূপ থাকিলেও উপসংহারে 'পদ্ভ্যামজায়ত' এইরূপ প্রয়োগ থাকায় 'মুখাদজায়ত' এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। পর পর সূক্তেও 'চন্দ্রমা মনসো জাতঃ' ইত্যাদি রূপেই উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ এই মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি সম্বন্ধে যজুঃ সংহিতার সপ্তম কাণ্ডে 'স মুখত স্ত্রিবৃতং নিরমিমীতে' ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা হইলেই বুঝিতে হইল এই বৈষম্য উৎপত্তির সমকালেই হইয়াছে, সুতরাং ইহা—বিধাতৃ-কৃত। ভগবান্ মনু ও বলিয়াছেন—

লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৃষ্টি বৈষম্যময়। বৈষম্যব্যতিরেকে এই জগদ্ বৈচিত্র্য থাকিতে পারে না। এই বৈচিত্র্য উপাদানের বৈষম্য নিমিত্তক হইয়াছে। উপাদান ত্রিগুণ—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা—প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি। যেমন অকারাদি বর্ণমালা পরস্পর মিলিত ও বিযুক্ত হইয়া জগতের যাবতীয় ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব নিত্য মিলিত গুণ ত্রয়ের ন্যূনাধিক্যে এই বৈষম্যময় অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। সাম্যে সৃষ্টি নাই, সাম্যে প্রলয়; গুণ বৈষম্যই যদি সৃষ্টির হেতু, তবে গুণের কার্য্যে কেন বৈষম্য থাকিবে না? এই গুণত্রয়ের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বভাব সিদ্ধ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণেও তাই তারতম্য দেদীপ্যমান। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ।

ইহা দ্বারাও চাতুর্ব্বর্ণ্য যে ঈশ্বর সৃষ্ট, মানব কল্পিত নহে তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। এই

বচনে 'গুণ কর্ম্ম বিভাগশঃ' এই অংশ দেখিয়া কেহ কেহ বলেন জন্মাধীন চাতুর্ব্বর্ণ্য' ঈশ্বর সৃষ্ট নহে, গুণাধীন চাতুর্ব্বর্ণ্যই ঈশ্বর সৃষ্ট। এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকৃতই অসমীচীন। কারণ গুণাধীন চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি অভিপ্রেত হইলে কর্ম্মশব্দটী নিষ্প্রয়োজনীয় হয় এবং শস্ প্রত্যয়ের ও কোনই সার্থকতা থাকেনা। 'গুণ বিভাগেন' বলিলেই চলে। শস্ প্রত্যয়টী বীপ্সার্থের দ্যোতক সুতরাং এক এক বর্ণের গুণ এবং কর্ম্ম সহ আমি চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট করিয়াছি, এইরূপ অর্থই যুক্তি যুক্ত। অপর প্রতিবাদীর—আমি গুণও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করিয়াছি, ব্রাহ্মণোচিতগুণ যাহার আছে সেই ব্রাহ্মণের কর্ম্ম করিলে ব্রাহ্মণ হইবে। ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে ও এই নিয়ম। এইরূপ ব্যাখ্যা বস্তুতই অসঙ্গত, ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করিব। গুণকর্ম্ম সংকারে সৃষ্টি ভগবানের অভিপ্রেত না হইলে হিংসা পরাঙ্মুখ সত্যনিষ্ঠ অর্জ্জুনকে ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিয় —

"সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।"

অর্থাৎ অর্জ্জুন এরূপ যুদ্ধলাভ নিতান্ত সুখ সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়ের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এরূপভাবে উত্তেজিত করা এবং স্বভাবজ ব্রহ্মকর্ম্ম ও ক্ষাত্রকর্ম্ম প্রভৃতির কীর্ত্তন করা শ্রীভগবানের পক্ষে নিতান্তই অসঙ্গত হয়। কারণ স্বভাব সহোৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন উষ্ণতা অগ্নির স্বভাব, উহা অগ্নির সহিতই উৎপন্ন, সেইরূপ স্বভাবজ কর্ম্মও জন্মের সহিতই উৎপন্ন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তবে যে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়—

সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে
নবৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

অজগর রূপী নহুষ রাজার প্রশ্নোত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে সত্য দান ক্ষমা প্রভৃতি গুণ কর্ম্ম বিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। শূদ্র হইলেই শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রাহ্মণ নহে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে একবার ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে তাহাকে কি আর ব্রাহ্মণ নহে বলাযায়? এরূপ কথা বলিলে অবশ্যই বুঝিতে হইবে জাতি ব্রাহ্মণ হইলেই পূর্ণ ব্রাহ্মণ হয় না। এই শ্লোকের প্রথম ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ জাতিব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ পূর্ণ ব্রাহ্মণ বা মুখ্য ব্রাহ্মণ। এইরূপ অর্থ ভেদ না করিলে ঐরূপ বাক্যের কোন ব্যাখ্যাই হয় না, উহা অযোগ্য বাক্য হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ সত্যাদিগুণকর্ম্মবিশিষ্ট হইলেই ব্রাহ্মণ হয় ইহা যদি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত—তবে তিনি সত্যাদি গুণ কর্ম্ম বিশিষ্ট মহাত্মা বিদুরকে ব্রাহ্মণ করিয়া লন নাই কেন? বিদুর কি তখন যুধিষ্ঠিরের কথিত সত্যাদি গুণ কর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াও ব্রাহ্মণোচিত কোন অধিকার পাইয়াছিলেন? বরং তিনি পুত্র শোকাতুর অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ নহি বলিয়া আপনাকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ

প্রদান করিতে পারি না। * আত্ম তত্ত্বানুশীলনই প্রকৃত হৃদয়ের শান্তনা। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ্য দ্বিবিধ; দেহগত ও আত্মগত, এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব প্রভৃতি। দেহগত ব্রাহ্মণত্বাদিই জাতি। উহা জন্মমূলক, কেননা 'জন'ধাতু হইতে জাতি শব্দটী সিদ্ধ হইয়াছে। জন ধাতুর অর্থ জন্ম। জন্মলব্ধ দেহগত ব্রাহ্মণ্য সহসা কুকর্ম্ম করিলেও নষ্ট হয় না! তাই মহর্ষি অত্রি—

দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥

দেব-ব্রাহ্মণ, মুনি-ব্রাহ্মণ, বিপ্র-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ব্রাহ্মণ, শূদ্র-ব্রাহ্মণ, নিষাদ-ব্রাহ্মণ, পশু ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ এই দশবিধ ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন। এবং ঐ দশবিধ ব্রাহ্মণের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ করিয়াছেন। জন্ম-মূলক ব্রাহ্মণ্য একটা না থাকিলে ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ-চাণ্ডাল ব্রাহ্মণকে তিনি ব্রাহ্মণ বলিবেন কিরূপে? বেদ বর্জ্জিত পশু ব্রাহ্মণ ও জন্মতঃ ব্রাহ্মণ। আত্মগত ব্রাহ্মণ্য সংস্কার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। যাহাতে সত্যাদি গুণ কর্ম্ম লক্ষিত হয় তাহারই আত্মগত ব্রাহ্মণ্য লাভ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কেন না সেই মহাভারতেই অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম বলিয়াছেন—

জন্মনৈব মহাভাগো ব্রাহ্মণো নাম জায়তে।
নমস্যঃ সর্ব্ব-ভূতানামতিথিঃ প্রসৃতাগ্রভুক্॥

সংস্কারাদি না হইলেও কেবল জন্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ সকলের নমস্য এবং অগ্রে অন্ন ভোজনের যোগ্য। এইরূপে জন্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য ও পূজ্যতা বলিয়া—

যে যোনিশুদ্ধাঃ সততং তপস্যাভিরতা ভৃশং।
দানাধ্যয়ন সম্পন্নাস্তেবৈ পূজ্যতমাঃ সদা।

যোনিশুদ্ধ অর্থাৎ জন্মশুদ্ধ এই জাতি ব্রাহ্মণই তপস্যা এবং দান ও অধ্যয়নাদি সম্পন্ন হইলে তিনিই সর্ব্বদা পূজ্যতম। অর্থাৎ তিনিই মুখ্য ব্রাহ্মণ।

তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্ ব্রাহ্মণ্য কারণং।
ত্রিভির্গুণৈঃ সমুদিত স্ততো ভবতি বৈ দ্বিজঃ॥

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে, তপস্যা শাস্ত্রজ্ঞান এবং জন্ম এই তিনটী পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যের কারণ। অর্থাৎ জাতি ব্রাহ্মণ না হইলে কেবল আত্মগত ব্রাহ্মণ্য দ্বারা কেহ দ্বিজ অর্থাৎ মুখ্য ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। আরও স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

* শূদ্রযোনাবহং জাতো নাতোঽন্যদ্বক্তুমুৎসহে।
কুমারস্য তু যা বুদ্ধির্বেদ তাং শাশ্বতী মহম্॥
ব্রাহ্মীং হি যোনিমাপন্নঃ সুগুহ্যমপি যো বদেৎ।
ন তেন গর্হ্যো দেবানাং তস্মাদেতদ্ ব্রবীমি তে।
মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্বান্তর্গত সনৎসুজাত পর্ব্ব॥

তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ এতদ্ব্রাহ্মণ কারণম্।
তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতি ব্রাহ্মণ এব সঃ।

বস্তুতঃ পক্ষেও জাতি গুণাধীন হইতেই পারে না। সত্যাদি সদ্‌গুণের স্ফুরণ বয়স সাপেক্ষ ভূমিষ্ঠ মাত্র বালকের সেই গুণ না থাকায় তাহার জাতি নির্ণয় অসম্ভব, অথচ তখনই তাহার জাতি নির্দ্দেশ না হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র সম্মত জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সংস্কার মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের সমন্ত্রক সংস্কার, শূদ্রের সংস্কার অমন্ত্রক—

শূদ্রোঽপ্যেবং বিধঃ প্রোক্তো বিনা মন্ত্রেণ সংস্কৃতঃ।
ন কেনচিৎ সমসৃজচ্ছন্দসা তং প্রজাপতিঃ॥ (যম)

ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র জাতকর্ম্ম করিতে হয়, তখন না হইলে অন্নপ্রাশনের সময়ে গৌণকালে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু তখনও শিশুর সদ্‌গুণাবলীর স্ফুরণ হয় না। সুতরাং জাতি নিরূপণ করিতে না পারায় সংস্কার লোপ স্বাভাবিক হইয়া উঠে। সংস্কার শব্দের অর্থ সংশোধন—মার্জ্জনা। খনিজ পদার্থকে প্রথমতঃ খনি হইতে উত্তোলিত করিলে তখন তাহার স্বাভাবিক অবস্থা বর্ত্তমান থাকে না, কিন্তু মার্জ্জনা করিলে স্বীয় রূপ ধারণ করে। সে মার্জ্জনাও কিন্তু একবিধ নহে, সুবর্ণের যাদৃশ মার্জ্জনা—সংস্কার; লৌহের তাদৃশ নহে। সুবর্ণোচিত সংস্কারে লৌহ সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। পক্ষান্তরে নিজ অনুরূপ উৎকর্ষ লাভও করিতে পারে না। সেইরূপ ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার না হইলে ব্রাহ্মণ বালকের সত্যাদি সদ্‌গুণের উন্মেষ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অপর বর্ণের ও ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারে কোন ফলোদয় হয় না। গুণাধীনজাতি স্বীকারে সংস্কারের পৌর্ব্বাপর্য্যও পার্থক্যের বিপর্য্যয় দোষ উপস্থিত হয়, কারণ বালকের স্বভাব দর্শনে জাতি নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ যে ভাবের আবেশে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার সমাহিত হইয়াছে সেই ভাবের বিপর্য্যয়ে পরবর্ত্তি-সংস্কার বিলুপ্ত বা অন্যবিধ হইতে পারে। ইহাতে সংস্কারের উদ্দেশ্য শরীর শুদ্ধি ও তাহার ফল চিত্ত-শুদ্ধি সংসাধিত হয় না।

অপিচ জাতি গুণ কর্ম্মাধীন হইলে "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" এই শ্রুতিতে দুরুত্তর ইতরেতরাশ্রয় দোষ উপস্থিত হয়। কারণ উপনয়ন সংস্কার রূপ কর্ম্ম না হইলে যেরূপ ব্রাহ্মণ হওয়া দুর্ঘট, আবার ব্রাহ্মণ ভিন্ন উপনয়নও তত্তুল্য অসম্ভব। যেহেতু শ্রুতিতে উপনয়নের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এইজন্য মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এক বাক্যে জন্মগত জাতিই স্বীকার করিয়াছেন—

সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্বক্ষত যোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়া স্তএব তে। (মনু)

অনন্য পরিণীতা স্বস্ব সবর্ণাপত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের যে সন্তান তাহারা যথাক্রমে সেই সেই জাতি হইবে। যেমন ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সন্তান ক্ষত্রিয় ইত্যাদি।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক ও ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন—

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।
অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ।

সুতরাং সকলেরই মতেই জাতি জন্মগত ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

ক্রমশঃ।

হিন্দু-সমাজ।

লেখক—পণ্ডিত শ্রীশরৎকমল ন্যায়স্মৃতিতীর্থ।

সহৃদয় পাঠকবৃন্দ! আজ হিন্দুর সমাজ, তাহার সামাজিক জীবন কিরূপ এবং তাহার সম্বন্ধ কাহার সহিত ইত্যাদি কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম কথা—হিন্দু-সমাজ কাহাকে বলে?

যে সমাজের কর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি যাবতীয় নীতি একমাত্র ধর্ম্মনীতির অধীন তাহার নাম হিন্দু-সমাজ। যে সমাজের সমগ্রনীতি একমাত্র ধর্ম্মনীতি হইতে উদ্ভূত এবং তদ্বারা পরিপুষ্ট, বর্দ্ধিত, সর্ব্বত্র প্রচারিত ও অনুষ্ঠিত সেই সমাজের নাম হিন্দু-সমাজ। যে সমাজে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রম দ্বারা মানবজীবন পরিচালিত তাহার নাম হিন্দু-সমাজ। যে সমাজ কর্ম্মের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, ধর্ম্মের চির দাস, ভগবানের পরম অনুগৃহীত—ভক্তসন্তান তাহার নাম হিন্দু-সমাজ। যে সমাজে ত্যাগের এবং নিবৃত্তির অখণ্ড একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত, যে সমাজে কষ্ট সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল মূর্ত্তি চিরকাল প্রত্যক্ষীভূত, যে সমাজ ভূত দয়া, পরসেবা, অহিংসা মন্দাকিনীর সুশীতল স্বচ্ছ বারিধারা দ্বারা সতত স্নাপিত, প্লাবিত ও পরমপূত তাহার নাম হিন্দু-সমাজ।

শেষকথা—যে সমাজরূপদেহীর ধর্ম্ম জীবাত্মা, ভগবান পরমাত্মা, ব্রাহ্মণ মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহু বৈশ্য উরু, শূদ্র গমনশক্তিবিশিষ্ট পদ এবং অন্যান্য বর্ণ বা জাতি চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাহার নাম হিন্দু-সমাজ।

হিন্দু! তুমি মনে রাখিও তুমি কর্ম্মবীরের সন্তান। এমন কর্ম্মসুশৃঙ্খলা পৃথিবীতে কোনজাতি করিতে পারে নাই বা করিতে জানেও না। তোমার কর্ম্মকে প্রথমে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ও কাম্যকর্ম্ম। যে কার্য্য না করিলে পাপ হয় অথচ করিলে কোনও পুণ্য হয় না তাহার নাম নিত্যকর্ম্ম, স্নান, সন্ধ্যা, তর্পণ, পূজাপাঠ ইত্যাদি সমস্তই নিত্যকর্ম্মের মধ্যে।

যে সময়ে গভীর নিদ্রায় সমগ্র বিশ্ব নিদ্রিত, যে সময়ে অলসতার মোহনমন্ত্রে সকলেই শয্যাক্রোড়ে জড়িত, যে সময়ে পক্ষিগণেরও জাগরণ হয় নাই, সেই পরম পূত সময়ে তোমার কর্ম্মনীতির কি সুন্দর সুশৃঙ্খলা? সে সময় তুমি প্রবুদ্ধ, সমগ্র বিশ্বের পূর্ব্বে তোমার জাগরণ, সমগ্র বিশ্বের কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে তোমার নিত্যকর্ম্মারম্ভ, এমন কি পক্ষিগণের পূর্ব্বেও জাগ্রত হইয়া সেই জ্যোতিরেক পরায়ণের ভাস্বত জ্যোতির সম্মুখে তুমি ভক্তি-গদগদভাবে প্রণামশীল। হে হিন্দু সাধক! তুমি বুঝিতে পার কি কি সুন্দর তোমার কর্ম্মনীতি, "ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থায় আত্মনোহিত চিন্তনম্, কর্ত্তব্যং চ বিশেষতঃ" ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া নিজের আত্মার হিত চিন্তা করিতে হইবে, যাহাতে আত্মার দ্বারা আত্মার উদ্ধার হয়, যাহাতে কোন

সময়ের জন্যও আত্মা অবসাদ প্রাপ্ত না হয়, যাহাতে আত্মাই আত্মার শত্রু হইয়া না বসে, অতি তীক্ষ্ণতার সহিত অতিদূর দৃষ্টির সহিত অতি বিচক্ষণতার সহিত এমনিভাবে প্রভাতকালে উঠিয়া আত্মার হিত চিন্তা করিতে হইবে।

পরে— "প্রাতরারভ্য সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্নাথ তদেব তবপূজনম্" ॥

বলিয়া সেই দয়াল ভগবানে আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক প্রাতঃকাল হইতে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য আছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে।

হে কর্ম্মবীর হিন্দু! ইহাই তোমার প্রথম কর্ম্মনীতি, এই নীতি কোন নীতির অধীন সে চিন্তা তুমি কোনদিন করিয়া থাক কি? উহা কি ধর্ম্মনীতির অধীন নহে। তুমি অজ্ঞ কুতর্কের খেয়ালে কর্ম্মহীনতার প্রভাবে সে সমস্ত হারাইয়াছ। কিন্তু আজ তোমাকে বুঝিতে হইবে ঐ কর্ম্মনীতি তোমার ধর্ম্মনীতির অধীন ছিল। এখন আমরা এই কথাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব, ঐরূপ আত্মার হিতচিন্তার পর, প্রাতস্নানের ব্যবস্থা, এই কর্ম্মানুষ্ঠানের সময় আমরা কি বলিয়া থাকি।

"সুরধনি মুনিকন্যে তারয়েঃ পুণ্যবন্তং"
সতরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্র কিন্তে মহত্বং।
যদি গতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাং,
তদপি তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বং!

মা গঙ্গে! তুমি পুণ্যবান্‌দিগকে উদ্ধার করিয়া থাক, তাহাতে তোমার কিছুমাত্র মহত্ব নাই, কারণ তাহারা ত নিজের পুণ্যবলেই উদ্ধার হইয়া থাকে, তাহাতে আর তোমার মহত্ব কি? যদি তুমি গতিবিহীন পাপীকে উদ্ধার করিতে পার তবেই তোমার মহত্ব, পাপীকে উদ্ধার করিলে যে মহত্ব তাহাই প্রকৃত মহত্ব। কি সুন্দর কথা, কি সুন্দর শরণাগতি।

ক্রমশঃ—

বিবিধ।

সন্ধ্যোক্ত দেব দেবীর মূর্ত্তিপট। কলিকাতা ৩৫ নং শূরি লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সত্যনিষ্ঠ পরহিতৈষী ও সদাচারী। তাঁহাকে বহুবিষয়েই আমরা বিশেষ ভাবে জানি। বর্ত্তমান সময়ে তিনি আর একটী সদনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি সন্ধ্যোক্ত দেব দেবীর মূর্ত্তিপট বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন। বিতরণের সময় বৈকাল ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত। যে কোন ব্রাহ্মণ এই সময়ের মধ্যে উপরের ঠিকানায় গমন করিয়া মূর্ত্তিপট লইয়া আসিতে পারেন। মফঃস্বলের গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণ গণ ঐ মূর্ত্তিপট কলিকাতার কোনও ব্রাহ্মণ বন্ধুর দ্বারা লইবেন। কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিকে দেওয়া প্রয়োজন বা প্রথাও নাই। শ্রীযুক্ত পরেশ বাবুর প্রদত্ত এই সন্ধ্যোক্ত দেব দেবীর মূর্ত্তিপট অনেকের ধ্যানধারণার সহায়তা করিবে। ব্রহ্মণ্যদেব পরেশ বাবুর দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ প্রদান করুন।

কায়স্থ ও ডোমে বিবাহ। অপ্রকাশ ঘোষ নামে ইত্যাদি—

অপ্রকাশ ঘোষ নামে জনৈক কায়স্থ গত ১৯১৩ সালে সুশীলাবালা দাসী নাম্নী জনৈক ডোম-কন্যাকে "বিবাহ" করিয়া স্বামী স্ত্রীর ন্যায় বাস করিতে থাকে। গত ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুশীলা ফরাসী চন্দন-নগরে তাহার ভ্রাতার বাড়ী হইতে আসামী ভোলানাথ মিত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। অনেক স্থানে থানাতল্লাসীর পর গত ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সুশীলাকে ভোলানাথের সহিত এলফিনষ্টোন বায়স্কোপ হইতে ভাড়াটে মোটর গাড়ী চড়িয়া ফিরিতে দেখা যায়। অবশেষে কলিকাতা ঠাকুর ক্যাসল রোডে সুশীলা ও ভোলানাথ গ্রেপ্তার হয়। ভোলানাথের বিরুদ্ধে অপরের (বিবাহিত) পত্নী ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া এবং সহবাস করার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়। একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ইহার বিচার হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ভোলানাথকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ছয় মাস শশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ভোলানাথ এই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করে।

জজ মিঃ প্যাণ্টন রায়ে বলেন,—"ফরাসী চন্দন-নগরে অপ্রকাশ ঘোষের সহিত সুশীলার যথারীতি বিবাহ হইয়াছিল এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রেজেষ্টারী করা হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে প্রমাণে কোনরূপ সন্দেহ নাই।: :এই বিবাহ হিন্দু আইন অনুসারে সিদ্ধ। হিন্দু আইন অনুসারে বিভিন্ন শূদ্র জাতির মধ্যে বিবাহ যে আইনতঃ বৈধ, এ সম্বন্ধে কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বলা হইয়াছে যে, অপ্রকাশ কায়স্থ, সুতরাং সে ডোম জাতীয়া সুশীলাকে বিবাহ করিতে পারে না, কারণ ডোম শূদ্র জাতির বাহিরে। বিশ্বনাথ দাস ঘোষ বনাম ষোড়শীবালা দাসীর মামলায় ইতঃপূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে বাঙ্গালী কায়স্থেরা শূদ্র। হিন্দু

আইন অনুসারে ঐরূপ বিবাহ যে অসিদ্ধ, ইহার সমর্থন কল্পে মনু প্রভৃতি অনেক শাস্ত্রকারের শাস্ত্রবাক্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ডোম খুব নিম্ন শ্রেণীর জাতি, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশের আদিম অধিবাসীরা কেন যে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। এইরূপ বিবাহ সামাজিক হিসাবে নিন্দনীয় হইলেও বিবাহের সমুদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে বিবাহ অবৈধ হইবার কোন হেতু নাই। পক্ষান্তরে একবারে প্রত্যক্ষভাবে ডোম সম্প্রদায় সম্পর্কিত বিবাহ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত না হইলেও ম্যাজিষ্টরের সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্ব্বক মামলায় বিচার ইতঃপূর্ব্বে অনেক হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আপীল ডিসমিস হইল।"

জজ মিঃ গ্রীভস্ জজ মিঃ প্যাণ্টনের রায়ের সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন,—"অপ্রকাশের সহিত সুশীলার হিন্দুমতে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বে তাহারা হিন্দুই ছিল। সুতরাং সুশীলা ডোম সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়। শূদ্রদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ বৈধ। কোন বিবাহ যদি সর্ব্বপ্রকারে বৈধ হয়, তাহা হইলে উহা সম্প্রদায়গত প্রথা সম্মত না হওয়ার দরুণ যে অবৈধ হইবে, তাহার কোন কারণই নাই।

কায়স্থ শূদ্র হইলেও সৎশূদ্র, ডোম অন্ত্যজ শূদ্র। শাস্ত্রে বা দেশাচারে কোনমতেই এ বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায় না। আজ বিদেশীয় বিচারকের হাতে আমাদের হিন্দুসমাজের এবং হিন্দুধর্ম্মের এরূপ গ্লানি ও দুর্গতি বড়ই দুঃখের ও লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। সমাজের কায়স্থের আসন ও ডোমের আসন কোথায়, তাহা বুঝিবার শক্তি কি এ দেশের প্রধান বিচারকের নাই? অথবা ইচ্ছা করিয়া সমাজ ধ্বংসের জন্য এরূপ জ্ঞানপাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে? সমস্ত হিন্দুসমাজ হইতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। ভারতের অন্তিম অধিবাসী বলিয়া যে উদারতা আজ বিচারক প্রবর দেখাইয়াছেন, সে উদারতা নেটালের কাফ্রীদের প্রতি দেখাইবার অবকাশ কোন ইংরাজ পাইয়াছেন কি? সমাজ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতম্মন্য বিচারকের কি ভয়ঙ্কর স্পর্দ্ধা!

ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মাবলী।

১। বর্ষগণনা—১৩১৯ সালের আশ্বিন মাসে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্বিন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত বৎসর পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩৩০ সালের বর্ত্তমান আশ্বিন হইতে ইহার দ্বাদশ বর্ষ চলিতেছে।

২। মূল্য—ব্রাহ্মণ-সমাজের বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র দুই টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকে লইতে হইলে দুই টাকা দুই আনা লাগিবে। স্বতন্ত্র ডাকমাশুল লাগিবে না। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। ব্রাহ্মণ-সমাজের মূল্য অগ্রিম দেয়। বৎসরের কোন ভগ্নাংশের জন্য গ্রাহক গৃহীত হয় না। বৎসরের যে মাসেই যিনি গ্রাহক হউন না কেন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্বিন হইতেই তাঁহার বার্ষিক চাঁদার হিসাব চলিবে।

৩। পত্রপ্রাপ্তি—ব্রাহ্মণ-সমাজ বাঙ্গলা মাসের শেষ তারিখে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোনও গ্রাহক পরমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ-সমাজ না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। না জানাইলে পরে তাঁহাদের ক্ষতি পূরণ করা কঠিন হইবে।

৪। ঠিকানা পরিবর্ত্তন—গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া—তাঁহাদের নাম ধাম পোষ্ট-অফিস ইত্যাদি যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কিম্বা অন্য প্রয়োজনে চিঠিপত্র লিখিলে অনুগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা নিজের গ্রাহক নম্বরটী লিখিয়া দিবেন।

৫। চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি—"ব্রাহ্মণ-সমাজে" কোনও প্রবন্ধাদি পাঠাইতে হইলে লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। আর সর্ব্বদাই কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিবেন। ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্পাদক প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ এ সমস্তই সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদকের নামে ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। টাকাকড়ি—৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ব্রাহ্মণসভার কার্য্যালয়ে ব্রাহ্মণসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইবেন।